তাদেরই তিনজন

ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কি

অনুবাদঃ
সুনীলকুমার দত্ত

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২
দাম : ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ নং ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

১

আজও কের্জেন্‌ৎসের গ্রামে গ্রামে আস্তিপ লুনেফ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যায়। সেখানকার বন-বাদাড়ে বিক্ষিপ্ত, নিঃসঙ্গ কবরগুলির মধ্যে যে প্রাচীনপন্থী মানুষগুলোর হাড়পাঁজর প্রতিদিন ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ধূলো হ'য়ে যাচ্ছে, আস্তিপ তাদেরই একজন।

আস্তিপ লুনেফ ছিলো চাষী : ধনী এবং অত্যন্ত লোভী এক চাষী। একটি একটি ক'রে পঞ্চাশটি বছর পার্থিব সুখ-সম্ভোগে কাটিয়ে একদিন সে গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে গেলো, বিষন্ন থেকে বিষন্নতর হ'য়ে যেতে লাগলো দিন দিন ; অবশেষে স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আশ্রয় নিলো বনে। সেখানে একটা গভীর খাতের ধারে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে তার মধ্যে আটটি বছর কাটালো সে, আটটি শীত, আটটি গ্রীষ্ম ; কাউকেই সে ঘেঁষতে দিলো না তার কাছে, এমন কি তার আত্মীয়-বন্ধুদেরও না। যদি কোন পথিক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে, হোঁচট খেয়ে থ'মকে দাঁড়াতো কুঁড়েঘরখানার সামনে, তা'হলে দেখতে পেতো দরজার গোড়ায় নতজানু হ'য়ে আস্তিপ উপাসনা ক'রছে। দেখতে দেখতে তার চেহারাটা ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো ; উপাসনা ও উপবাস-ক্লিষ্ট দেহখানা শুকিয়ে কুঁচকে একেবারে দড়ি হ'য়ে গেলো ; উপরন্তু তাকে দেখাতে লাগলো লোমাবৃত জন্তুর মতো। কাউকে দেখলে আস্তিপ উঠে দাঁড়াতো এবং আভূমি নত হ'য়ে তাকে নিঃশব্দে অভিবাদন জানাতো। কেউ তার কাছে বন থেকে বেরুবার পথের খোঁজ ক'রলে, সে তেমনি নীরবে হাতের ইশারায় পথের নির্দেশ দিয়ে আবার আভূমি নুয়ে প'ড়তো, তারপর তার কুঁড়েঘরে ঢুকে দরজাটা দিতো বন্ধ ক'রে। এই আট বছর অনেকেই তাকে দেখেছে, কিন্তু কেউই তার গলার শব্দ শোনে নি। খাবার এবং কাপড়-চোপড় নিয়ে তার স্ত্রী-পুত্ররা আসতো তার কাছে। এমন কি তাদের সামনেও সে নিঃশব্দে আভূমি মাথা নোয়াতো ;

তাছাড়া তার প্রায়শ্চিত্তের এই আট বছরের মধ্যে তাদের সংগে সে একটি কথাও বলে নি।

আস্তিপের মৃত্যু হয়, যে-বছর আদেশ জারী করা হ'লো যে, যেখানে যতো সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া হবে। ঘটনাটা এই রকম :

দলবল নিয়ে দারোগাসাহেব কুঁড়েঘরখানার সামনে পৌছে দেখলো, ঘরের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে আস্তিপ নিঃশব্দে উপাসনা ক'রছে।

দারোগা হাঁকলো : "ওহে, শুনছো ? বেরিয়ে এসো ! তোমার আস্তানাটা ভাঙবো আমরা !"

কিন্তু আস্তিপ তার কথায় কানও দিলো না। দারোগা শাসালো বারেবার, কিন্তু বৃদ্ধ তবুও পাষাণের মতো নীরব। তখন দারোগা তার লোকজনকে আদেশ ক'রলো চুলের মুঠি ধ'রে আস্তিপকে ঘর থেকে টেনে বের ক'রে আনতে; কিন্তু তারা যখন দেখলো যে বৃদ্ধ তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে সেই একই ভাবে আত্মসমাহিত হ'য়ে উপাসনা ক'রে চ'লেছে, তখন তারা বৃদ্ধের আত্মশক্তির মহিমায় চমৎকৃত হ'য়ে ওপরওলার আদেশ অমান্য ক'রলো। দারোগা তাদের হুকুম দিলো কুঁড়েঘরখানাকে ভেঙে দিতে এবং তারা নীরবে, সতর্কভাবে ঘরের চালটা ভাঙতে সুরু ক'রলো পাছে বৃদ্ধের এতোটুকুও আঘাত লাগে।

আস্তিপের মাথার ওপর তক্তাগুলোয় কুড়ুলের ঘা প'ড়তে লাগলো। ফাটা তক্তাগুলো প'ড়তে লাগলো মেঝেতে, বনে বনে কুড়ুল ঠোকার শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'লো ; সেই শব্দে ভয় পেয়ে পাখিরা চক্কর দিতে লাগলো কুঁড়েঘরখানার চার-ধারে এবং গাছের পাতাগুলো উঠলো কেঁপে কেঁপে। কিন্তু বৃদ্ধ যেন বেহুঁস, কিছু দেখছেও না শুনছেও না, শুধু একইভাবে উপাসনা ক'রে চ'লেছে। এইবার কড়িগুলো ভেঙে প'ড়তে লাগলো, কিন্তু তখনো সে নিশ্চল। যখন শেষ কড়িগুলো ভেঙে একধারে ফেলে দেওয়া হ'লো এবং দারোগা এগিয়ে এসে তার চুলের মুঠি ধ'রলো, তখন—কেবল তখন আকাশের দিকে চোখদুটি তুলে আস্তিপ অস্ফুটস্বরে ভগবানের কাছে মিনতি জানালো :

"হে করুণাময় ঈশ্বর, এদের ক্ষমা ক'রো।" এই ব'লে সে পিছনে ট'লে প'ড়লো এবং মারা গেলো।

এটা যখনকার ঘটনা আস্তিপের বড়োছেলে জাকবের বয়স তখন তেইশ এবং ছোটোছেলে তেরেন্সের বয়স তখন আঠারো। তেরেন্স ছিলো কুঁজো, লাজুক, স্বল্পবাক এবং দীর্ঘবাহু। জাকবের চেহারা ছিলো সুন্দর; তার দৈহিক শক্তিও ছিলো অসাধারণ। সে যখন নামমাত্র বালক তখনই সারা গ্রামে তার নাম র'টে গিয়েছিলো 'বেহেড জাকব' ব'লে; আর যে-সময়টায় তার বাবা মারা গেলো সেই সময় তার মতো লম্পট এবং জবরদস্ত ঝগড়াটে অত বড়ো একটা জেলাতেও ছিলো বিরল। প্রত্যেকেই নালিশ ক'রতো তার বিরুদ্ধে—নিজের মা থেকে আরম্ভ ক'রে গাঁয়ের মোড়ল, পাড়াপড়শী সবাই। তাকে গ্রেপ্তার করা হ'লো, আটকে রাখা হ'লো, এমন কি চাবকানোও হ'লো; কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, তার বুনো স্বভাবের কোনোই পরিবর্তন হ'লো না। তাছাড়া যতোই দিন যেতে লাগলো গ্রামের গোঁড়া মানুষগুলোর সংগে মানিয়ে চলা তার পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠতে লাগলো। এরা ছিলো ছুঁচোর মতো নিরীহ, আঁকড়ে থাকতো সনাতন রীতিনীতি এবং নতুন কিছু দেখলেই আঁৎকে উঠতো। এদিকে জাকব তামাক টানতো, ভদ্‌কা গিলতো, জার্মান ধাঁচের পোষাক প'রতো, কস্মিন কালেও কোনো ধর্ম-সভায় যেতো না, উপাসনাও ক'রতো না এবং ভারিক্কে মেজাজের লোকজন তাকে তিরস্কার ক'রলেই সে জবাব দিতো নাক তুলে :

"আহা, চ'টছেন কেন? আপনারা তো সকলেই গণ্যমান্য প্রাচীন লোক, আপনারাই বলুন, সব কিছুরই একটা সময় আছে তো! পাত্র আগে পূর্ণ হ'ক? আমার পাপের ঘড়া যখন পূর্ণ হবে, তখন আমিও প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো। কিন্তু এখন?—কি যে বলেন, এ তো সবে শুরু। দেখুন, আমার বাবার কথা আর আমার কাছে ব'লবেন না;—পাপ ক'রলেন তিনি ঝাড়া পঞ্চাশটি বছর, আর প্রায়শ্চিত্ত ক'রলেন মোটে আটটি বছর। আমার পাপগুলো হ'লো গিয়ে সন্ত-ফোটা পাখির গায়ে হাল্‌কা পালকের মতো; দাঁড়ান, আগে কাকের পালকের মতো আমার গায়েও পাপের পালক ছেয়ে যাক, তবে তো প্রায়শ্চিত্তের সময় আসবে!"

গ্রামের গোঁড়া লোকগুলো জাকব লুনেফকে ব'লতো "কুলাঙ্গার"। তারা ওকে ঘৃণাও ক'রতো ভয়ও ক'রতো। বাবার মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পরে জাকব

বিয়ে ক'রলো ; অবশ্য তার নিজের গ্রামের কোনো মেয়েকে নয়। সে-গ্রামের কোন্ বাপ-মা প্রাণ ধ'রে তাদের মেয়েটাকে তুলে দেবে ওর মতো একটা লম্পটের হাতে, তিরিশ বছরের কঠোর শ্রম-সঞ্চিত পৈতৃক সম্পত্তিটাকে যে লোচ্চামিতে উড়িয়ে দিয়েছে? জাকব বিয়ে ক'রলো দূরবর্তী এক গ্রামের বাপ-মা-মরা সুন্দরী একটি মেয়েকে এবং বিয়ের খরচ যোগাতে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিলো তার বাবার ঘোড়াদুটো এবং মৌচাকগুলো। ছোটো ভাই তেরেন্স এ নিয়ে কোনো ঝামেলা ক'রলো না। জাকবের রোগা মা বিছানা থেকে কর্কশ স্বরে ছেলেকে অভিসম্পাত দিলো :

"যমের অরুচি তুই! এতো অধর্ম সইবে না! এখন থেকে সাবধান হ হতভাগা!"

জাকব জবাব দিলো :

"চিন্তা ক'রো না মাগো। বাবা ঈশ্বরের কাছে আমার জন্যে সুপারিশ ক'রবেন!"

জাকব স্ত্রীকে নিয়ে প্রায় একটি বছর শান্তভাবেই ঘর-সংসার ক'রলো। এমন কি কিছু কিছু কাজও সে ক'রতো; কিন্তু অল্পদিন পরেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সে আবার লাম্পট্যে গা ভাসিয়ে দিলো, মাঝে মাঝে মাসের পর মাস বাড়িই আসতো না, শেষকালে ফিরতো মার খেয়ে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে-খুঁড়ে, ক্ষুধায় ধুঁকতে ধুঁকতে। দেখতে দেখতে জাকবের মায়ের মৃত্যু হ'লো। মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন তার বহুদিনের শত্রু গাঁয়ের মোড়লকে মেরে-ধ'রে সে পঙ্গু ক'রে দিলো এবং সেই অপরাধে তার জেল হ'য়ে গেলো। ছাড়া পেয়ে সে যখন আবার গ্রামে ফিরে এলো তখন তার মাথা নেড়া, মুখখানা বিষণ্ণ ও ভ্রূকুটি-মণ্ডিত। গ্রামবাসীরা তাকে আরও ঘৃণা ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো; কেবল তাকেই নয়, তার বাড়ির লোকদেরও, বিশেষ ক'রে নিরীহ কুঁজো তেরেন্সকে। বাল্যকাল থেকেই তেরেন্স গ্রামের ছেলেমেয়েদের উপহাসের পাত্র ছিলো। তারা জাকবের নাম দিয়েছিলো গলাকাটা আসামী, আর তেরেন্সকে তারা উপহাস ক'রতো রাক্ষস-খোক্কস ব'লে। হাজার বিদ্রূপেও তেরেন্সের মুখে রা কাটতো না, কিন্তু জাকব প্রকাশ্যভাবে শাসাতো :

"ঠিক আছে, সবুর করো, আমিও তোমাদের দেখে নেবো একদিন!"

জাকবের বয়স যখন চল্লিশ তখন গ্রামে একবার আগুন লাগে। সাব্যস্ত হ'লো জাকবই আগুন লাগিয়েছে। ফলে তাকে চালান ক'রে দেওয়া হ'লো সাইবেরিয়ায়। তার ওপর আগুনও লাগলো আর জাকবের স্ত্রীও গেলো পাগল হ'য়ে।

তখন বৌদি এবং দশ বছরের ভাইপো ইলিয়ার সমস্ত দায়িত্ব এসে প'ড়লো তেরেন্সের ঘাড়ে। ভাইপোটি মজবুত, তার মাথার চুল কালো এবং বয়সের তুলনায় সে একটু বেশি গম্ভীর। খুদে ইলিয়া পথে বেরুলেই ছেলে-মেয়েরা তার পিছু নিতো, তাকে ঢিল মারতো, আর বয়স্ক লোকজন ব'লতো :

"শয়তানের ছা, আসামীর বাচ্চা কোতাকার! অকালে যেন তুই যমের পেটে যাস্!"

তেরেন্স কোনো ভারি কাজ ক'রতে পারতো না; ছুঁচ, সুতো, আলকাতরা—এমনি সব টুকিটাকি জিনিষ ফেরি ক'রতো সে। কিন্তু সেবারকার আগুন অর্ধেকটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় লুনেফের ঘরদোর জিনিষপত্র সব কিছুই পুড়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। আগুন নিবতে দেখা গেলো পুঁজির মধ্যে আছে কেবল একটি ঘোড়া এবং গোটা সাটেক টাকা। গ্রামে আর বসবাস করা সম্ভব নয় জেনে তেরেন্স তার বৌদিকে এক গরীব স্ত্রীলোকের জিম্মায় রেখে ঠিক ক'রে দিলো যে বৌদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে স্ত্রীলোকটি পাবে মাসে বারো আনা ক'রে। তারপর একখানা পুরণো গাড়ি কিনে ভাইপোকে তাতে বসিয়ে সে ঠিক ক'রলো যে নিকটতম শহরটিতে গিয়ে সেখানে পেত্রুহা ফিলিমনফ্ নামে তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খোঁজ ক'রবে। তার আশা : দেখা হ'লে আত্মীয়টি তাকে সাহায্য ক'রবেই। পেত্রুহা ছিলো একটা হোটেলের 'চীফ বারম্যান'।

রাত্রে চোরের মতো চুপিচুপি তেরেন্স স্বগ্রাম ত্যাগ ক'রলো। বড়ো বড়ো কালো চোখদুটি ফিরিয়ে বারেবার পিছনে দেখতে দেখতে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগলো সে। ঘোড়াটা চ'লেছে ধীরে-সুস্থে, গাড়িখানা দুলছে যথেষ্ট, আর খড়ের গাদায় শুয়ে ইলিয়া ঘুমে অচেতন। মাঝরাত্রে নেকড়েবাঘের আর্তনাদের মতো একটা অদ্ভুত ভুতুড়ে শব্দে ইলিয়ার ঘুম ভেঙে গেলো। সুন্দর রাত।

গাড়িখানা থেমে গিয়েছিলো একটা জঙ্গলের ধারে। খানিক দূরেই শিশির-ভেজা ঘাসগুলো চিবচ্ছিলো ঘোড়াটা। দেখা গেলো মাথা-ভাঙা একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ-গাছ মাঠের মধ্যে গলা বাড়িয়ে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে র'য়েছে; মনে হ'লো তাকে যেন বার ক'রে দেওয়া হ'য়েছে জঙ্গল থেকে। কাকার খোঁজে ইলিয়ার খাক্লালো চোখদুটো ছটফট ক'রতে লাগলো, আর এদিকে নিস্তব্ধ রাত্রে সুস্পষ্টভাবে শোনা যেতে লাগলো মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ, তার সাঁই-সাঁই নিশ্বাস এবং সেই সংগে একটা অদ্ভুত, বিষণ্ণ, কম্প্র শব্দ যা ইলিয়ার মধ্যে ভীতির সঞ্চার ক'রলো।

মৃদুস্বরে ডাকলো ইলিয়া: "কাকু!"

তেরেন্স তাড়াতাড়ি জবাব দিলো: "কি?"

সংগে সংগে সেই আর্তনাদও হঠাৎ থেমে গেলো।

"তুমি কোথায়?"

"এই যে এখানে। ছটফট করিস্ নি, ঘুমো।"

ইলিয়া দেখলো বনের ধারে একটা ছোটো পাহাড়ের ওপর ব'সে র'য়েছে ওর কাকা। অন্ধকারে তাকে দেখাচ্ছে কালো ঢিবির মতো।

ইলিয়া ব'ললো: "আমার ভয় ক'রছে।"

"কেন, কি হ'য়েছে? ভয় পাবার কি আছে? তুই আর আমি ছাড়া এখানে তো আর কেউ নেই।"

"কে যেন কাতরাচ্ছে!"

ধীরভাবে ব'ললো কুঁজো তেরেন্স: "তুই স্বপ্ন দেখেছিস।"

"না, না, সত্যি কে যেন কাতরাচ্ছে।"

"তা হবে, কোনো নেকড়েবাঘ হয়তো,—অনেক দূরে। তুই ঘুমো।"

কিন্তু ইলিয়ার চোখে আর ঘুম এলো না। অথৈ নিস্তব্ধতা! ভয়ে তার গা ছমছম ক'রতে লাগলো এবং তার কানে তখনো বাজতে থাকলো সেই করুণ আর্তনাদ। ইলিয়া সতর্কভাবে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, দূরে জঙ্গলের মাঝখানে ঐ যে পর্বত-চূড়াটা দেখা যাচ্ছে এবং যার ওপর দাঁড়িয়ে র'য়েছে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত পাঁচ গম্বুজওয়ালা সাদা গির্জাটা, ঠিক সেই দিকেই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর কাকা। ইলিয়া জানতো ওটা হ'লো রোমোদানভ্স্কির গির্জা, যার

মাইল দেড়েক দূরে, তাদের এবং গির্জাটার মাঝখানে বনের মাঝামাঝি খাতটার কাছে যে-গ্রামটি আছে সেটি তাদেরই কিতেজ্‌নাইয়া।

ইলিয়া চিন্তিতভাবে ব'ললো :

"আমরা বেশি দূর আসি নি।"

"কি ব'লছিস ?"—জিজ্ঞাসা ক'রলো ওর কাকা।

"ব'লছি, এগিয়ে গেলেই ভালো হ'তো। ওখান থেকে যদি কেউ এসে পড়ে ?"

নিজের গ্রামের উদ্দেশে ইলিয়া অভিসম্পাত দিলো।

বিড়বিড় ক'রে ব'ললো ওর কাকা :

"এগুবো আমরা ঠিকই। একটু সবুর কর্‌।"

তারপর আবার সবকিছু নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো। তাড়াতাড়ি কোনোরকমে উঠে, গাড়ির সুমুখটায় ভর দিয়ে ইলিয়া যেদিকে তার কাকা চেয়েছিলো সেই দিকেই চেয়ে রইলো। অরণ্যের নিরেট অন্ধকারে গ্রামখানা দেখা না গেলেও তার মনে হ'লো সে যেন সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে : কুটীরগুলো, লোকজন, এমন কি রাস্তার মাঝখানে কূয়োর কাছে গ্রামের সেই বুড়ো উইলো গাছটা পর্যন্ত, যার তলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছিলো তার বাবাকে ; বাবার গায়ে ছেঁড়া শার্ট, হাতদুটো মোচড় দিয়ে পিছনে বাঁধা, আদুড় বুকখানা ঠেলে বেরিয়ে গেছে সামনে, আর মাথাটা যেন উইলো গাছের গুঁড়ির ওপর এসে প'ড়েছে ; মড়ার মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার চোখদুটো ভয়ংকর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চাষীদের দিকে। মোড়লের কুটীরের কাছে চাষীরা এসে জ'মেছে, সংখ্যায় তারা অনেক, সকলের মুখেই উৎকট বিদ্বেষ। তারস্বরে তারা চেঁচাচ্ছে আর গালাগাল দিচ্ছে। দৃশ্যটা মনে প'ড়তেই ইলিয়ার মন বিষাদে ভ'রে গেলো, কান্না জ'মলো তার গলায়। চারিধার জনহীন। ঠাণ্ডা কনকনে রাত। হাওয়া বইছে সাঁই সাঁই ক'রে। ইলিয়ার কাঁদতে ইচ্ছা হ'লো ; কিন্তু তার কাকাকে সে বিরক্ত ক'রবে কি করে ? তাই ছোট্টো দেহটাকে পুঁটুলির মতো গুটিয়ে-গুটিয়ে কান্নাটাকে সে গিলে ফেললো।

হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে আবার সেই আর্তনাদ ধ্বনিত হ'লো। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, একটু পরে ফোঁপানি এবং সেই সংগে করুণ গোঙানির শব্দ :

"ও—উ—উ—উঃ!"

শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ক্রমেই জোরালো হ'তে থাকলো। ইলিয়া তখন ভয়ে একেবারে কাঠ। চীৎকার ক'রে বললো সে :

"কাকু, তুমি কি কাতরাচ্ছো?"

তেরেন্স জবাবও দিলো না, ন'ড়লোও না। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ইলিয়া দৌড়ে গেলো ওর কাকার কাছে এবং কাকার পাদুটো চেপে ধ'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলো। ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে ও শুনতে পেলো কাকা ব'লছে :

"ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিলো। হায় ভগবান, আমরা এখন যাই কোথায়......?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ললো ইলিয়া :

"একটু সবুর করো, আমি বড়ো হ'য়ে উঠি, তারপর মজা দেখিয়ে দেবো ওদের! দেবোই তো—"

দুঃখে অবসন্ন হ'য়ে ইলিয়া ঘুমে ঢুলতে লাগলো। ওকে কোলে তুলে নিয়ে তেরেন্স শুইয়ে দিলো গাড়িতে; তারপর ফিরে গিয়ে পাহাড়ের ওপর তার জায়গাটিতে ব'সে সে আবার বিলাপ সুরু ক'রলো—ধীরে ধীরে, করুণভাবে।

শহরে পৌঁছনোর ঘটনাটা ইলিয়ার বহুদিন মনে থাকবে। একদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই সামনে চেয়ে সে দেখলো একটা প্রকাণ্ড নদী, যেমন চওড়া তেমনি ঘোলা, তার ওপারে একটা উঁচু পাহাড় যার ওপর থুকথুক ক'রছে লাল এবং সবুজ ছাদওয়ালা অসংখ্য গৃহ, আর সেগুলিকে ঘিরে র'য়েছে ঘন-সন্নিবিষ্ট দীর্ঘ বৃক্ষপুঞ্জ। পাহাড়ের গা বেয়ে বাড়িগুলো স্তরে স্তরে ওপরে উঠে গেছে, সুন্দরভাবে, একেবারে চূড়া পর্যন্ত। বাড়ির ছাদগুলো ছাপিয়ে ছোটো বড়ো গির্জার গম্বুজ এবং সোনালী ক্রুশগুলো মাথা তুলেছে আকাশের দিকে; সূর্য তখন সবে উঠেছে, তার বাঁকা আলো প্রতিফলিত হ'য়েছে বাড়ির জানলাগুলোতে; গোটা শহরটা ঝকঝক ক'রছে চুনী-পান্না-বসানো সোনার মুকুটের মতো।

ছবির মতো সুন্দর এই দৃশ্যের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠলো: "হ্যাঁ, এ একটা দেখবার জিনিষ বটে!" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে শহরটার প্রশংসা ক'রতে লাগলো সে। কিন্তু তারপরই যখন তার মনে হ'লো যে তার মতো কালো, টিকিনের ছেঁড়া পেন্টুলুন-পরা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একরত্তি একটা ছোঁড়া এবং তার ঐ কুৎসিত কুঁজো কাকাটি থাকবে কোথায়, তখন তার মন অস্বস্তিতে ভ'রে গেলো। পরিপাটী ক'রে সাজানো, সোনার মতো ঝকঝকে, ঐ প্রকাণ্ড, সমৃদ্ধ শহরটিতে তাদের কি থাকতে দেওয়া হবে? তার মনে হ'লো তাদের গাড়িখানা যে নদীর এপারেই থেমে গেছে তার কারণ, দরিদ্র, জরাজীর্ণ এবং কুৎসিত মানুষদের ঐ শহরে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হয় না, আর সেইজন্যেই হয়তো তার কাকা নগর-প্রবেশের অনুমতি ভিক্ষা ক'রতে গেছে।

কাকার খোঁজে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক চাইতেই ইলিয়ার চোখে প'ড়লো তাদের গাড়ির সামনে-পিছনে আরও অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে র'য়েছে: কতকগুলিতে কাঠের ফ্রেমে-বসানো বালতি বালতি দুধ, আবার কতকগুলিতে ঝুড়ি ঝুড়ি পাখি, শশা, পেঁয়াজ, ট্যাঁপারি এবং বস্তা বস্তা আলু। গাড়িগুলোর মধ্যে এবং কাছাকাছি অনেকগুলি চাষী স্ত্রীপুরুষকে দেখা গেলো, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে, দেখে মনে হ'লো তারা যেন এক বিশেষ ধাঁচের মানুষ, কথা ব'লছে চেঁচিয়ে, উচ্চারণ সুস্পষ্ট, এবং তাদের পরণে নীল টিকিনের পোষাক তো নেইই, বরং তার বদলে তারা প'রেছে উজ্জ্বল ক্যালিকো এবং লাল মখমলের পোষাক। প্রায় তাদের সকলেরই প'য়ে বুট। তাছাড়া কোমরে তরোয়াল নিয়ে একজন সার্জেণ্টকে নাকের কাছে ঘোরাঘুরি ক'রতে দেখেও তাদের ভয় নেই ভ্রূক্ষেপ নেই, এমন কি কেউ একটা কুনিশও জানাচ্ছে না তাকে। এসব খুব ভালো লাগলো ইলিয়ার। গাড়িতে ব'সে ঐ উজ্জ্বল, জীবন্ত এবং রঙীন ছবিখানির দিকে চেয়ে সে স্বপ্ন দেখলো একদিন সেও বুট প'রবে আর গায়ে দেবে লাল মখমলের শার্ট! অবশেষে চাষীদের মধ্যে তেরেন্স-কাকার আবির্ভাব ঘ'টলো। ইলিয়া দেখলো কাকা হেঁটে আসছে প্রসন্ন মুখে, মাথা উঁচু ক'রে, সদর্পে বালি মাড়িয়ে। খানিকটা দূর থেকে তেরেন্স ইলিয়ার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো এবং তার হাতখানা সামনে বাড়িয়ে চেটোর ওপর কি একটা জিনিষ দেখালো ইলিয়াকে।

"ভগবান আমাদের দিকে ইলিয়া, ভগবান আমাদের দিকে। তার মানে ……থাক্, তা নিয়ে ভেবে দরকার নেই। বিনা কষ্টেই দেখা পেয়ে গেলাম পেত্রুহা-কাকার। এই নে, ধর্, এখনকার মতো এইটে খা।"

এই ব'লে সে ইলিয়ার হাতে একখানা গোল খাস্তা-বিস্কুট দিলো।

প্রায় সসম্মানে বিস্কুটখানি গ্রহণ ক'রে শার্টের পকেটে সেটা লুকিয়ে, ইলিয়া অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো,

"ওরা আমাদের ঐ শহরে ঢুকতে দেবে না?"

"কে ব'ললো দেবে না? খেয়া এলেই আমরা রওয়ানা হবো।"

"আমরাও?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও। এখানে তো আর আমরা থাকতে পারি না!"

"জানো কাকু, আমার ভয় হ'চ্ছিলো ওরা হয়তো আমাদের ওখানে ঢুকতেই দেবে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমরা থাকবো কোথায়?"

"তা আমি জানি না। ঈশ্বরই একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।"

"যদি আমরা ঐ প্রকাণ্ড লাল বাড়িটায় থাকতে পেতাম!"

"দূর্ গাধা, ওগুলো যে ব্যারাক। ওখানে সৈন্যরা থাকে।"

"বেশ, তাহ'লে না হয় ঐ… ·ঐ বাড়িটায়।"

"হুঁ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত!"

শেষ পর্যন্ত ইলিয়াই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ক'রে দিলো:

"কুছ্ পরোয়া নেই, চাঁদই ধ'রবো।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তেরেন্স-কাকা ব'ললো: "কথা শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।"

এই ব'লে সে আবার কোথায় যেন চ'লে গেলো।

২

শহরের উপকণ্ঠে বাজারের কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড ছাইরঙা বাড়িতে তাদের থাকবার জায়গা জুটলো। বাড়িখানার চারধারের দেয়ালে লেপ্‌টে র'য়েছে বারমহলের অনেকগুলো খোপ-খুপরি। তাদের কতকগুলো বেশ নতুন, কিন্তু বাদবাকিগুলো নোংরা, পাঁশুটে এবং খোদ বাড়িটার মতোই বিশ্বপুরণো। দরজা-জানলাগুলো বাঁকা-বাঁকা, তাছাড়া সবকিছুই যেন ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রছে। বার-বাড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে অতগুলো বেড়া, ফটক সবকিছুই গেছে এক সংগে জড়িয়ে-মড়িয়ে; ফলে মোটমাট ছবিখানা দাঁড়িয়েছে এই: সবুজ শেওলা-ধরা পচন্ত কাঠের যেন একটা বিরাট মাকড়সা। জানলার শার্শিগুলো গেছে ঝাপ্‌সা হ'যে, বাড়ির সামনের দিকের কতকগুলো কড়ি এসেছে বেরিয়ে; আর সবশুদ্ধ মিলিয়ে বাড়িখানার চেহারা হ'য়েছে তারই অন্তর্গত হোটেলটার মালিকের মতো। তুলনা ক'রলে দেখা যাবে মালিকটিও প্রাচীন এবং তার গায়ের রঙও ছাই-ছাই, তার চোখদুটি জানলার শার্শিগুলোর মতোই ঝাপ্‌সা, এবং সে যখন তার মোটা লাঠিটায় ভর দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে তার স্থূল বপুটিকে টেনে নিয়ে যায়, তখন তার লাঠিটাও ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে।

একতলার অসংখ্য ঘুপচির একটিতে, উঠানের ধারে জানলার পাশের একটি বেঞ্চিতে তেবেন্সকাকা বাসা বাঁধলো। জানল দিয়ে দেখা যেতো উঠানে প'ড়ে রয়েছে একগাদা জঞ্জাল এবং তারই পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে একটা সুগন্ধ লেবুগাছ আর দুটো এল্‌ডার।

তিন দিন পরে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ক'রতে ক'রতে মালিকের আগমন ঘ'টলো সেখানে। হাতের লাঠিটা ইলিয়ার দিকে উঁচিযে জিজ্ঞাসা ক'রলো সে:

"তুই কাদের ছেলে র‍্যা? কোত্থেকে এসেছিস্?"

জঞ্জাল-স্তূপের পিছনে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকালো ইলিয়া। চোখ পিটপিট ক'রলেও কোনো জবাব দিলো না সে।

"বলি, এটা কাদের ছেলে এখানে? তাড়াও একে! কি রে ব্যাটা, শুনছিস? ভাগ্‌ এখান থেকে, নইলে···। এই দেখো···আ-হা-হা···খুদে

ইন্দুরটি যেন! কি? কার কি হ'স ব'ললি? যে ডিশ ধোয় তার···ছেলে! ছেলে নয়? ও—হ্—হো, তার ভাইপো! জোচ্চোর কুঁজোটার আক্কেল দেখো! বলা তো উচিত ছিলো যে তার একটা ভাইপো আছে। পেত্তের্! কি হে ভাবছো কি? কুঁজোটার একটা ভাইপোও আছে ···· এ সবের মানে কি? তাড়াও, তাড়াও ব্যাটাকে।"

হোটেলটার একটা জানলা দিয়ে উঠানে মুখ বাড়িয়ে লালমুখো 'বার-ম্যান' পেত্রুহা তার ঝোঁকড়া-চুলগুলো ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ব'ললো:

"ও এখানে সামান্য কিছুদিন হ'লো আছে, ভাসিলি দোরিমেন্দোন্তিচ্, একে বাচ্চা ছেলে, তার ওপর অনাথ। আমার অনুমতি নিয়েই ও আছে এখানে; তবে আপনি যদি বলেন আমি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এ-কথাটা কানে যেতেই ইলিয়া কাঁদতে কাঁদতে তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো মালিকের পাশ দিয়ে, তারপর ইঁদুর যেভাবে নিজের গর্তে গিয়ে ঢোকে, সেও সেইভাবে শুট্ ক'রে জানলা দিয়ে গ'লে নিজের ঘুপচিটিতে গিয়ে ঢুকলো। বেঞ্চির ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাকার ওভারকোটটা মাথায় জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো সে। কিন্তু কাকা এসে শান্ত ক'রলো তাকে:

"ও-কথা যেতে দে, ভয় পাস নি। উনি অমন মিছিমিছি ব'কেই থাকেন। বুঝতেই তো পারছিস বুড়ো হ'য়েছেন উনি, আর বুড়ো হ'লেই মানুষ আর একবার খোকা ব'নে যায়। এখানকার আসল কর্তা হ'লো পেত্রুহা, উনি নন। —যা করবার সে-ই করে। পেত্রুহার কথা শুনবি, তাকে মান্য ক'রবি,বুঝলি?"

এ-বাড়িতে এসেই ইলিয়ার প্রথম কাজ হ'লো বাড়িটার কোথায় কি আছে, তা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বার করা। অতএব যে কথা সেই কাজ। তবে বাড়িটার বিরাটত্ব দেখে অবাক হ'লো সে। অগুন্তি লোক থাকে এখানে। ইলিয়ার মনে হ'লো গোটা কিতেজ্নাইযা গ্রামে যত লোক ধরে তার চেয়েও যেন বেশি লোক ধরে এই বাড়িটায়। তাছাড়া বাড়ি তো নয়, যেন বাজার। হৈ-হল্লা লেগেই আছে। ওপর-নিচ দুটো তলা নিয়েই হোটেলটা। লোকজনের ভিড়ে সেটা হামেশাই গমগম করে। চিলেকোঠাগুলোতে থাকে কতকগুলো মাতাল মেয়ে-মানুষ। তাদের একজন হ'লো মাতিৎসা। মাতিৎসা বয়সে বড়ো, তার গায়ের

রঙটা ময়লা এবং তার পা দুখানা যখনই দেখো নগ্ন। মাতিৎসার ক্রুদ্ধ, কালো চোখদুটো ইলিয়ার মনে ভীতির সঞ্চার ক'রলো। মাটির তলার এঁদোঘরগুলোয় থাকে (১) পেৰ্ফিশ্‌কা মুচি: তার রুগ্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী এবং তার সাত বছরের মেয়েটাকে নিয়ে; (২) জেরেমিয়া: যার কাজ হ'লো ন্যাকড়া-কানি কুড়িয়ে বেড়ানো, (৩) রোগা, হট্টগোলে এক ভিখিরি-বুড়ি: যাকে ওখানকার সকলে 'একাই একশো' ব'লে ডাকে; এবং (৪) মাকার্ স্তেপানিচ্ নামে শান্তিপ্রিয়, স্বল্পবাক, মধ্যবয়স্ক এক কোচোয়ান।

উঠানের এককোণে একটা কামারশালা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আগুন জ্বলে সেখানে, আর সারাদিন ধ'রে চাকায রবার পরানো হয়, নাল বাঁধানো হয় ঘোড়ার পায়ে, হাতুড়ি-পেটার শব্দ হয় অবিশ্রাম, আর সাভেল নামে ঢ্যাঙা শক্তিমান কামারটি অফুরন্ত গান গায় তার বিষণ্ণ হেঁড়ে গলায়। সাভেলের স্ত্রী মাঝে মাঝে আসে কামারশালাটিতে। ছোটোখাটো, মোটাসোটা, ফর্শা, নীল-চোখো এই স্ত্রীলোকটির মাথায় সর্বদাই একখানা সাদা শাল জড়ানো থাকে। কামারশালাটিকে দেখায কালো গহ্বরের মতো। এর মধ্যে সাভেল-বনিতার সুন্দর মুখখানাকে অদ্ভুত বেখাপ্পা ঠেকে। প্রায় যখনই দেখো তার মুখে চকচকে হাসিটি লেগেই আছে। সাভেলও যোগ দেয় সেই হাসিতে, তবে তার হাসি আর হাতুড়ি-পেটার শব্দের মধ্যে বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বেশির ভাগ সমযেই সাভেল তার স্ত্রীর হাসির জবাবে গর্জন ক'রে ওঠে। লোকে বলে সাভেল তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, কিন্তু স্ত্রীটা হ'লো স্বৈরিণী।

বাড়িটার আনাচে-কানাচে লোক। নির্জনতা নেই একটুও। হট্টগোলে চীৎকারে বাড়িখানা গমগম করে সকাল থেকে রাত্রি পযন্ত; মনে হয় একটা পুরনো মরচে-ধরা কেৎলিতে অনন্তকাল ধ'রে কি যেন একটা ফুটেই চ'লেছে। সন্ধ্যা হ'লেই প্রত্যেকে যে যার ঘুপচি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে উঠানে চ'লে যায কিংবা ফটকের ধারে বেঞ্চিখানায় গিয়ে বসে; পের্ফিশ্‌কা-মুচি তার হার্মোনিযামটা বাজায়, সাভেল গান গায় গুনগুনিয়ে, এবং মত্তাবস্থায় থাকলে মাতিৎসা অবোধ্য ভাষায় কি যেন একটা গভীর দুঃখের গান গায় আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদে।

ওদিকে উঠানের এক কোণে বাড়ির সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়ে জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার চারিধারে গোল হ'য়ে ব'সে মিনতি জানায়ঃ

"ঠাকুর্দা, একটা গল্প বলো!"

বৃদ্ধ জেরেমিয়া তার ঝাপ্‌সা, লাল চোখদুটো তুলে ধরে এদের দিকে। তার চুনট-করা গালদুখানা বেয়ে অশ্রু গড়ায় অবিরাম। ছেঁড়া টুপিটা চোখের ওপর নাগিয়ে ক্ষীণ কম্পিত স্বরে গল্প শুরু করে সে ঃ

"একদা কোনো এক দেশে এক নাস্তিকের জন্ম হয়। আমাদের প্রভু—সেই সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর—দেখলেন যে, সন্তানটির দেহের মধ্যে তার অজ্ঞাত মাতাপিতার পাপ র'য়েছে।"

জেরেমিয়ার দাঁত নেই একটিও, মুখের গহ্বরটা কালো। হাঁ ক'রলেই তার লম্বা-পাকা দাড়িটা কেঁপে ওঠে, সেই সংগে নড়ে তার মাথাটাও এবং ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়াতে থাকে তার দুটি কুঞ্চিত গাল বেয়ে।

"এই লোকটি ছিলো দুষ্টের শিরোমণি ঃ সে যীশুখ্রীষ্টকে বিশ্বাস ক'রতো না, ভালোবাসতো না কুমারী মেরীকে, মাথা নোয়াতো না গির্জে দেখলে এবং মান্য করতো না তার বাপ কিংবা মাকে।"

ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধের কথা শোনে আর নীরবে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে তার মুখের পানে।

জেরেমিয়ার সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা হ'লো পেত্রুহার ছেলে জাকব। জাকব রোগা, টিকলো তার নাক, চুলের রঙ হাল্‌কা, গলাটা সরু কিন্তু মাথাটি প্রকাণ্ড। দৌড়বার সময় মাথাটা গলার ডাইনে-বাঁয়ে এমনভাবে দোলে যে মনে হয় ছিঁড়ে প'ড়ে যাবে। তার চঞ্চল, ডাগর চোখদুটো কেবলই ঘুরে বেড়ায় চোরের মতো এখান থেকে ওখানে, এ-জিনিষ থেকে ও-জিনিষে, থামবার নাম নেই, থামবার জো-ও নেই বুঝি; কিন্তু কোনো কিছুর ওপর একবার এঁটে ব'সলে চোখদুটো অদ্ভুতভাবে বিস্ফারিত হ'য়ে যায়, আর জাকবের মুখখানাকে দেখায় ভেড়ার মুখের মতো। একগাদা ছেলেমেয়ের মধ্যে তাকে দেখলেই চেনা যায়, কারণ তার মতো শীর্ণ বিবর্ণ মুখ এবং পরিচ্ছন্ন অক্ষত পোষাক এখানে আর কারোরই নেই। ইলিয়া চট্‌ ক'রে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললো জাকবের সংগে এবং তাদের আলাপের

অপ্রত্যাশিত। যাই হ'ক, মনে মনে ইলিয়া আবছাভাবে বুঝলো যে এ-বাড়ির ছেলেদের মধ্যে তার স্থান বেশ একটু নিচে ; ফলে পাশ্‌কার প্রতি তার শত্রু-ভাবটা যতোই বাড়তে লাগলো, জাকবের সংগে তার বন্ধুত্বটা জ'মতে লাগলো ততোই। জাকব ধীরস্থির, সে কারও সংগে মারামারি ক'রতো না, এমন কি চেঁচিয়ে কথাই ব'লতো না ; নিজে সে খেলতো না ব'ললেই হয়, কিন্তু বড়-লোকের ছেলেমেয়েরা তাদের উঠানে কিংবা পার্কে যে-সব খেলা খেলতো তা নিয়ে গল্পগুজব ক'রতে ভালোবাসতো সে। একমাত্র ইলিয়া এবং পের্ফিশ্‌কা-মুচির সাত বছরের মেয়ে মাশা ছাড়া সে আর কারোর সংগে ভাব ক'রে নি। মাশা মেয়েটি একফোঁটা, রোগা এবং লাজুক। কোঁকড়া-চুলে ভর্তি তার ছোট্টো মাথাটাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দেখা যেতো উঠানে।

মাশার মা সর্বদাই ব'সে থাকতো নিজের দোর-গোড়াটিতে, ব'সে ব'সে তার দীঘল দেহটাকে নুইয়ে সর্বদাই কিছু-না-কিছু বুনতো। তার চওড়া বিনুনিটা প'ড়ে থাকতো পিঠের ওপর। মুখ তুলে মেয়ের দিকে চাইলে ইলিয়া দেখতো মাশার মায়ের মুখখানা নীল, মাংসল এবং মড়ার মুখের মতো নির্বিকার ; নিরীহ চোখের তারাদুটি কালো, কিন্তু অভিব্যক্তিহীন। কারোর সংগেই কথা ব'লতো না সে, এমন কি মেয়েকে ডাকবার সময়ও ইশারায় ডাকতো। কচিৎ কদাচিৎ তার ধরা-গলার ফাটা ডাক শোনা যেতো :

"মাশা !"

প্রথম প্রথম যে-কোনো কারণেই হ'ক ইলিয়ার ভালো লাগতো এই স্ত্রীলোকটিকে ; কিন্তু সে যখন শুনলো যে বছর তিনেক ধ'রে তার পাদুটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে আছে এবং শীঘ্রই সে মারা যাবে তখন সে ভয় পেতে লাগলো ওকে দেখে।

একদিন তার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে হাত বাড়িয়ে ইলিয়ার শার্টটা চেপে ধ'রলো এবং ভীত ইলিয়াকে নিজের কাছে টেনে এনে ব'ললো :

"শোনো, মাশার কোনো ক্ষতি ক'রো না, ওর কোনো ক্ষতি ক'রো না !"

মনে হ'লো, কথা বলবার সময় তার দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে।

"লক্ষীটি, ওর কোনো ক্ষতি ক'রো না !"

করুণ দৃষ্টিতে ইলিয়ার মুখের দিকে একবার চেয়ে মাশার মা ইলিয়াকে ছেড়ে

দিলো। সেই থেকে ইলিয়া আর জাকব পরম যত্নে মুচির মেয়েটাকে আগলে রাখবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। মাশার মায়ের মতো একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক যে তার কাছে মিনতি জানিয়েছে, এতে বেজায় খুশী হ'য়ে গেলো ইলিয়া; কারণ আর যে-সব বয়স্ক লোক ছিলো তারা কেবল জানতো হুকুম ক'রতে এবং বাচ্চাদের ঠেঙাতে। গাড়ি ধুচ্ছে এমন সময় যদি বাচ্চা ছেলেরা তার খুব কাছাকাছি গিয়ে প'ড়তো তাহ'লে কোচোয়ান মাকার তাদের লাথি মারতো এবং ভিজে তোয়ালে দিয়ে শপাং শপাং ক'রে দু-এক ঘা কষিয়েও দিতো তাদের মুখে। কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে বিনা কাজে যদি কেউ সাভেলের কামারশালায় উঁকি মারতো তাহ'লে সাভেল যেতো চ'টে এবং কয়লার বস্তাগুলো ছুঁড়ে মারতো ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। পেফিশ্কার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কেউ যদি এতটুকুও আলো-আঁধারি ক'রতো তাহ'লে সে হাতের কাছে যা পেতো তা-ই মারতো ছুঁড়ে। মাঝে মাঝে তারা বিনা কারণে, হাতে কোনো কাজ না থাকায় কিংবা স্রেফ ঠাট্টার ছলে ছেলে-মেয়েদের ঠেঙাতো। কেবল জেরেমিয়াই মারতো না কাউকে।

অচিরে ইলিয়া সিদ্ধান্ত ক'রে ফে'ললো যে শহরে থাকার চেয়ে গ্রামে থাকা অনেক ভালো। গ্রামে সে যেখানে খুশি গিয়ে বেড়াতে পারে, কিন্তু এখানে তার কাকা ব'লেই দিয়েছে যে উঠানের বাইরে পা বাড়ানো চ'লবে না, গ্রামে সে কতো কি খেতে পারে: শশা, মটরশুটি, আরও কতো কি, কিন্তু এখানে সে সবের বালাই নেই, ট্যাকে পয়সা না থাকলে কিছু খাওয়ারও উপায় নেই, ফেলো কড়ি মাখো তেল। তাছাড়া গ্রাম কত নির্জন, কত জায়গা সেখানে, সকলের কাজও ওখানে এক, কিন্তু এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মুখঝামটা দিচ্ছে, ঠেলাঠেলি ক'রে যে যার খুশি মতো কাজ ক'রছে, তার ওপর এরা সকলেই গরীব, অপরের ফলানো অন্নে এদের উদর-পূর্তি হয় এবং এরা ক্ষুধার্ত। দিনের পর দিন উঠানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে তার মনে হ'তে লাগলো নোংরা জানলাওয়ালা এই ধূসর, ধুমসো বাড়িখানায় সে আর থাকতে পারবে না।

একদিন দুপুরবেলা খেতে খেতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তেরেন্স-কাকা ব'ললো ওর ভাইপোকে:

"বর্ষা আসছে, ইলিয়া। হ্যাঁ…তা…আসছে! বড়ো বেকায়দায় প'ড়তে হবে আমাদের। হায় ভগবান!"

বাঁধাকপির ঝোল-ভর্তি বাটিটার দিকে হতাশভাবে চেয়ে তেরেন্স একমনে ভাবতে লাগলো। ইলিয়াও সুরু ক'রলো ভাবতে। নোংরা টেবিলখানায় তাদের খাওয়া শেষ হ'লো। শোনা গেলো হোটেলের মধ্যে একটা বীভৎস গণ্ডগোল হ'চ্ছে।

"পেত্রুহার ইচ্ছে ওর জাকবের সংগে তোকেও আমি যেন ইস্কুলে পাঠাই। ইচ্ছে কি আমারও নেই? ষোলো আনাই আছে। কথায় ব'লে, মুখ্যু হ'য়ে থাকাও যা আর অন্ধ হ'য়ে থাকাও তাই। বুঝি সবই! কিন্তু ইস্কুলে পাঠাতে হ'লে এক আধ জোড়া ভালো পোষাকও তো দিতে হবে তোকে! এই মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে এ-সব জোটাবো কোত্থেকে! হায় ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা!"

কাকার ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস এবং বিষণ্ণ মুখখানা ইলিয়াকে অত্যন্ত ব্যথিত ক'রে তুললো। ধীরে ধীরে বললো সে:

"চলো এখান থেকে আমরা চ'লে যাই।"

বিষণ্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো কুঁজো তেরেন্স:

"কোথায়, কোন চুলোয় যাবো আমরা?"

ইলিয়া ব'ললো: "বনে।" তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে চ'ললো সে: "বলো তো কতো বছর ধ'রে আমার ঠাকুর্দা একলাই বনে কাটিয়েছিলেন! আর আমরা তো দু'জন! লেবুগাছের ছাল ছাড়াবো আমরা; 'দুষ্টু' কর্ণেই-এর মতো শেয়াল শিকার করবো, কাঠ-বেড়াল শিকার ক'রবো। আমি পাতবো ফাঁদ, আর তুমি বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রবে। তাছাড়া আমি কত্তো রকমের পাখি ধ'রবো। তাই না? তারপর সেখানে রাশি রাশি ট্যাপারি আছে, বেঙের ছাতা আছে। সত্যি কাকু, চলো আমরা চ'লে যাই।"

মুচকি হেসে ভাইপোর দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো তেরেন্স-কাকা:

"কিন্তু সেখানে যে অনেক বাঘ ভাল্লুক আছে; সেগুলোর কি হবে?"

উত্তেজিতভাবে জবাব দিলো ইলিয়া:

"বন্দুক থাকলে ভাল্লুক, নেকড়েবাঘ কি ক'রবে? আমি যখন বড়ো হবো, এত্তোটুকুও ভয় ক'রবো না জন্তু জানোয়ারকে। দু'হাতে তাদের গলা টিপে মারবো! বলে, এখনই আমি ডরাই না কাউকে! এখানে বাঁচা শক্ত। বাচ্চা ছেলে হ'লেও আমি বুঝি সব। গাঁয়ের লোকজন মারামারি করে সত্যি কিন্তু এখানকার লোকগুলো তার চেয়েও বিচ্ছিরিভাবে মারামারি করে। সবই দেখি সবই বুঝি, কাঠের পুতুল তো আর নই! ওই কামারটা যখন মাথায় গাঁট্টা মারে, সারাটা দিন মাথায় সেই ব্যথা টের পাই না আমি? আর, যতোই দেমাক দেখাক না কেন, এখানকার লোকগুলো হরদম মার খাচ্ছে, হরদম।"

"ম'রে যাই মানিক আমার!"—এই ব'লে চামচখানা ফেলে দিয়ে তেরেন্স তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেলো।

সেই সন্ধ্যায় উঠানে চক্কর দিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লো ইলিয়া, এবং আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় কাকার টেবিলের পাশে মেঝেটিতে ব'সে তেরেন্স জেরেমিয়াকে যা কিছু ব'ললো তার সব কিছুই শুনলো সে। জেরেমিয়া হোটেলে এসেছিলো চা খেতে। কুঁজো তেরেন্সকে সে ভালোবাসতো খুবই এবং প্রতিদিন কাজের শেষে বাড়ি ফিরে তেরেন্সের টেবিলের কাছটিতে ব'সে চা খেতো।

ইলিয়া শুনলো জেরেমিয়া ফাটা গলায় ব'লছে:

"মন খারাপ ক'রো না। ভগবানের ওপর শুধু আস্থাটি রাখো, আর দিনরাত মনে মনে তাঁর নাম জপ করো! তুমি হ'লে তাঁর নফর,—শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বরের গোলাম আমরা, যা কিছু তোমার, সবই তাঁর; ভালোমন্দ তা-ও তাঁর! ভাঙা কপাল তিনিই আবার জোড়া দিয়ে দেবেন। তিনি তোমায় দেখছেন, ঈশ্বর যে সর্বদ্রষ্টা! একদিন আসবে যখন তিনি তাঁর কোনো দূতকে ব'লবেন: যাও, আমার বিশ্বস্ত গোলাম তেরেন্সকে একটু সুখী ক'রে এসো। আর সেই দিনই তুমি সুখী হবে,—সেদিন আসবে!"

তেরেন্স মৃদু স্বরে ব'ললো:

"ঠাকুর্দা, ঈশ্বরই আমার একমাত্র ভরসা, আমি আর কীই বা ক'রতে পারি? আমার বিশ্বাস, তিনি আমায় টেনে তুলবেনই!"

"কে? ঈশ্বর? বিশ্বাস করো, পৃথিবীর কোনো মানুষকেই তিনি ত্যাগ ক'রবেন না। পৃথিবীটা যে তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তার কারণ,

তিনি আমাদের পরীক্ষা ক'রতে চান, দেখতে চান আমরা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি কি না। স্বর্গ থেকে তিনি দেখছেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসছি কি না। 'আমার কথা মতো তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসো তো?'—এটা তো তাঁরই কথা! আর তিনি যদি দেখেন যে তেরেন্সের বড়োই দুঃসময় যাচ্ছে, তাহ'লে তিনি জেরেমিয়ার কাছে বাণী পাঠিয়ে ব'লবেন: জেরেমিয়া, আমার ভৃত্যকে সাহায্য করো!"

তারপর রেগে গেলে 'বারম্যান' পেত্রুহার গলার আওয়াজটা যেমন শোনায় ঠিক সেইভাবে তার কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ ব'দলে, বৃদ্ধ জেরেমিয়া ব'ললো তেরেন্সকে:

"ইলিয়ার পোষাকের জন্যে আমি তোমায় পাঁচ টাকা ধার দেবো। একটু রেখে-বেঁধে চ'ললেই টাকাটা যোগাড় হ'য়ে যাবে। পরে পয়সাকড়ি হ'লে ওটা শোধ দিও।"

বিস্মিত তেরেন্স মৃদুস্বরে ব'ললো: "ঠাকুর্দা!"

"থামো, চুপ করো! আপাতত ছেলেটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। এখানে ওর কিছুই করবার নেই। ও বরং আমার কাজে একটু-আধটু হাত লাগাক। ও যদি ন্যাকড়া-কানি বা হাড়ের টুকরোগুলো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে এই বুড়োকে আর পিঠটা নোয়াতে হয় না।"

খুশি হ'য়ে কুঁজো চেঁচিয়ে উঠলো:

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!"

"ঈশ্বর আমাকে দেন, আমি তোমাকে দিই, তুমি তাকে দাও, সে আবার দেয় আর কাউকে,—এমনি ক'রে চ'লে যায় ঈশ্বরের কাছে। চাকাটা ঘুরছে এই ভাবেই; কেউই কারোর কাছে ঋণী হ'য়ে থাকবে না। হা-হা-হা! কী ব'লবো, বুঝলে ভায়া, বেঁচে আছি অনেকদিন, দেখলামও তো অনেক কিছু; কিন্তু যা জেনেছি তা এই: ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। যা দেখছো সবই তাঁর, যা দেখছো সবই তাঁর নিমিত্ত, যা দেখছো সবই এসেছে তাঁর কাছ থেকে।"

শুনতে শুনতে শব্দগুলির প্রশান্ত ধ্বনিতে ঘুমিয়ে প'ড়লো ইলিয়া। তারপর ভোর হ'তেই জেরেমিয়া তাকে ডেকে দিয়ে ব'ললো:

"চলো ইলিয়া, বেরিয়ে পড়ি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো! চোখ খুলে চেয়ে দেখো। নাও, নাও, চোখ খোলো!"

জেরেমিয়া ঠাকুর্দার আওতায় ইলিয়া এক মজার জীবন শুরু ক'রলো। ভোর হ'লেই বৃদ্ধ তাকে জাগিযে দিতো এবং তারা প্রতিদিন এক নাগাড়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরময় ঘুরে ঘুরে কুড়িয়ে বেড়াতো ন্যাকড়া-কানি, হাড়, ছেঁড়া কাগজ, লোহার টুকরো, চামড়ার ফালি,—এই সব। শহরটা বড়ো, দেখবার জিনিষও ছিলো প্রচুর ; তাই প্রথমটায় বৃদ্ধের কাজে ইলিয়ার মন ব'সলো না। কাজ ফেলে রেখে সে লোকজন, ঘরবাড়ির দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতো এবং যা দেখতো তাতেই অবাক হ'য়ে প্রশ্ন ক'রতো হরদম। জেরেমিয়াও কথা ব'লতে ভালোবাসতো। এটা-ওটার খোঁজে মাথা নুইয়ে পাথরের টালিগুলোর ওপর তার লাঠির লোহা-বাঁধানো মুখটা ঠুকতে ঠুকতে পথে পথে হাঁটতো সে এবং সেইসঙ্গে তার শার্টের ছেঁড়া আস্তিনে কিংবা নোংরা থলির প্রান্তটা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে একঘেয়ে একটানা গলায় তার সাকরেদের সঙ্গে কথাও ব'লতো অবিশ্রাম।

"এই বাড়িটা হ'লো এক কারবারীর—সাভ্‌ভা পেত্রোভিচ্ প্‌ৎচেলিনের। বেশ বড়ো লোক এই প্‌ৎচেলিন। খাবার খায় রূপো আর ফটিকের বাসনে।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রতো ঃ "ঠাকুর্দা, লোকে বড়ো লোক হয় কি ক'রে ?"

"কি ক'রে আবার, খেটে—মানে, কাজ ক'রে। যারা বড়োলোক হ'তে চায় তারা দিনরাত কাজ করে এবং দিনরাত টাকা জমায়। আর, যখন দেখে যে টাকা জ'মেছে যথেষ্ট, তখন তারা বাড়ি তোলে, ঘোড়া কেনে, বাসন-কোসন কেনে, আরও কতো কি। সেগুলো আবার একেবারে নতুন! এরপর তারা চাকর রাখে, লোকজন ভাড়া করে—নানা রকমের লোক—যারা তাদের হ'য়ে কাজ করে, আর তারা তখন নিশ্চিন্তে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে দিন কাটায়। দেখে লোকে বলে ঃ হ্যাঁ, লোকটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছ'পয়সা ক'রেছে, জোচ্চুরির পয়সা নয়। কিন্তু কতকগুলো লোক আছে যারা জোচ্চুরি আর পাপের মধ্যে দিয়ে বড়ো লোক হয়। শোনা যায়, যুবা বয়সেই প্‌ৎচেলিন পাপে আত্মাটুকু খুইয়েছিলো। লোকে হয়তো হিংসায় এ-কথা বলে, কিংবা এটাই হয়তো সত্যি। তবে প্‌ৎচেলিন লোকটা বদ, আড়চোখে চায়, চোখের

তারাছুটো ডাইনে বাঁয়ে ঘোরায় এবং চোখছুটো কেবলই লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু এমনও হ'তে পারে প্‌ৎচেলিন সম্বন্ধে যা শোনা যায় তা মিথ্যে। মাঝে মাঝে মানুষ আবার হঠাৎ বড়লোকও হ'য়ে যায়; সেটা স্রেফ ভাগ্যের জোরে, আর বিধাতার আশীর্বাদে।"

এই ব'লে ক্লান্ত পা ছুখানায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে জেরেমিয়া আবার শুরু করতো:

"একমাত্র ঈশ্বরের জীবনই সৎ; এছাড়া আমরা কেউই কিছু জানি না। মানুষ হ'লো ঈশ্বরের বীজ। সেই বীজ পৃথিবীর মাটিতে বুনে ঈশ্বর বলেন: এবার তোমরা গাছের মতো বেড়ে ওঠো, আর আমি ওপর থেকে দেখি কোন্ ধরণের ফল ধ'রছো তোমরা! এই ভাবে জগৎ চ'লছে ইলিয়া।...ঐ যে বাড়িখানা দেখছো, ওটা পাভ্‌লিচ্‌ সাবানেইএফের। লোকটা প্‌ৎচেলিনের চেয়েও বড়ো লোক এবং এক নম্বরের শয়তান। আমি অবিশ্যি তার বিচার ক'রছি না, বিচার করবার মালিক ঈশ্বরই; তবে আমি ভালো ক'রে জানি মিত্রি পাভ্‌লিচ্‌ একটা পাকা বদমাশ। ও ছিলো আমাদেরই গ্রামের গোমস্তা; রক্তটুকু পর্যন্ত চুষে নিয়ে ও আমাদের সকলকে পথে বসিয়ে গেছে। বহুদিন ধ'রে ঈশ্বর ওকে কিছুই বলেন নি। শেষটায় তিনি শাস্তি দিলেন ওকে। প্রথমে মিত্রি পাভ্‌লিচ কালা হ'য়ে গেলো, তারপর ওর ঘোড়াগুলো মেরে ফেললো ওর ছেলেটাকে। তাছাড়া শোনা যায় কিছুদিন আগে ওর মেয়েটাও নাকি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।"

বৃদ্ধ জেরেমিয়া শহরের সব খবর রাখতো, সকলকে চিনতো এবং সবকিছুই ব'লতো সরল বিশ্বাসে। রাগ বা হিংসার ছিটেফোঁটাও থাকতো না তার গলায়। মনে হ'তো তার প্রত্যেকটি কথা খাঁটি, প্রত্যেকটি কাহিনী যেন তার চির-বহমান চোখের জলে ধোয়া।

বড়ো বড়ো বাড়িগুলো দেখতে দেখতে ইলিয়া মন দিয়ে বৃদ্ধের কথা শুনতো আর ব'লতো মাঝে মাঝে:

"যদি একবার উঁকিও মারতে পারতাম ভেতরে!"

"পারবে, পারবে, একটু সবুর করো। এখন কাজ শেখো আর খাটো। বড়ো হ'লে সবকিছুই দেখবে। কে জানে, তুমি হয়তো নিজেই তখন পয়সাওলা

লোক হ'য়ে যাবে! বাঁচতে চেষ্টা করো, চেষ্টাটা চালু রাখো। অনেকদিন বাঁচলাম, অনেক কিছু দেখলাম,……উঃ… · এখানে থেকে থেকে আর দেখে দেখে নিজের চোখদুটো নষ্ট ক'রেছি ; হামেশা জল পড়ে ; তাইতো আমি এতো রোগা আর অসুস্থ। একদিকে চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে রক্ত যাচ্ছে শুকিয়ে!"

ঈশ্বর সম্বন্ধে জেরেমিয়া যা-কিছু বলতো তার সবটুকুতেই থাকতো দরদ এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা ; তাই ইলিয়ারও তা শুনতে ভালো লাগতো। শুধু তাই নয়, জেরেময়ার দরদ-মাখা কথাগুলো শুনতে শুনতে সুন্দর ও আনন্দময় ভবিষ্যতের একটা প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ আশায় তার বুকখানা নেচে উঠতো। দেখতে দেখতে ইলিয়া আগের চেয়ে আরও প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো এবং তার ছেলেমানুষিও গেলো বেড়ে। পুরো দমে আবর্জনার গাদায় খোঁজ-তল্লাশ চ'লতে লাগলো এবং প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ইলিয়া সেই কাজে জেরেমিয়াকে সাহায্য ক'রতেও শুরু ক'রে দিলো। লাঠি দিয়ে জঞ্জালের স্তূপগুলো হাঁটকাতে খুবই ভাল লাগতো তার ; তবে বিশেষ ক'রে অপ্রত্যাশিত কিছু জুটে গেলে বৃদ্ধ জেরেমিয়ার মুখখানা যখন আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো তখন তারও খুশির অবধি থাকতো না। একদিন ইলিয়া ডাষ্টবিন থেকে খুঁজে বার ক'রলো একখানা রূপোর চামচ। সেজন্য জেরেমিয়া তাকে এক পো ঝাল-বিস্কুট কিনে দিলো।

আর একদিন সে আবিষ্কার ক'রলো সবজে ছাতা-ধরা একটা মনিব্যাগ, যার মধ্যে পাওয়া গেলো প্রায় পাঁচসিকে পয়সা। মাঝে মাঝে তাদের বরাতে জুটে যেতো ছুরি, কাঁটা, ইস্ক্রুপ, ভাঙা তামার বাসন, আস্তো টিন, এই ধরণের নানান জিনিষ। একবার একটা খাতের মধ্যে যেখানে সারা শহরের আবর্জনা জমা হয়, সেইখান থেকে ইলিয়া খুঁজে বার ক'রলো পিতলের একটা ভালো এবং ভারি বাতিদান। প্রত্যেকটি দামী জিনিষের জন্য জেরেমিয়া তাকে একটি ক'রে উপহার দিতো।

দামী জিনিষ খুঁজে পেলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতো ইলিয়া :

"ঠাকুর্দা, দেখো দেখো, কি বার ক'রেছি তোমার জন্যে!" আর বৃদ্ধ জেরেমিয়া উৎকণ্ঠায় অধীর হ'য়ে আশপাশ দেখতে দেখতে সাবধান ক'রে দিতো ইলিয়াকে :

"অতো চেঁচাতে নেই! চেঁচিও না! সবই তাঁর দয়া!"

অপ্রত্যাশিত কিছু পেলেই জেরেমিয়া ঘাবড়ে যেতো এবং চট্ ক'রে ইলিয়ার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতো তার প্রকাণ্ড থলিটায়।

সাফল্যে উত্তেজিত হ'য়ে ইলিয়া সগর্বে চেঁচিয়ে উঠতো:

"দেখো, এবার কি মোক্ষম জিনিষ পেয়েছি!"

সংগে সংগে বৃদ্ধ চাপা গলায় ব'লতো: "চুপ চুপ, চেঁচিও না বাপ্!" আর, তার দুর্বল লাল চোখদুটো দিয়ে অনবরত জল ঝ'রতে থাকতো।

ইলিয়া চেঁচাতো আবার:

"ঠাকুদা, দেখো দেখো, কি বড়ো একটা হাড়!"

হাড় কিংবা ন্যাকড়া পেলে জেরেমিয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনাই দেখা যেতো না। ইলিয়ার হাত থেকে সেগুলো নিয়ে কাঠি দিয়ে ময়লাটা চেঁচে ফেলে দিয়ে, সেগুলো সে চুপচাপ রেখে দিতো তার থলিটার মধ্যে। জেরেমিয়া ইলিয়াকেও একটা ছোটো থলি বানিয়ে দিয়েছিলো, তাছাড়া লোহা-বাঁধানো ছুঁচলো একটা লাঠিও দিয়েছিলো তাকে। এই লাঠিটার জন্যে ইলিয়ার গর্বের সীমা ছিলো না। নানা রকমের বাক্শো, ভাঙা খেলনা, কাঁচ বা চিনেমাটির সুন্দর সুন্দর টুকরো দিয়ে সে ভর্তি ক'রতো তার থলিটা; তারপর সেটা পিঠে নিয়ে হাঁটবার সময় ভারি মজা লাগতো তার; শুধু তাই নয়, সে কান পেতে শুনতো জিনিষগুলোর মধ্যে কেমন মজাদার ঠোকাঠুকির শব্দ হ'চ্ছে। জেরেমিয়া-ঠাকুদার কাছে সে শিখলো কেমন ক'রে এই সব জিনিষ যোগাড় ক'রতে হয়।

"এগুলো কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাও। বাচ্চাদের দিলে তারা খুশি হবে; আর মানুষকে আনন্দ দেওয়াটা বড়ো ভালো কাজ ইলিয়া। ঈশ্বরও তাতে খুশি হন। কি ব'লবো বাপ্, সব মানুষই আনন্দ চায়, কিন্তু ও-জিনিষটা বড়ো কম এই দুনিয়ায়,—এতো কম যে সারাটা জীবন ধ'রে খুঁজেও আনন্দের হদিস্ পাওয়া যায় না!"

পথে পথে ঘুরে নানান আঁস্তাকুড় হাঁটকানোর চেয়ে ইলিয়া ঢের বেশি পছন্দ করতো শহরের বাইরের আবর্জনা-স্তূপগুলোকে। জেরেমিয়ার মতো

জন-দুই-তিন বুড়ো ছাড়া সেখানে আর কেউই জঞ্জাল ঘাঁটতে যেতো না। তাছাড়া সেখানে ঝাড়ুদারের ভয়ও ছিলো না। কিন্তু শহরের আঁস্তাকুড়ে কখন যে কোন্ ঝাড়ুদার এসে প'ড়বে তার ঠিক কি? এসে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে তো দেবেই, উপরন্তু হয়তো ঝাঁটার বাড়িও বসিয়ে দেবে দু'ঘা।

প্রতিদিন দু-এক ঘণ্টা জঞ্জাল হাঁটকানোর পর জেরেমিয়া ইলিয়াকে ব'লতো:

"থাক, এবার একটু থামাল দাও ইলিয়া! এসো খানিক জিরিয়ে নিই, কিছু মুখে দিই।"

এই ব'লে সে তার শার্টের পকেট থেকে একখণ্ড রুটি বার ক'রতো এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে সেই রুটির এক টুকরো দিতো ইলিয়াকে, আর অপর টুকরো নিতো নিজে। খাওয়া শেষ হ'লে তারা একটা খাতের ধারে শুয়ে আধ ঘণ্টাটাক জিরিযে নিতো; শুয়ে শুয়ে দেখতো খাতটা গিয়ে মিশেছে নদীতে, আর চওড়া রুপোলী-নীল নদীটা ব'য়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ইলিয়ার ইচ্ছা হ'তো ঐ নদীতে ভেসে যেতে! ওপারে দেখা যেতো একটানা সবুজ মাঠ যার ওপর খড়ের গাদাগুলোকে দেখাতো ধূসর গম্বুজের মতো; আর বহুদূরে নীল দিগন্তে স্পষ্ট দেখা যেতো অরণ্যের আঁকাবাঁকা একটা কালো রেখা। প্রশান্ত মাঠগুলো ঝলমল করতো রোদে, মেঠো বাতাসটাও ছিলো নির্ভেজাল, স্বচ্ছ ও মধুর; কিন্তু ঐ খাতের আশপাশের হাওয়াটা পচন্ত জঞ্জালের দুর্গন্ধে জমাট বেঁধে থাকতো. যার দরুণ ইলিয়ার নাক-চোখ যেতো জ্ব'লে, এমন কি জেরেমিয়ার মতো তার চোখ দিয়েও জল গড়াতো।

বৃদ্ধ জেরেমিয়া ব'লতো:

"চেয়ে দেখো ইলিয়া, পৃথিবীটা কত বড়ো। এই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ বাঁচার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছে, আর স্বর্গ থেকে ঈশ্বর সবকিছুই দেখছেন। তিনি জানেন না এমন কিছুই নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তাই তাঁকে বলা হয় সর্বজ্ঞ। তিনি সব জানেন, সব বোঝেন এবং সব মনে রাখেন। তোমার পাপ তুমি মানুষের কাছে লুকোতে পারো। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে পারবে না। তিনি চেয়ে চেয়ে দেখেন আর বলেন: ওরে পাজী নরাধম, সবুর কর্, তোর দিন ঘনিয়ে আসছে! আর, সময়টি হ'লেই তিনি শাস্তি দেন—সে শাস্তি বড়ো

কঠোর। পরস্পর পরস্পরকে তিনি ভালোবাসতে ব'লেছেন; তাছাড়া তাঁর বলা-ই আছে যে, যদি কোনো মানুষ কাউকে ভালো না বাসে, তাহ'লে তাকেও কেউ ভালোবাসবে না; সারাটা জীবন তাকে একলা কাটাতে হবে; আর সে-জীবন যেমন ভয়ংকর তেমনি দুঃখের।"

চিৎ হ'য়ে শুয়ে ইলিয়া দেখতো আকাশের অন্ত নেই। একটা বিষণ্ণ তন্দ্রায় এলিয়ে আসতো তার দেহ এবং নানা অদ্ভুত কল্পনায় ভ'রে যেতো তার মনটা। তার মনে হ'তো, আকাশে এমন একটা কিছু ভাসছে যা বিরাট ও অনির্বচনীয়, যা নয়নাভিরাম ও উত্তেজনাময়, যা স্বচ্ছতায় ভাস্বর ও কঠোর-কোমল। আরও মনে হ'তো, গোটা পৃথিবীর সংগে বৃদ্ধ জেরেমিয়া আর সেও যেন উড়ে চ'লেছে সেইদিকে, সেই অসীম উচ্চতায়, সেই নিষ্কলুষ দীপ্ত নীলিমায়। তখন তার হৃদয় ভ'রে যেতো এক স্নিগ্ধ, প্রশান্ত আনন্দে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সদর দরজায় পা দিয়েই ইলিয়া এমন একটা ভাব দেখাতো যেন সে একটা যে-সে লোক নয়, দস্তুরমতো কাজের লোক সে এবং সারাদিনের কাজকর্ম সেরেই সে বাড়ি ফিরছে; সুতরাং কোনো বালখিল্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই এবং এখন সে একটু বিশ্রাম চায়। তার গাম্ভীর্যের প্রতি ছেলেমেয়েগুলোর কেমন একটা শ্রদ্ধা ছিলো, তাছাড়া তার পিঠের ঝুলিটাও তার দাম দিয়েছিলো বাড়িয়ে। ঝুলিটার মধ্যে রোজই থাকতো নানা রকমের মজার মজার জিনিষ।

জেরেমিয়া ছেলেমেয়েগুলোর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে কিছু না কিছু রসিকতা ক'রতোই:

"খবর কি গো? আমরা তো গোটা শহর খুঁচিয়ে এলাম! ইলিয়া, হাত মুখ ধুয়ে হোটেলে চা খাবে এসো।"

মাতব্বরের মতো ব'কতে ব'কতে ইলিয়া তার এঁদো ঘরখানার দিকে পা বাড়াতেই ছেলেমেয়েগুলো দলবেঁধে তার পিছু নিতো, এবং যেতে যেতে ইলিয়ার ঝুলিটা সাবধানে টিপে-টাপে দেখতো। আর, পাশ্কা ইলিয়ার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ব'লতো উদ্ধতভাবে:

"কী এনেছো, দেখাও আমাদের!"

উন্নাসিক ভংগিতে জবাব দিতো ইলিয়া:

"দাঁড়াও, আগে চা খাই, তারপর দেখাবো।"

হোটেলে তাকে দেখেই তার কাকা মিষ্টি হেসে ব'লতো :

"এই যে, খুদে রোজগেরে ফিরেছে দেখছি! হ্যাঁরে, ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিস?"

তাকে রোজগেরে ব'ললে ইলিয়া খুশি হ'তো। অবশ্য কাকা ছাড়া আরও কেউ কেউ তাকে এই নামে ডাকতো। একদিন পাশ্‌কা কি-একটা দুষ্কর্ম ক'রে ফেলায় সাভেল তাকে চেপে ধ'রলো, তারপর তার মাথাটা হাঁটুদুটোর মধ্যে গুঁজে দড়ি দিয়ে তাকে চাবকালো বেধড়ক এবং চাবকানোর তালে তালে ব'লতে লাগলো বারেবার :

"পাজি বদমাশ কোতাকার, আর এমন বাঁদরামো ক'র'ব? তোর ছাল ছাড়িয়ে নেবো আমি! বল্ আর ক'রবি? কিরে, ক'রবি আর? বল্ আর ক'রবি কি না। তোর মতো বয়েসে কতো লোকের ছেলেপুলে নিজেরটা নিজেই যোগাচ্ছে, আর তুই খালি গণ্ডেপিণ্ডে গিলছিস আর জামা ছিঁড়ছিস।" রাগে, যন্ত্রণায় পাশ্‌কা যতো চেঁচায় আর পা ছোঁড়ে, সাভেলের দড়িও তার পিঠে পড়ে ততো জোরে। শত্রুর দুরবস্থা দেখে মনে মনে কেমন যেন একটু খুশি হ'লো ইলিয়া এবং পাশ্‌কার চেয়ে তার দাম যে বেশি এটাও সে বুঝলো সাভেলের কথায়। তবে সংগে সংগে তার দুঃখও হ'লো পাশ্‌কার জন্যে। হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'ললো সে :

"সাভেল-কাকা, আর মেরো না ওকে! সাভেল-কাকা!"

ছেলের পিঠে শেষ বাড়িটি বসিয়ে সাভেল ইলিয়ার দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ব'ললো :

"তুই থাম্ হতভাগা! ভারি আমার দরদী রে! দাঁড়া, এবার তোকেও দিচ্ছি দু'ঘা।"

অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে পাশ্‌কা উঠানের এক কোণে চ'লে গেলো। সান্ত্বনা দেবার জন্যে ইলিয়াও গেলো তার পিছনে পিছনে। হাঁটু গেড়ে ব'সে দেয়ালে কপাল রেখে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে পাশ্‌কা কেঁদে উঠলো আরও জোরে। ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো তাকে দুএকটা মিষ্টি কথা বলে। তার বদলে সে শুধু জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"লাগছে?"

পাশ্‌কা খিঁচিয়ে উঠলো: "যাযাঃ ভাগ্‌।"

এতে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে মুরুব্বীর মতো ব'ললো ইলিয়া:

"তুমি সবাইকে ধ'রে ধ'রে মারো, এবার তোমার পালা—।" কিন্তু ইলিয়ার কথা শেষ হবার আগেই পাশ্‌কা তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে ফেলে দিলো। ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে ইলিয়াও চেপে ধ'রলো পাশ্‌কাকে। তারপর শুরু হ'লো ধ্বস্তাধ্বস্তি। পাশ্‌কা যতোটা পারলো ইলিয়াকে আঁচড়ালো কামড়ালো, আর ইলিয়া পাশ্‌কার চুলের মুঠি ধ'রে তার মাথাটা ঠুকতে লাগলো মাটিতে। শেষটায় পাশ্‌কা চীৎকার ক'রে ব'লতে বাধ্য হ'লো:

"ছাড়্‌ ব'লছি!"

তখন দাঁড়িয়ে উঠে বিজয়ী ইলিয়া সগর্বে ব'ললো:

"সেই ভালো। দেখছো তো তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশি। তার মানে: আমার পেছনে লাগলেই মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দেবো!"

শার্টের হাতায় মুখের রক্তটা মুছতে মুছতে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। উঠানের মাঝখানে রাগে ভ্রূকুটি ক'রে দাঁড়িয়েছিলো সাভেল। তাকে দেখেই ভয়ে কাঠ হ'য়ে থ'মকে দাঁড়ালো ইলিয়া। তার নিশ্চিত ধারণা হ'লো যে, ওর ছেলেকে মারার জন্যে সাভেল তাকে শাস্তি দিতে এসেছে। কিন্তু সাভেল একটু ন'ড়েচ'ড়ে শুধু ব'ললো:

"এই যে, হাঁ ক'রে আমার দিকে দেখছিস কি? আগে কখনো দেখিস্‌নি বুঝি আমাকে? কোন্‌ চুলোয় যাচ্ছিলি যা; এখানে দাঁড়াতে হবে না।"

সন্ধ্যাবেলায় ইলিয়াকে সদর দরজায় পাকড়াও ক'রে তার কপালে মৃদু টোকা মেরে একটু হেসে রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো সাভেল:

"কি হে, কাজকর্ম হ'চ্ছে কেমন?"

খুশি হ'য়ে ইলিয়া মুখ টিপে হাসলো। এটা কি সোজা কথা, সেখানকার সবচেয়ে তাগড়া এবং ভয়ংকর সাভেল, যাকে সবাই ভয় করে সম্মান করে, সে কি না তার সংগে রীতিমতো ইয়ার্কি দিচ্ছে?! তাছাড়া সাঁড়াশির মতো আঙুলগুলো দিয়ে তার কাঁধটা চেপে ধ'রে সাভেল যখন ব'ললো: "বাঃ, বেশ মজবুত ছোকরা তো তুই! এ-চেহারা সহজে কাহিল হবার নয়! তাড়াতাড়ি

বেড়ে ওঠ্, বুঝলি? বড়ো হ'লে তোকে আমার কামারশালায় ভর্তি ক'রে নেবো," তখন ইলিয়া আরও খুশি হ'লো।

সাভেলের প্রকাণ্ড একটা পা জাপ্‌টে ধ'রলো সে। সাভেল অনুভব ক'রলো তার রুক্ষ আদরে ইলিয়ার বুকটা যেন দ্রুত স্পন্দিত হ'চ্ছে; ইলিয়ার মাথার ওপর তার ভারি হাতখানা রেখে ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সাভেল, তারপর ব'ললো হেঁড়ে গলায়ঃ

"হ'য়েছে, হ'য়েছে, এবার ছেড়ে দে!"

সেই সন্ধ্যায় ইলিয়ার আনন্দ দেখে কে! খুশিতে বিভোর হ'য়ে সে সারা দিনের কুড়োনো 'রত্নগুলো' বিলোতে লাগলো। প্রতি সন্ধ্যায় এগুলো সে বিলিয়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ধ'রেই অপেক্ষা ক'রছিলো তার জন্যে। এখন তারা ইলিয়ার চারপাশে গোল হ'য়ে ব'সে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার নোংরা ঝুলিটার দিকে। ইলিয়া সেই ঝুলি থেকে বার ক'রলো এক টুক্‌রো ছিট, রং-চটা হতভাগ্য একটা কাঠের সৈনিক, জুতোর কালির একটা খালি টিন, সুগন্ধী তেলের একটা খালি শিশি এবং হাতলহীন একটা ভাঙা চায়ের কাপ।

এক সংগে অনেকগুলো ব্যাকুল কণ্ঠ কিচির-মিচির ক'রে উঠলোঃ

"ওটা আমার, ওটা আমার!" এবং সেই সংগে অনেকগুলো ছোটো ছোটো নোংরা হাত কাঠের তরোয়ালের মতো খাড়া হ'য়ে উঠলো।

ইলিয়া ধমকায় তাদেরঃ

"একটু সবুর করো, কোনো জিনিষে হাত দিও না। সবাই সবকিছু যদি একসংগে চাও, তাহ'লে আমাদের খেলাটা হবে কি দিয়ে? দাঁড়াও, এই আমার দোকান সাজিয়ে ব'সলাম! এইবার এই ছিটের টুকরোটা বিক্রি ক'রছি—সরেস জিনিষ এটা, দাম বারো আনা। মাশা, এটা তুমি কিনে নাও।"

জাকব জবাব দিলোঃ "আমি কিনছি এটা মাশার জন্যে!"—এই ব'লে সে তার পকেট থেকে একটা মাটির চাকৃতি বার ক'রে দোকানীর হাতে দিলো; কিন্তু ইলিয়া নিলো না সেটা!

"এভাবে কি খেলা হয়? আগে দরদস্তুর হোক্! তুমি কোনোদিন তা ক'রবে না। এটা ঠিক নয় কিন্তু।"

আত্মরক্ষার্থে উত্তর দিলো জাকব : "এই যা, ভুলে গিয়েছিলাম।" তারপর শুরু হ'লো দরকষাকষি। এইভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা তুজনেই যখন দরদস্তুর ক'রতে ক'রতে গলদঘর্ম হ'য়ে উঠতো তখন কোনো ফাঁকে পাশ্‌কা তার পছন্দমতো জিনিষটি তুলে নিয়েই দৌড় দিতো এবং সেটা নিয়ে নাচতে নাচতে রাগাতো তাদের :

"কেমন ধুলো দিয়েছি চোখে! দেখলে তো চুরির বাহাত্বরি! দুয়ো হাঁদারামের দল, দুয়ো!"

প্রথম প্রথম পাশ্‌কার শয়তানিতে তারা সকলেই রেগে টং হ'য়ে যেতো। যারা একেবারে বাচ্চা তারা চেঁচাতো কিংবা কান্না জুড়ে দিতো; অন্যদিকে জাকব এবং ইলিয়া উঠানময় তাড়িয়ে বেড়াতো চোরটাকে, কিন্তু তাকে ধরে কার সাধ্যি! যাই হ'ক ধীরে ধীরে তারা পাশ্‌কাকে ভালো ক'রেই চিনলো এবং বুঝলো যে তার কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো আচরণ আশা করা বৃথা। তারা সবাই মিলে ঘৃণা ক'রতে লাগলো পাশ্‌কাকে, খেলাও বন্ধ ক'রে দিলো তার সংগে। ফলে পাশ্‌কা একঘরে হ'য়ে দিন কাটাতে লাগলো এবং খিটিমিটি ক'রতে লাগলো সকলের সংগেই। এদিকে হাঁড়ি-মাথা জাকব পেফিশ্‌কা-মুচির কোঁকড়া-চুলওলা ছোট্টো মেয়েটাকে মায়ের মতো আগলে থাকতো আর মেয়েটাও জাকবের স্নেহ-মমতাটুকুকে তার ন্যায্য প্রাপ্য মনে ক'রে গ্রহণ ক'রতো। জাকবকে সে ডাকতো 'খুদে জাকব' ব'লে এবং প্রায়ই সে ছেলেটাকে মারতো-ধ'রতো আর আঁচড়ে দিতো। যতোই দিন যেতে লাগলো বন্ধুহিসেবে জাকব ইলিয়াকে আরও ভালোবাসতে লাগলো। তাছাড়া সে হামেশাই তার অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শোনাতো তার বন্ধুকে :

"মনে হ'লো আমার অনেক টাকা—সব নোট—প্রকাণ্ড একটা বস্তা ভর্তি খালি টাকা আর টাকা! বস্তাটাকে আমি বনের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চ'লেছি এমন সময় হঠাৎ কতকগুলো ডাকাত এসে হাজির! কী ভীষণ চেহারা তাদের, তার ওপর সকলের হাতেই ছোরা। দৌড়তে শুরু ক'রলাম—যতো জোরে পারি। তারপর হঠাৎ বস্তার মধ্যে কি যেন পতপত ক'রে উঠলো। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বস্তাটা, আর তার মধ্যে থেকে ডানা ঝাপটাতে

ঝাপটাতে বেরিয়ে এলো নানান রকমের পাখি—টিয়া, দোয়েল, চড়ুই—এমনি অনেক পাখি। তারপর তারা আমাকে তুলে নিয়ে উড়ে চ'ললো আকাশের দিকে—অনেক, অনেক উঁচুতে—।"

এইভাবে ব'লতে ব'লতে হঠাৎ থেমে যেতো জাকব, তার চোখদুটো আসতো বেরিয়ে এবং তার মুখখানাকে দেখাতো ভেড়ার মুখের মতো।

শেষটুক শোনবার জন্যে অধীর হ'য়ে ইলিয়া তাকে উৎসাহ দিয়ে ব'লতো:

"তারপর?"

গম্ভীর মুখে শেষ ক'রতো জাকব:

"তারপর আর কি, উড়ে গেলাম অনেক দূরে।"

"কোথায়?"

"ব'ললাম তো, অনেক দূরে।"

হতাশ হ'য়ে বিদ্রূপ ক'রতো ইলিয়া:

"তোমার দৌড় ঐ পর্যন্ত। কিছুই মনে রাখতে পারো না তুমি।"

একটু পরেই হোটেল থেকে বেরিয়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে ডেকে উঠতো জেরেমিয়া:

"কই, খুদে ইলিয়া কোথায় গেলি রে? যা, এবার শুয়ে পড়, শোবার সময় হ'য়েছে।"

ইলিয়া তখুনি বৃদ্ধের কথামতো উঠে গিয়ে শুয়ে প'ড়তো তার বিছানায়—খড় দিয়ে ঠাসা একটা প্রকাণ্ড বস্তার ওপর। এখানে শুয়ে তার ঘুমটি হ'তো মিষ্টি আর জেরেমিয়ার আওতায় তার জীবনটাও কাটছিলো আরামে। কিন্তু তার এই সুখের দিন শেষ হ'লো অচিরেই।

জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার কথার নড়চড় হ'লো না। ইলিয়াকে সে একজোড়া বুট, মোটাসোটা একটা ওভারকোট এবং একটি টুপি কিনে দিলো। তারপর ইলিয়াকে পাঠানো হ'লো স্কুলে। ইলিয়া স্কুলে গেলো ভয়ে ভয়ে, আকণ্ঠ কৌতূহল নিয়ে; ফিরে এলো রাগে-হতাশায় কাঁদতে কাঁদতে। ব্যাপারটা এই : সে আর জেরেমিয়ার সাকরেদ যে একই ব্যক্তি এটা জানতে পেরে ছেলেরা তাকে নির্দয়ভাবে "ভিখিরি, এই ভিখিরি, আজ কতো ন্যাকড়া কুড়োলি, ভিখিরি, এই ভিখিরি" ব'লে জ্বালিয়েছে; উপরন্তু তাদের কেউ কেউ তাকে চিমটি কেটেছে, কেউ বা জিভ দেখিয়েছে। একটা ছেলে আবার তার সামনে এগিয়ে এসে কি যেন শুঁকেছে খানিকক্ষণ; তারপর হঠাৎ বিকট মুখভংগি ক'রে, পিছনে লাফ দিয়ে চীৎকার ক'রে ব'লেছে : "কি বিচ্ছিরি গন্ধ রে বাবা!"

হতভম্ব ও মর্মাহত হ'য়ে বাড়ি ফিরে এসে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"ওরা আমায় রাগালো কেন? ন্যাকড়া কুড়োনো কি খারাপ কাজ?"

ইলিয়ার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এবং তার মুখখানা ভাইপোর তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি থেকে লুকোতে লুকোতে জবাব দিলো তেরেন্স :

"যেতে দে ওসব কথা; ওরা অমন দুষ্টুমি ক'রে কতো কি ব'লে থাকে। তাই ব'লে তুই ঘাবড়াবি কেন? ধৈর্য ধ'রে থাক্। দেখবি, একদিন ওরাও তোকে মানিয়ে নেবে, তার তুইও ওদের মানিয়ে নিবি।"

"কিন্তু ওরা আমার জুতো নিয়ে কোট নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ক'রবে কেন? ওরা ব'ললো এগুলো অপরের, আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আনা হ'য়েছে।"

চোখ টিপে হেসে জেরেমিয়া-ঠাকুর্দাও তাকে সান্ত্বনা দিলো :

"ধৈর্য ধরো ইলিয়া। ঈশ্বর এর বিহিত ক'রবেন,—না ক'রেই পারেন না তিনি। তিনি ছাড়া আর যে কেউ নেই বাপ!"

এতোটা আনন্দ এবং বিশ্বাস নিয়ে জেরেমিয়া ঈশ্বর ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতো যে মনে হতো, সে যেন ঈশ্বরের মনের সমস্ত কথাই জানে এবং তাঁর প্রকৃতি-রহস্যও সে যেন ভেদ ক'রে ফেলেছে। জেরেমিয়ার

কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়ার রাগও যেন মিলিয়ে যেতো, কিন্তু তার পরদিনই সেই রাগের আগুন আবার নতুন ক'রে জ্ব'লে উঠতো। নিজের সম্বন্ধে ইলিয়ার ধারণাটা ছিলো উঁচু—কারণ সে খেটে খায়। এমন কি সাভেলও যার সঙ্গে হেসে কথা ব'লেছে, তাকে স্কুলের ছেলেগুলো তবুও যে কেন উপহাস ক'রবে বিদ্রূপ ক'রবে তা সে বুঝেই উঠতে পারে না। এই বিরাট দুঃখটা দিন দিন তার মনে গভীর রেখাপাত ক'রতে লাগলো। স্কুলে যাওয়াটা যেন ক্রমেই এক অসহ্য যন্ত্রণা হ'য়ে উঠতে লাগলো তার কাছে। সে কারোর সংগে মিশতো না। এদিকে সে ছিলো বুদ্ধিমান ছাত্র, তাই মাষ্টারমশাইও আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন তার দিকে। তিনি ব'লতেন: "ইলিয়া আদর্শ ছাত্র।" এতে তার সহপাঠীরা আরো চটে গেলো তার ওপর। সামনের বেঞ্চিতে ব'সে সে কেবলই অনুভব ক'রতো তার শত্রুদের উপস্থিতি এবং তার পিছনে ব'সে ছাত্ররা তাকে হামেশা যন্ত্রণা দিতো ও বিদ্রূপ ক'রতো। ইলিয়ার সংগে জাকবও ভর্তি হ'য়েছিলো এই স্কুলে। সহপাঠীরা তাকেও ভালো চোখে দেখতো না, ডাকতো 'ভেড়া' ব'লে। বোকা এবং অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ তাকে শাস্তিও দেওয়া হ'তো হরদম, কিন্তু তাতে সুফল কিছুই ফ'লতো না। মনে হ'তো সে যেন নির্বিকার, কিছুই দেখছে না কিছুই শুনছে না; কি বাড়ি কি স্কুল সর্বত্রই সে থাকতো একা-একা। তার চিন্তাগুলো ছিলো যেমন অদ্ভুত তেমনি মৌলিক, এবং প্রায় প্রতিদিনই সে উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্নে অবাক ক'রে দিতো ইলিয়াকে। কোনোদিন হয়তো সে চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সতো:

"আচ্ছা ইলিয়া, এটা কি ক'রে হয়, মানুষের চোখদুটো তো ছোটো ছোটো, কিন্তু মানুষ দেখে সবই! রাস্তাটার কথাই ধরো; এতো বড়ো একটা জিনিষ ওই ছোট্টো চোখে ঢোকে কি ক'রে পুরোপুরি?"

কিংবা, আকাশের দিকে চেয়ে সে হঠাৎ ব'লতো:

"আর, ঐ সূর্য..."

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রতো: "সূর্যের আবার কি হ'লো?"

"উঃ, সূর্যটা কি সেঁকাই না সেঁকে!"

"তারপর?"

"কিছু না। আমার কি মনে হয় জানো? সূর্য হ'লো স্বামী, আর চাঁদ হ'লো ওর স্ত্রী। এইভাবে তারাগুলো এসেছে!"

প্রথম প্রথম ইলিয়া এই আজব কথাগুলো নিয়ে ভাবতো; কিন্তু পরে সেগুলো তার মানসিক অশান্তির কারণ হ'য়ে উঠতেই তার বাস্তব জীবনের সংগে যে-ঘটনাগুলি ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, সেগুলো থেকে তার মনটা যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো। এদিকে তার জীবনে ঘটনার অভাব ছিলো না, এবং সেগুলো সে লক্ষ্যও ক'রতো গভীর মনোযোগ দিয়ে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসেই বিশ্রী মুখ ক'রে সে ব'ললো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দাকে:

"আমাদের মাষ্টারমশাইটিকে কি ব'লবে তুমি? হুঁ:—আস্তো একটি ঘুঘু সে! কাল যখন ঐ দোকানদার মালাফেইএফের ছেলেটা জানলার শার্শি ভাঙলো, তখন তাকে আলতো করে একটু ব'কে নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে সে নতুন শার্শি কিনে দিলো।"

অভিভূত হ'য়ে ব'ললো জেরেমিয়া: "তাহ'লে দেখো লোকটি কতো ভালো।"

"হুঁ:, ভালো বৈ কি! আর যখন ভাংকা ক্রুচারফ্ একটা শার্শি ভাঙলো, তখন সে তাকে টিফিন তো খেতে দিলোই না, উপরন্তু ভাংকার বাবাকে ডাকিয়ে এনে, ব'ললো: 'শার্শির জন্যে দশ আনা পয়সা বের করো!' এছাড়া ভাংকা বাপের কাছে মারও খেলো একচোট! বুঝলে, মাষ্টারমশাইটি হ'লো এই চীজ্!"

উৎকণ্ঠিতভাবে চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে বৃদ্ধ জেরেমিয়া ব'ললো:

"ওসব দিকে নজর দিও না, ইলুশা। মনে ক'রো ওসব ব্যাপারের সংগে তোমার কোনো সম্বন্ধই নেই। ন্যায়-অন্যায় বিচার করার মালিক ঈশ্বর, আমরা নই! আমরা পারিও না! আমরা শুধু অন্যায়টাই দেখি, ন্যায়টা আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু ঈশ্বর সব দেখেন। তিনি জানেন কোন্ ব্যাপারের গুরুত্ব কতোটা। বয়স তো কম হ'লো না, দেখলামও তো কতো। মন্দ দেখেছি এক কাঁড়ি—এতো যে ব'লে শেষ করা যায় না; কিন্তু ভালো দেখি নি একরত্তিও। আমার বয়স হ'লো আশী, তবু এতোদিনে কোথাও এক ফোঁটা ভালো দেখতে পেলাম না,—এটা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? কোথাও

না কোথাও ভালো ছিলোই, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই নি।...ব্যাপারটা আজও বুঝতে পারি না আমি।"

সন্দিগ্ধভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে? একজনের কাছ থেকে যদি দশ আনা নাও, তাহ'লে আর-একজনের কাছ থেকেও দশ আনা নেবে।—আর, এইটাই হ'লো ঠিক!"

বৃদ্ধ এতে সায় দিলো না। নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই ব'লতে গিয়ে সে ব'ললো যে, মানুষের চোখে ঠুলি, তাই মানুষ কখনো মানুষের বিচার ক'রতে পারে না। ঈশ্বরের বিচারই একমাত্র ঠিক বিচার। ইলিয়া কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো; কিন্তু তার মুখখানা আরও থমথমে হ'য়ে গেলো এবং তার চোখদুটো হ'য়ে উঠলো বিষাদময়। সে হঠাৎ জেরেমিয়াকে প্রশ্ন ক'রে ব'সলো :

"ভগবান কবে বিচারে ব'সবেন?"

"তা কেউ জানে না! তবে সময় হ'লেই তিনি মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবিত মৃত সকলেরই বিচার ক'রবেন।...কিন্তু কবে, তা কেউ জানে না! চলো শনিবার সন্ধ্যায় আমরা গির্জেতে যাই।"

"বেশ!"

"এই তো চাই।"

অতএব, শনিবার সন্ধ্যায় দেখা গেলো, ইলিয়া আর জেরেমিয়া ভিখিরিদের সংগে দাঁড়িয়ে আছে গির্জার চাতালে—দুটো দরজার মাঝখানে। বাইরের দরজাটা খুলে যেতেই রাস্তার হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠলো ইলিয়ার মুখখানা, চিন্‌চিন্ ক'রতে লাগলো তার পায়ের আঙুলগুলো। আস্তে আস্তে পাথরের মেঝেতে পা-দুটো ঠুকতে ঠুকতে গির্জার কাঁচের দরজার মধ্যে দিয়ে সে দেখলো, ভিতরে মোমবাতির শিখাগুলো কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতে সেগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে সোনালী-সোনালী ফুট্‌কির এক মনোরম নক্‌শায় এবং সেই সোনালী আলো গিয়ে প'ড়ছে দেব-দেবীর ছবিগুলোর চকচকে ফ্রেমে, মানুষের কালো কালো মাথায়, সাধুদের মুখে এবং খোদাই-করা কাঠের বাহারী দেয়ালটার ওপর। রাস্তার চেয়ে গির্জার ভিতরে লোকগুলোকে যেন আরও শান্ত ও সহৃদয় দেখালো; সোনালী আলোতে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নীরব

মুখগুলোকে মনে হ'লো যেন আরও সুন্দর, আরও প্রশান্ত। গির্জার দরজাটা একবার খুলে যেতেই চাতালটা ভেসে গেলো গানের সুরে ও ধূপ-ধূনোর গন্ধে, আর ইলিয়া মহানন্দে সেই সুগন্ধ বাতাস যতোটা পারলো বুকে টেনে নিলো। তাছাড়া, তার বেশ লাগছে প্রার্থনারত জেরেমিয়ার পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওদিকে গির্জার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে অজস্র মধুর শব্দ। ইলিয়া শোনে আর প্রতীক্ষা করে কখন দরজাটা খুলে যাবে, উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো সেই শব্দ এসে প'ড়বে তার ওপর, আর সুগন্ধ আমেজী হাওয়ায় জুড়িয়ে যাবে তার দেহটা। সে জানতো গ্রিশ্‌কা বুব্‌নফ্‌ আর ফেদ্‌কো দল্‌গানফ্‌ গান গায় গিজার দলে। স্কুলে যে-কুচুটে ছেলেগুলো তাকে হামেশাই রাগাতো, গ্রিশ্‌কা ছিলো তাদেরই একজন, আর ঐ বিশ্ব-ঝগড়াটে ফেদ্‌কা-দানবটা তাকে তো কতোবারই পিটেছে, কিন্তু এখন তাদের বিরুদ্ধে যেন ওর কোনো অভিযোগই নেই, ঘৃণাও নেই বুঝি, কেবল একটু ঈর্ষা যেন উঁকি মারছে ফাঁকে ফাঁকে। এমনি ক'রে তারও ইচ্ছা করে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে লোকজনের মুখের দিকে চেয়ে গির্জার দলে গান গাইতে। সে ভাবে: সোনালী দরজাওয়ালা উঁচু বেদীটার ওপর থেকে নীরব ও শান্ত মুখগুলোর দিকে তাকাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে। গির্জা থেকে ফেরবার সময় তার মনটা এতো নরম হ'য়ে গেলো যে সে ঠিক ক'রে ফেললো যদি ওরা চায় তাহ'লে বুব্‌নফ্‌ দল্‌গানফ্‌ এবং স্কুলের অন্যান্য সহপাঠীদের সংগে সে ভাব ক'রে ফেলবে, কিন্তু সোমবার স্কুল থেকে সে যখন বাড়ি ফিরলো, তার মুখখানা আগের মতোই বিষণ্ণ এবং রাগে অন্ধকার।

প্রত্যেক ভিড়েই অন্ততপক্ষে এমন একটি লোককে পাওয়া যাবে যে মনে করে ভিড়টা বেছে বেছে তাকেই যেন পিষে দিচ্ছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সে বাদবাকি লোকগুলোর চেয়ে ভালো কিংবা খারাপ। সে যদি অসাধারণ না-ও হয় কিংবা তার নাকটাও যদি সার্কাসের ক্লাউনের মতো না হয়, তাহ'লেও সে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পারে, অর্থাৎ স্রেফ মজা লোটবার জন্যে কিংবা একটু মুখ বদলাবার জন্যে ভিড়ের লোকগুলো তাদের মধ্যে থেকে একজনকে অনায়াসেই বেছে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভিড় ইলিয়া লুনেফকে বেছে নিলো। হয়তো ভিড়টা শেষপর্যন্ত তাকে মানিয়ে নিতো এবং সে-ও

শেষপর্যন্ত ভিড়টাকে মানিয়ে নিতো; কিন্তু এই সময় এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেলো যার দরুণ ইলিয়ার জীবনটা নেহাতই থেঁতো হ'য়ে গেলো এবং সেই ঘটনাগুলোর পাশে তার স্কুলের জীবনটাকে মনে হ'লো নিতান্তই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর।

একদিন জাকবের সংগে হোটেলটার দিকে এগুতে এগুতে ইলিয়া দেখলো সদর দরজার কাছে কিসের যেন সোরগোল হ'চ্ছে। জাকবকে ব'ললো সে:

"দেখো দেখো, ওদিকে দেখো। হয়তো আবার মারামারি লেগেছে। চলো ছুটে যাই!"

এক ছুটে উঠানে পৌঁছে তারা দেখলো এক কাঁড়ি অচেনা লোক ত্রস্ত ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রছে এদিকে ওদিকে, আর চেঁচাচ্ছে এই ব'লে:

"পুলিশে খবর দাও, ওহে পুলিশে খবর দাও! ওকে বাঁধা দরকার, এখুনি বাঁধা দরকার!"

দেখা গেলো কামারশালাটার কাছে একটা প্রকাণ্ড ভিড় জ'মেছে। মানুষগুলো যেন একেবারে বোবা মেরে গেছে। জাকব এবং ইলিয়া ভিড় ঠেলে সামনে গিয়েই পিছিয়ে এলো। দেখলো: তাদের পায়ের কাছে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে র'য়েছে একটা স্ত্রীলোক, তার মাথার পিছন দিকটা সপসপ ক'রছে রক্তে এবং লেই-এর মতো আরও কি যেন একটা চট্‌চটে পদার্থ লেগে র'য়েছে তার সংগে; আর যেখানে সে প'ড়ে আছে সেখানকার বরফের রং'টা গাঢ় লাল। তার পাশেই পড়ে র'য়েছে একখানা চটকানো সাদা রুমাল এবং প্রকাণ্ড একটা চিমটে। আর, কামারশালার চৌকাঠে পুঁটুলি হ'য়ে ব'সে সাভেল চেয়ে আছে সেই স্ত্রীলোকটার হাতদুটোর দিকে। মাথা গুঁজে, হাতদুখানা সামনে ছড়িয়ে, মুঠোদুটো বরফে গেঁথে এইভাবে তাকে পড়ে থাকতে দেখে মনে হ'চ্ছে, স্ত্রীলোকটা হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে পালাতে লুকোবার চেষ্টা করেছিলো। ঠোঁটে ঠোঁট এবং দাঁতে দাঁত চেপে কঠোর ভ্রূকুটি নিয়ে ব'সে আছে সাভেল-কামার; তার গালের হাড়গুলো উঁচিয়ে আছে টল-গুলির মতো এবং দরজার খুঁটির ওপরে রাখা তার ডান হাতের আঙুলগুলো ছট্‌ফট্‌ ক'রছে বিড়ালের নখের মতো। এছাড়া কামারশালাটার মধ্যে আর সব কিছুই নিশ্চল। কিন্তু ইলিয়ার মনে হ'তে লাগলো, যে-কোনো মুহূর্তে সাভেল তার আঁটসাঁট

ঠোঁট দুখানা খুলে তার বিরাট ছাতির সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারে।

লোকজন সাভেলের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো। তাদের মুখের চেহারা এতো কঠোর যে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাভেল সম্পর্কে তাদের কর্তব্য তারা স্থির ক'রে ফেলেছে। উঠানে এখনো হৈ-চৈ ও ব্যস্ততার অন্ত নেই, কিন্তু কামারশালাটার কাছে সবাই নীরব ও নিশ্চল। হঠাৎ দেখা গেলো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা এগিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। তার মাথার চুল উশ্‌কো-খুশ্‌কো, দরদরিয়ে ঘাম ঝ'রছে তার দুখানা গাল বেয়ে। এসেই কামারটার দিকে এক ঘটি জল বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো :

"নাও, এটা খেয়ে নাও।"

জেরেমিয়ার হাত দুখানা কাঁপতে থাকে।

এই সময় ফিসফিস ক'রে কে যেন ব'লে উঠলো :

"জল নয়, জল নয়, ওর গলার জন্যে একটা ফাঁস দরকার।"

বাঁ হাতে জলের ঘটিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে জলটুকু খেলো সাভেল। তারপর খালি ঘটিটার দিকে চেয়ে কাঁপা গলায় ব'লতে লাগলো সে :

"আমি ওকে পইপই সাবধান ক'রে দিয়েছি। ব'লেছি : এবার থামাল দে, আর নয় থামাল দে, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেলবো! হাজার বার আমি ওকে মাপ করেছি, রেহাই দিয়েছি। দিই নি? দিয়েছি। কিন্তু ও আমার কথা কানে নেয় নি। ফলে·····যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে। পাশ্‌কাটার এখন আর কেউ রইলো না। ওকে তুমি একটু দেখো ঠাকুর্দা। ভগবান তোমায় ভালোবাসেন। ওর দিকে তুমি একটু নজর রেখো।"

কাঁপা হাতে কামারটার কাঁধ ছুঁয়ে মৃদু স্বরে ব'ললো বৃদ্ধ জেরেমিয়া : "থাক্ থাক্—হয়েছে, হয়েছে।"

সংগে সংগে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ব'লে উঠলো :

"বলিহারি যাই! শয়তান কোতাকার! চোরের মুখে আবার রাম নাম!"

কথাটা শুনেই তার ভয়ংকর চোখদুটো তুলে সাভেল চীৎকার ক'রে উঠলো :

শেষপর্যন্ত ভিড়টাকে মানিয়ে নিতো; কিন্তু এই সময় এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেলো যার দরুণ ইলিয়ার জীবনটা নেহাতই থেঁতো হ'য়ে গেলো এবং সেই ঘটনাগুলোর পাশে তার স্কুলের জীবনটাকে মনে হ'লো নিতান্তই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর।

একদিন জাকবের সংগে হোটেলটার দিকে এগুতে এগুতে ইলিয়া দেখলো সদর দরজার কাছে কিসের যেন সোরগোল হ'চ্ছে। জাকবকে ব'ললো সে :

"দেখো দেখো, ওদিকে দেখো! হয়তো আবার মারামারি লেগেছে। চলো ছুটে যাই!"

এক ছুটে উঠানে পৌঁছে তারা দেখলো এক কাঁড়ি অচেনা লোক ত্রস্ত ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রছে এদিকে ওদিকে, আর চেঁচাচ্ছে এই ব'লে :

"পুলিশে খবর দাও, ওহে পুলিশে খবর দাও! ওকে বাঁধা দরকার, এখুনি বাঁধা দরকার!"

দেখা গেলো কামারশালাটার কাছে একটা প্রকাণ্ড ভিড় জ'মেছে। মানুষগুলো যেন একেবারে বোবা মেরে গেছে। জাকব এবং ইলিয়া ভিড ঠেলে সামনে গিয়েই পিছিয়ে এলো। দেখলো : তাদের পায়ের কাছে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে র'য়েছে একটা স্ত্রীলোক; তার মাথার পিছন দিকটা সপসপ ক'রছে রক্তে এবং লেই-এর মতো আরও কি যেন একটা চট্‌চটে পদার্থ লেগে র'য়েছে তার সংগে; আর যেখানে সে প'ডে আছে সেখানকার বরফের রংটা গাঢ় লাল। তার পাশেই পড়ে র'য়েছে একখানা চটকানো সাদা রুমাল এবং প্রকাণ্ড একটা চিমটে। আর, কামারশালার চৌকাঠে পুঁটুলি হ'য়ে ব'সে সাভেল চেয়ে আছে সেই স্ত্রীলোকটার হাতদুটোর দিকে। মাথা গুঁজে, হাতদুখানা সামনে ছড়িয়ে, মুঠোদুটো বরফে গেঁথে এইভাবে তাকে পড়ে থাকতে দেখে মনে হ'চ্ছে, স্ত্রীলোকটা হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে পালাতে লুকোবার চেষ্টা করেছিলো। ঠোঁটে ঠোঁট এবং দাঁতে দাঁত চেপে কঠোর ভ্রূকুটি নিয়ে ব'সে আছে সাভেল-কামার; তার গালের হাড়গুলো উঁচিয়ে আছে টল-গুলির মতো এবং দরজার খুঁটির ওপরে রাখা তার ডান হাতের আঙুলগুলো ছট্‌ফট্ ক'রছে বিড়ালের নখের মতো। এছাড়া কামারশালাটার মধ্যে আর সব কিছুই নিশ্চল। কিন্তু ইলিয়ার মনে হ'তে লাগলো, যে-কোনো মুহূর্তে সাভেল তার আঁটসাঁট

ঠোঁট দুখানা খুলে তার বিরাট ছাতির সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে পারে।

লোকজন সাভেলের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো। তাদের মুখের চেহারা এতো কঠোর যে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সাভেল সম্পর্কে তাদের কর্তব্য তারা স্থির ক'রে ফেলেছে। উঠানে এখনো হৈ-চৈ ও ব্যস্ততার অন্ত নেই, কিন্তু কামারশালাটার কাছে সবাই নীরব ও নিশ্চল। হঠাৎ দেখা গেলো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা এগিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। তার মাথার চুল উশ্‌কো-খুশ্‌কো, দরদরিয়ে ঘাম ঝ'রছে তার দুখানা গাল বেয়ে। এসেই কামারটার দিকে এক ঘটি জল বাড়িয়ে দিয়ে সে বললো:

"নাও, এটা খেয়ে নাও।"

জেরেমিয়ার হাত দুখানা কাঁপতে থাকে।

এই সময় ফিসফিস ক'রে কে যেন ব'লে উঠলো:

"জল নয়, জল নয়, ওর গলার জন্যে একটা ফাঁস দরকার।"

বাঁ হাতে জলের ঘটিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে জলটুকু খেলো সাভেল। তারপর খালি ঘটিটার দিকে চেয়ে কাঁপা গলায় ব'লতে লাগলো সে:

"আমি ওকে পইপই সাবধান ক'রে দিয়েছি। ব'লেছি: এবার থামাল দে, আর নয় থামাল দে, নইলে তোকে খুন ক'রে ফেলবো! হাজার বার আমি ওকে মাপ করেছি, রেহাই দিয়েছি। দিই নি? দিয়েছি। কিন্তু ও আমার কথা কানে নেয় নি। ফলে·…যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে! পাশ্‌ কাটার এখন আর কেউ রইলো না। ওকে তুমি একটু দেখো ঠাকুর্দা। ভগবান তোমায় ভালোবাসেন। ওর দিকে তুমি একটু নজর রেখো।"

কাঁপা হাতে কামারটার কাঁধ ছুঁয়ে মৃদু স্বরে ব'ললো বৃদ্ধ জেরেমিয়া: "থাক থাক্—হয়েছে, হয়েছে।"

সংগে সংগে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ব'লে উঠলো:

"বলিহারি যাই! শয়তান কোতাকার! চোরের মুখে আবার রাম নাম!"

কথাটা শুনেই তার ভয়ংকর চোখদুটো তুলে সাভেল চীৎকার ক'রে উঠলো:

"তোদের কি দরকার এখানে ? বেরো, দূর হ সব !"

চীৎকার তো নয়, যেন চাবুক ! অপ্রসন্ন মুখে গাঁইগুঁই ক'রতে ক'রতে ভিড়টা সরে যেতেই বিরাটকায় সাভেল উঠে দাঁড়ালো, এক পা এগিয়ে গেলো মৃত স্ত্রীলোকটার দিকে, তারপর হঠাৎ পিছিয়ে এসে ফিরে গেলো কামারশালাটার মধ্যে। সকলে দেখলো তার নেহাইটার ওপর ব'সে মাথাটা চেপে ধ'রে সাভেল সামনে পিছনে দুলছে—যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে তার মাথাটা ! সাভেলের জন্যে দুঃখ হ'লো ইলিয়ার। কামারশালাটা থেকে স'রে গিয়ে, স্বপ্নচারীর মতো ঘুরতে ঘুরতে সে শুনতে লাগলো এখানে ওখানে জোট পাকিয়ে লোকজন কি বলাবলি ক'রছে , কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না সে। তার চোখের সামনে নাচতে লাগলো একটা রক্তবিন্দু, আর মনে হ'লো তার বুকের ওপর কি যেন একটা চেপে ব'সেছে। একটু পরে পুলিশ এসে লোকগুলোকে তাড়াতে লাগলো, তারপর সাভেল-কামারকে নিয়ে চ'লে গেলো তারা।

সদর দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে চীৎকার ক'রে ব'ললো সাভেল :

"বিদায়, ঠাকুদা, বিদায় !"

সাভেলের দিকে এগুবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে জেরেমিয়াও সংগে সংগে চেঁচিয়ে ব'ললো :

"বিদায়, সাভেল ইভানিচ্, বিদায় বাপ্।"

জেরেমিয়া ছাড়া আর কেউই সাভেলকে বিদায় জানালো না।

উঠানের এখানে ওখানে জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে, চাদর-ঢাকা লাসটার দিকে মাঝে মাঝে বিষণ্ণভাবে দেখতে দেখতে লোকগুলো তখন নিজেদের মধ্যে গুজুর-গুজুর ক'রতে লাগলো।

আর, এদিকে সাভেলের জায়গায় কামারশালাটার চৌকাঠে ব'সে একজন পুলিশ পাইপের ধোঁয়া ছাড়বার ফাঁকে ফাঁকে থুতু ফেলতে ফেলতে, ঝিমিয়ে-পড়া চোখে জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার দিকে চেয়ে শুনতে থাকে বৃদ্ধ কি ব'লছে।

প্রশান্ত এবং রহস্যময় কণ্ঠে বলতে থাকে বৃদ্ধ জেরেমিয়া :

"তোমাদের কি মনে হয় ও স্ত্রীলোকটাকে খুন ক'রেছে ? না। তাকে খুন ক'রেছে শয়তান। মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে না। মানুষ ভালো,

তার মধ্যে র'য়েছে ঈশ্বরের ছায়া। সে খুন ক'রতে পারে না তাই, কিছুতেই না, কখনোই না!"

জেরেমিয়া তার হাতদুটো বুকের কাছে এমন ভাবে তুললো যেন সে কোনো কিছুকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, তারপর একটু কেশে লোকজনের কাছে ঘটনাটার রহস্য ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলো সে :

'বহুদিন ধ'রেই শয়তান ওর কানে মন্তর দিচ্ছিলো : বউটাকে খুন কর্।"

মুরুব্বীর মতো জিজ্ঞাসা ক'রলো পুলিশটা :

"বহুদিন ধ'রে, তুমি ব'লছো?"

"হ্যাঁ, বহুদিন ধ'রে। 'বউটা তোর সম্পত্তি, বউটা তোর সম্পত্তি' এই ব'লে শয়তান ওকে তাতাচ্ছিলো। কিন্তু এটা সত্য নয়। একটা ঘোড়া আমার হ'তে পারে, একটা কুকুর আমার হ'তে পারে, কিন্তু বউ—সে ভগবানের; কারণ, সে মানুষ। স্বর্গ মর্ত্য সর্বত্রই ঈশ্বরের-দেওয়া দুঃখকষ্টে সে পুরুষের সাথী। কিন্তু ঐ শয়তান তবুও ওর কানে কানে মন্তর দিয়েছে : 'ওকে খুন ক'রে ফেল্, ও তোর সম্পত্তি, ওকে খুন কর্!' শয়তান চায় আমরাও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাই। সে নিজে ঈশ্বরের শত্রু কি না, তাই মানুষের মধ্যেও সে তার একটা দোস্ত খোঁজে।"

পুলিশটি ব'ললো : "যাই হ'ক না কেন, চিমটে দিয়ে শয়তান তো আর মাগীটাকে চেপে ধরে নি, ধরেছে ঐ কামারটাই।"

এই ব'লে সে মাটিতে থুতু ফেললো।

তখন চীৎকার ক'রে ব'ললো বৃদ্ধ জেরেমিয়া :

"কিন্তু ওকে ফুসলেছে কে? সেইটা একবার ভেবে দেখুন।"

পুলিশটি ব'ললো : "থামো। ঐ কামার তোমার কে হয়? ছেলে?"

"না তো!"

"তবে কি কোনো আত্মীয়?"

"তাও না। তিন কুলে আমার কেউ নেই।"

"তাহ'লে এ নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন?"

"আমার? হায় ভগবান!"

তখন পুলিশটি ব'ললো কঠোরভাবে :

"বুড়ো বয়সে তোমায় ভীমরতিতে ধ'রেছে, বুঝলে? যাও, যাও, কেটে পড়ো এখান থেকে, ভাগো।"

এই ব'লে ঠোঁটের একপাশ দিয়ে এক কাঁড়ি ধোঁয়া ছেড়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিলো; কিন্তু জেরেমিয়া তবুও হাত নাড়তে নাড়তে ব'কে চ'ললো—চেঁচিয়ে, ক্রোধভাবে। এদিকে ফ্যাকাশে মুখে চোখদুটো বড়ো বড়ো ক'রে ইলিয়া কামারশালা থেকে স'রে এসে, গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে অন্যান্য লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো মাকার্ কোচোয়ান, পের্ফিশ্‌কা, মাত্তিৎসা এবং চিলে-কোঠার বাদবাকি মেয়েমানুষগুলো।

স্ত্রীলোকদের একজন ব'ললো:

"আমি খুব ভালো ক'রেই জানি বিয়ের আগে মাগী বেজায় আলুথালু ছিলো। এমন কি কামারটা হয়তো পাশ্‌কার বাপই নয়, ইস্কুলের ঐ মাষ্টারমিন্‌সেই হয়তো ওর বাপ। মাষ্টারটা থাকতো ঐ দোকানদার মালাফেইএফেব সংগে, আর মদ গিলতো কাঁড়ি কাঁড়ি।"

পের্ফিশ্‌কা জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কে, যে নিজেকে গুলি ক'রেছিলো?"

"হ্যাঁ, সে-ই। মাগী ওর সংগেই প্রথম সুরু করে।"

গম্ভীরভাবে ব'ললো মাকার্:

"সে যাই হ'ক, এটা কেমন ঠিক নয়। ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে: সে খুন ক'রবে তার বউকে, আমি খুন ক'রবো আমার বউ'কে।"

সদানন্দ পের্ফিশ্‌কা-মুচি ব'ললো:

"সে বরাত কি সকলের হবে? এই আমার বউটাকেই দেখো না, ও তো একটা ফালতু মেয়েমানুষ, তবুও আমি ওকে মানিয়ে চ'লেছি।"

সংগে সংগে ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠলো মাত্তিৎসা:

"থাক্ শয়তান থাক্! তুমি ওকে কতোটা মানিয়ে চলো তা সকলেই জানে।"

এদিকে পের্ফিশ্‌কার পঙ্গু বউটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি গায়ে জড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠানের ধারে এঁদো ঘরখানার মুখে তার সেই একই জায়গাটিতে এসে ব'সলো এবং হাতদুখানা নিশ্চলভাবে কোলের ওপর রেখে, ঝুলে-পড়া

ঠোঁটদুখানা আঁটসাট চেপে, কালো কালো চোখদুটো তুলে তাকালো আকাশের দিকে। প্রথমে তার চোখের দিকে, তারপর অতল আকাশের পানে চেয়ে ইলিয়ার মনে হ'লো, পেফিশ্‌কার বউ হয়তো ভগবানকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে নীরবে কিছু ভিক্ষা চাইছে।

দেখতে দেখতে এঁদো ঘরখানার মুখে ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হ'লো। সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর মুড়িসুড়ি দিয়ে ব'সে, ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে, আকণ্ঠ কৌতূহল নিয়ে তারা শুনতে লাগলো সাভেলের ছেলের কাহিনী। এদিকে পাশ্‌কার মুখখানা থমথম ক'রছে, তার ধূর্ত চোখদুটো উৎকণ্ঠায় এবং অস্বস্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের মুখের ওপর। পাশ্‌কা ভাবছে সে যেন একটা বিরাট নাটকের নায়ক, কারণ এর আগে আর কেউই তার দিকে এতোটা নজর দেয় নি। এই নিয়ে দশবার হ'লো সে একই কাহিনী আওড়ে চ'লেছে। অনিচ্ছু নির্বিকার গলায় সে ব'লতে লাগলো :

"তিন দিন আগে মা চ'লে যেতেই সেই যে বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বইলো, তারপর থেকে এই ক'টা দিন বাবা রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে কাটিয়েছে। এদিকে আমি যদি এতোটুকুও দুষ্টুমি ক'রেছি আমার চুলের মুঠি ধ'রে সে কি ঝাঁকানি! আমি তখনই বুঝেছিলাম—উঃ! তারপর মা যখন এলো আমরা দুজনেই তখন কামারশালায়, তাই আমাদের ঘরদোর বন্ধ ছিলো। তাপর ঠেঙাতে ঠেঙাতে দেখলাম দরজার গোড়ায় এসে মা ঘরের চাবি চাইছে। চাইতেই চিমটেটা নিয়ে বাবা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো—বেড়ালের মতো। আমার তখন এতো ভয় হ'লো যে চোখে হাত চাপা দিলাম। ভাবলাম চেঁচিয়ে বলি : 'মা, পালিয়ে যা।' কিন্তু পারলাম না। চোখ খুলে দেখি বাবা তখনো হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তার চোখদুটো জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ ক'রে। মা আস্তে আস্তে পেছনে হাঁটতে লাগলো, তারপর মনে হ'লো এইবার বুঝি ছুটে পালাবে—"

পাশ্‌কার মুখের পেশী-সমেত তার লিকলিকে কুৎসিত দেহটা কেঁপে উঠলো এইবার। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ব'ললো সে :

"আর, তারপর বাবা চিমটেটা বসিয়ে দিলো মায়ের ওপর।"

নিশ্চল ছেলেমেয়েগুলো আঁৎকে উঠলো সংগে সংগে।

"আর হাতদুটো ওপরে ছুঁড়েই মা প'ড়ে গেলো—জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো ক'রে।"

কথা শেষ ক'রে এক ফালি কাঠ তুলে নিয়ে সেটা খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো পাশ্‌কা; তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ছেলেমেয়েগুলোর মাথার ওপর দিয়ে। ছেলেমেয়েরা তখনো নীরব ও নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো, যেন তারা পাশ্‌কার মুখ থেকে আরো কিছু শুনবে ব'লে প্রতীক্ষা ক'রছে; কিন্তু পাশকা আর একটি কথাও না ব'লে মাথা নুইয়ে ব'সে রইলো।

চিলের মতো চেঁচিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো মাশা:

"তোমার বাবা কি ওকে একেবারে মেরে ফেলেছে?"

মাথা না তুলেই পাশ্‌কা ব'ললো:

"গাড়োল একটা!"

বাচ্চা মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধ'রে জাকব তাকে নিজের আরও কাছে টেনে নিলো, আর এদিকে ইলিয়া পাশ্‌কার আরও কাছে স'রে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলো আস্তে আস্তে:

"মায়ের জন্যে তোমার দুঃখ হ'চ্ছে না?"

ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিলো পাশ্‌কা:

"তাতে তোর দরকার কি?"

সংগে সংগে সকলে চুপচাপ পাশ্‌কার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"হবে না! বউটা দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো"—মাশার খন্‌খনে গলা থেকে এই মন্তব্যটা বেরুতেই জাকব তাড়াতাড়ি তাতে বাধা দিয়ে ব'ললো উৎকণ্ঠিতভাবে:

"তাতে আর আশ্চর্য কি! দেখতেই তো পাচ্ছো কতো গুণের স্বামী ছিলো ঐ কামার! যখনই দেখো তার মুখ ভার, খুঁতখুঁত ক'রছে হামেশাই, তারপর মানুষ তো নয় যেন দানো! কিন্তু পাশ্‌কার মা ছিলো পেফিশ্‌কার মতোই হাসিখুশি। অমন স্বামীর সংগে থাকতে পারে কোনো বউ?"

জাকবের দিকে চেয়ে পাশ্‌কা তিরিক্ষি মেজাজে বয়স্কলোকের মতো প্রভুত্বব্যঞ্জক গলায় ব'লতে লাগলো:

"মাকে আমি ব'লতাম: 'মা রে, সাবধানে থাকিস্, বাবা তোকে একদিন

খুন ক'রে ফেলবে!' মা আমার কথায় কান দিতো না, শুধু ব'লতো এসব ব্যাপার নিয়ে আমি যেন মাথা না ঘামাই। আমাকে কতো কি কিনে দিতো মা, আর সেই সার্জেন্ট-মেজরটা তো কতো দিন আমাকে আনি-দোআনি দিয়েছে। তাকে একটা ক'রে চিঠি এনে দিতাম, আর সেও আমাকে দিতো একটি ক'রে আনি। লোকটা ছিলো যেমন ভালো, তেমনি তাগড়া, তারওপর ইয়া বড়ো গোঁফ ছিলো তার।"

মাশা জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তার তরোয়াল ছিলো?"

সগর্বে জবাব দিলো পাশ্কা:

"হ্যাঁ, ইয়া বড়ো এক তরোয়াল! আমি একবার সেটাকে খাপ থেকে বের ক'রেছিলাম।—শালা কী ভারি!"

চিন্তিতভাবে ব'ললো য়্যাকব:

"ইলিয়ার মতো তুমিও অনাথ হ'য়ে গেলে।"

ঘৃণাভরে জবাব দিলো অনাথ পাশ্কা:

"অনাথ না হাতী! তুমি কি ভেবেছো আমিও রাস্তায় রাস্তায় ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়াবো? না হে না!"

"আমি তা ব'লছি না।"

সগর্বে মাথা তুলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে ব'ললো পাশ্কা:

"আমার যা খুশি আমি তা-ই ক'রতে পারি। কে বলে আমি অনাথ? স্রেফ একা থাকবো আমি। বাবা আমাকে ইস্কুলে পাঠাতে চাইতো না, এখন তো তাকে জেলে দেওয়া হবে, এবার আমি ইস্কুলে যাবো আর দেখবো কে বেশি লায়েক হয়—আমি না তোমরা!"

বিজয়ীর হাসি হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কিন্তু জামাকাপড় পাবে কোত্থেকে? ঐ ধুকড়ি প'রে গেলে ইস্কুলে তো কেউ ঢুকতে দেবে না তোমাকে—!"

"জামাকাপড়? কামারশালাটা আমি বেচে দ'বো।"

সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো পাশ্কার দিকে। ইলিয়ার মনে হ'লো সে পরাজিত হ'য়েছে। পাশ্কা এইবার ঝোপ বুঝে কোপ মারলো:

"তাছাড়া আমি একটা ঘোড়া কিনবো, সত্যিকারের জ্যান্ত ঘোড়া। আর সেইটাতে চ'ড়ে ইস্কুলে যাবো।"

কল্পনাটা তার ভালো লাগলো, তাই হাসলোও একটু—কিন্তু কেমন যেন ভয়ে ভয়ে, অর্থাৎ হাসিটা ঠোঁটের ওপর ঝিলিক মেরেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো।

পাশ্‌কার দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে হঠাৎ ব'ললো মাশা:

"এবার তোমাকে আর কেউ মারবে না।"

ইলিয়া ব'ললো: "মারবার লোক অবিশ্যি কেউ না কেউ থাকবেই।"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে মাটিতে এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো পাশ্‌কা:

"কে, তুই? আয় না, মেরে দেখ্!"

ঠিক সেই সময় জাকব ব'লে উঠলো:

"কি আশ্চর্য, তাই না ভাই? একটা মানুষ এখানে সবায়ের মতোই চ'লছিলো, ব'লছিলো, আরও কত্তো কি ক'রছিলো,—তারপর যেই একজন তার মাথায় চিমটে দিয়ে মারলো, অমনি সে খতম হ'য়ে গেলো…!"

ওরা তিনজনই জাকবের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালো, আর জাকবের চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসে স্থির হ'য়ে রইলো হাস্যকরভাবে।

ইলিয়া ব'ললো: "তা··তা···সত্যি। আমিও ওটা নিয়ে ভাবছিলাম।"

রহস্যভরা কণ্ঠে ধীরে ধীরে ব'লতে লাগলো জাকব:

"সবাই ব'লছে পাশ্‌কার মা মরে গেছে; কিন্তু ম'রে যাওয়ার মানে কি?"

বিষণ্ণভাবে ব'ললো পাশ্‌কা:

"তার মানে আত্মা ভেগেছে।"

আকাশের দিকে চেয়ে জাকবের কাছটিতে স'রে এসে মাশা ব'ললো: "স্বর্গে।"

তারাগুলো তখন সবে ফুটছে। দেখা গেলো একটা প্রকাণ্ড উজ্জল তারা নির্লিপ্ত নিশ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। তিনটি ছেলেই মুখ তুলে তাকালো ওপরদিকে। পাশ্‌কা ক্ষণিকের জন্য তাকিয়েই দিলো ছুট্। ইলিয়া তার ভয়গ্রস্ত মুখখানি ওপরে তুলে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে রইলো

সেইদিকে, আর জাকবের চোখদুটো আকাশময় কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

মাথাটা ঝুঁকিয়ে ইলিয়া ডাকলো :

"জাকব!"

"অ্যাঁ?"

"আমি ভাবছি—" ব'লেই ইলিয়া থেমে গেলো।

মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব : "কি ভাবছো?"

"ভাবছি—"

"বলো, কি ভাবছো?"

"ভাবছি—এটা কি ভালো হ'লো—একটা মানুষ খুন হ'লো, সবাই মিলে ঘটা ক'রে লম্ফঝম্প বকর-বকরও তো ক'রলো কম নয়, কিন্তু কেউ তো কাঁদলো না, কেউ তো একটু দুঃখও ক'রলো না!"

"তা ··তা ঠিক, তবে জেরেমিয়া তো কেঁদেছে।"

"সে হামেশাই কাঁদে। কিন্তু পাশ্‌কাকে দেখো; ব্যাপারটা ও এমনভাবে ব'ললো যেন গল্প ব'লছে।"

"ওটা ওর লোকদেখানো ঢঙ। আসলে ও দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু ওর ধারণা আমাদের সামনে কাঁদলে ওর মাথা কাটা যাবে! এইতো এখন ছুটে চ'লে গেলো, দেখো গিয়ে কেঁদে নিশ্চয়ই বুক ভাসাচ্ছে।"

কিছুক্ষণের জন্য ওরা চুপচাপ পাশাপাশি ব'সে রইলো।

মাশা ঘুমিয়ে প'ড়েছে জাকবের কোলে, কিন্তু তার মুখখানা তখনও আকাশের দিকে তোলা।

ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"তোমার কি ভয় ক'রছে?"

ইলিয়া একইভাবে জবাব দিলো : "হ্যাঁ।"

"পাশ্‌কার মায়ের আত্মাটা এইখানে ঘুরে বেড়াবে।"

"হ্যাঁ।—মাশা তো ঘুমিয়ে প'ড়লো।"

"ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আমার যেতে ভয় ক'রছে।"

"চলো একসংগে যাই।"

ঘুমন্ত শাশার মাথাটা তার কাঁধে রেখে, হাতদুখানা দিয়ে মেয়েটার ছোট্টো রোগা দেহটা জাপটে ধ'রে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে, ফিসফিস ক'রে ব'ললো জাকব :

"ইলিয়া, একটু দাঁড়াও, আমি আগে আগে যাবো।"

কাঁধে বোঝা নিয়ে ট'লতে ট'লতে জাকব আগে আগে চ'ললো, আর তার পিছনে পিছনে চ'ললো ইলিয়া। তার নাকটা প্রায় ঠেকে-ঠেকে জাকবের ঘাড়ে। ইলিয়ার মনে হ'লো কোনো অদৃশ্য ব্যক্তি যেন তার গলার ওপর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে তার পিছনে পিছনে আসছে ; মনে হ'লো সেই অদৃশ্য ব্যক্তি বুঝি এখুনি তার গলাটা টিপে ধ'রবে। আলতো ক'রে বন্ধুর পিঠে একটা টোকা মেরে অস্ফুট স্বরে ব'ললো সে :

"আরও তাড়াতাড়ি চলো !"

এই ঘটনাগুলোর পর থেকেই জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার শরীরটা আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগলো। সে এখন কচিৎ কদাচিৎ ন্যাকড়া-কানি কুড়োতে বেরুতো, থাকতো বাড়িতেই, অবসন্ন দেহটা নিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াতো উঠানময়, কিংবা শুয়ে থাকতো তার অন্ধকার ঘুপ্‌চিটাতে। বসন্তের ইশারা পেয়ে পরিষ্কার আকাশটা যখনই রোদে ঝলমল ক'রে উঠতো, বৃদ্ধ তার আঙুলগুলোয় কি-যেন গুনতে গুনতে ঠোঁটদুখানা নিঃশব্দে নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে রোদ পোয়াতো। ছেলেমেয়েদের গল্প বলা সে অনেক কমিয়ে দিয়েছিলো, তাছাড়া ব'লতেও পারতো না আগের মতো ভালো ক'রে। গল্প ব'লতে শুরু করেই দম্‌কা কাশিতে অধীর হ'য়ে সে থেমে যেতো, আর তার বুকের মধ্যেটা এমনভাবে ধড়ফড় ক'রে উঠতো যেন কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে তার বুকের খাঁচা থেকে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে গল্প শুনতে তার বেশি ভালো লাগলেও মাশা ব'লতো বৃদ্ধকে :

"থাক্ ঠাকুর্দা, আর না।"

প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় জেরেমিয়া ব'লতো :

"একটু সবুর কর্, একটু সবুর কর্, এখুনি থেমে যাবে।"

কিন্তু তার কাশি থামতো না, কাশির দাপটে তার জরাজীর্ণ দেহখানা আরও কেঁপে কেঁপে উঠতো। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েগুলো গল্পের শেষটুকুর জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রেই উঠে যেতো, আর বৃদ্ধ জেরেমিয়া করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো তাদের পিছনে।

ইলিয়া লক্ষ্য ক'রতো বৃদ্ধের অসুখটা খুবই ভাবিয়ে তুলেছে পেত্রুহা আর তেরেন্স-কাকাকে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার পেত্রুহা হোটেলের খিড়কি-দরজায় এসে জেরেমিয়ার দিকে তার সদানন্দ পাঁশুটে চোখদুটো নামিয়ে খোঁজখবর নিয়ে যেতো :

"এখন কেমন আছো ঠাকুর্দা? একটু ভালো ঠেকছে?"

বৃষস্কন্ধ বলিষ্ঠ পেত্রুহা গোলাপী ছিটের শার্ট প'রে, চক্‌চকে নরম চামড়ার জুতোয়-গোঁজা ঢিলেঢালা পাতলুনের পকেটে তার হাতদুখানা গুঁজে ঘুরে

ঝোলাতো, আর টাকা-পয়সাগুলো হামেশাই ঝমঝম ক'রতো তার পকেটে। পেক্রুহার গোল মাথায় টাক প'ড়তে শুরু ক'রলেও তখনো পর্যন্ত ধারে ধারে হাল্কা রঙের যে-বাবরিগুলো অবশিষ্ট ছিলো সেগুলো সে হামেশাই ঝাঁকাতো মনের আনন্দে। ইলিয়া তাকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখে নি, কিন্তু এখন তার ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেলো। সে জানতো পেক্রুহা জেরেমিয়া-ঠাকুর্দাকে পছন্দ করে না। একদিন সে শুনতে পেলো পেক্রুহা তার কাকাকে ব'লছে :

"তেরেন্স, ওদিকে একটু নজর রেখো। বুড়ো যা কিপ্‌টে। আমার মনে হয় ওর বালিশ-বিছ্‌না হাঁটকালে বেশকিছু বেরিয়ে প'ড়বে। এমন সুযোগ ছেড়ো না। ছুঁচোটার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি ওর দোস্ত, তাছাড়া তিন কুলে ওর কেউ নেই। তাই ব'লছি, ওদিকে একটু খেয়াল রেখো, চাঁদু।"

জেরেমিয়া তার সন্ধ্যাগুলো কাটাতো হোটেলে কুঁজো তেরেন্সের সংগে ঈশ্বর, সততা এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে নানান আলোচনা ক'রে। শহরে থেকে থেকে তেরেন্সের চেহারাটা আরও কুৎসিত হ'য়ে উঠেছিলো। তাকে দেখে মনে হ'তো, খেটে খেটে ঘামে ভিজে সে যেন ভিজে ন্যাকড়া ব'নে গেছে। তার চোখের চাহনিটা হ'য়ে গেছে আবছা আর ভীরু-ভীরু, এবং দেহের খানিকটা যেন গ'লে প'ড়ে গেছে হোটেলের প্রচণ্ড উত্তাপে। তার নোংরা শার্টটা কেবলই ওঠা-নামা ক'রতো তার কুঁজের ওপর দিয়ে এবং কারোর সংগে কথা বলবার সময় পিঠের ওপর দিয়ে তার হাতদুটো সে এমনভাবে ঝট্ ক'রে নামিয়ে নিতো যে মনে হ'তো, সে যেন কিছু লুকিয়ে ফেলছে তার প্রকাণ্ড কুঁজটার মধ্যে।

জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা উঠানে এসে ব'সলে, তেরেন্স তার মুখখানা কুঁচকে চোখদুটো আড়াল ক'রে সিঁড়ির একটা ধাপে এসে দাঁড়াতো এবং তার ছোটো হ'লদে দাড়িশুদ্ধ মুখখানা বৃদ্ধের দিকে অপরাধীর মতো নামিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতো ক্ষীণ কণ্ঠে :

"ঠাকুর্দা, তোমার কিছু চাই?"

জেরেমিয়া জবাব দিতো :

"না। ধন্যবাদ।"

সংগে সংগে তেরেন্স তার লিকলিকে পা দুটোর ওপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চ'লে যেতো সেখান থেকে।

দেখতে দেখতে জেরেমিয়ার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগলো।

একদিন ইলিয়া তার পাশে ব'সে আছে এমন সময় জেরেমিয়া ব'ললো:

"মনে হ'চ্ছে এ-অসুখ আর সারবে না ইলুশা। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুধু—"

এই ব'লে সন্দিগ্ধভাবে আশপাশ চেয়ে সে আবার ব'লতে লাগলো ফিসফিস ক'রে:

"এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসবে, তা ভাবি নি বাপ্! আমার কাজ এখনো শেষ হয় নি। সময়ই পেলাম না।···টাকাগুলোর কথা ব'লছি। সতেরো বছর ধ'রে আমি এগুলো জমিয়েছি। জমিয়েছিলাম গির্জের জন্যে। ভেবেছিলাম আমার গাঁয়ে একটা গির্জে তৈরি ক'রবো। এর বড়ো দরকার······ ইলুশা······এর বড়ো দরকার—ভগবানের গির্জেতে মানুষের বড়ো দরকার। আমাদের একমাত্র আশ্রয় হ'লেন ভগবান। যা জমিয়েছি তাও অতি সামান্য, তাতে কিছুই কুলোবে না। তাছাড়া যা আমার আছে তা দিয়ে যে কি ক'রবো তাও বুঝতে পারছি না।···ভগবান, তুমিই আমায় ব'লে দাও কি ক'রবো! এদিকে কাকগুলো কা-কা করে ঘুরছে চারধারে, তারা গন্ধ পেয়েছে। ইলিয়া, মনে রেখো বাপ্, আমার টাকা আছে। কাউকে ব'লো না, শুধু মনে রেখো।"

বৃদ্ধের কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়ার বুক গর্বে ফুলে উঠলো, কারণ এতো বড়ো একটা মূল্যবান গোপন তথ্য যার জিম্মায় রাখা যায়, সে কি একটা যে-সে লোক? সেই সংগে সে বুঝতে পারলো সেই কাকগুলো কারা যাদের সম্বন্ধে জেরেমিয়া এতো দুঃখ ক'রে এবং এতো ভয়ে ভয়ে তাকে অনেক কথাই ব'ললো।

কয়েকদিন পরে, ইলিয়া তখন সবে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে তার জামা-পাতলুন ছাড়ছে, এমন সময় সে শুনতে পেলো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার আস্তানায় কিসের যেন অদ্ভুত শব্দ হ'চ্ছে একটা, কে যেন হাঁপাচ্ছে

হাঁপাতে বিড়বিড় ক'রছে এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—যেন কেউ কারো গলা টিপে ধ'রেছে এইভাবে। আর মাঝে মাঝে ইলিয়া স্পষ্ট শুনতে লাগলো একটা অস্ফুট কাতরোক্তি :

"স…স…স'রে যাও, ছুঁয়ো না!"

ভয়ে ভয়ে সে দরজাটা খুলবার চেষ্টা ক'রলো, কিন্তু দেখলো ভিতর থেকে বন্ধ। তখন সে কাঁপা গলায় ডাকলো চীৎকার ক'রে :

"ঠাকুর্দা!"

সংগে সংগে ভিতর থেকে একটা রুদ্ধশ্বাস, ফিস্‌ফিসে জবাব ভেসে এলো :

"ও-হো-হো-হো, ভগবান! দয়া করো, ওগো দয়া করো!"

আর, তারপরই হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো। কি ক'রবে ভেবে না পেয়ে ইলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা থেকে স'রে এসে পার্টিশানটার ফাটলে মুখ রেখে যন্ত্রণায় এবং ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। বৃদ্ধ জেরেমিয়ার খুপরিটা প্রায় অন্ধকার। নোংরা খুদে জানলাটা দিয়ে ঘরে আলো ঢুকবার কোনো উপায় নেই। বাইরে তখন বরফ গ'লছে। জলের ফোঁটাগুলো ঝুপ্‌ঝাপ্ ক'রে প'ড়ছে জানলার শার্শিটায় এবং উঠানের নোংরা জলধারা শর্‌শর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে জানলার নিচের ঝাঁঝরিটার মধ্যে। শব্দগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া দেখলো বৃদ্ধ জেরেমিয়া বিছানার ওপর বুক চিতিয়ে শুয়ে নিঃশব্দে তার হাতদুটো ছুঁড়ছে।

বিষণ্ণভাবে ডাকলো ইলিয়া :

"ঠাকুর্দা!"

জেরেমিয়া শিউরে উঠে মাথা তুলে জোরে জোরে বিড়বিড় ক'রতে লাগলো :

"শোনো · শোনো…শেক্রহা…এসব ভগবানের! হায় ঈশ্বর! শোনো, এগুলো ঈশ্বরের জন্যে, তাঁর গির্জের জন্যে! বুঝেছি, কাকের ঝাড়, বুঝেছি…! ভগবান, এসব তোমারই, তোমার জিনিষ তুমিই রক্ষা করো, ভগবান! দয়া, একটু দয়া করো, দয়া…!"

ভয়ে কাঁপতে লাগলো ইলিয়া, কিন্তু তার চলৎশক্তি যেন রহিত হ'য়ে

গেছে! সে দেখলো শীর্ণ কালো হাতখানা অসহায়ভাবে নাড়তে নাড়তে জেরেমিয়া কাকে যেন ভয়ংকরভাবে শাসাচ্ছে:

"সাবধান, এসব ভগবানের! সাবধান, ছুঁয়ো না ব'লছি!"

তারপর বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে ব'সলো। তার পাকা দাড়িটা কেঁপে উঠলো উড়ন্ত পায়রার ডানার মতো; তারপর তার হাতদুখানা সামনে ছুঁড়ে কাকে যেন একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে সে প'ড়ে গেলো মেঝের ওপর।

চীৎকার ক'রে উঠে ইলিয়া পালিয়ে গেলো সেখান থেকে, আর সেই অস্ফুট কাতরোক্তি ছুটলো তার পিছু পিছু:

"স ··স···স'রে যাও······!"

তীরবেগে হোটেলে ঢুকেই ইলিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললো:

"কাকা, ঠাকুর্দা ম'রে গেছে!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে, মদের কাউণ্টারের পিছনে দণ্ডায়মান পেত্রুহার দিকে চেয়ে, গায়ের শার্টটা টেনে, তেরেন্স মেঝের ওপর তার পাদুটো পালা ক'রে ঠুকতে লাগলো।

"কাকা, শীগ্‌গির যাও!"

পেত্রুহা কর্কশ স্বরে ব'লে উঠলো:

"যাও না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? যা-ই বলো, বুড়ো লোক ভালো ছিলো। আহা, ওর আত্মার শান্তি হ'ক! আচ্ছা, চলো, আমিও না হয় যাচ্ছি। ইলিয়া, তুই একটু দাঁড়া এখানে, কোনো দরকার প'ড়লেই আমাকে ডেকে আনবি, বুঝলি? জাকব, তুই এই মদের বোতলগুলো একটু আগ্‌লা, আমি এখুনি আসছি।"

পেত্রুহা ধীরে-সুস্থে, জুতোর খটখট শব্দ ক'রতে ক'রতে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলো; আর ছেলেদুটো শুনতে পেলো যেতে যেতে পেত্রুহা ব'লছে:

"আর-একটু জোরে পা চালাও গাড়োল, আর একটু জোরে!"

সব দেখে-শুনে ভয়ে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলো ইলিয়া; তবে ভয় যতোই পাক্ না কেন, দৃষ্টিটা সজাগ রেখে সে লক্ষ্য ক'রতে লাগলো তার চারপাশে কি ঘ'টছে আর কি না ঘ'টছে।

মদের কাউণ্টারের পিছন থেকে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"ওকে ম'রতে দেখলে ?"

জাকবের প্রশ্নের জবাবে ইলিয়া আর একটি প্রশ্ন ক'রলো :

"এরা ওখানে গেলো কেন ?"

"দেখতে ! তুমিই তো ওদের ডাকতে এসেছিলে !"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পব চোখদুটো বুঁজে ব'ললো ইলিয়া :

"উঃ, কী ভয়ংকব ! কী জোরেই না ঠাকুর্দা ঠেলে দিলো তাকে !"

অধীর কৌতূহল নিয়ে ব'ললো জাকব :

"কাকে ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে ইলিযা জবাব দিলো :

"শয়তানকে !"

"দেখলে তাকে ?"

"কি ব'লছো ?"

ইলিয়ার কাছে দৌড়ে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"ব'লছি, শয়তানকে দেখলে ?"

কিন্তু তার বন্ধু চোখ বুঁজে নীরব হ'য়ে রইলো।

ইলিয়ার শার্টের আস্তিনে টান মেরে প্রশ্ন ক'রলো জাকব :

"তখন তোমার খুব ভয় ক'রছিলো, না ?"

এমন সময ইলিয়া হঠাৎ ব'লে উঠলো :

"শোনো, আমি একটু ঘুরে আসছি, কেমন ? কিন্তু তোমার বাবাকে ব'লো না যেন, বুঝলে ?

"আচ্ছা ! এইখানেই ফিরে এসো কিন্তু।"

চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় আসতেই ইলিয়া এক-ছুটে হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এসে পৌছলো পাতালপুরীতে; তারপর নিঃশব্দে ইঁদুরের মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে পার্টিশানটার ফাটলে মুখ রাখলো। বুড়ো জেরেমিয়া তখনো বেঁচে। খাবি খাচ্ছিলো। কিন্তু ইলিয়া তাকে দেখতে পেলো না। মেঝের ওপর দুটো জীবন্ত কালো মূর্তির পায়ের কাছে প'ড়ে ছিলো জেরেমিয়া। আলো-আঁধারিতে মনে

হচ্ছিলো সেই মূর্তিদুটো গ'লে গিয়ে, তালগোল পাকিয়ে যেন একটা প্রকাণ্ড কিম্ভূতকিমাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'য়েছে। কিছুক্ষণ পরে ইলিয়া তার কাকাকে চিনতে পারলো। দেখলো তেরেন্স-কাকা জেরেমিয়ার বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে বালিশের মুখটা তাড়াতাড়ি সেলাই ক'রছে। সেলাই-এর শব্দটা স্পষ্ট কানে এলো তার। তেরেন্সের পিছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পেত্রুহা হঠাৎ তার বাবরিতে দোল্ দিয়ে ফিসফিস ক'রে ব'ললো তিরস্কারের সুরে :

"তাড়াতাড়ি করো হাঁদারাম! তখনই ব'লেছিলাম ছুঁচসুতো তৈরি রাখতে। কথা তো শোনো নি, তাই আবার ছুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে এতোটা সময় নষ্ট ক'রে ফেললে। কি ব'লবো, একটা আস্তো ছাগল তুমি! এমন কি ভালো ক রে তল্লাশটুকু পর্যন্ত ক'রতে পারলে না। যাই হ'ক, চলো এবার, বুড়ো শান্তিতে মরুক, যা পাওয়া গেছে তা-ই ঢের। বলি, কথাটা কানে গেলো? আ-মর্, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো এবার—!"

পেত্রুহার ফিস্‌ফিস্‌নি, মুমূর্ষু জেরেমিয়ার নাভিশ্বাস, সেলাই-এর খশখশ শব্দ এবং নালার জলের শরশর আওয়াজ—সবশুদ্ধ মিলিয়ে এমন একটা বিষণ্ণ, ভোঁতা শব্দের সৃষ্টি হ'লো যা বিভ্রান্ত ক'রে দিলো ইলিয়াকে। সে আস্তে আস্তে দেয়ালের ধার থেকে স'রে এসে বেরিয়ে গেলো এঁদোপুরী থেকে। একটা নোংরা কালো চাকা যেন ঘুরতে লাগলো তার চোখের সামনে, আর নিজেকে তার অসাড় এবং অসুস্থ মনে হ'তে লাগলো। সিঁড়ির হাতলটা চেপে ধ'রে, অতি কষ্টে সে হোটেলের দিকে উঠতে লাগলো। পা যেন আর চলে না! দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে উঠলো। মনে হ'লো তার চোখের সামনে নাচতে নাচতে জাকব যেন তাকে কিছু ব'লছে। তারপর কে যেন তার পিঠে একটা ধাক্কা দিলো এবং সে শুনলো পেফিশ্‌কা ব'লছে :

"কে? কি? কেন? কি-স্তু, কি—ম'রে গেছে? ও! শ-শয়তান!"

এই ব'লে ইলিয়াকে আবার একটা ধাক্কা মেরে পেফিশ্‌কা-মুচি এতো জোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো যে মনে হ'লো সিঁড়িটা বুঝি চিড় খাবে। সিঁড়ির তলায় থেমে পেফিশ্‌কা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো :

"ওরে…ফাদার…!"

ইলিয়া শুনতে পেলো তার কাকা আর পেত্রুহা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

তার ইচ্ছা নয় ওরা তাকে কাঁদতে দেখুক, কিন্তু চোখের জল বাধা মানলো না।

পেত্রুহা চেঁচিয়ে ব'ললো :

"জাকব, যা, দৌড়ে গিয়ে পুলিশ-সার্জেণ্ট মিহেই-কে ডেকে নিয়ে আয়। তাকে ব'লবি জেরেমিয়া পটল তুলেছে।—যা, চট্ ক'রে চ'লে যা!"

পেফিশ্কা চেঁচিয়ে উঠলো :

"ও, তুমি! তা'হলে এর মধ্যেই সেখানে ঢুঁ মেরে এলে? হুঁ-হুঁ।"

ভাইপোর দিকে না চেয়ে তেরেন্স একধারে চলে গেলো, কিন্তু পেত্রুহা ইলিয়ার কাঁধে হাত রেখে ব'ললো :

"কিরে কাঁদছিস? তা, কাঁদ্—বোঝা যাচ্ছে নুন খেয়ে গুণ গাইতে জানিস তুই। তাছাড়া তোর অনেক উগ্গার ক'রেছিলো বুড়ো।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে, ইলিযাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আবার ব'ললো সে :

"সে যাই হ'ক, দরজা আটকে দাঁড়াস নি।"

শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে ইলিযা চারিধারে চেয়ে দেখলো। পেত্রুহা ইতোমধ্যে কাউণ্টারের পিছনে গিয়ে বাবরি দোলাচ্ছে, আর পেফিশ্কা তার সামনে দাঁড়িয়ে সবজান্তার মতো হাসছে মিটমিট ক'রে। হাসলেও, তার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে জুয়ায় সে যেন তার শেষ কপর্দকটিও খুইয়ে এসেছে।

ভ্রূকুটি ক'রে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো পেত্রুহা :

"তারপর, কি মনে ক'রে পেফিশ্কা?"

"আমি? হুঁ—হুঁ। দু-এক আনা হবে না কি?"

আস্তে আস্তে ব'ললো পেত্রুহা : "কেন?"

পা ঠুকতে ঠুকতে পেফিশ্কা-মুচি চেঁচিয়ে ব'ললো :

"কি জ্বালা! খাওয়ার মুখ আমারও আছে, তবে কি না কালিয়া পোলোয়া সবার জন্যে নয়! তা বেশ বেশ। হ্যাঁ, একটা কথা—তোমার জয়-জয়কার হ'ক পেতের্ য়াকিমিচ্!"

মোলায়েম আপনী হাসি হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলো পেত্রুহা :

"ব্যাপার কি? কি সব আবোল-তাবোল ব'কছো?"

"না, কিছু না। সাদাসিধে মানুষ আমি, তাই দু-একটা সাদাসিধে কথা ব'লছিলাম।"

"মানে, এক গেলাস মদ চাই, এই তো? হি-হি-হি··!"

পের্ফিশ্কাও খুশি হ'য়ে হেসে উঠলো: "হা-হা-হা···!"

ইলিয়া বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলো সেখান থেকে।

সেই রাত্রে তার ঘুমোতে অনেক দেরি হ'লো। তাছাড়া নিজের ঘুপচিটাতে না শুয়ে শুলো হোটেলে তেরেন্সের কাপ-ডিশ্ ধোবার টেবিলের তলায়। ভাইপোকে শুইয়ে কুঁজো-কাকা টেবিলগুলো মুছতে লাগলো।

এদিকে কাউণ্টারের ওপর জ্বলতে থাকে একটা বাতি যার আলোয় চিকচিক ক'রে ওঠে তাক-সাজানো কেৎলি আর বোতলগুলো। হোটেলের মধ্যেটা অন্ধকার, বাইরের কালো রাত উঁকি মারে জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে, আর ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টির সংগে শিরশির ক'রতে থাকে একটা মৃদু বাতাস। তেরেন্সকে দেখায় একটা প্রকাণ্ড শজারুর মতো। ন'ড়েচ'ড়ে বাতিটার দিকে এগুতেই তার একটা কিম্ভূতকিমাকার ছায়া প'ড়লো মেঝেতে, আর ইলিয়ার মনে হ'লো ঐ ছায়াটা যেন জেরেমিয়ার আত্মা হ'য়ে তার কাকার পিছনে পিছনে ব'লছে: "স···স···স'রে যাও···!"

ভয়ে, ঠাণ্ডায় ইলিয়া যেন কাঠ হ'য়ে গেলো। ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে—সেদিন শনিবার, তাই মেঝেটা আবার ধুয়েও দেওয়া হ'য়েছিলো। পচা কাঠের গন্ধ ছাড়তে থাকে ঘরময়। ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো কাকাকে বলে টেবিলের তলায় তার পাশটিতে শুতে, কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকলো। শুয়ে শুয়ে তার মনে হ'লো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা তার পাকা দাড়িটা নাড়তে নাড়তে ঝুঁকে প'ড়ে তার কানে কানে যেন ব'লছে:

"বাছা আমার, বাপ্ আমার! ভগবান জানেন আমরা কি সইতে পারি, আর কি না সইতে পারি। ঠিক আছে, ঠিক আছে!"

বিরক্ত হ'য়ে বিষণ্ণভাবে ইলিয়া ব'ললো কাকাকে:

"শোবে না?"

কুঁজো চ'ম্‌কে উঠেই থ'মকে দাঁড়ালো। তারপর ব'ললো ভয়ে ভয়ে:

"কে ওখানে?"

"আমি। শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হ'য়েছে।"

"এই যে, এখুনি শুচ্ছি, এখুনি শুচ্ছি"—এই ব'লে কুঁজো তেরেন্স টেবিল-গুলোর আশেপাশে ইঁদুরের মতো ঘুরতে লাগলো। ইলিয়া বুঝলো ওর কাকাও ভয় পেয়ে গেছে, তাই খুশি হ'য়ে ব'ললো মনে মনে :

"বেশ হ'য়েছে!"

বৃষ্টি-পড়ার আওয়াজ হ'তে থাকে শার্শিগুলোতে এবং শুনতে পাওয়া যায় কোথায় যেন একটা ধুপধাপ শব্দ হ'চ্ছে। মোমবাতির শিখাটা কেঁপে উঠতেই মনে হ'লো কেৎলি আর বোতলগুলো যেন মিটমিট ক'রে হাসছে নিঃশব্দে। কাকার কোটটা মাথায় চাপা দিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে শুয়ে রইলো ইলিয়া। তারপর হঠাৎ কি যেন ন'ড়েচ'ড়ে উঠলো তার পাশে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাথা থেকে কোটটা সরাতেই সে দেখলো, বুকের ওপর চিবুক রেখে হাঁটু গেড়ে ব'সে তেরেন্স বিড়বিড় ক'রছে :

"হে ঈশ্বর, পরম পিতা, হে ঈশ্বর··!"

তার ফিস্‌ফিসে কথাগুলো শোনালো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার নাভিশ্বাসের মতো। মনে হ'লো ঘরের মধ্যে অন্ধকারটা যেন চ'লে বেড়াচ্ছে, আর মেঝেটাও যেন দুলছে তার সংগে। এদিকে চিম্‌নিগুলোর মধ্যে বাতাস আর্তনাদ ক'রতে থাকে :

"হু—উ—উ—হুই—ই—!"

খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ইলিয়া :

"প্রার্থনা ক'রতে হবে না!"

কুঁজো আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কেন, কি হ'য়েছে? দোহাই তোর, ঘুমিয়ে পড়্!"

তবুও নাছোড়বান্দার মতো ব'ললো ইলিয়া :

"প্রার্থনা ক'রো না!"

"আচ্ছা······বেশ, ক'রবো না।"

নিরেট অন্ধকার এবং ভারি স্যাঁৎসেতে হাওয়াটা ইলিয়ার বুকে এমন চেপে ব'সলো যেন এখুনি তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। ভয় ক'রতে লাগলো ইলিয়ার, সেইসংগে তার গভীর দুঃখ হ'লো বুড়ো জেরেমিয়ার জন্যে। কাকার ওপর

রাগে বুকটা যেন পুড়ে যেতে লাগলো তার। শেষটায় ছটফট ক'রতে ক'রতে উঠে ব'সে গোঙাতে লাগলো সে।

তার হাতদুখানা ধ'রে ভয়ে ভয়ে ব'ললো তার কাকা:

"কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে রে?"

কিন্তু ইলিয়া তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো; তারপর ভয়ে যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় ব'লতে লাগলো:

"ভগবান! কোথাও গিয়ে যদি লুকোতে পারতাম!—আর যদি কারোর মুখ আমাকে দেখতে না হ'তো! ভগবান!"

কান্নায় তার গলা যেন বুঁজে এলো। অতি কষ্টে নোংরা হাওয়ায় খানিকটা নিশ্বাস নিয়ে, মেঝেতে মুখ রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এই ঘটনাগুলোর পর ইলিয়ার চরিত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা গেলো। এ-পর্যন্ত সে কেবল তার স্কুলের সহপাঠীদের থেকেই দূরে দূরে থেকে এসেছে, কারণ তার প্রতি ওদের আচরণটাকে সে বরদাস্তও ক'রতে পারে নি, মানিয়েও নিতে পাবে নি। ফলে ওদের কাছে সে হারও মানে নি কিংবা ওদের সংগে বন্ধুত্বও পাতায় নি। এদিকে যতোটা পেরেছে হোটেলের লোকগুলোর সংগে সে ভালোভাবেই মিশেছে, তাদের বিশ্বাসও ক'রেছে এবং বয়স্ক লোকজন তাকে ভালো ব'ললে তাতে খুশিও হ'য়েছে।

কিন্তু এখন সে সকলেব থেকেই দূরে দরে থাকতে লাগলো এবং বযসের অনুপাতে তাকে দেখাতে লাগলো বড়ো বেশি গম্ভীব। কথাবার্তা তো একেবারে কমিয়ে দিলোই, উপবন্ত বয়স্ক লোকদের সে দেখতে লাগলো সন্দেহের চোখে। বিশেন ক'রে তাদের আলাপ আলোচনাগুলো শোনবার সময তার মুখে দেখা যেতে লাগলো কেমন একটা তিক্ত ভ্রূকুটি। জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার মৃত্যুর দিন যা যা ঘ'টেছিলো তার স্মৃতিটা তাকে অনববত কষ্ট দিতে লাগলো এবং তার মনে হ'লো বৃদ্ধের কাছে তাব কাকা এবং পেত্রুহাই শুধু অপরাধী নয়, অপরাধী যেন সেও। মুমূর্ষু জেবেমিয়া হয়তো এদের দেখেছিলো তার টাকাপয়সা আত্মসাৎ করবার সময় এবং হয়তো ভেবেছিলো ইলিযাই পেত্রুহাকে এর খোঁজ দিয়েছে। এই চিন্তাটা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রতে লাগলো এবং এর দরুণ সে প্রত্যেককে দেখতে লাগলো একটা গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে। কারোর মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে সে খানিকটা স্বস্তি পেতো এবং ভাবতো এতে তার নিজের পাপের ভারও বুঝি কিছুটা ক'মলো। ব'লতে কি, মানুষের স্বভাবের কদাকার দিকটা তার চোখে প'ড়লোও কম নয়। অলক্ষ্যে সবাই পেত্রুহাকে ব'লতো 'চোরাই সম্পত্তির মালিক' এবং 'রাস্কেল', কিন্তু প্রকাশ্যে আবার তাকেই সমীহ ক'রে সেলাম ঠুকতো এবং ডাকতো পেতের্ য়াকিমিচ ব'লে। এদিকে মাত্তিৎসাকে সবাই যা-তা ব'লতো, সে মাতাল-অবস্থায় থাকলে তাকে ধ'রে পিটতোও; এমন কি একদিন সে নেশা ক'রে রান্নাঘরের জানলার নিচে ব'সে আছে, এমন সময় রাঁধুনীটা তার মাথায় এক বাল্তি নোংরা জলও ঢেলে

দিলো। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাকে দিয়ে সবাই এটা-ওটা করিয়ে নিলেও প্রতিদানে সে পেতো শুধু গালমন্দ আর লাথি-ঝাঁটা। মাতিৎসাকে দিয়ে পেফিশ্‌কা ওর রুগ্না বউটাকে ধোয়াতো মোছাতো, বড়ো বড়ো পরবের ছুটির আগে পেক্রুহা তাকে দিয়ে গোটা হোটেলটাই মিনিমাগনা সাফ করিয়ে নিতো, আর তেরেন্স তাকে দিয়ে সেলাই করাতো ওর ছেঁড়া শার্টগুলো। মাতিৎসা কিন্তু বিরক্ত হ'তো না এতোটুকুও, সকলের কথাই সে রাখতো এবং কাজও করতো পরিপাটীভাবে। তাছাড়া অসুস্থ লোকজনের সেবা-শুশ্রূষা করা এবং ছেলে-মেয়েদের আগ্‌লানোর কাজেও সে ছিলো সমান উৎসাহী।

ইলিয়া দেখতো, যে-লোকটা সবচেয়ে বেশি খাটে—সেই পেফিশ্‌কা-মুচিকে নিয়ে সবাই হাসি-মস্করা ক'রছে এবং তার দিকে কেবল তখনই নজর দিচ্ছে যখন সে নেশা ক'রে তার হারমোনিয়ামটা কোলে নিয়ে হোটেলে এসে ব'সেছে কিংবা যখন সেটা বাজিয়ে মজাদার চুট্‌কি গান গাইতে গাইতে উঠানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে যখন তার রুগ্না স্ত্রীকে সযত্নে বাইরে এনে বসায় কিংবা তার ছোট্টো মেয়েটাকে অজস্র চুমু খেতে খেতে নানা রঙ্গ-তামাশা ক'রে ঘুম পাড়ায়, তখন তার দিকে কেউ নজর দেয় না। তেমনি, যখন সে হেসে হেসে মাশাকে রাঁধতে বা ঘরদোর গোছাতে শেখায় কিংবা একটা ছেঁড়া নোংরা জুতো নিয়ে মাঝ-রাত পর্যন্ত মুখ গুঁজে সেলাই-মেরামত করে, তখনও কেউ তার দিকে ফিরেও দেখে না।

সাভেল-কামারকে যখন পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেলো, তখন পের্ফিশ্‌কা ছাড়া আর কেউই তার অনাথ ছেলেটার কথা ভাবেনি। সে পাশ্‌কাকে তখুনি নিজের কাছে এনে তার কাজে লাগিয়ে দিলো। ছেলেটা মোম দিয়ে সুতো পাকাতো, তার ঘরদোর ঝাঁট দিতো, তাছাড়া তার জন্যে এটা-ওটা ফাই-ফরমাশও খাটতো, যেমন জল তুলে আনা, দোকান থেকে মদ বা রুটি বা পেঁয়াজ কিনে আনা—এইসব। ছুটির দিনে নেশা ক'রলে সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ক'রতো, কিন্তু কেউই জানতো না যে ঠিক তার পরের দিনই প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পের্ফিশ্‌কা তার স্ত্রীকে ব'লছে :

"আমাকে মাপ্ করো, দুনিয়া। আমি মদ খাই তা তুমি জানো, কিন্তু মাতাল হবো ব'লে খাই না, খাই খেটে খেটে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি ব'লে। গোটা

হুক্কাটা ধ'রে খালি কাজ আর কাজ, চোখমুখ যেন ঝামরে পড়ে, তাই চান্‌কে নেশার জন্যে একটু মদ খাই।"

ভাঙা-ভাঙা, ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিতো তার স্ত্রী :

"কিন্তু আমি কি তোমায় দোষ দিচ্ছি? শুধু ভগবানই জানেন, তোমার জন্যে আমার কতো দুঃখ! তুমি কি ভাবো আমি দেখি না তুমি কতো খাটো? তোমার গলার চারধারে আমি যেন পাথর হ'য়ে ঝুলছি। যদি ম'রতে পারতাম! যদি তোমাকে নির্ঝঞ্ঝাট ক'রে দিতে পারতাম!"

"এ-সব কথা ব'লো না, আমার শুনতে ভালো লাগে না। আমিই বরং তোমাকে আঘাত দিই, কিন্তু তুমি তো আমায় দাও না। তবে এর কারণ এই নয় যে আমি লোক খারাপ, এর কারণ হ'লো আমি দুর্বল। একদিন আমরা অন্য কোথাও উঠে যাবো, তখন সব-কিছু যাবে ব'দলে—ঘরদোর জানলা কপাট সব কিছু। জানলা খুললেই রাস্তা দেখতে পাবো, জুতোর মাপে কাগজ কেটে সেটা আটকে দেবো দরজার কাঁচে—সেইটাই হবে আমাদের সাইন-বোর্ড। তখন লোকজন আসবে আমাদের দোকানে, কাজও শুরু হবে সত্যি ক'রে। তাই না? তখন আমরা সুখে ঘরকন্না ক'রবো, আর টাকাও রোজগার ক'রবো!"

পেফিশ্‌কার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটির খবর রাখতো ইলিয়া এবং জানতো একা-একা কী কঠোর সংগ্রামই না ক'রছে সে বাঁচবার জন্যে। এদিকে সে প্রত্যেকের সংগেই হেসে-হেসে কথা ব'লছে, রঙ্গ-তামাশা ক'রছে, তার ওপর কি সুন্দরই না বাজায় সে তার হারমোনিয়ামটা! ইলিয়া শ্রদ্ধা ক'রতো পেফিশ্‌কা-মুচিকে।

পেত্রুহা কিছুই ক'রতো না, কাউণ্টারের পিছনে ব'সে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চা খেতো, পরিচিত লোকজনের সংগে দাবা খেলতো, আর গালমন্দ ক'রতো খানসামাগুলোকে। জেরেমিয়ার মৃত্যুর পর সে তেরেন্সকে দাঁড় করিয়ে দিলো কাউণ্টারে, তাকে শেখালো কি ক'রে মাল বেচতে হয়, আর সে নিজে কেবল শিস্ দিয়ে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো উঠানময়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাড়িখানাকে দেখতে লাগলো হামেশা এবং দেয়ালগুলোয় ঘুষিও মারতে লাগলো থেকে থেকে। অবাক কাণ্ড!

এইভাবে অনেক কিছুই দেখতো ইলিয়া, কিন্তু যা তার চোখে প'ড়তো তার

সবই খারাপ এবং অপদার্থ ; ফলে সে ক্রমেই স'রে যেতে লাগলো মানুষজনের সান্নিধ্য থেকে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা হ'তো কাউকে তার মনের কথা খুলে বলে, কিন্তু কাকার সংগে কথা ব'লতে তার এতোটুকুও ভালো লাগতো না। জেরেমিয়ার মৃত্যুর পর থেকে কাকা-ভাইপোর মাঝখানে গজিয়ে উঠেছিলো একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ; তাই কাকার কাছে যেতে ইলিয়ার কেমন বাধো-বাধো ঠেকতো। এদিকে জাকবও অনেক কথাই বুঝতে পারতো না, থাকতো দূরে দূরে, নিজের চিন্তাতেই নিজে বিভোর হ'য়ে। জেরেমিয়ার মৃত্যুতে সেও মর্মাহত হ'য়েছিলো কম নয়, তাই প্রায়ই সে দুঃখ ক'রে বলতো :

"কিছুই ভালো লাগছে না। জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে কতো গল্প ব'লতো আমাদের। গল্পের চেয়ে ভালো যেন আর কিছুই নেই ; আর ঠাকুর্দা এই রকম ভালো গল্প জানতোও অনেক।"

ইলিয়া জবাব দিতো : "সবকিছুই জানতো সে।"

একদিন জাকব রহস্যময় কণ্ঠে তার খেলার সাথীটিকে ব'ললো :

"তোমাকে একটা জিনিষ দেখাবো, দেখবে ?"

"নিশ্চয়ই দেখবো।"

"কিন্তু আগে দিব্যি গালতে হবে কাউকে জানাবে না।"

"ভগবানের দিব্যি, একটি কথাও আমি কাউকে ব'লবো না !"

"তাহ'লে বলো : 'ব'ললে আমার যেন ওলাউঠো হয়'।"

ইলিয়া সেই দিব্যিই গাললো। তখন জাকব তাকে উঠানের এক কোণে প্রাচীন লেবুগাছটার তলায় নিয়ে গেলো। তারপর গাছের গুঁড়িটার ওপর থেকে জাকব এক চোক্‌লা ছাল সরিয়ে নিতেই দেখা গেলো সেখানে একটা বড়ো ফোকর র'য়েছে। গর্তটি করা হ'য়েছে ছুরি দিয়ে চেঁচে চেঁচে এবং তার মধ্যেটা সুন্দরভাবে সাজানো হ'য়েছে রঙবেরঙের কাপড় ও কাগজের টুকরো দিয়ে, চায়ের বাক্‌শোর রাংতা এবং পিতলের চক্‌চকে পাত দিয়ে। আর গর্তটির একেবারে তলায় র'য়েছে পিতলের একটি বিগ্রহ এবং তার সামনেই র'য়েছে সুতোয়-বাঁধা একটা মোমবাতির অবশিষ্টাংশ।

গর্তটা আবার ঢেকে-ঢুকে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব : "দেখলে ?"

"দেখলাম, কিন্তু এটা দিয়ে হবে কি ?"

জাকব বুঝিয়ে ব'ললো: "এটা হ'লো গির্জে। রাত্তিরে চুপিচুপি এখানে এসে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে উপাসনা ক'রবো। কেমন ?"

বন্ধুর প্ল্যানটা মন্দ লাগলো না ইলিয়ার, কিন্তু ভাবলো এতে বিপদও আছে।

"ধরো, কেউ যদি আলোটা দেখতে পায় ? তোমার বাবা তোমায় মারবে।"

"রাত্তিরে আবার কে দেখবে ? তখন সবাই ঘুমোয়, গোটা পৃথিবীটা নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়। আমি বাচ্চা,—তাই দিনের বেলা গণ্ডগোলের মধ্যে ভগবান আমার প্রার্থনা শুনতে পান না। কিন্তু রাত্তিরে আমার গলা নিশ্চয়ই শোনা যাবে! তাই না ?"

বন্ধুর ফ্যাকাশে মুখ এবং বড়ো বড়ো চোখদুটোর দিকে চেয়ে ব'ললো ইলিয়া:

"জানি না, তবে শুনলেও শুনতে পারেন ভগবান।"

জাকব জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তুমি আমার সংগে প্রার্থনা ক'রবে ?"

সংগে সংগে ইলিয়াও জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কিন্তু কী জন্যে প্রার্থনা ক'রবে, বলো ?"

তারপর দু'জনে এ ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো।

একটু পরে শোনা গেলো ইলিয়া আবার ব'লছে:

"আমি প্রার্থনা ক'রবো যাতে চালাক-চতুর হ'তে পারি এবং যা চাই তা যেন পাই—এই ব'লে। আর, তুমি ?"

"আমিও তাই।"

একটু চিন্তা ক'রে জাকব ব'লতে লাগলো:

"ঠাকুদা প্রার্থনা ক'রতো, কিন্তু সে শুধু এমনি-এমনি। কিছুই চাইবো না যদি তবে প্রার্থনা ক'রবো কেন ? ভগবান যা ইচ্ছে ক'রবেন, যা ইচ্ছে দেবেন—এটা ঠিক না। তুমি যেভাবে প্রার্থনা ক'রবে ব'ললে আমিও সেইভাবে ক'রবো।"

তখন দুই বন্ধুতে মিলে ঠিক হ'লো, সেই রাত্রি থেকেই তারা প্রার্থনা-পর্ব শুরু ক'রবে। কিন্তু সেই রাত্রি কেন, কোনো রাত্রেই তাদের ঘুম ভাঙলো না, এবং পরে এমন অনেক ঘটনা ঘ'টলো যার দরুণ ইলিয়ার মন থেকে গির্জার প্রসঙ্গটা ধুয়ে-মুছে সাফ হ'য়ে গেলো।

যে লেবুগাছটার মধ্যে জাকব তার গির্জা বানিয়েছিলো, সেই গাছটারই ডালে ফাঁদ পেতে পাশ্‌কা পাখি ধ'রতো। তার জীবন কাটছিলো অতি কষ্টে। রোগা হ'য়ে তার মুখখানা হ'য়ে গিয়েছিলো আমসির মতো, তার ওপর তার চোখের তারা দুটো ডাইনে-বাঁয়ে গড়াতো মাংসাশী জন্তুর মতো। উঠানে ছুটোছুটি করবার সময়ই পেতো না সে, সারাদিন ধ'রে খাটতো পের্ফিশ্‌কার হ'য়ে, একমাত্র ছুটিছাটার দিনে—যখন পের্ফিশ্‌কা মাতাল হ'তো—কেবল তখনই তার দেখা পেতো তার বন্ধুরা। পাশ্‌কা তার খেলুড়েদের জিজ্ঞাসা ক'রতো স্কুলে তারা কি কি শিখছে এবং তারা যখন সগর্বে মুরব্বীর মতো নানান গল্প ব'লতো, তখন সে ভ্রূকুটি ক'রতো ঈর্ষায়। একদিন সে ব'ললো :

"অতো দেমাক দেখাস্ নি, বুঝলি ? আমিও ওসব শিখবো একদিন।"

"পের্ফিশ্‌কা তোমাকে ছাড়লে তো।"

পাশ্‌কা গম্ভীরভাবে জবাব দিলো :

"না ছাড়লে, পালিয়ে যাবো।"

আর ব'লতে কি, এই কথাবার্তার কিছু পরেই উঠানে এসে পের্ফিশ্‌কা হাসতে হাসতে ব'ললো :

"কাণ্ড দেখো একবার! আমার সাকরেদটি ভেগেছে। বিচ্চু ছেলে যা হ'ক। মুচির কাজ ভালো লাগলো না তার।"

বৃষ্টি প'ড়ছিলো। ইলিয়া প্রথমে তাকালো নোংরা পের্ফিশ্‌কার দিকে; তারপর বিষণ্ণ ও পাঁশুটে আকাশটার পানে চেয়ে তার দুঃখ হ'লো দুর্দান্ত পাশ্‌কার জন্যে। গাড়ি রাখবার টিনের শেড্-টার নিচে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তারা চেয়ে রইলো হোটেলটার দিকে। ইলিয়ার মনে হ'লো মহাকালের চড়-চাপড়ে বাড়িখানা যেন দিন দিন মাটিতে ব'সে যাচ্ছে এবং তার ঘুণ-ধরা পাঁজরগুলো ক্রমেই এমনভাবে পলস্তারার চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে, যেন বহুদিনের সঞ্চিত জঞ্জালের চাপ প্রতিরোধ করবার সামর্থ্য তার আর নেই ; যেন

দুঃখে, ব্যথায়, অসহ্য দাপাদাপিতে, মাতালের হুল্লোড় আর তিক্ত গানে বিপর্যস্ত হ'য়ে সে ধীরে ধীরে ফেটে যাচ্ছে, ভেঙে প'ড়ছে, আর তার ঘোলাটে শার্শিগুলোর মধ্যে দিয়ে যেন শেষবারের মতো সে দেখে নিচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া আলো।

পের্ফিশ্‌কা ব'ললো :

"আজ বাদে কাল ঝুড়িও ফাটবে, আর বেঙাচিগুলোও ছড়িয়ে প'ড়বে স্যাঁতা মাটিতে। তখন আমরা ছিটকে প'ড়বো এদিকে-ওদিকে, আস্তানা খুঁজবো অন্য কোথাও। খুঁজে পেতে যদি একটা পাই, তখন আমাদের জীবনও ব'দলে যাবে; শুধু জীবন কেন—জানলা-দরজা সবকিছুই,—এমন কি ছারপোকার কামড়টুকু পর্যন্ত ব'দলে যাবে। শুধু, যতো তাড়াতাড়ি স'রে যেতে হয় ততোই মঙ্গল! এই খোঁয়াড়ে থেকে থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠেছি!—আছি অনেকদিন, স'য়েও গেছে, তবু ব'লবো, আজই এর নিকেশ হ'ক্!"

কিন্তু পেফিশ্‌কার ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো না; যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো বাড়িখানা। উপরন্তু পেত্রুহা সেটা কিনে নিলো। কেনার পর ঝাড়া দুটো দিন ধ'রে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো পচা বাড়িটার সর্বাংগ। তারপর ইট এলো, তক্তা এলো, ভারা বাঁধা হ'লো বাড়িখানার আষ্টেপৃষ্ঠে, এবং প্রায় তিন মাস ধ'রে বাড়িটা কাঁপলো, গোঙালো কুড়ুলের চোপে। করাত চ'ললো, বাটালি চ'ললো, পেরেক ঠোকা হ'লো কাঁড়ি কাঁড়ি, পচা পাঁজরগুলো উড়িয়ে দিয়ে বসানো হ'লো নতুন পাঁজর, খোদ বাড়িটার সংগে জুড়ে দেওয়া হ'লো নতুন একটা বা'র-বাড়ি, তারপর গোটা বাড়িটাকে মুড়ে দেওয়া হ'লো পাতলা তক্তা দিয়ে। এইবার এই বেঁটে-সেটে, চওড়া বাড়িখানাকে এমন খাড়া আর মজবুত দেখাতে লাগলো যে মনে হ'লো যেন মাটির নিচে এর নতুন শেকড়-বাকড় গজিয়েছে।

তারপর পেত্রুহা দরজায় এক বিরাট সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে দিলো এবং তার নীল জমির ওপর সোনালী হরফে লেখা হ'লো :

"ফিলিমনফের ডেরা—ফুর্তি-ফোয়ারা।"

পের্ফিশ্‌কা ব'ললো একদিন :

"বাইরে চেকনাই, ভেতরটা পচা-ই।"

ইলিয়ারও তাই মত। কথাটা শুনে খুশি হ'য়ে একটু হাসলো সে। তারও মনে হ'লো তালি-তাপ্পা দেওয়া বাড়িটার সবটুকুই জোচ্চুরি। এই সময় পাশ্‌কার কথা মনে প'ড়তে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো: "কে জানে ছেলেটা কোথায় কী ক'রছে!" পের্কিশ্‌কার মতো সেও স্বপ্ন দেখতো, একদিন জানলা-কপাট-লোকজন সবকিছুই পাল্‌টে যাবে।

এখানকার জীবন আগের চেয়ে আরও দুর্বিষহ হ'য়ে উঠলো। লেবুগাছটা কেটে ফেলা হ'য়েছে, তাই নিরালা কোণটুকুও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, আর তার স্থান দখল ক'রেছে নতুন বা'র-বাড়টা। ছেলেমেয়েগুলো কোথাও ব'সে একটু নির্জনে গল্পগুজব ক'রবে তার আর কোনো উপায়ই নেই। নিরিবিলি কোণ ব'লতে যেটুকু বাকি আছে সেখানে যেতে গেলে নাকে হাত-চাপা দিতে হয়, কারণ তার ঠিক সামনেই এক গাদা পচা কাঠ জড়ো ক'রে রাখা হ'য়েছে। আগে এইখানেই কামারশালাটা ছিলো। কিন্তু এখানে ব'সতে ভয় করে ইলিয়ার, মনে হয় থেতলানো মাথাটা নিয়ে সাভেলের বউ আজও ঐ কাঠের গাদার নিচে শুয়ে র'য়েছে।

পেত্রুহা তেরেন্সকে একখানা নতুন ঘর দিলো—ঘরখানা ছোটো, হোটেলের হলঘরের ঠিক পাশেই। কিন্তু হ'লে হবে কি, সবুজ কাগজে-মোড়া পার্টিশান-দেয়ালটার ফাঁক দিয়ে হোটেলের যত হৈ-হল্লা, ভদ্‌কার গন্ধ আর তামাকের ধোঁয়া সেখানে এসে ঢুকতো। ঘরখানা পরিষ্কার খটখটে,—তবু মনে হ'তো আগের এঁদোপুরীটা যেন এর চেয়ে অনেক ভালো ছিলো। জানলা খুললে চোখে পড়ে শুধু গ্যারেজের নোংরা দেয়ালটা; আকাশ, সূর্য বা নক্ষত্র কিছুই চোখে পড়ে না এখান থেকে,—তাদের ছিটে-ফোঁটাও না! কিন্তু আগের এঁদোপুরীর জানলার সামনে নতজানু হ'লে এ-সবই দেখা যেতো।

হালকা-বেগ্‌নেরঙের শার্টের ওপর একটা খাটো কোট গায়ে দিয়ে তেরেন্স সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো কাউন্টারের পিছনে। দেখে মনে হ'তো কোটটা যেন বাক্‌শোর ওপর ঝুলছে। লোকজনের সংগে কথা বলবার সময় সে এখন 'আপনি' না ব'লে ব'লতো 'তুমি'; গলাটা শোনাতো কুকুরের আকস্মিক ঘেউ-ঘেউ ডাকের মতো এবং মনে হ'তো প্রভুভক্ত কুকুরের মতোই সে যেন তার মনিবের ধনসম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে। ইলিয়াকে সে কিনে দিলো

একটা কোট, একজোড়া জুতো, ফতুয়া, আর একটা টুপি। সেগুলো প'রতেই ইলিয়ার মনে প'ড়ে গেলো বুড়ো জেরেমিয়াকে। আজকাল সে কাকার সংগে প্রায় কথাই ব'লতো না। তার জীবনটা কেটে চললো একঘেয়ে গরুর গাড়ির মতো। অদ্ভুত অদ্ভুত অশিশুসুলভ চিন্তা ও অনুভূতিতে ভ'রে থাকতো তার মনটা এবং মনে হ'তো জগদ্দল পাথরের মতো একটা ক্লান্তি তার বুকে যেন চেপে ব'সে আছে। এখন প্রায়ই সে ভাবতো গ্রামের কথা, আর ভেবে ভেবে ঠিক ক'রতো এ-জীবনের চেয়ে গ্রামের জীবন লক্ষ গুণে ভালো। সে-জীবন আরও সরল, আরও নিরিবিলি এবং আরও সহজবোধ্য! তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো কের্জেনৎসের বন, মনে প'ড়তো আস্তিপ সন্ন্যাসী সম্বন্ধে তার কাকার গল্পগুলো। আর, আস্তিপের কথা চিন্তা ক'রলেই তার মনে প'ড়ে যেতো পাশ্‌কাকে। ছেলেটা গেলো কোথায়? হয়তো সে-ও পালিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে কোনো গুহায় দিন কাটাচ্ছে! বনে বাতাসের আর্তনাদ আছে, নেকড়ের গর্জন আছে—তা সত্যি; তবু কেমন যেন একটা মাদকতাও আছে তার মধ্যে। তাছাড়া শীতের দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকলে সেখানে সবকিছুই ঝকঝক করে রূপোর মতো, চারিধার থাকে নিস্তব্ধ—এতো নিস্তব্ধ যে, যদি কেউ ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে শুনতে পায় শুধু তার বুকের স্পন্দন আর বরফের মুচমুচে শব্দ। এ-ছাড়া আর কিছুই না।

কিন্তু শহর হ'লো হট্টমন্দির। এখানে সবকিছুই ঝাপ্‌সা, এমন কি রাত্রেও নির্জনতা নেই। গানের ধাক্কায়, আর্তের চীৎকারে, অসহ্য গোঙানিতে, গাড়িঘোড়ার ঘর্ঘর শব্দে এবং পাহারাওয়ালার চেঁচামেচিতে জানলার শার্শিগুলো পর্যন্ত থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। স্কুলে ছেলেগুলো সময় কাটায় চেঁচামেচি-হুড়োহুড়িতে, আর বয়স্ক লোকগুলো হৈ-হল্লা করে, মারামারি করে, দিব্যি গালে, আর মদ গেলে। এতে কেবল যে অশান্তিরই সৃষ্টি হয় তা নয়, এতে বিপদেরও আশংকা প্রচুর। এখানকার সবাই যেন কেমন 'বেহেড্‌', হয় পেত্রুহার মতো চোর, আর নয়-তো সাভেলের মতো হিংসুটে, কিংবা ঐ পের্ফিশ্‌কা, তেরেন্স-কাকা বা মাত্তিৎসার মতোই অপদার্থ। বিশেষ ক'রে পের্ফিশ্‌কার দুর্বোধ্য অভদ্র আচরণে ইলিয়া চ'মকে ওঠে।

একদিন, স্কুলে যাবে ব'লে ইলিয়া সবে চৌকাঠ পার হ'য়েছে, এমন সময় পের্ফিশ্‌কা হোটেলের কাউন্টারের সামনে এসে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো তেরেন্সের দিকে। উশ্‌কোখুশকো তার চেহারা, যেন ঘুমোয় নি গতরাত্রে, বাঁ চোখটা কাঁপছে, সারা মুখে ভ্রূকুটি, তার ওপর নিচের ঠোঁটখানা ঝুলে প'ড়েছে হাস্যকরভাবে। তার দিকে চেয়ে একটু হেসে তেরেন্স নিয়মমতো তাকে তিন পয়সার ভদ্‌কা একটা গেলাসে ঢেলে দিলো। কাঁপা-হাতে গেলাসটা ধ'রে মদটুকু খেলো পেফিশ্‌কা, কিন্তু দিব্যিও গাললো না বা অন্য কিছু খেতেও চাইলো না। তারপর আবার সে চেয়ে রইলো তেরেন্সের দিকে ;—বাঁ চোখটা তাব তখনো কাঁপছে, আর ডান চোখটা এমন নিষ্প্রভ ও নিশ্চল হ'য়ে র'য়েছে যেন সেটা অন্ধ।

তেরেন্স জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তোমার চোখে কি হ'য়েছে ?"

চোখ র'গড়ে, হাতের চেটোর দিকে চেয়ে, গোটা গোটা ক'রে ব'ললো পের্ফিশ্‌কা :

"আমার বউ—আভ্‌দোতিয়া পেত্রফ্‌না মারা গেছে।"

দেয়ালে-লটকানো বিগ্রহটার দিকে চেয়ে গডানে-গলায় ব'ললো তেরেন্স :

"তাই নাকি ? আহা, তার আত্মার শান্তি হ'ক !"

"অ্যাঁ ?"

"ব'লছি : তার আত্মার শান্তি হ'ক।"

"হ্যাঁ—সে ম'রেছে !" এই ব'লে পের্ফিশ্‌কা হঠাৎ চ'লে গেলো।

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে তেরেন্স-কাকা ব'ললো :

"আজব লোক যা-হ'ক।"

ইলিয়াও ভাবলো : সত্যিই, আজব লোক এই পের্ফিশ্‌কা। স্কুলে যাবার আগে মৃতদেহটাকে এক-পলক দেখে নেবে ব'লে সে ঢুকলো এঁদোপুরীতে। দেখলো : অন্ধকার খুপরিটায় তখন ভিড় জ'মে গেছে, চিলেকোঠার স্ত্রীলোকগুলো এক কোণে বিছানাটার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ক'রছে ; একধারে মাত্রিৎসা মাশাকে একটা জামা পরাতে পরাতে ব'লছে : "লাগছে বগলে ?" আর মাশা হাত ছুটো মেরে জবাব দিচ্ছে খেয়ালী মেজাজে :

হ্যা—!" এদিকে টেবিলের ওপর জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে, চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে পেফিশ্‌কা-মুচি চেয়ে আছে তার মেয়ের দিকে।

মৃত স্ত্রীলোকটার মাংসল, সাদা মুখখানার দিকে তাকালো ইলিয়া। আভ্‌দোতিয়ার কালো কালো চোখদুটি চিরদিনের জন্য বুঁজে গেছে। একটা তীব্র ব্যথা নিয়ে ইলিয়া বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

স্কুল থেকে ফিরে হোটেলে ঢুকতেই সে শুনতে পেলো পেফিশ্‌কা তার হারমোনিয়াম বাজিয়ে ফাঁকা-গলায় গাইছে :

" 'সই গো আমার পরাণটারে নিয়েই গেলে সই—
হায়, গো, হায় নিলে কেন—অবাক ব'নে রই ,
ও সই, একি উচিত হ'লো ?
নিলেই যদি, পরাণটারে ফেল্‌লে কোথায় বলো ?' "

"চুলোর কাণ্ড দেখো। মাগীরা আমায় খেদিয়ে দিলো। ব'ললো কি না : 'দূর হ মাতাল-মিনসে, অমন রাক্ষুসে মুখে ঝাড়ু মারি তোর।' আমি রাগ করি নি—ধৈর্য ধ'রে আছি—গালমন্দ দেবে দাও, মারবে মারো, কিন্তু আমাকে একটু বাঁচতে দাও, শুধু বাঁচতে দাও একটু আমায়, দয়া ক'রে বাঁচতে দাও। ভাইরে, সবাই চায় ভালোভাবে বাঁচতে—এইটাই হ'লো আসল কথা। আত্মা সবায়েরই এক—ভাস্কারও যা, জাকবেরও তাই।

" 'কে কাঁদে ? বলি, কাঁদে কে ?
কি চাই তোর ?—বড়ো ব্যথা যে।
শান্ত হ, ক্ষান্ত হ, কি হবে মাথা খুঁড়ে ?
ব'সে ব'সে শুকনো রুটি খা কুরে কুরে।' "

পেফিশ্‌কার অদ্ভুত মুখখানা খুশিতে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। তার দিকে চাইতেই ইলিয়ার সর্বাংগ ভয়ে ও ঘৃণায় শিউরে উঠলো। তার মনে হ'লো, যে লোকটা স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেই এমন অকথ্য আচরণ ক'রতে পারে, ঈশ্বরের উচিত তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। কিন্তু পেফিশ্‌কা পরের দিনও মাতাল

হ'লো। সবাই দেখলো শবাধারের পিছনে যেতে যেতে সে ট'লছে, তার চোখ দুটো পিটপিট ক'রছে এবং হাসছেও সে মৃদু মৃদু। সকলেই তাকে ছি-ছি ক'রতে লাগলো, এমন কি একজন তার ঘাড়ে একটা রদ্দাও দিলো।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন সন্ধ্যায় ইলিয়া ব'ললো জাকবকে :

"বলিহারি রকম-সকম! পের্ফিশ্কাকে কেমন লাগে তোমার? রীতিমতো একটা পাজি লোক!"

নির্বিকারভাবে জবাব দিলো জাকব :

"চুলোয় যাক্গে!"

কিছুদিন যাবৎ ইলিয়া লক্ষ্য ক'রছে জাকবের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। ও উঠানেও আসে না, ঘরে ব'সে থাকে সারাটা দিন, এমন কি ইলিয়াকেও যেন এড়িয়ে চ'লতে চায়। প্রথমটায় ইলিয়া ভাবলো, ভালো ছাত্র ব'লে স্কুলে তার যে সুনাম র'টেছে তাতে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে জাকব হয়তো বাড়িতে ব'সে স্কুলের পড়াই প'ড়ছে, কিন্তু তা তো সত্যি নয়; স্কুলের পড়ায় জাকবের কোনোই উন্নতি হয় নি, তাছাড়া মাস্টারমশাই তো হামেশাই ব'কছেন : "তুমি এতো অন্যমনস্ক কেন জাকব? সবচেয়ে সোজা জিনিষগুলোও তোমার মাথায় ঢোকে না!" পের্ফিশ্কা সম্বন্ধে জাকবের উক্তিতে অবাক হ'লো না ইলিয়া, কারণ জাকব আজকাল সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না, ওর আশেপাশে কি ঘ'টছে না ঘ'টছে তার দিকে ওর যেন কোনো নজরই নেই। তবু, ইলিয়া ভাবলো, তার জানা উচিত জাকবের মনের কথাটা কী! তাই সে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তোমার মতলব কি বলো তো? আমার সংগে তুমি কি আর বন্ধুত্ব রাখতে চাও না?"

বিস্মিত হ'য়ে জাকব জবাব দিলো :

"আমি? তোমার সংগে বন্ধুত্ব রাখতে চাই না? কি ব'লছো তুমি?"

এই ব'লে সে হুড়হুড় ক'রে আরও কতকগুলো কথা ব'লে গেলো :

"তোমাকে একটা জিনিষ দেখাবো। বাড়ি যাও,—আমি চট্ ক'রে আসছি।"

জাকব দৌড়ে চ'লে যেতেই এক-গলা কৌতূহল নিয়ে ইলিয়া নিজের ঘরে

হ্যা—!" এদিকে টেবিলের ওপর জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে, চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে পেফিশ্‌কা-মুচি চেয়ে আছে তার মেয়ের দিকে।

মৃত স্ত্রীলোকটার মাংসল, সাদা মুখখানার দিকে তাকালো ইলিয়া। আভ্‌দোতিয়ার কালো কালো চোখদুটি চিরদিনের জন্য বুঁজে গেছে। একটা তীব্র ব্যথা নিয়ে ইলিয়া বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

স্কুল থেকে ফিরে হোটেলে ঢুকতেই সে শুনতে পেলো পেফিশ্‌কা তার হারমোনিয়াম বাজিয়ে ফাঁকা-গলায় গাইছে :

" 'সই গো আমার পরাণটারে নিয়েই গেলে সই—
হায়, গো, হায় নিলে কেন—অবাক ব'নে রই,
ও সই, একি উচিত হ'লো ?
নিলেই যদি, পরাণটারে ফেললে কোথায় বলো ?' "

"চুলোর কাণ্ড দেখো! মাগীরা আমায় খেদিয়ে দিলো। ব'ললো কি না : 'দূর হ মাতাল-মিনসে, অমন রাক্ষুসে মুখে ঝাড়ু মারি তোর।' আমি রাগ করি নি—ধৈর্য ধ'রে আছি—গালমন্দ দেবে দাও, মারবে মারো, কিন্তু আমাকে একটু বাঁচতে দাও, শুধু বাঁচতে দাও একটু আমায়, দয়া ক'রে বাঁচতে দাও! ভাইরে, সবাই চায় ভালোভাবে বাঁচতে—এইটাই হ'লো আসল কথা। আত্মা সবায়েরই এক—ভাস্কারও যা, জাকবেরও তাই।

" 'কে কাঁদে ? বলি, কাঁদে কে ?
কি চাই তোর ?—বড়ো ব্যথা যে !
শান্ত হ, ক্ষান্ত হ, কি হবে মাথা খুঁড়ে ?
ব'সে ব'সে শুকনো রুটি খা কুরে কুরে।' "

পেফিশ্‌কার অদ্ভুত মুখখানা খুশিতে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। তার দিকে চাইতেই ইলিয়ার সর্বাংগ ভয়ে ও ঘৃণায় শিউরে উঠলো। তার মনে হ'লো, যে লোকটা স্ত্রীর মৃত্যুর দিনেই এমন অকথ্য আচরণ ক'রতে পারে, ঈশ্বরের উচিত তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। কিন্তু পেফিশ্‌কা পরের দিনও মাতাল

হ'লো। সবাই দেখলো শবাধারের পিছনে যেতে যেতে সে ট'লছে, তার চোখ দুটো পিটপিট ক'রছে এবং হাসছেও সে মৃদু মৃদু। সকলেই তাকে ছি-ছি ক'রতে লাগলো, এমন কি একজন তার ঘাড়ে একটা রদ্দাও দিলো।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন সন্ধ্যায় ইলিয়া ব'ললো জাকবকে :

"বলিহারি রকম-সকম! পের্ফিশ্কাকে কেমন লাগে তোমার? রীতিমতো একটা পাজি লোক!"

নির্বিকারভাবে জবাব দিলো জাকব :

"চুলোয় যাক্গে!"

কিছুদিন যাবৎ ইলিয়া লক্ষ্য ক'রছে জাকবের মধ্যে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। ও উঠানেও আসে না, ঘরে ব'সে থাকে সারাটা দিন, এমন কি ইলিয়াকেও যেন এড়িয়ে চ'লতে চায়। প্রথমটায় ইলিয়া ভাবলো, ভালো ছাত্র ব'লে স্কুলে তার যে সুনাম র'টেছে তাতে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে জাকব হয়তো বাড়িতে ব'সে স্কুলের পড়াই প'ড়ছে; কিন্তু তা তো সত্যি নয়; স্কুলের পড়ায় জাকবের কোনোই উন্নতি হয় নি, তাছাড়া মাস্টারমশাই তো হামেশাই ব'কছেন: "তুমি এতো অন্যমনস্ক কেন জাকব? সবচেয়ে সোজা জিনিষগুলোও তোমার মাথায় ঢোকে না।" পের্ফিশ্কা সম্বন্ধে জাকবের উক্তিতে অবাক হ'লো না ইলিয়া, কারণ জাকব আজকাল সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না, ওর আশেপাশে কি ঘ'টছে না ঘ'টছে তার দিকে ওর যেন কোনো নজরই নেই! তবু, ইলিয়া ভাবলো, তার জানা উচিত জাকবের মনের কথাটা কী! তাই সে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তোমার মতলব কি বলো তো? আমার সংগে তুমি কি আর বন্ধুত্ব রাখতে চাও না?"

বিস্মিত হ'য়ে জাকব জবাব দিলো :

"আমি? তোমার সংগে বন্ধুত্ব রাখতে চাই না? কি ব'লছো তুমি?"

এই ব'লে সে হুড়হুড় ক'রে আরও কতকগুলো কথা ব'লে গেলো :

"তোমাকে একটা জিনিষ দেখাবো। বাড়ি যাও,—আমি চট্ ক'রে আসছি।"

জাকব দৌড়ে চ'লে যেতেই এক-গলা কৌতূহল নিয়ে ইলিয়া নিজের ঘরে

এসে ঢুকলো। একটু পরেই দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এলো জাকব। তারপর দরজায় খিল দিয়ে, জানলার ধারে এসে শার্টের পকেট থেকে সে একখানা লাল মলাটের বই বের ক'রলো। ভেরেন্স-কাকার বিছানার ওপর ব'সে, ইলিয়াকে তার পাশে ব'সতে ব'লে, চুপি চুপি ব'ললো সে: "এখানে স'রে এসো।" তারপর বইখানা তার কোলের ওপর খুলে, ঝুঁকে প'ড়ে, হ'লদে পাতাগুলোর ওপর তার একটা আঙুল বুলোতে বুলোতে, প'ড়তে লাগলো জাকব:

"'এমন সময় সেই নির্ভীক নাইট হঠাৎ দূরে দেখতে পেলো একটা আকাশ-ছোঁয়া, লোহার দরজাওয়ালা পাহাড। দেখেই তার বিশাল বুকখানা বীরত্বে দপ্ ক'রে জলে উঠলো। তখন সে তার বর্শাটা বাগিয়ে ধ'রে, চীৎকার ক'রে, প্রচণ্ডগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে, তীরবেগে দৌড়ে গেলো সেই পাহাডের দিকে। বর্শার প্রচণ্ড আঘাতে বাজ-পড়ার মত একটা বিকট শব্দ ক'রে দরজাটা ভেঙে প'ড়লো টুকরো-টুকরো হ'য়ে। আর সংগে সংগে পাহাডটা থেকে লাফিয়ে উঠলো লেলিহান অগ্নিশিখা, ধোঁয়া বেরুতে লাগলো হুডহুড় ক'রে, এবং কে যেন ভয়ংকর গলায় চীৎকার ক'রে উঠলো। সেই চীৎকারে কাঁপতে লাগলো পৃথিবীটা, পাহাড়ের পাথরগুলো ধুপধাপ ক'রে প'ডতে লাগলো অশ্বারোহীর পাদমূলে। 'এই যে, তুই এসেছিস মূর্খ? এতো স্পধা তোর। আমি আর যম তোর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি অনেক দিন ধ'রে!' কথাটা শুনেই সেই নাইট তখন ধোঁয়ায় ধাঁধিয়ে গিয়ে'—"

বন্ধুর আবেগকম্পিত কণ্ঠ শুনতে শুনতে অবাক হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলো ইলিয়া: "ও কে?"

বইয়ের ওপর থেকে ফ্যাকাশে মুখখানা তুলে ব'ললো জাকব: "কোথায় কে?"

"না, না, ব'লছি, নাইট কী?"

বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিলো জাকব:

"বর্শা হাতে বীর অশ্বারোহী—সেই নির্ভীক রাউল! ড্রাগনটা তার সুন্দরী স্ত্রী লুইসাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু—আঃ, আবার কি হ'লো? শোনো না চুপ ক'রে—!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বলো! না, দাঁড়াও একটু—ড্রাগন কী?"

"ডানা আর পা-ওয়ালা সাপ; তার নখগুলো লোহার, তার তিনটে মাথা, আর তিনটে মাথা দিয়েই আগুন বেরোয়—বুঝলে?"

চোখদুটো ছানাবড়া ক'রে ব'ললো ইলিয়া:

"বাপ-রে-বাপ! তারপর ড্রাগনটা দিলো তো নাইটকে বলিয়ে?"

"তোমার মুণ্ডু!"

ঘেঁষাঘেঁষি ব'সে, একটা আজব মিষ্টি ভয়ে আর কৌতূহলে কাঁপতে কাঁপতে ছেলে দুটো এখন এক মায়ারাজ্যে প্রবেশ ক'রলো, যেখানে নির্ভীক নাইটের প্রচণ্ড বর্শার আঘাতে বিকট রাক্ষসগুলো ধরাশায়ী হ'চ্ছে, যেখানে সব কিছুই সুন্দর, অদ্ভুত ও জাঁকালো এবং যেখানকার জীবনের সংগে এখানকার নোংরা একঘেয়ে জীবনের কোনোই মিল নেই। সেখানে ছিন্নচীরধারী মাতালও নেই, আর গলিত কাঠের গৃহও নেই, তার বদলে আছে বিরাট বিরাট স্বর্ণময় প্রাসাদ আর গগনচুম্বী দুর্ভেদ্য লৌহদুর্গ। এদিকে দুই বন্ধুতে মিলে যখন অপূর্ব মায়ারাজ্যে বিচরণ ক'রছে, তখন স্ফূর্তিবাজ পের্ফিশ্‌কা তার হারমোনিয়াম বাজিয়ে খানিক দূরেই গান গাইছে:

" 'ধরে যদি শয়তান, মরবার পরে নয়—
ধরা যদি পড়ি তবে জ্যান্তই প'ড়বো;
শয়তান এসে মোরে ধ'রবে গো ঝাপ্‌টে,
মদ খেয়ে যবে আমি ফূর্তিই ক'রবো।'

"কেমন কি না? ফূর্তিসে গান গেয়ে যাও! ভগবান ভালোবাসেন ফূর্তিবাজ লোকদেরই!"

পের্ফিশ্‌কার খনখনে কণ্ঠস্বরের তালে তালে হারমোনিয়ামটা যথাসাধ্য হাঁপাতে থাকে, আর পের্ফিশ্‌কা সেই সংগে চীৎকার ক'রে গাইতে থাকে নাচের সুরে:

" 'যদি বলো কেঁদে কেঁদে কেটেছিলো যৌবন
ঠাণ্ডায়, কনকনে ঠাণ্ডায়,

আমি বলি : ভয় কি, টের পাবে পন্নমের
প'ড়লেই নরকের কড়াটায়।' ”

প্রত্যেকটি গানের সংগে সংগে ফেটে পড়ে হাসি আর 'বাহবা-বাহবা'র হুল্লোড়। হারমোনিয়ামের শব্দটা মিশে যায় কাপ-ডিশের টুং-টাং, মেঝের ওপর জুতোর ঘষড়ানি আর চেয়ার সরানোর ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজে, এবং সবশুদ্ধ মিলিয়ে মনে হয়, শীতের অরণ্যে একটা দম্‌কা বাতাস যেন আর্তনাদ ক'রে ফিরছে।

আর এদিকে একটা নোংবা খুপরিতে ব'সে দুটি বালক ঝুঁকে প'ড়ে একখানা বই প'ড়তে থাকে। ফাটা কাঠের দেয়ালে ঐ শব্দঝঞ্ঝা বারেবার ঝাপট মারে, কিন্তু তবুও ওদের একজন আস্তে আস্তে প'ড়ে যায় :

"তারপর সেই নাইট রাক্ষসটাকে লৌহ-আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রতেই রাক্ষসটা ভয়ে এবং যন্ত্রণায় বজ্রকণ্ঠে গর্জন ক'রে উঠলো।' ”

যথাসময়ে নাইট আর ড্রাগনের কাহিনী পড়া শেষ হ'লো। তারপর এলো 'অজেয় বিশ্বস্ততার গল্প— গুয়াক্' এবং 'ভেনিসের নির্ভীক রাজকুমার ফ্রান্সিস ও সুন্দরী রাণী রেন্‌ংজিন্‌ভিনের কাহিনী'। দেখতে দেখতে ইলিয়ার মনটা হ'য়ে উঠতে লাগলো 'নাইট' ও 'লেডী'-দের লীলাভূমি এবং সেই সংগে বাস্তব জীবনের ছোপ-ছাপগুলো মুছে যেতে লাগলো তার মনের শ্লেট থেকে। দুই বন্ধু পালা ক'রে কাউণ্টার থেকে সরাতো আনা পাঁচেক ক'রে পয়সা; তাই বইও আসতো যথেষ্ট। একদিকে ওরা যেমন পরিচিত হ'লো 'য়াশকা স্মেরদ্‌তেন্‌স্কি'র এ্যাড্‌ভেঞ্চারের সংগে, অন্যদিকে ওরা তেমনি মুগ্ধ হ'লো 'তাতারী ঘোড়সওয়ার য়াপান্‌চা'-র বীরত্বে। ফলে, ওরা ধীরে ধীরে ওদের কঠোর ও কুৎসিত জীবন থেকে কেবলই স'রে স'রে গিয়ে প্রবেশ ক'রতে লাগলো এমন এক রাজ্যে যেখানে মানুষ নিয়তির নিষ্ঠুর চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে সুখের সৌধ গ'ড়ছে। এইভাবে ওদের দিন কাটতে লাগলো। কেবল একটি ঘটনা এই সময় দাগ কেটে গেলো ইলিয়ার মনে।

একদিন থানা থেকে সমন এলো পের্ফিশ্‌কার নামে। যাবার সময় তাকে দেখালো উৎকণ্ঠায় কাঁচুমাচু, কিন্তু পাশ্‌কা গ্রাৎচফের হাতখানা বাগিয়ে ধ'রে সে যখন ফিরে এলো, তখন তার স্ফূর্তি দেখে কে! পাশকা রোগা হ'য়ে গিয়েছিলো অসম্ভব, গায়ের রঙও গিয়েছিলো হ'লদে হ'য়ে, এবং মুখের উদ্ধত-ভাবটা কমলেও তার শ্যেনদৃষ্টিটুকু বজায় ছিলো পুরোপুরিই। ওকে হোটেলে এনে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ টিপতে টিপতে ব'লতে লাগলো পের্ফিশ্‌কা:

"ওগো ভাল্‌মান্‌ষের বাছারা, দেখো দেখো কে এসেছে,—স্বয়ং পল্ গ্রাৎচফ, —সোজা পেন্‌সা থেকে—পুলিশ পাহারায়। আজকালকার ছোঁড়ারা আর ঘরে ব'সে ভাগ্যের অপেক্ষা করে না; উড়তে শিখলে নিজেরাই পথে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যের খোঁজে!"

পাশ্‌কা দাঁড়িয়েছিলো পের্ফিশ্‌কার পাশেই। ওর বাঁ হাতখানা গোঁজা ছিলো ছেঁড়া পাতলুনের পকেটে; ডান হাতখানা ও কেবলই ছাড়িয়ে নেবার

চেষ্টা ক'রছিলো পের্ফিশ্‌কার মুঠো থেকে, আর ফাঁকে ফাঁকে রাগতভাবে তাকাচ্ছিলো মুচিটার দিকে।

কে একজন ব'লে উঠলো :

"পের্ফিশ্‌কা, ছোঁড়াটাকে দাও না ছু ঘা!"

গম্ভীরভাবে জবাব দিলো পের্ফিশ্‌কা :

"কেন? ও ঘুরতে চায় ঘুরুক; কে জানে হয়তো ভাগ্যের দেখাও পেয়ে যেতে পারে।"

এমন সময় তেরেন্স ব'ললো :

"আমার কিন্তু মনে হয় পাশ্‌কার খিদে পেয়েছে।"—এই ব'লে এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে আবার ব'ললো সে : "নে, পাশ্‌কা, ধর্‌!"

ধীরে-সুস্থে রুটির টুকরোটা নিয়ে পাশ্‌কা বেরিয়ে গেলো হোটেল থেকে।

শিস্‌ দিতে দিতে ব'লে উঠলো পের্ফিশ্‌কা :

"এই দেখো, আবার ভাগ্‌লো! যা বেটা, যাবি তো যা!"

এতোক্ষণ ধ'রে ঘরের দরজা থেকে ইলিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই লক্ষ্য ক'রছিলো। এইবার সে ইশারায় পাশ্‌কাকে ডাকলো। চৌকাঠের সামনে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়ালো পাশ্‌কা, তারপর সন্দিগ্ধভাবে এদিক-উদিক চেয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্তভাবে ব'লে উঠলো ফোঁস ক'রে :

"কি চাই?"

"গুড মর্নিং!"

"বেশ, গুড মর্নিং। তারপর?"

"ব'সো।"

"কেন?"

"এই এমনি, একটু গল্পগুজব ক'রবো।"

গ্রাৎচফের কাটা-কাটা, রাগত প্রশ্নে এবং তার তিরিক্ষে মেজাজে ক্ষুণ্ণ হ'লো ইলিয়া। ওর ইচ্ছা ছিলো পাশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে গোটা গ্রীষ্মকালটা সে কোথায় কাটালো এবং কী-ই বা দেখলো। কিন্তু পাশ্‌কা পায়ের ওপর পা দিয়ে জোরে ব'সে রুটিতে কামড় দিতে দিতে নিজেই ছুঁড়তে লাগলো প্রশ্নের বাণ :

"পড়াশুনো শেষ হ'লো?"

"আসছে বসন্তে হবে।"

"আর আমি এর মধ্যেই সব শেষ ক'রে ফেলেছি।"

কথাটা বিশ্বাস হ'লো না, তাই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"সত্যি?"

"সত্যি না তো কি? আমি যা ধরি তা চটপট শেষ ক'রে ফেলি।"

"কিন্তু তুমি প'ড়লে কোথায়?"

"জেলে, কয়েদীদের কাছে।"

পাশ্‌কার আরও কাছে স'রে এসে, তার শীর্ণ মুখখানার দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"সেখানে কি তুমি অনেক দিন ছিলে? ভয় হয় নি তোমার?"

"ভয়ের কি আছে? সেখানে ছিলাম চার মাস। তবে, এক জায়গাতেই নয়, ছিলাম নানান শহরের নানান জেলে। বাপধন! জেণ্টেলমানদের কাছে ধন্না দিতাম। সেখানে লেডীও ছিলো অনেক—সত্যিকারের লেডী আর সত্যিকারের জেণ্টেলমান! তারা নানান ভাষায় কথা বলে, আর জানেও সব! আমি তাদের ঘরদোর সাফ ক'রে দিতাম! হ'ক না কয়েদী, তারা ছিলো দস্তুরমতো ফূর্তিবাজ, বুঝলি?—এক একটি তুবড়ি!"

"ডাকাত বুঝি?"

"দূর্, খাঁটি চোর!"—সগর্বে ব'ললো পাশ্‌কা।

পাশ্‌কার প্রতি ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধায় ইলিয়ার চোখদুটো পিটপিট ক'রতে লাগলো। জিজ্ঞাসা ক'রলো সে:

"তারা কি রাশিয়ান?"

"তাদের কেউ কেউ ছিলো ইহুদী। সেরা লোক। মাইরি, কি জবরদস্ত মানুষই না ছিলো তারা! হেঁজিপেঁজি নয়। চুরি যখন ক'রতো, একেবারে পুকুর-চুরি! যাই হ'ক, ধরা প'ড়লো, আর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো সাইবেরিয়ায়।"

"তুমি তাহ'লে লেখাপড়া শিখলে কি ক'রে?"

"কি ক'রে আবার? ব'ললাম: শেখাও। আর তারা আমায় শিখিয়ে দিলো।"

"লিখতে-প'ড়তে ?"

"লিখতে শিখিয়েছে একটু একটু ! কিন্তু পড়ার কথা যদি বলিস, আমি যতো খুশি প'ড়ে যেতে পারি ! অনেক—অনেক বই প'ড়ে ফেলেছি আমি।"

বইয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই খুশি হ'লো ইলিয়া।

"আমরাও পড়ি—আমি আর জাকব। সে-সব যা বই না !"

এর পর দুজনেই পাল্লা দিয়ে পড়া-বইয়ের তালিকা দিতে লাগলো। এ যদি বলে তিনখানা ও বলে ছখানা। যাক, একটু পরেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো পাশ্‌কা :

"বুঝতে পারছি, তোরা বেশি বই প'ড়েছিস্। ধুত্তোর্, তোদের বইগুলোও আরো ভালো। আমি প'ড়েছি পদ্য। বই ওদের ছিলো অনেক, কিন্তু তার সবই পদ্য, অবিশ্যি ভালো পদ্য।"

এমন সময় ঘরে ঢোকে জাকব। পাশ্‌কার দিকে বিস্মিতভাবে একটু তাকিয়েই হেসে ওঠে সে।

পাশ্‌কা তাকে অভ্যর্থনা জানালো :

"এই-যে ভেড়া যে। এতো হাসি কেন ?"

"না, কিছু না। ছিলে কোথায় ?"

"যেখানে তুই বাপের জন্মেও যেতে পারবি না।"

ইলিয়া জাকবকে ব'ললো :

"জানো, পাশ্‌কাও অনেক বই প'ড়েছে।"

"তাই না কি !" ব'লেই জাকব পাশ্‌কার সংগে গল্প জুড়ে দিলো। তারপর এই তিনটি বালকের মধ্যে যে কথাবার্তা হ'লো তা যেমন অসংলগ্ন তেমনি বিস্ময়কর, যেমন আজব তেমনি মনোহারী।

উত্তেজনায় এবং গর্বে ফুলতে ফুলতে ব'লতে থাকে পাশ্‌কা :

"এমন এমন জিনিষ দেখেছি না যা তোদের বলা অসম্ভব ! একবার তো এমন হ'লো ঝাড়া দুটো দিন পেটেই কিছু প'ড়লো না—একেবারেই কিছু না। একা-একা ঘুমোলাম জঙ্গলে !"

জাকব প্রশ্ন ক'রলো :

"ভয় লাগে নি তোমার ?"

"যা না, সেখানে গিয়ে একটা রাত কাটিয়ে আয় না, তাহ'লেই বুঝবি! একবার তো কুত্তার কামড়ে ম'রতেই ব'সেছিলাম! তখন আমি কাজানে। ওখানে একটা মনুমেণ্ট দেখলাম,—কে একজন অনেক পদ্য লিখেছিলো, সেটা তারই মনুমেণ্ট। ইয়া ব'ড়ো লোকটা—কি বড়ো বড়ো তার পা! আর তার মুঠোটা, বুঝলি জাকব, ঠিক তোর মাথার মতন! আমিও পদ্য লিখবো। এর মধ্যেই শিখে গেছি একটু একটু লিখতে।"

এই ব'লে হঠাৎ জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে এক কোণে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে, সগর্বে ভ্রূ কুঁচকে, হুড়হুড় ক'রে ব'লে গেলো সে :

"রাস্তা-ঘাটে নিত্যি দেখি লোকের চলাচল,
সাজপোষাকে কেতাদুরস্ত্ ভুঁড়িমোটার দল ;
কিন্তু যদি বলো তাদের : কিছু খেতে দাও,
ব'লবে তারা : ভাগো ভাগো, তফাৎ স'রে যাও!"

বলা শেষ ক'রে বন্ধুদের দিকে চেয়ে মাথা হেঁট ক'রলো পাশ্‌কা! ক্ষণিকের জন্য সবাই চুপচাপ। তারপর ইলিয়া ব'ললো ভয়ে ভয়ে :

"কিন্তু এটা কি পদ্য?"

চ'টে গিয়ে পাশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো :

"পদ্য না তো কি! শুনলি না—চল-দল, দাও-যাও? একেই তো পদ্য বলে।"

সংগে সংগে জাকব ব'ললো :

"পদ্যই তো! মাঝখানে বাগড়া দেওয়া তোমার কেমন যেন স্বভাব, ইলিয়া!"

খুশি হ'য়ে জাকবের দিকে চেয়ে পাশ্‌কা ব'ললো : "আরও কতকগুলো লিখেছি।" তারপর আবার শোনা গেলো পাশ্‌কা আওড়াচ্ছে :

"কালো মেঘ গর্জায়, মাটি ভিজে সারা,
দরজায় ডাক শুনি ভরা-বরষার ;
একা আমি, সাথীহীন, আমি গৃহহারা ;
পরণের পাতলুন ছেঁড়া ন্যাকড়ার!"

চক্ষু ছানা-বড়া ক'রে জাকব এমন একটা শব্দ ক'রে উঠলো যেন হঠাৎ ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে সে।

ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি ক'রে ঘ্যানঘেনিয়ে জবাব দিতো মাতিৎসা :

"তাতে কি এসে যায় ? ও মরুক ! মাতাল মিন্‌সেটা কি ভুলেছে যে ওর একটা কচি মেয়ে আছে ? মিনসের মুখ দেখাও পাপ। কুকুরের মতো বমি ক'রে মরুক ও !"

মাশা ব'লতো : "বাবা জানে আমি বড়ো হ'য়েছি, তাই নিজেরটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারি।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ব'লতো মাতিৎসা :

"মাগো, কালে কালে দেখবো কতো ! হায় ভগবান, এখন এই মেয়েটার কি দশা হবে ? আমারও একটা বাচ্চা মেয়ে ছিলো—ঠিক তোর মতো। হোরোলের নাম শুনেছিস তো ? সেই শহরেই সে প'ড়ে রইলো। হোরোল কি এখানে যে যাবো ব'ললেই যেতে পারি ? তাছাড়া যেতে পারলেও রাস্তাঘাট খুঁজে পাবো কি ক'রে ? এই রকমই হয় ! শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের জন্মস্থানটাও ভুলে যায় !"

এই হাঁড়ি-মুখো, গরু-চোখো স্ত্রীলোকটার ভারি গলার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগতো মাশার। মাতিৎসার মুখে হামেশা ভদ্‌কার গন্ধ ছাড়লেও সে ঐ বিশালস্তনীর কোলে উঠে ব'সতো এবং ওর উদ্‌গত ঢিবির মতো বুকটায় ঠেস দিয়ে চুমু খেতো ওর পুরুষ্টু, স্থূল ঠোঁটজোড়ায়। মাতিৎসা আসতো সকালে, আর সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা জড়ো হ'য়ে এখানে ব'সে তাস খেলতো; তবে বেশির ভাগ দিনই তারা প'ড়তো এটা-ওটা। মাশা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো সেই পাঠ এবং সবচেয়ে উত্তেজক অংশগুলো এলেই অস্ফুটভাবে 'উঃ, আঃ' শব্দ ক'রে উঠতো।

মাশার প্রতি জাকবের মনোযোগটা আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেলো। মেয়েটাকে সে হামেশাই এনে দিতো রুটি ও মাংসের টুকরো, চা, চিনি, মদের বোতলে কেরোসিন তেল ; তাছাড়া বই কেনার পর যে পয়সা বাঁচতো তাও সে মাঝে মাঝে দিতো মাশাকে। দিন দিন এই ব্যাপারটা তার যেন গা-সওয়া হ'য়ে গেলো ; আর মাশা ভাবতো : "ঠিক আছে, এ আর কি ! অমন সকলেই দিয়ে থাকে !" ব'লতো :

"জাকব, কয়লা নেই !"

"আচ্ছা।"

তারপর, হয় সে মাশাকে কয়লা এনে দিতো, আর নয় তো একটা দোআনি ফেলে দিয়ে ব'লতো :

"যাও, কিনে আনো গে যাও। আজ আর চুরি ক'রতে পারলাম না।"

মাশাকে একখানা শ্লেট এনে দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় সে ওকে পড়াতে শুরু ক'রলো। পড়াশুনোর গতি মন্থর হ'লেও দেখা গেলো দুমাসেই মাশা বর্ণপরিচয় শেষ ক'রে ফেলেছে—প'ড়তেও পারছে, লিখতেও পারছে!

এই বন্ধুত্বটা ইলিয়ারও গা-সওয়া হ'য়ে গেলো এবং ওখানকার কেউই তেমন নজর দিতো না ওদের দিকে। ইলিয়ার পালা প'ড়লে সেও বন্ধুকে খুশি করবার জন্যে রান্নাঘর বা ভাঁড়ারঘর থেকে এটা-ওটা চুরি ক'রে এনে পের্ফিশ্‌কার এঁদোঘরে এসে হাজির হ'তো। তারই মতো অনাথ এই ছিমছাম, তামাটে রঙের মেয়েটাকে ভালো লাগতো ইলিয়ার। তাছাড়া মাশার স্বাবলম্বী, ভারিক্কে চালচলনটাকে সে প্রশংসা না ক'রেই পারতো না। মাশাকে হাসতে দেখলে সে খুশি হতো এবং কেবলই চেষ্টা ক'রতো কি ক'রে মেয়েটাকে এক কোণে জাপটে ধরা যায়; না পারলে ক্রুদ্ধ হ'য়ে সে মাশাকে জ্বালাতো :

"দূর্ খানকী!"

সংগে সংগে মাশাও চ'টে গিয়ে ব'লতো :

"দূর্ বাক্‌শোমুখো হতচ্ছাড়া!"

মাঝে মাঝে ওদের ঝগড়া বিপজ্জনক হ'য়ে উঠতো। চট্ ক'রে রেগে গিয়ে মাশা তেড়ে যেতো ইলিয়ার দিকে আঁচড়ে দেবার জন্যে; কিন্তু ইলিয়া মুখ ভেংচে হেসে পালিয়ে যেতো ওর সামনে থেকে।

একদিন ওরা তাস খেলছে, এমন সময় জোচ্চুরি ক'রতে গিয়ে মাশা হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেলো ইলিয়ার কাছে। আর যাবে কোথা, রেগে টং হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠলো ইলিয়া :

"জাকবের মাগ্‌ কোতাকার!"

আর, তারপরই সে আরও এমন একটা নোংরা শব্দ উচ্চারণ ক'রলো যার অর্থ সে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে। জাকবও তখন ছিলো সেখানে। প্রথমটায় সে হাসলো, কিন্তু যে-ই দেখলো রাগে অপমানে মাশার চোখদুটি

জলে ভাসছে, তখন সে হাসি থামিয়ে বিবর্ণ মুখে লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে, ইলিয়ার দিকে তেড়ে গিয়ে তার নাকে মারলো প্রচণ্ড এক ঘুষি, তারপর তার চুলের মুঠি ধ'রে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝের ওপর। ব্যাপারটা ঘ'টলো এতো তাড়াতাড়ি যে ইলিয়া আত্মরক্ষার সময়ই পেলো না। তারপর যখন মেঝে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, রাগে-যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে, "যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ দাঁড়িয়ে থাক্! দেখাচ্ছি তোর মজা—" ব'লে, শিংবাঁকানো ষাঁড়ের মতো সে তেড়ে গেলো জাকবের দিকে, তখন দেখলো টেবিলে মুখ রেখে জাকব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুমুখী মাশা ব'লছে :

"ওর সংগে আর ভাব রেখো না। যেমন নীচ আর তেমনি হিংসুটে ও। বিষের ঝাড় কি না—বাবা আসামী, আর কাকাটা তো কুঁজো। ওরও একদিন কুঁজ বেরুবে!"

জাকবকে কাঁদতে দেখে শিংবাকানো অবস্থাতেই ইলিয়া থেমে গিয়েছিলো মাঝপথে। তার দিকে এগোতে এগোতো চীৎকার ক'রে ব'লতে লাগলো মাশা :

"দেদো, কুচুটে ছোঁড়া কোতাকার, গ্যাকড়া-কুড়ুণীর বাচ্চা! আয়, এগিয়ে আয়, তোর চোখ খাব্‌লে নেবো আমি। আয়, এগিয়ে আয়!"

কিন্তু ইলিয়া এগুলো না। জাকবকে কাঁদতে দেখে ওর মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো। জাকবকে ও সত্যিই দুঃখ দিতে চায় নি। এদিকে একটা মেয়ের সংগে মারামারি ক'রতেও প্রবৃত্তি হ'লো না ওর, যদিও দেখলো চুলোচুলি করবার জন্যে মাশার হাতদুটো নিশপিশ ক'রছে। একটি কথাও না ব'লে ইলিয়া বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে, তারপর রাগে-দুঃখে মনমরা হ'য়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো উঠানময়। অবশেষে পের্ফিশ্‌কার জানলায় চোরের মতো উঁকি মেরে দেখলো, জাকব আর মাশা আবার তাস নিয়ে ব'সেছে; রঙীন হাতপাখার মতো ক'রে তাসগুলো ধ'রে তার আড়ালে মাশা হাসছে, আর জাকব তাসগুলো দেখতে দেখতে ভাবছে কোন্‌টা ফেলা যায়। ইলিয়ার দুঃখ হ'লো। উঠানে আরও কিছুক্ষণ পায়চারী ক'রলো সে, তারপর সাহসে ভর দিয়ে সোজা ঢুকে প'ড়লো মাশার ঘরে।

টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে ব'ললো ইলিয়া :

"আমাকে খেলতে নাও।"

এই ব'লে ও লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু জাকব বা মাশার কাছ থেকে কোনো সাড়াই এলো না। তাদের দিকে চেয়ে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"আমি আর একটাও নোংরা কথা ব'লবো না। ভগবানের দিব্যি! আর একটাও ব'লবো না।"

মাশা ব'ললো : "আচ্ছা ব'সো।—পাজি কোত্থাকার!"

আর জাকব ব'ললো কঠোরভাবে :

"গাড়োল, এখনো কি ছোটোটি আছো? এবার থেকে যা ব'লবে ভেবে-চিন্তে ব'লবে। —বুঝলে?"

দুম্ ক'রে টেবিলে একটা ঘুষি মেরে মাশা ব'ললো জাকবকে :

"না, আমরা এখনো ছোটোই আছি, আর সেইজন্তেই আমাদের নোংরা কথা বলা উচিত নয়!"

তিরস্কারের সুরে ইলিয়া জাকবকে ব'ললো :

"তুমি আমায় কি মারটাই না মারলে!"

তখন জবাব দিলো মাশা—রাগতভাবে :

"তার রীতিমতো কারণও ছিলো। চুপ করো, চেঁচিয়ো না।"

"আ—আচ্ছা, বেশ। আমি রাগ করি নি; দোষ আমারই।"—এই ব'লে বিব্রতভাবে জাকবের দিকে চেয়ে একটু হেসে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"আর তুমি—তুমিও রাগ ক'রো না কিন্তু, কেমন?"

"আচ্ছা। নাও, তাস তুলে নাও।"

মাশা ব'ললো : "বুনো ওল যেন!"

আর এইখানেই ঝগড়াটার পরিসমাপ্তি ঘ'টলো।

এক মুহূর্ত পরেই দেখা গেলো ইলিয়া খেলায় একেবারে ডুবে গেছে। মাশার সামনেই ব'সেছে সে—ভ্রূ কুঁচকে। মেয়েটা হারলেই খুশি হ'য়ে উঠতো ইলিয়া। আজও সে প্রাণপণ চেষ্টা ক'তে লাগলো যদি মাশাকে দিয়ে হার স্বীকার করানো যায়; কিন্তু মেয়েটা খেলতো ভালো, আর বেশির ভাগ দিনই হারতো জাকব। তখন মাশা সহানুভূতির সুরে আস্তে আস্তে ব'লতো :

"নাও, আবার তুমি হারলে। এদিকে তো খুব চোখ পাকানো হয়!"

"চুলোয় যাক তাস্। এ-আর আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে বরং এসো 'কাম্‌চাদাল্‌কা' পড়ি।"

তখন সেই ময়লা ছেঁড়া বইখানা বের ক'রে তারা প'ড়তে শুরু ক'রে দিতো প্রেমোন্মত্ত 'কাম্‌চাদাল্‌কা'র অশেষ দুঃখের কাহিনী।

ব্যাপারটা গ্রাৎচকের কানে যেতেই, অভিজ্ঞ লোকের মতো ব'ললো সে:

"হুঁ, এদিকে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হ'চ্ছে।" তারপর জাকব ও মাশার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে এবার গম্ভীরভাবে ব'ললো পাশ্‌কা:

"যেমন চালাচ্ছিস চালিয়ে যা! আর, জাকব, পরে কোনো সময় তুই বিয়ে ক'রে ফেলিস মাশাকে, বুঝলি?"

মুচকি হেসে মাশা ব'ললো: "গবেট কোতাকার!"

তারপর তারা চারজনেই হেসে উঠলো।

বই পড়া শেষ হয়ে গেলে কিংবা প'ড়তে প'ড়তে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লে, পাশ্‌কা তার নিজের এ্যাড্‌ভেঞ্চারগুলো শোনাতো বন্ধুদের; আর ব'লতে কি তার কাহিনীগুলো বইয়ের কাহিনীর চেয়ে কোনো অংশেই কম মনোহারী ছিলো না।

"বুঝলি, যখন দেখলাম যে পাসপোর্ট ছাড়া আর এক-পাও এগোনো যায় না, তখন বুদ্ধি খাটালাম। পুলিশ সার্জেণ্ট দেখলেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিতাম, যেন কেউ আমায় কিছু আনতে পাঠিয়েছে এইভাবে; কিংবা কোনো চাষীর কাছাকাছি থাকতাম যাতে সে মনে করে যে চাষীটা আমার মনিব কিংবা দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়। ফলে, সার্জেণ্টটা আমার দিকে একবার তাকিয়েই নিজের কাজে চ'লে যেতো; আর এই সুযোগে বাছাধনকে কলা দেখিয়ে আমিও স'রে পড়তাম। এদিক দিয়ে কিন্তু গ্রাম ভালো। সেখানে সার্জেণ্ট-ফার্জেণ্টের বালাই নেই। রাত থাকতে উঠে চাষী মাগীমদ্দ যে যার মাঠে চ'লে যায়; থাকার মধ্যে থাকে শুধু বুড়োবুড়ি আর কাচ্চাবাচ্চাগুলো। তারা শুধোয়: তুমি কে গা? বলি: ভিখিরি। কাদের ছেলে তুমি? বলি: কারোর না। কোত্থেকে আসা হ'চ্ছে? বলি: শহর থেকে। বাস্, এইখানেই শেষ। তখন তারা ভালো ভালো খাবার দেয়, মদ চাইলে মদও পাওয়া

যায়। সেখানে তোমার ইচ্ছে-মতো ঘুরে বেড়াও ; ছুটতে ইচ্ছে হয় ছোটো, হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছে হয় হামাগুড়ি দাও। চারধারে শুধু মাঠ আর মাঠ, এ-ছাড়া এখানে-ওখানে জঙ্গল তো আছেই ; আকাশে পাখিরা গান গাইছে, ইচ্ছে হবে আমিও ওদের কাছে উড়ে যাই। খিদের বালাই না থাকলে ইচ্ছে ক'রবে গোটা পৃথিবীটাই চক্কর দিয়ে ফেলি।—সেখানে হেঁটে এতো আরাম যে বলার নয়। মনে হয় যেন মায়ের কোলে কোলে চ'লেছি! মাঝে মাঝে আমার ভীষণ খিদে পেতো, কি ব'লবো মাইরি, মনে হ'তো নাড়িভুঁড়ি যেন চচ্চড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হ'তো মাটিই চিবিয়ে খাই ; মাথাটা ঘুরতো বনবন ক'রে। তারপর যখন একটুকরো রুটি যোগাড় ক'রে তাতে কামড় দিতাম, বুক জুড়িয়ে যেতো, মনে হ'তো দিনরাত শুধু খেয়েই যাই। বেশ লাগতো।"

একটু থেমে ইদিক-উদিক চেয়ে, আবার ব'লতো পাশ্‌কা :

"যাই হ'ক, জেলে গিয়েও আমি খুশি হ'লাম। প্রথমটায় ভয় ভয় ক'রতো, কিন্তু পরে দেখলাম বেশ আছি। পুলিশ-সার্জেণ্টগুলোকে কিন্তু ভীষণ ভয় ক'রতাম। ভাবতাম ওদের একজন যদি আমাকে ধরে তাহ'লে হয়তো পিটেই মেরে ফেলবে। একদিন কি হ'লো, শোন্‌। একটা সার্জেণ্ট চুপিচুপি এসে আমার শার্টের কলারটা চেপে ধ'রলো। আমি তখন একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাজানো ঘড়িগুলো দেখছিলাম—নানা রকমের ঘড়ি—সোনার, রূপোর, আরও অনেক রকমের। সার্জেণ্টটা খপ্‌ ক'রে আমায় ধ'রতেই আমি চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু সে আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস ক'রলো : 'তোর নাম কি? কোত্থেকে আসছিস্‌?' ব'ললাম যা বলবার। মিথ্যে ব'লে লাভ কি, ও তো জেনে নেবেই যা জানবার—ওরা জানেও সব। তখন সার্জেণ্টটা আমায় থানায় নিয়ে গেলো। দেখলাম সেখানে অনেক জেণ্টেলমান র'য়েছে। প্রশ্ন করা হ'লো : কোথায় যাচ্ছিলি? বললাম : বেড়াতে! তারা হেসে উঠলো। তারপর আমায় জেলে পুরে দেওয়া হ'লো। সেখানেও সবাই হাসতো, আর পরে তারা আমাকে তাদের কাজেও লাগালো। কি মানুষ তারা! শালা, এক একটা যেন—ও-হো-হো-হো!"

'জেণ্টল্‌ম্যান্‌'-দের কথা এলেই পাশ্‌কা 'ওহো, আহা' ক'রতো! স্পষ্টই

বোঝা যেতো তারা ওর মনে বেশ একটা দাগ রেখে গেছে। কিন্তু তাদের চেহারাগুলো যে ওর খুব বেশী মনে আছে তা বোধ হ'তো না। সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটা আবছা স্মৃতি ঘুরে বেড়াতো ওর মনে। পের্ফিশ্‌কার কাছে প্রায় একটি মাস থেকে পাশ্‌কা আবার পালিয়ে গেলো। পরে পের্ফিশ্‌কা জানলো পাশ্‌কা কোন্ এক ছাপাখানায় ঢুকেছে, শহরেই আছে, তবে সে অনেক দূরে। কথাটা শুনে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইলিয়া ব'ললো জাকবকে :

"আমাদের সারাটা জীবন হয়তো এইখানেই কাটাতে হবে!"

পাশ্‌কা চ'লে যেতে প্রথম প্রথম তার জন্য মন কেমন ক'রতে লাগলো ইলিয়ার। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো ইলিয়া আবার তার কুহকরাজ্যে ডুব দিয়েছে—যে-রাজ্যের সংগে এ-দুনিয়ার কোনো সম্বন্ধই নেই। স্কুলে যাওয়া, বই পড়া—দুইই চ'লতে লাগলো আগের মতোই এবং স্বপ্নরাজ্যের কল্পনায় তার দিনগুলোও কাটতে লাগলো আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে। একদিন অবশ্য তার ঘুম ভাঙলো—হঠাৎ—ঝট্‌কায়। শুনলো তার কাকা বলছে:

"লেখাপড়া তো শেষ হ'য়ে এলো, আজ বাদে কাল চোদ্দোয় প'ড়বি। এবার তোর একটা চাকরি-বাকরির খোঁজ করা দরকার।"

পেত্রুহা ব'ললো:

"সে আর এমন একটা শক্ত কথা কি! লোকজনের সংগে আলাপ-পরিচয় তো আছেই, একটা না একটা চাকরি জুটে যাবেই। জাকবের জন্যে অবিশ্যি চিন্তা নেই; আর একটা বছর যাক, তারপর ওকে কাউণ্টারেই ব'সতে হবে! আর তেরেন্স, তোমাকেও ভাবছি কাছাকাছি কোথাও একটা হোটেল ক'রে দেবো। হিসেব-পত্তরটা নিয়মিতভাবে আমায় দেখিও; নইলে ব'লতে পারো, সে একরকম তোমারই হোটেল! ব'লতে কি ভগবানের দয়ায় আজ আমার কোনো অভাব নেই!"

ইলিয়া তখনো তার স্বপ্নরাজ্যেই বিচরণ ক'রছে, তাই পেত্রুহার কথায় সে বিশেষ বিচলিত হ'লো না। কিন্তু একদিন ভোরে তেরেন্স তাকে জাগিয়ে দিয়ে ব'ললো:

"চট্‌ ক'রে নেয়ে তৈরি হ'য়ে নে।"

ঘুম-জড়ানো চোখে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া: "কোথায় যেতে হবে?"

"তোর নতুন চাকরিতে। ঈশ্বরের কৃপায় জুটে গেছে একটা,—মাছওয়ালার দোকানে।"

সংগে সংগে যেন মুষড়ে প'ড়লো ইলিয়া। অজানা আশংকায় টিপটিপ ক'রতে লাগলো তার বুকটা। চেনা-শোনা লোকজন সমেত এ-বাড়ি তাকে ছেড়ে

যেতে হবে, এ-কথাটা ভাবতেই তার মন ভীষণ খারাপ হ'য়ে গেলো। এতোদিন পর্যন্ত সে তার এঁদো ঘরখানাকে ঘেন্নাই ক'রে এসেছে, কিন্তু এখন তার হঠাৎ মনে হ'লো এমন পরিষ্কার আলো-বাতাসওয়ালা ঘর পৃথিবীতে হয়তো আর একখানিও নেই। বিছানায় ব'সে মেঝের দিকে তাকিয়ে সে এইসবই ভাবতে লাগলো। সাজগোছ ক'রতে ইচ্ছাই হ'লো না তার। এমন সময় ঘরে ঢুকলো জাকব— বিষণ্ণ এবং উশ্‌কোখুশ্‌কো তার চেহারা। মাথা কাত ক'রে, বন্ধুর দিকে আড়চোখে চেয়ে সে ব'ললো :

"তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নাও, বাবা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মাঝে মাঝে এসো, কেমন ?"

"আসবো।"

"মনে থাকবে তো ? যাবার সময় মাশার সংগে একবার দেখা ক'রে যেও।"

চ'টে গিয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"আশা করি এখান থেকে আমি জন্মের মতো চ'লে যাচ্ছি না।"

যাক্, মাশা নিজেই এলো। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইলিয়ার দিকে চেয়ে দুঃখিতভাবে ব'ললো সে :

"তাহ'লে বিদায়।"

পিত্তি জ্ব'লে গেলো ইলিয়ার। কোটটা প'রতে প'রতে তাতে খ্যাঁচ ক'রে একটা টান মেরে কি-একটা দিব্যি গাললো সে। মাশা আর জাকব একই সংগে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

জাকব ব'ললো : "আমাদের সংগে আবার দেখা ক'রতে এসো।"

বিষণ্ণভাবে জবাব দিলো ইলিয়া : "আচ্ছা।"

মাশা টিপ্পনী কাটলো : "দেখ্‌ছো, ইলিয়া কি রকম নাক তুলে কথা ক'ইছে ? না হয় কাজই ক'রবে দোকানে, তাই ব'লে এতো গরম ?"

আস্তে আস্তে, তিরস্কারের সুরে জবাব দিলো ইলিয়া : "নেকী—!"

এর একটু পরেই দেখা গেলো ইলিয়া পেত্রুহার সংগে হাঁটছে রাস্তার এক পাশ দিয়ে। পেত্রুহার গায়ে লম্বা ওভারকোট, পায়ে মচমচে জুতো। যেতে যেতে বলে পেত্রুহা :

"চাকরির জন্যে তোকে যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি সে হ'লো শহরের একটা

গণ্যমান্য লোক। নামটা ব'লে রাখি: কিরিল্ ইভানোভিচ্ স্ত্রোগানফ্। দানধ্যানের জন্যে সে অনেকগুলো মেডেল পেয়েছে; আপাতত সে কাউন্সিলার, তবে পরে হয়তো শহরের মেয়র হ'য়ে যাবে! মন দিয়ে যদি কাজকম্মো করিস একটু লোভ টোভ সামলে, তাহ'লে সে তোর একটা হিল্লে ক'রে দেবেই। ছেলে তো তুই খারাপ নয়, তাই ফল মোটের ওপর ভালোই হবে। স্ত্রোগানফের পক্ষে তোর দিকে একটু মুখ তুলে চাওয়াও যা আর একটু থুতু ফেলাও তাই। ইচ্ছে ক'রলে সে সবকিছুই ক'রতে পারে।"

পেত্রুহার কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া মনে মনে ওর ভাবী মনিবের একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করে। যে কোনো কারণেই হ'ক, ওর মনে হ'লো, ব্যবসাদার স্ত্রোগানফ্ নিশ্চয়ই জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার মতো কেউ হবে—তারই মতো রোগা, আর তারই মতো দয়ার শরীর! কিন্তু দোকানে ঢুকেই কাউন্টারের পিছনে ও যাকে দেখলো সে একটা দশাসই, প্রকাণ্ড ভূঁড়িওয়ালা লোক। লোকটার মাথা-জোড়া টাক, কিন্তু চোখের কোল থেকে গলা পর্যন্ত এক গাদা লাল দাড়িতে ভর্তি; তার ভ্রূ জোড়াও ঝোপের মতো, লালচে—যার নিচে নাচছিলো দু'টো খুদেখুদে ফিরিঙ্গে সবুজ চোখ।

চোখের ইশারায় লাল দাড়িওয়ালা লোকটাকে দেখিয়ে পেত্রুহা চুপিচুপি ব'ললো ইলিয়াকে:

"ওকে নমস্কার কর্।"

হতাশ হ'য়ে মাথা নোয়ালো ইলিয়া।

জয়ঢাকের আওয়াজ এলো: "ওর নাম কি?"

পেত্রুহা ব'ললো: "ইলিয়া।"

"শোনো ইলিয়া, চোখ দুটোই, কিন্তু দেখবে তিনটে দিয়ে। এখন থেকে মনিব ছাড়া তোমার আর কেউ নেই—আত্মীয় না, বন্ধু না, কেউই না; বুঝলে? আমিই তোমার মা-বাপ, তাই যা ব'লবো ক'রতে হবে।"

দোকানের চারধারে চোখ বুলোতেই ইলিয়া দেখলো: মেঝের ওপর ঝুড়ি ঝুড়ি সাজানো র'য়েছে বরফ-দেওয়া বড়ো বড়ো কাৎলা আর ভেট্‌কি; তাকগুলোতে গাদা করা র'য়েছে শুঁটকিমাছ, পোনা, পার্শে, মৌরলা আর বাটা; তাছাড়া টিনের কৌটোগুলো চকচক ক'রছে সর্বত্র; ঘরখানা

স্যাঁতসেতে, আঁশটে গন্ধে ভর্তি ; লোনা জলের তীব্র গন্ধে দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে ; তাছাড়া সবকিছুই এমন গাদাগাদি ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা যে হাত-পা নাড়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই ; মেঝের ওপর বড়ো বড়ো গামলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে কই, মাগুর, শিঙ্গি আর শোল। দেখা গেলো একটা শোল মাছ অন্যান্য মাছগুলোকে ঠেলেঠুলে, লেজের ঝাপটায় মেঝের ওপর জল ছিটোতে ছিটোতে রঙ্গতামাশা ক'রছে। মাছটার জন্যে দুঃখ হ'লো ইলিয়ার। এমন সময় দোকানের একটা কর্মচারী তার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটা বেঁটে, মোটা, চোখদুটো তার গুলিভাঁটার মতো, নাকটা যেন শকুনির ঠোঁট,—সব মিলিয়ে যেন পেঁচাটি। এসেই সে ইলিয়াকে হুকুম ক'রলো গামলা থেকে একটা মরা মাছ তুলতে। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে ইলিয়া ডান হাতখানা ডুবিয়ে দিলো গামলার মধ্যে। কিলবিল ক'রছে মাছগুলো। একবার সে একটা নিশ্চল জ্যান্ত মাছকে মরা মনে ক'রে যে-ই ধ'রতে গেলো মাছটা অমনি ঢেউ খেলিয়ে পিছলে গিয়ে গোঁত্তা মারলো গামলার গায়ে। সংগে সংগে কর্মচারীটা ব'লে উঠলো দাঁত খিঁচিয়ে :

"কাণা না কি! মরা মাছ জ্যান্ত মাছ চিনিস না? তাছাড়া ওভাবে বুঝি শিঙ্গি মাছ ধরে? মুণ্ডুটা চেপে ধর্!"

ধরতে গিয়ে আঙুলে কাঁটা ফুটে যেতে ইলিয়া আঙুলটা চুষতে লাগলো। এমন সময় ভারী গলায় ব'লে উঠলো দোকানের মালিক :

"মুখ থেকে হাত নামাও!"

একটু পরে ইলিয়ার হাতে একখানা প্রকাণ্ড ভারী কুড়ুল গুঁজে দিয়ে হুকুম করা হ'লো পাশের এঁদো ঘরখানায় গিয়ে বরফের চাঁইগুলো সমান ক'রে ভাঙতে। ধাঁই ধাঁই ক'রে কুড়ুল চালাবার সংগে সংগে বরফের কুচিগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকতে লাগলো ওর শার্টের মধ্যে। ঘরখানা বেজায় ছোটো, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি অন্ধকার। একবার অন্যমনস্কভাবে কুড়ুল চালাতে চালাতে তার ফলাটা গেঁথে গেলো ঘরের ছাদে। একটু পরে ইলিয়া যখন সেই এঁদো ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তখন টপটপ ক'রে জল ঝরছে ওর জামা থেকে। এসেই ও ব'ললো মালিককে :

"হাঁড়ি না কি-একটা-যেন ভেঙে ফেলেছি।"

মালিক ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ব'ললো :

"প্রথমবারের মতো মাপ ক'রে দিলাম। মাপ ক'রলাম নিজের মুখে দোষ স্বীকার ক'রলে ব'লে। কিন্তু এর পর থেকে কানমলা খাবে।"

তারপর শুরু হ'লো ইলিয়ার একঘেয়ে জীবন—প্রকাণ্ড একটা ঘড়ঘড়ে যন্ত্রে তুচ্ছ একটা ইস্ক্রুপের মতো। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে সে প্রথমে তার মনিবের, মনিব-গুষ্টীর এবং দোকানের খাস কর্মচারীগুলোর জুতো সাফ ক'রতো, তারপর দোকানটা ঝাঁট দিয়ে টেবিলগুলো এবং দাঁড়িপাল্লাটা ধুয়ে দিতো। খদ্দের আসতে আরম্ভ ক'রলেই সে মাছগুলো ওঠাতো-নামাতো, প্যাকেটগুলো দিয়ে আসতো বাড়ি বাড়ি, তারপর খেতে যেতো দুপুরবেলা। দুপুরের খাওয়ার পর আর কোনো কাজ থাকতো না তার। তবে তাকে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে পাঠানো হ'তো। যেদিন কোথাও যেতে না হ'তো, সেদিন এই সময়টায় সে দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বাজারের লোক চলাচল দেখতো : ভিড়ে ভিড়, হৈ-হট্টগোল, ব্যস্ততার অন্ত নেই যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও ভাবতো দুনিয়ায় কতো লোকই না আছে, আর কি পরিমাণ মাছ-মাংস-শাকশব্জীই না উদরসাৎ করে তারা! একদিন ও সেই পেচকরূপী কর্মচারীটাকে ব'ললো :

"মিচায়েল ইগ্‌নাতিচ্‌!"

"কি?"

"আচ্ছা, যখন সব মাছ ধরা হ'য়ে যাবে, আর সব গরু-ভেড়া কাটা হ'য়ে যাবে, তখন লোকজন খাবে কি?"

ছোট্টো ক'রে জবাব দিলো কর্মচারীটা : "গাড়োল!"

একদিন ও কাউন্টার থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে প'ড়ছে, এমন সময় কর্মচারীটা ওর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর নাকে একটা খোঁচা মেরে খেঁকিয়ে উঠলো :

"বলি, কে তোকে হুকুম দিয়েছে পড়বার জন্যে, অ্যা? গাধা কোতাকার!"

ইলিয়া এই কর্মচারীটাকে পছন্দ ক'রতো না। মালিকের সংগে কথা বলবার সময় মিচায়েলকে দেখাতো প্রভুভক্ত কুকুরটির মতো, কিন্তু অলক্ষ্যে সে স্ত্রোগানফ্‌কে ব'লতো জোচ্চোর, ভণ্ড এবং লালচুলো শয়তান। ফি শনিবারে

এবং ছুটিছাটার আগের দিনগুলোয় দোকানের মালিক গির্জায় গেলে, মিচায়েলের বউ কিংবা বোন দোকানে আসতো, আর মিচায়েল তাদের হাতে থলি ক'রে মাছটা বা এটা-ওটা পাঠিয়ে দিতো। কর্মচারীটার আর একটা স্বভাব ছিলো ভিখিরিদের নিয়ে রগড় করা। বুড়ো-হাবড়া ভিখিরিগুলোকে দেখে ইলিয়ার মনে প'ড়ে যেতো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দাকে। যখন কোনো বুড়ো ভিখিরি দোকানের দরজায় এসে মাথা নুইয়ে ইনিয়েবিনিয়ে ভিক্ষে চাইতো, তখন কর্মচারীটা একটা কই মাছ তুলে এনে এমনভাবে সেটা ভিখিরিটার হাতে চেপে ধ'রতো যাতে তার হাতে কাঁটা ফুটে যায়; আর, ভিখিরিটা চমকে উঠে যন্ত্রণায় হাতটা সরিয়ে নিলেই সে ঠাট্টা ক'রে ব'লে উঠতো :

"কি চাঁদবদন, চাই না? মনে ধ'রলো না বুঝি? যা, যা, ভাগ্!"

একদিন একটা বুড়ি ভিখিরি তার শতছিন্ন ঘাগরাটার ভাঁজে একটা শুঁটকি মাছ লুকিয়ে ফেলতেই মিচায়েল বাঁ হাত দিয়ে বুড়ির ঘাড়টা নিচু ক'রে ধ'রে ডান হাত দিয়ে তার মুখে কষিয়ে দিলো একটা প্রচণ্ড ঘুষি। বুড়িটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত না ক'রে মাথা নুইয়ে চ'লে গেলো সেখান থেকে। ইলিয়া দেখলো বুড়ির নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ভিখিরিটার দিকে চেয়ে চীৎকার ক'রে ব'ললো মিচায়েল :

"কেমন, এবার মাছ খাওয়া হ'য়েছে তো?"

তারপর দোকানের অন্য একটা কর্মচারীর দিকে চেয়ে ব'ললো সে :

"বুঝলে কার্প্, ভিখিরিগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না! শালাদের কাজ নেই কর্ম নেই, খালি ব'সে ব'সে খাবে, আর গতর বাগাবে! কি না যীশুর বেরাদার! ম'রে যাই রে! এদিকে শালা জীবনভোর খেটে খেটে আমার জান কয়লা হ'য়ে গেলো! না পেলাম শান্তি, না পেলাম সম্মান!"

কার্প্ ধর্মভীরু লোক। গির্জা, উপাসনা, বিশপ—এ-ছাড়া তার মুখে যেন আর অন্য কোনো কথাই যোগাতো না; এবং ফি শনিবারেই সে খুঁতখুঁত ক'রতো পাছে তার সান্ধ্য উপাসনার দেরি হ'য়ে যায়। জাদুকর এবং গুনিনদের প্রতিও তার শ্রদ্ধা ছিলো অগাধ। শহরে কোনো জাদুকর বা গুনিন এলেই সে তার সংগে দেখা ক'রে আসতো। কার্প্ লোকটা ছিলো রোগা, ঢ্যাঙা এবং ধূর্ত। দোকানে খদ্দেরের ভিড়ের মধ্যে সে ঘুরঘুর ক'রতো

সাপের মতো, হেসে কথা ব'লতো সকলের সংগে এবং ফাঁক পেলেই তাকাতো মনিবের দিকে ; ভাবখানা এই, মনিব দেখুক সে কি রকম কাজের লোক। ইলিয়াকে সে ঘেন্না ক'রতো, তাই ইলিয়াও তাকে ভালো চোখে দেখতো না। কিন্তু দোকানের মালিককে ভালো লাগতো ইলিয়ার। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে স্ত্রোগানফ্ এমন নির্বিকারভাবে টাকাপয়সাগুলো টেবিলের ড্রয়ারে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতো যেন তাতে তার কোনো লোভও নেই আকর্ষণও নেই। যে কোনো কারণেই হ'ক এটা কেমন যেন ভালো লাগতো ইলিয়ার। তাছাড়া, স্ত্রোগানফ্ দোকানের অন্যান্য কর্মচারীদের সংগে যতো কমই আর যে-ভাবেই কথা বলুক না কেন, ইলিয়ার সংগে সে কথাও ব'লতো বেশি এবং ওর প্রতি তার আচরণটাও ছিলো অপেক্ষাকৃত ভদ্র। মালিককে ওর ভালো লাগার এও একটা কারণ বটে। একটু নিরিবিলি হ'লে এবং দোকানে খদ্দের না থাকলে দরজার গোড়ায় ইলিযাকে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রোগানফ্ ব'লতো :

"কি হে ইলিয়া, ঘুমচ্ছো না কি ?"

"না।"

"তবু ভালো। কিন্তু তুমি সব সময়ই অমন গোঁজমুখো হ'য়ে থাকো কেন ?"

"জানি না।"

"একঘেয়ে লাগছে, না ?"

"তা– হ্যাঁ।"

"তা একটু লাগছে লাগুক ! আমিও অমন মুখ বেজার ক'রে থাকতাম। ন বছর বয়স থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক উটকো লোকের মুখও শুনেছি, অনেক একঘেয়েমিও স'য়েছি। আর এখন—এই তেইশ বছর ধ'রে—কেবলই এমন সব লোক দেখছি যাদের মুখে দিনরাত সেই একঘেয়েমির নালিশ।"

এই ব'লে সে মাথাটা এমনভাবে নাড়তো যেন ব'লতে চায় :

"এ-ছাড়া আর করবারই বা কি আছে !"

মালিকের সংগে বার তিনেক এই ধরণের কথাবার্তা ব'লে ইলিয়া নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা ক'রতে শুরু ক'রলো : অমন একখানা প্রকাণ্ড ঝকঝকে-

তকতকে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও এই ধনী, গণ্যমান্য লোকটা কেন সারাটা দিন নোনা মাছের টঁকো আর ঝাঁঝালো গন্ধে-ভর্তি এই নোংরা দোকানঘরে ব'সে থাকে? কেন?—

স্রোগানফের বাড়ির আবহাওয়াটা অদ্ভুত: কোথাও কোনো চাপল্য নেই, ফিটফাট বাড়িখানা যেন সর্বদাই থমথম করে। বাড়ির বাসিন্দা ব'লতে তো কেবল স্রোগানফ্, তার স্ত্রী, তাদের তিনটি সন্তান, রাঁধুনী আর একটা চাকর। তার ওপর আবার যে রাঁধুনী সে-ই ঝি এবং যে চাকর সে-ই কোচোয়ান। কিন্তু হ'লে হবে কি, বাড়িতে তবুও যেন জায়গার টানাটানি। সকলেই কথা বলে চাপা গলায়, তাছাড়া বাড়ির প্রকাণ্ড পরিষ্কার উঠানটা পার হবার সময় এমন এক পাশ ঘেঁষে যায় যেন খোলা জায়গায় পা বাড়াতে ভয় ক'রছে তাদের।

এই নিশ্চিন্ত নিঝুম পুরীর সংগে পেত্রুহার বাড়িখানার তুলনা ক'রতে গিয়ে ইলিয়া হঠাৎ সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সলো যে এ-বাড়িতে থাকার চেয়ে নোংরা হ'ক হেটুরে হ'ক পেত্রুহার বাড়িতে থাকাই ভালো। নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই অবাক হ'লো ইলিয়া, নিজের মনকে নিজেই বিশ্বাস করতে চাইলো না সে; কিন্তু আশ্চর্য, এই সিদ্ধান্ত বারেবার তার মগজে উঁকি মারতে লাগলো। ইলিয়া ভাবলো: তাই যদি না হবে তাহ'লে মনিব তার অট্টালিকায় না থেকে এই দোকানঘরেই বা প'ড়ে থাকবে কেন? ওর খুব ইচ্ছা হ'লো মনিবকে এ-কথাটা জিজ্ঞাসা করে। একদিন সে-সুযোগও এলো। কার্প্ তখন কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়ে গেছে। আর মিচায়েলও তখন পাশের এঁদোঘরে গিয়ে দরিদ্রাবাসে পাঠাবার জন্যে পচা মাছ সংগ্রহ ক'রছে। কথায় কথায় ইলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো মনিবকে:

"টাকাপয়সা তো অনেক ক'রেছেন কিরিল্ ইভানোভিচ্; এবার কি আপনার কাজ-কারবার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? যতো আঁশটে গন্ধ এখানে, কিন্তু আপনার বাড়িখানা কতো সুন্দর!"

ইলিয়ার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে প'ড়লো স্রোগানফ্। তার ভ্রূজোড়া কাঁপতে লাগলো। ইলিয়ার কথা শেষ হ'তেই জিজ্ঞাসা ক'রলো সে:

"তারপর ? আর কিছু ব'লবে ?"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো ইলিয়া :

"না।"

"এদিকে এসো।"

ইলিয়া কাছে যেতেই ওর থুতনিটা ধ'রে মুখখানা তুলে, ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো স্ত্রোগানফ্ :

"এসব কথা ব'লতে কেউ তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে, না কি নিজের থেকেই ব'লছো ?"

"ভগবানের দিব্যি, এ আমার নিজের কথা।"

"হুঁ, তাহ'লে অবিশ্যি কিছু আসে যায় না, কিন্তু শোনো, আর কোনোদিন আমার সংগে—বুঝলে - তোমার মনিবের সংগে এভাবে কথা ব'লবে না! মনে থাকে যেন। যাও, নিজের কাজে যাও।"

তারপর কার্প্ ফিরে আসতেই স্ত্রোগানফ্ আড়চোখে ইলিয়ার দিকে চেয়ে ব'লতে লাগলো কর্মচারীটাকে :

"জীবনভোরই মানুষের কিছু না কিছু করা উচিত—জীবনভোর! এ-কথাটা যে না বোঝে সে বেকুব। আমি তো বুঝতেই পারি না মানুষ কি ক'রে কুঁড়ে হ'য়ে ব'সে থাকে। কাজে যার মন নেই সে মানুষই নয়।"

"ঠিক কথা কিরিল্ ইভানোভিচ্, ঠিকই ব'লেছেন আপনি"—এই ব'লে কার্প্ এমনভাবে দোকানের আনাচ-কানাচ দেখতে থাকে যেন কাজেরই সন্ধান করছে সে।

মনিবের দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবতে লাগলো।

দিন আসে দিন যায়, আর এখানেও যেন ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। ভাবে : এই একঘেয়েমির শেষ কোথায় ? দিন তো নয় যেন অন্তহীন ময়লা সুতো—যা খুলছে তো খুলছেই কোনো একটা প্রকাণ্ড, অদৃশ্য নাটাই থেকে। তবে, তবে কি ওকে সারাটা জীবন দরজায় দাঁড়িয়ে বাজারের হট্টগোল শুনতে শুনতেই কাটাতে হবে ? কিন্তু হার মানে না ইলিয়া, এখানকার জীবন যতোই দুঃখময় আর একঘেয়ে হ'ক না কেন তার কাছে হার মানে না সে। এখানে আসবার আগে ও যা দেখেছে, যা শুনেছে এবং বইয়ে যা প'ড়েছে তা-ই দিয়ে ও

মনটাকে সতেজ রাখবার চেষ্টা করে। মনটা তাই কাজও ক'রে যায় নিঃশব্দে। এখানকার অভিজ্ঞতাগুলোকে ও যাচাই করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভালো-মন্দ বিচারের সবটুকুই হয় অনিশ্চিত; মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছা করে মনের কথা কাউকে খুলে বলে, কিন্তু কাকেই বা ব'লবে, এখানে কেউ নেই। তাই, ওর মনের কথা মনেই তোলা থাকে। শত শত আবছা চিন্তা ভিড় ক'রে আসে ওর মাথায়, সেগুলো ফুটতে থাকে কেৎলিতে জলের মতো, গুঁতোগুঁতি করে, তালগোল পাকিয়ে যায়, একটা আর একটাকে গিলে ফেলে, আবার কখনো বা সেগুলো পাথরের মতো চেপে বসে মগজে; তখন ও চোখ বুঁজে ভাবে কোথাও চ'লে যাবে, পাশ্‌কা গ্রাৎচফ্‌ যেখানে গেছে তার চেয়েও অনেক দূরে; এবং একবার গেলে সেখান থেকে ও আর কিছুতেই ফিরে আসবে না এই বিষণ্ণ, একঘেয়ে আর অবোধ্য ব্যস্ততার জগতে।

ছুটিছাটার দিনে ওকে গির্জায় পাঠানো হ'তো, আর ফিরে এসে ওর মনে হ'তো ওর দেহমন কে যেন গোলাপজলে ধুয়ে দিয়েছে। চাকরীর ছ' মাসের মধ্যে কাকার কাছে ওকে যেতে দেওয়া হ'য়েছে মাত্র দুটি বার। হোটেলটার কিছুই বদলায় নি: কেবল কুঁজো তেরেন্স আরও রোগা হ'য়ে গেছে, পেত্রুহার শিস আরও জোরালো হ'য়েছে এবং তার মুখের গোলাপী রঙে লালচে আভা লেগেছে। জাকব ব'ললো:

"বাবা আমাকে উঠতে ব'সতে গালমন্দ করে। বলে: 'গ্রন্থকীটের দরকার নেই আমার। এবার কাজে মন দে!' কিন্তু কাউণ্টারে দাঁড়াতে আমার যদি ভালো না লাগে আমি কি করি বলো তো? খালি গণ্ডগোল, হুড়োহুড়ি, চীৎকার আর হুল্লোড়! নিজের গলা নিজেরই শোনবার জো নেই যেন! আমি বাবাকে বলি: 'আমাকে বরং এমন একটা দোকানে লাগিয়ে দাও যেখানে দেবদেবীর ছবি বিক্রি হয়। সেখানে খদ্দেরের ঝামেলাও কম, আর এই সব ছবি আমার ভালোও লাগে বেশী।"

জাকবের চোখদুটো দুঃখে পিটপিট ক'রতে থাকে এবং ওর কপালের চামড়াটা হ'লদে হ'য়ে যাওয়ার দরুণ চকচক ক'রতে থাকে ওর বাবার টাকের মতো।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো: "এখনো বই পড়ো?"

"পড়বো না? ঐ তো আমার একমাত্র আনন্দ! প'ড়তে প'ড়তে মনে হয় অন্য একটা শহরে বাস ক'রছি; আর বই বন্ধ ক'রলেই মনে হয় ঘণ্টাঘর থেকে যেন মাটিতে প'ড়ে গেলাম।"

বন্ধুর দিকে চেয়ে ব'ললো ইলিয়া:

"কি রকম যেন বুড়ো-বুড়ো লাগছে তোমায়! মাশা কোথায়?"

"অন্নসত্রে গেছে দুটো ভিক্ষের জন্যে। আজকাল আমি আর ওকে সাহায্য ক'রতে পারি না; সবসময়ই বাবা আমায় চোখে চোখে রাখে। তাছাড়া পেফিশ্‌কাও ভুগছে বহুদিন ধ'রে। তাই মাশাকে এখন ভিক্ষে ক'রেই দিন কাটাতে হ'চ্ছে,—অন্নসত্রে যায় আর সেখান থেকে কখনো-বা খানিকটা বাঁধাকপির ঝোল আনে, আবার কখনো-বা এক টুকরো রুটি। মাত্যিৎসাও ওকে মাঝে মাঝে এটা-ওটা এনে দেয়। তবে, বড়ো কষ্টেই দিন কাটাচ্ছে মাশা।"

চিন্তিতভাবে ইলিয়া ব'ললো: "আমিও কিছু সুখে নেই ওখানে।"

"বড়ো একঘেয়ে লাগে, না?"

"শুধু একঘেয়ে? যেন মরমে ম'রে আছি। এখানে তো তোমার বইপত্তর আছে, কিন্তু ওখানে 'হালের ভোজবাজি' ছাড়া আর দোসরা কোনো বইই নেই। সেটাও আবার দোকানদার নিজের বাক্সে চাবি দিয়ে রাখে, পাবারও উপায় নেই, প'ড়তে চাইলে বাক্যোৎ দেয়ই না!—বড়ো দুঃখেই আমাদের জীবন শুরু হ'য়েছে জাকব।"

"সত্যিই, বড়ো দুঃখে, ভাই!"

আর খানিকক্ষণ কথাবার্তা ব'লে ওরা পরস্পরকে বিদায় জানালো। দুজনকেই দেখালো বিষণ্ণ ও চিন্তিত।

৯

কয়েক সপ্তাহ পরে ভাগ্যদেবী হঠাৎ ইলিয়ার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। শাপে বর হ'লো।

সকালে খদ্দেরের ভিড়ে দোকানটা গমগম ক'রছে সেদিন, এমন সময় কাউন্টারের জিনিষপত্রগুলো তাড়াতাড়ি ঘাঁটকাতে ঘাঁটকাতে মনিবের বুকের রক্ত মাথায় উঠলো, কপালখানা গেলো লাল হ'য়ে এবং তার গলার শিরগুলো ফুটে বেরুলো দড়ির মতো। চীৎকার ক'রে ব'ললো স্ত্রোগানফ্ :

"ইলিয়া, খুঁজে দেখো তো মেঝের ওপর কোথাও দশটাকার একখানা নোট প'ড়ে আছে কি না।"

মনিবের দিকে একবার চেয়ে, চট ক'রে মেঝের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে, ধীরভাবে জবাব দিলো ইলিয়া :

"কৈ, কিছু নেই তো।"

জয়ঢাক ধ'মকে উঠলো :

"ব'লছি ভালো ক'রে দেখো।"

"দেখলাম তো এক্ষুণি।"

রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে মনিব শাসালো :

"আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমার একগুঁয়েমি বের ক'রে দিচ্ছি আমি।"

দোকানটা খালি হ'য়ে যেতেই স্ত্রোগানফ্ তার মোটা-মোটা মজবুত দুটো আঙুল দিয়ে ইলিয়ার একটা কান বেশ ক'ষে চেপে ধ'রলো, তারপর সেটাকে ডাইনে বাঁয়ে টানতে টানতে হেঁড়ে গলায় ব'লতে লাগলো :

"যখন তোমায় দেখতে বলা হবে তখন দেখবে, বুঝলে, যখন তোমায় দেখতে বলা হবে তখন এক-শো-বা-র দেখবে।"

মনিবের ভুঁড়িতে ওর দুটো হাত চেপে একটা জুতসই ধাক্কা দিয়ে ইলিয়া ওর কানটা ছাড়িয়ে নিলো, তারপর রাগে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ব'ললো :

"কিসের জন্যে আপনি আমার ওপর এমন মেজাজ দেখাচ্ছেন? টাকাটা নিয়েছে ঐ মিচায়েল ইগ্নাতিচ্।—ইচ্ছে হয় ওর ওয়েস্টকোটের বাঁ পকেটটা খুঁজে দেখুন।"

মিচায়েলের পেঁচার মতো মুখখানা এক মুহূর্তে যেন সাদা হ'য়ে গেলো। হঠাৎ ধাঁই ক'রে ইলিয়ার কানের ওপর একটা ঘুষি বসিয়ে দিলো সে। টাল সামলাতে না পেরে ইলিয়া প'ড়ে গেলো মেঝের ওপর। প্রথমটায় সে ছটফট ক'রতে লাগলো যন্ত্রণায়; তারপর কাঁদতে কাঁদতে হামাগুড়ি দিয়ে দোকানের এককোণে চ'লে গেলো। এমন সময় যেন স্বপ্নের ঘোরে ও শুনতে পেলো মনিবের গর্জন :

"দাঁড়াও! যাচ্ছো কোথায়? আমার টাকাটা দিয়ে যাও!"

"ও মিছে কথা ব'লেছে", মিচায়েলের কর্কশ গলার জবাব এলো।

"এদিকে এসো!"

"ভগবান সাক্ষী, ব'লছি—"

"মাথা ফাটিয়ে দেবো তোমার!"

"এ আমার টাকা, কিরিল্ ইভানোভিচ্,—মিথ্যে ব'ললে আমার যেন ওলাউঠো হয়।"

"চোপ্‌রাও!"

তারপরেই সব চুপচাপ। মনিব চ'লে গেলো তার নিজের ঘরে, আর একটু পরেই শোনা গেলো ক্যাশবাক্‌শের ডালা বন্ধ হওয়ার ধড়াস্ ক'রে একটা শব্দ। মেঝের ওপর ব'সে দু হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে ইলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিচায়েলের দিকে; আর দোকানের এক কোণে দাঁড়িয়ে মিচায়েল ওর দিকে চেয়ে থাকে শয়তানের মতো। দাঁত খিঁচিয়ে চাপা গলায় ব'ললো মিচায়েল :

"কেমন বাঞ্চোৎ, চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে দিয়েছি তো?"

কোনো কথা না ব'লে ইলিয়া একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সলো।

"একটু সবুর করো, এর পর তোমায় এমন সাজা দেবো যে মনে থাকবে চিরদিন।"

এই ব'লে মিচায়েল তার পেঁচার মতো চোখ দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে ইলিয়ার দিকে এগোতেই ইলিয়া দাঁড়িয়ে উঠে কাউণ্টার থেকে একখানা লম্বা ছুরি তুলে নিয়ে ধীরভাবে ব'ললো :

"আয়, এগিয়ে আয়!"

ইলিয়ার মজবুত দেহ আর ছুরিশুদ্ধ লম্বা হাতখানার দিকে চেয়ে মিচায়েল থ'মকে দাঁড়ালো, তারপর ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে ব'ললো টিপে টিপে :

"আসামীর বাচ্চা কোতাকার!"

মিচায়েলের দিকে এক-পা এগিয়ে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"দাঁড়িয়ে কেন? আয়, এগিয়ে আয়।"

ওর চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝড়ের মতো নাচতে থাকে, আর ওর মনে হয় একটা বিরাট শক্তি ওকে যেন কেবলই সামনে ঠেলে দিচ্ছে। নির্ভয়ে এগিয়ে যায় ইলিয়া।

এমন সময় মনিবের গলা শোনা গেলো :

"ছুরিটা ফেলে দাও।"

চমকে উঠে মনিবের লাল দাড়ি আর রক্তাভ মুখখানার দিকে তাকালো ইলিয়া, কিন্তু ছুরিখানা ধ'রেই রইলো আগের মতো।

আরও ধীরভাবে ব'ললো স্ত্রোগানফ :

"ব'লছি ছুরিখানা ফেলে দাও!"

চোখে ঝাপ্‌সা দেখলো ইলিয়া, তারপর কাউণ্টারের ওপর ছুরিখানা রেখে সজোরে ফুঁপিয়ে উঠে আবার ব'সে প'ড়লো মেঝের ওপর। মাথাটা ওর ঝিমঝিম করতে লাগলো, কানটা দপদপ ক'রে উঠলো যন্ত্রণায়, মনে হ'লো একটা পাথুরে ক্লান্তি যেন হঠাৎ চেপে ব'সেছে ওর বুকের ওপর। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'লো ওর, কথা ব'লতে গিয়ে গলাটা যেন আটকে গেলো বারে-বার। এমন সময় ও শুনতে পেলো মনিবের ভারী গলার আওয়াজ :

"তোমার মাইনেটা বুঝে নাও মিশ্‌কা।"

"সে আপনার ইচ্ছে—"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে, নইলে আমি পুলিশ ডাকবো।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু ঐ ছোঁড়াটার ওপর একটু নজর রাখবেন, এই আমার মিনতি। দেখলেন তো ছুরি তুলেছিলো।......হুঁ:...... হাজার হ'ক একটা আসামীর বাচ্চা তো! হুঁ......!"

"বেরিয়ে যাও!"

তারপর আবার দোকানখানা নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলো, আর ইলিয়ার মনে হ'লো

শির শির ক'রে কি একটা যেন নামছে ওর গাল বেয়ে। চোখের জলটা মুছে মুখ তুলতেই ও দেখলো কাউণ্টারের পিছন থেকে ওর মনিব ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠে ট'লতে ট'লতে ও দরজার দিকে চ'লেছে, এমন সময় মনিব ব'ললো :

'এদিকে শোনো! তুমি কি ওকে সত্যিই ছুরি মারতে?"

"হ্যাঁ, মারতামই তো," জবাব দিলো ইলিয়া।

"হুঁ, তোমার বাবাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হ'য়েছিলো কেন?—খুনের দায়ে?"

"না। আগুন লাগানোর জন্যে।"

"যাই হ'ক, ও দুটোই সমান খারাপ কাজ।"

তার একটু পরেই কার্প্ দোকানে ঢুকলো, এবং নিরীহ গোবেচারীর মতো দরজার ধারে একটা টুলে ব'সে, চেয়ে রইলো রাস্তার দিকে।

তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ললো স্ত্রোগানফ্ :

"মিচায়েলকে জবাব দিয়ে দিলাম, কার্প্।"

"সে আপনার খুশি।"

"আজকাল ও চুরি-চামারি ধ'রেছিলো, বুঝলে?"

জীবনে ও যেন কখনো এমন কথা শোনে নি এইভাবে ব'ললো কার্প্ :

"হায় ভগবান! এও কি সম্ভব? সত্যি ব'লছেন?"

সংগে সংগে হো-হো ক'রে ব্যংগের হাসি হেসে উঠলো মনিব। মনে হ'লো তার দাড়িতে যেন ভূমিকম্প হ'চ্ছে।

"হো-হো-হো, বলিহারি কার্প্, বলিহারি! কি নাটুকেপনাই না শিখেছো তুমি। আহা-হা ম'রে যাই চাঁদ আমার, হো-হো-হো!"

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে, চিন্তিতভাবে, কঠোর স্বরে ব'ললো মনিব :

"কি ব'লবো তোমাদের, তোমরা যেন এক একটা—! এটা ঠিক যে তোমাদের সকলকেই বাঁচতে হবে, পেটের জ্বালা মেটাতে হবে; কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই চাও প্রত্যেকের পাতে মাছের সেরা মুড়োটা পড়ুক! তাই না?"

এই ব'লে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ হ'য়ে যায় স্ত্রোগানফ্।

এদিকে মনিব ওর দিকে আর তেমন নজর দিলো না ব'লে কাউণ্টারের কাছে ক্ষুণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে থাকে ইলিয়া।

গ্যাঁট হ'য়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকার পর স্লোগানফ্ ব'ললো :

"শোনো ইলিয়া, তোমায় দু একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই। প্রথমে বলো এর আগে আর কখনো তুমি মিচায়েলকে চুরি ক'রতে দেখেছিলে কি না?"

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম। ও তো যা পেতো তাই চুরি ক'রতো—জ্যান্ত মাছ, মরা মাছ, নোনা মাছ—"

"থাক্, হ য়েছে। একথাটা আমায় আগে বলো নি কেন?"

এক মূহূর্ত চিন্তা ক'রে জবাব দিলো ইলিয়া : "এমনি।"

"ভয়ে?"

"না।"

"তবে……..তবে আমায় বলো নি কেন : 'মনিব, আপনাকে পথে বসানো হ'চ্ছে?'"

"জানি না। হয়তো ব'লতে ইচ্ছে হয় নি, তাই।"

"হুঁ। তার মানে, আজ রেগে গিয়েছিলে ব'লেই একথাটা ব'ললে?"

স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলো ইলিয়া, "হ্যাঁ।"

"তাহ'লে তুমি এই চীজ, কেমন?"

এই ব'লে ইলিয়ার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনিব তার লাল দাড়িটায় হাত বুলোতে থাকে। এইভাবে চুপচাপ কাটে অনেকক্ষণ। অবশেষে ব'ললো মনিব :

"তারপর ইলিয়া, তুমি কোনোদিন চুরি ক'রেছো?"

"না।"

"তা বিশ্বাস করি; তুমি চুরি করো নি। আচ্ছা এইবার বলো তো, এই কার্প্ চুরি করে কি না?"

"করে, বেমালুম!" জবাব দেয় ইলিয়া।

তাজ্জব ব'নে গিয়ে ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে, চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে কার্প্ এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন এ-সব ব্যাপারের সংগে ওর কোনো সম্বন্ধই নেই। গুম হ'য়ে ব'সে মনিব তার দাড়িতে আবার হাত

বুলোতে থাকে। ব্যাপার যে সুবিধের নয় তা বুঝলো ইলিয়া; উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে রইলো নাটকের শেষ দৃশ্যটির জন্যে। এদিকে আঁশটে গন্ধে ঘর-খানা যেন হাঁপাতে থাকে। মাছির ভন্‌ভনানি আর গামলায় জলে মাছের ছলাংছলাং শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কার্প্‌ যেমন ব'সেছিলো তেমনিই ব'সে থাকে—রাস্তামুখো হ'য়ে, নিশ্চল পুতুলটির মতো।

একটু পরে মনিবের ডাক শোনা গেলো: "কার্প্‌, বাপধন!"

সংগে সংগে উঠে এসে, মালিকের দিকে নিষ্পাপ শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে, ব'ললো কার্প্‌:

"কি চাই বলুন?"

"শুনলে তো তোমার সম্বন্ধে কি বলা হ'লো?"

"শুনলাম।"

"এর ওপর তোমার কিছু বলার আছে?"

"কিছু না"—একটু ন'ড়ে চ'ড়ে জবাব দিলো কার্প্‌।

"সে কি,—কিচ্ছু না?"

"ব্যাপারটা অত্যন্ত সোজা, কিরিল্‌ ইভানোভিচ্‌। আমি হ'লাম এমন একটা লোক যার আত্মসম্মান-বোধ আছে, যে নিজের দাম জানে; তাই এক ফোঁটা একটা ছোঁড়ার ওপর আমার রাগ করা সাজে না। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন ছোঁড়াটা যেমন বেকুব তেমনি অভদ্র। ওর এই স্পর্ধার জন্যে আমি ওকে পুরোপুরি মাপ ক'রে দিলাম।"

"আস্তে, কার্প্‌, আস্তে। কথায় আমাকে মাত ক'রতে চেয়ো না! সোজা-সুজি জবাব দাও: ও যা ব'ললো তা সত্যি কি না?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, মাথা কাত ক'রে জবাব দিলো কার্প্‌:

"সত্য মিথ্যার যাচাই কি সহজ, কিরিল্‌ ইভানোভিচ্‌? কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ভর করে সেটাকে যে যেভাবে দেখে তার ওপর। আপনি অবিশ্যি ইচ্ছে ক'রলে ওর কথাকেই সত্য ব'লে মেনে নিতে পারেন; আর, তা যদি না মেনে নেন, তাহ'লে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মনিবকে একটা কুর্ণিশ জানিয়ে কার্প্‌ এমন একটা ভাব দেখায় যেন মর্মাহত হ'য়েছে সে।

সায় দিয়ে মনিব ব'ললো :

"তা—তা অবিশ্যি ঠিক। আমার মন যা ব'লবে তা-ই আসলে ঠিক! এখানে কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম হয়। তাহ'লে তুমি কি ব'লতে চাও ছেলেটা বেকুব ?"

দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে জবাব দিলো কার্প্ :

"একেবারে বেকুব।"

আমতা-আমতা ক'রে স্লোগানফ্ ব'ললো :

"আমার কিন্তু মনে হয় এটা তুমি ভুল ব'ললে কার্প্।"

ব'লেই সে হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

"কিন্তু বলো দেখি হক্ কথাটা ও তোমার মুখের ওপর কেমন ছুঁড়ে মারলো ? হো হো-হো! তাহ'লে কার্প্ও চুরি করে ? কার্প্ও! হো-হো-হো!"

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে এই কথা-কাটাকাটি শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনে হচ্ছিলো পরোক্ষে যেন ওকেই গালাগালি দেওয়া হ'চ্ছে। কিন্তু কার্পের মুখের ওপর মনিব হো-হো ক'রে হেসে উঠতেই ইলিয়া খুশি হ'য়ে কার্পের দিকে চেয়ে মনে মনে ব'ললো : "বেশ হ'য়েছে।" সংগে সংগে ওর হৃদয় মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেলো। হাসবার সময় স্লোগানফের চোখ দুটো কুঁচকে যায়, নাচতে থাকে। মনিবকে হাসতে দেখে কার্প্ও সাবধানে কেঠো হাসি হাসে :

"হি-হি-হি!"

কার্পের ক্ষীণ 'হি-হি'-হাসি শুনে স্লোগানফ্ কর্কশ গলায় ব'ললো :

"দোকান বন্ধ করো।"

ইলিয়া ওর আস্তানার দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় কার্প্ ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে ব'ললো :

"তুমি একটি আস্তো বেকুব, বুঝলে, একটি আস্তো বেকুব! এতো হৈ-চৈ ক'রে তোমার কি লাভটা হ'লো শুনি ? মনিবের মন পেতে হ'লে কি এই সব ক'রতে হয় ? না কি এতে তোমার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হ'য়ে যাবে ? গাড়োল কোথাকার! তুমি কি ভেবেছো ও জানতো না যে আমি আর মিশ্কা চুরি করি ? আজই না হয় ওর এতো বাড়বাড়ন্ত হ'য়েছে,

কিন্তু প্রথম জীবনে ও কি চুরি করে নি?—ছি-ছি! মিশ্‌কা গেছে, আপদ গেছে, সেজন্যে অবিশ্যি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তুমি যা বলেছো তার জন্যে আমি তোমায় কখনো মাপ ক'রবো না। সে তোমায় আগেই জানিয়ে রাখলাম। এতো দূর আস্পদ্দা তোমার, আমারই মুখের ওপর তুমি কি না এসব কথা ব'লতে সাহস করো! আচ্ছা, বেশ, আমিও তোমায় দেখে নেবো। বুঝতে পারছি তুমি আমায় এতোটুকুও ভক্তিছেদ্দা করো না।"

চুপ ক'রে ইলিয়া কথাগুলো শুনলো, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। ও ভেবেছিলো কার্প্‌ ওর ওপর রেগে টং হ'য়ে যাবে এবং রাস্তায় ওকে ধ'রে মারবে। এমন কি পথে বেরুতে ওর সাহসও হ'চ্ছিলো না। কিন্তু ও যখন বুঝলো যে কার্পের কথায় রাগের চেয়ে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপই বেশি, তখন তার শত ভীতি-প্রদর্শনেও ও ঘাবড়ালো না। অবশ্য কার্পের কথাগুলোর অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো যখন সন্ধ্যাবেলা ওকে ওপরে ডেকে পাঠালো মনিব।

টিপ্পনী কেটে ব'ললো কার্প্‌: "আহা, যাও ওপরে যাও। মনিব যে তোমায় ডাকছেন!"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে একখানা প্রকাণ্ড ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া দেখলো ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোল টেবিল র'য়েছে, তার ওপর বসানো র'য়েছে একটা বিরাট কেৎলি আর কড়িকাঠ থেকে একটা প্রকাণ্ড বাতি ঝুলছে সেই টেবিলের ওপর, টেবিলখানার ধারে ধারে ব'সে আছে মনিব, তার স্ত্রী এবং তাদের তিনটি কন্যা। মেজোটি বড়োর চেয়ে এক-মাথা ছোটো, আবার ছোটোটি মেজোর চেয়ে এক-মাথা খাটো। তাদের প্রত্যেকের মাথায় চুলই লাল, আর তাদের লম্বাটে শাদা শাদা মুখগুলো ফুট-ফুট দাগে ভর্তি। ইলিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখেই স্ত্রোগানফ্‌-নন্দিনীরা ভয়ে ঘেঁষাঘেঁষি হ'য়ে ব'সে তাদের তিন জোড়া নীল চক্ষু তুলে ধ'রে ইলিয়ার দিকে।

মনিব ব'ললো: "এ-ই সে-ই!"

যেন ওকে আজ এই প্রথম দেখছে এই ভাবে ইলিয়ার দিকে চেয়ে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে ব'লে ওঠে মনিবানী: "কি ছেলে বাবা!"

মুচকি হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে, টেবিলের ওপর তবলা বাজাতে বাজাতে ব'ললো মনিব :

"ইলিয়া, তোমাকে এখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা ব'লছি। তোমাকে আমার আর দরকার নেই, বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে তুমি বিদেয় হও।"

শুনেই হতভম্ব হ'য়ে যায় ইলিয়া, একটি কথাও ব'লতে পারে না। ঠোঁটদুটো ফাঁক হ'য়ে থাকে বিস্ময়ে। পিছন ফিরে দরজার দিকে এগোয় সে।

এমন সময় টেবিলে চাপড় মেরে ব'ললো মনিব :

"দাঁড়াও! যেও না।"

তারপর একটা আঙুল উঁচিয়ে, ধীরে ধীরে, সরাসরি ব'লতে থাকে মনিব :

"কেবল এই জন্যেই তোমায় এখানে ডেকে পাঠাই নি। তোমাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার—মানে—তোমাকে আমি ব'লতে চাই কেন তুমি আমার চক্ষুশূল হ'য়ে উঠেছো। তুমি আমার কোনো ক্ষেতি করো নি, লিখতে প'ড়তে জানো, কুঁড়ে নও, চোরছ্যাচড় নও, তার ওপর বেশ গাট্টাগোট্টা, সবই ভালো, কিন্তু তাহ'লেও তোমাকে আমার দরকার নেই। তোমার সংগে আমার ব'নছে না। কিন্তু ভাবছি, কেন ব'নছে না? সেইটাই হ'লো কথা।—"

ইলিয়া বুঝলো জুতো মেরে গরুদান করা হ'চ্ছে।—প্রশংসা আর বরতরফ একই সংগে। ব্যাপারটাকে ও কিছুতেই হজম ক'রতে পারে না। ওর মনে হয়, মনিবের কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান লোপ পেয়েছে। স্লোগানফের মুখের চেহারা দেখে এই ধারণাটাই ওর মনে বদ্ধমূল হ'লো। মনিবের মুখখানা চিন্তায় থমথম ক'রছে, কিন্তু চিন্তাটাকে সে যেন ধ'রতেও পারছে না, প্রকাশও ক'রতে পারছে না। এক পা এগিয়ে গিয়ে সসম্মানে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"ছুরি তুলেছিলাম ব'লে কি আপনি আমায় জবাব দিচ্ছেন?"

ভয়ে চ'মকে উঠে ব'ললো স্লোগানফের স্ত্রী :

"মাগো, কী আস্পদ্দা ছোঁড়াটার!"

সংগে সংগে ইলিয়ার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে, আঙুল দিয়ে ওকে একটা খোঁচা মেরে, খোসমেজাজে ব'ললো স্লোগানফ্ :

"ঠিক…ঠিক…ঐ 'আস্পদ্দা' কথাটাই খুঁজছিলাম এতোক্ষণ ধ'রে। বুঝলে

ইলিয়া তোমার বড়ো আস্পদ্ধা…বেজায় আস্পদ্ধা তোমার! শাস্ত্রে বলে চাকর হবে গোবেচারী, মনিবের মনই হবে তার মন। কিন্তু তোমার আবার একটা নিজের মন আছে। এটা খারাপ, খুবই খারাপ, ইলিয়া; আর এইখানেই তোমার যতো আস্পদ্ধা। ধ'রো, তুমি লোকের মুখের ওপরই বলো—চোর! এটা ঠিক নয়, এটা হ'লো আস্পদ্ধা। বেশ-তো, তুমি যদি সৎ, তবে একথাটা আমায় চুপিচুপি ব'ললেই পারতে,—মানে—ব'ললেই পারতেঃ 'মনিব, অমুক লোকটা চোর।' তখন আমি বুঝতাম কে চোর আর কে চোর নয়,—কারণ আমি মনিব! কিন্তু তা না ক'রে তুমি নিজেই ব'লে ব'সলে চোর। দাঁড়াও। শোনো তারপর। তিনজনের একজন সৎ হ'লে তাতে আমার কোনোই লাভ নেই।—হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা বেশ খোলসা ক'রেই বুঝিয়ে. বলি তোমায়, শোনো। দশজনের মধ্যে যদি একজন সৎ আর ন'জন রাস্কেল হয়, তাহ'লে জিত হবে না কারোরই, কিন্তু লোকসান হবে ঐ সৎ লোকটারই। কিন্তু যদি সাতজন সৎ আর তিনজন রাস্কেল হয়, তাহ'লে জিত হবে ঐ সৎ লোকগুলোরই, মানে, জিত হবে তোমার দলেরই। বুঝলে? বেশির ভাগ লোক যা ব'লবে তা-ই হবে হামেশা ঠিক। কিন্তু যদি একজন সৎ হয় তাতে আমারই বা কি, আর তারই বা কি? এইভাবে সততার বিচার ক'রতে হয়, বুঝলে? আর, ভবিষ্যতে মনে রেখো, অযাচিতভাবে নিজের ভালোপনা জাহির ক'রতে যেও না!"

হাতের চেটো দিয়ে ভ্রূর ঘাম মুছে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ধীরে ধীরে আবার ব'ললো মনিব:

"তার ওপর তুমি আবার ছুরি তোলো!"

ভয়ে চক্ষু ছানাবড়া ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো স্ত্রোগানফের স্ত্রী: "রক্ষে করো যীশু!" সেই সংগে ওর মেয়েগুলোও আর একটু ঘেঁষাঘেঁষি হ'য়ে ব'সলো।

"লোকে বলে ছুরি তুলেছো কি ম'রেছো। আর—আর,—হ্যাঁ, তাই তোমাকে আমার একটুও দরকার নেই। বুঝলে? এই নাও, তোমার বারো গণ্ডা পয়সা নিয়ে তুমি বিদেয় হও। মনে রেখো তুমি আমার কোনো ক্ষেতি করো নি, আর আমিও তোমার কোনো ক্ষেতি করি নি। চাই-কি, এই নাও, আরও বারো গণ্ডা পয়সা তোমায় বকশিশ দিচ্ছি। এতোক্ষণ ধ'রে

তোমাকে যা বললাম, তা খুব ভেবেচিন্তেই ব'লেছি। তুমি বাচ্চা ছেলে ব'লে তোমায় উপেক্ষা করি নি। কে জানে, তোমায় জবাব দিতে হয়তো আমার দুঃখও হ'চ্ছে, কিন্তু হ'লে হবে কি, তোমার সংগে আমার ব'নছে না। এক ফোঁটাই হ'ক আর আধ-ফোঁটাই হ'ক, লেবুর রসকে দুধের থেকে দূরে রাখাই ভালো। আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পারো।"

ইলিয়া ব'ললো: "চলি।"

মন দিয়ে মনিবের কথাগুলো শুনে ওর মনে হ'লো যে, দোকানে মাছ বিক্রি করার চাকর না থাকলে মনিবের চ'লবে না, তাই সে কার্প্‌কে জবাব না দিয়ে জবাব দিয়েছে ওকেই। এতে খুশিই হ'লো ইলিয়া, আর ওর মনে হ'লো মনিব যেন আলাদা মানুষ—কেমন যেন সাদাসিধে আর দয়ালু।

"তোমার পয়সাগুলো তুলে নাও।"

রূপোর সিকিগুলোকে মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে ধ'রে ইলিয়া আবার ব'ললো: "চলি। ধন্যবাদ।"

মাথা নেড়ে পাল্‌টা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে জবাব দিলো স্ত্রোগানফ্‌:

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই।"

বেরিয়ে যেতে যেতে ইলিয়া শুনলো স্ত্রোগানফের স্ত্রী তিরস্কারের সুরে ব'লছে:

"মাগো, ছোঁড়াটার কাণ্ড দেখো, যাবার সময় এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললো না।"

বোঁচকা কাঁধে নিয়ে স্ত্রোগানফের বাড়ির জবরদস্ত ফটক থেকে বেরুতেই ইলিয়ার মনে হ'লো ও যেন অনেক দূর থেকে আসছে, এমন একটা পাণ্ডুর, বন্ধ্যা দেশ থেকে যেখানে মানুষ নেই গাছ নেই, আছে কেবল পাথর, আর তার মধ্যে বাস করে একজন দয়ালু বুড়ো জাদুকর—যে এই দেশে এসে প'ড়লে, প্রত্যেককেই পথ দেখিয়ে দেয়। এমনই একটা দেশের কথা ও একখানা কেতাবে প'ড়েছিলো।

বসন্তের স্বচ্ছ সন্ধ্যা। অস্তমান সূর্যের লাল আগুনে ঝলমল ক'রছে বাড়ির জানলাগুলো। ইলিয়ার মনে প'ড়লো সেই দিনটির কথা যেদিন নদীর তীর থেকে ও প্রথম শহরটিকে দেখেছিলো। কাঁধের বোঁচকাটা বেশ

ভারী শিরদাঁড়াটা টনটনিয়ে ওঠে, তাই ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে ইলিয়া। রাস্তার দুধার দিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে চ'লেছে অজস্র লোক, তাদের কেউ কেউ ওকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, সংগে সংগে বোঁচকাটাও দুলে উঠছে থেকে থেকে। গাড়িঘোড়ার সোঁ-সোঁ-ঘড়ঘড় শব্দে কাঁপছে রাস্তাটা; সূর্যের বাঁকা আলোয় ঝাঁকেঝাঁক উড়ছে রাস্তার ধূলো। চারিধারেই ব্যস্ততা, হৈ-হৈ আর ফূর্তি। ইলিয়া ভাবে: দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেলো শহরে। এই দুটি বছরে ও কতো-কিই না দেখেছে, কতো-কিই না শুনেছে। ওর মনের মধ্যে একটা তোলপাড় চ'লতে থাকে। ইলিয়ার ধারণা হ'লো ও একজন মরদ হ'য়ে উঠেছে, তাই গর্বে ওর বুকখানা ফুলে উঠলো, মনে মনে ও ব'ললো: 'মাভৈঃ', আর সেই সংগে ওর মনে প'ড়লো মনিবের কথাগুলো:

"তুমি লিখতে প'ড়তে জানো, কুঁড়ে নও, হাঁদা নও, তারওপর বেশ গাঁট্টাগোট্টা—সবই ভালো ..."।

কাল যে ওকে আর স্ত্রোগানফের মাছের দোকানে ফিরে যেতে হবে না, এতে খুশি হ'য়ে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে—নিজের অজ্ঞাতেই মুচকি হেসে এবার তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলো ইলিয়া, আর ব'লতে লাগলো মনে মনে:

"কুছ পরোয়া নেই, কুছ পরোয়া নেই!"

পেক্রুহা ফিলিমনফের বাড়িতে ফিরে এসে ইলিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত ক'রে গর্ববোধ করে যে স্ত্রোগানফের দোকানে থাকা-কালে ও সত্যিই অনেক বড়ো হ'য়ে গেছে, আর খোকাটি নেই। ওকে নিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যায়। তাদের কৌতূহল যেন উপচে পড়ে, খোসামোদীও চ'লতে থাকে অল্পবিস্তর।

পের্ফিশ্‌কা ওর করমর্দন ক'রে ব'ললো:

"সাবাস্‌, দোকানদার, সাবাস্‌! জীতা রহো বেটা।—তারপর দোস্ত, ওখানকার ভোগান্তি শেষ হ'লো? সব কথাই শুনেছি আমি, হা-হা-হা! সত্য কথাটা ওরা সইতে পারে না, কি বলো? ওরা চায় তুমি কুকুরের মতো ওদের জুতো চাটো! বলিহারি যাই—হা-হা-হা-হা!"

মাশার সংগে ওর দেখা হ'তেই মেয়েটা আনন্দে ব'লে উঠলো:

"ও-মা, তুমি কত্তো বড়ো হ'য়ে গেছো!"

জাকবও খুশি হ'য়েছে। সে বললো:

"যাক, আমরা আবার এক সংগে বই প'ড়তে পারবো। শোনো, একটা বই পেয়েছি—'ভালো-মন্দ'—ভারি স্থন্দোর গল্প, ব'লছি প্লটটা: সিমন্‌ মনফর্‌ নামে একটা রাক্ষস ছিলো—"

এই ব'লে জাকব এমন হুড়হুড় ক'রে গল্পটার প্লট বর্ণনা ক'রতে শুরু করে যে সব কিছু গুলিয়ে যায়।

হাঁড়ি-মাথা জাকব যে ব'দলে যায় নি, এতে আশ্বস্ত হ'লো ইলিয়া। কিন্তু স্ত্রোগানফের সংগে ওর ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনে জাকব যখন নির্বিকারভাবে ব'ললো: "ঠিকই তো ক'রেছো, এতে আর অবাক হবার কি আছে!" তখন একটু ক্ষুণ্ন হ'লো ইলিয়া।

কথাটা পেক্রুহার কানে যেতে, সব শুনে, ইলিয়ার আচরণে সে তাজ্জব ব'নে গেলো, তারপর ব'ললো সায় দিয়ে:

"খুব কায়দা ক'রে ওদের পাকড়েছিলি তো! অবিশ্যি, তোকে রেখে তো আর কার্প্‌কে জবাব দিতে পারেন না কিরিল্‌ ইভানোভিচ্‌!, কার্প্‌ কাজের লোক, সে ব্যবসা বোঝে। তাছাড়া এ-সব ঝামেলার পর তার সংগে তুই

থাকতেও পারতিস না। হক্ কথাটা মুখের ওপর সরাসরি ব'লতে গেলি, তাই সেও তোকে তাড়িয়ে ছাড়লো।"

কিন্তু পরদিন তেরেন্স তার ভাইপোকে ব'ললো চুপিচুপি :

"পেত্রুহাকে একটু সামলে-সুমলে চলিস, অতো কথা বলিস নি। সাবধান। ও তোকে এখন ভালো চোখে দেখছে না, তোর নিন্দে ক'রতে শুরু ক'রেছে। বলে : 'ভারি আমার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হ'য়েছে রে! সত্য সত্য ক'রে মাথা ব্যথা করে কারা? যারা এখনো বেকুব আছে তারাই!' বুঝলি, এই সব কথা, ব'লছে ও।"

কাকার কথা শুনে হেসে উঠে ব'ললো ইলিয়া :

"আর কালই ও আমার কতো প্রশংসা ক'রছিলো! ব'ললো কি না : 'খুব কায়দা ক'রে ওদের পাকড়েছিলি তো!' সব শেয়ালেরই এক রা, সামনে প্রশংসা ক'রবে, আর নিন্দে ক'রবে পেছনে।"

যাই হ'ক, পেত্রুহা ওর সম্বন্ধে যা-ই বলুক না কেন, নিজের সম্বন্ধে ওর ধারণাটা এতোটুকুও ছোটো হ'লো না। ও যে একজন 'হিরো' এবং ঐ অবস্থায় প'ড়লে অন্য কেউ যে ওর চেয়ে ভালো কিছু ক'রতে পারতো না, এ-সম্বন্ধে ওর কোনো সন্দেহই রইলো না।

চাকরি খোঁজা চ'লতে লাগলো, কিন্তু দুমাসেও একটা জুটলো না, এমন বরাত! তখন হতাশ হ'য়ে তেরেন্স ব'ললো :

"যা বুঝ্ছি, চাকরি তোর কপালে নেই। সবাই বলে : 'এতো বড়ো একটা ছোঁড়াকে নিয়ে ক'রবো কি?' কি ক'রে আমাদের দিন কাটবে, বল্ দেখি? কি ক'রে?"

গম্ভীর মেজাজে দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে জবাব দিলো ইলিয়া :

"আমার বয়েস হ'লো পনেরো, লিখতে প'ড়তেও জানি! কিন্তু আমি যদি উদ্ধতই হই, তাহ'লে যে-চাকরিতেই যাই না কেন, কোনোখানেই আমায় রাখবে না! উদ্ধত ছেলেকে কে চায় বলো?"

বিছানায় ব'সে চাদরটা চেপে ধ'রে শংকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো কুঁজো তেরেন্স :

"তাহ'লে আমাদের গতি কি হবে?"

"শোনো, আমায় একটা বাক্শো বানিয়ে দাও; আর সাবান, আতর, ছুঁচ, বই—এই সব নানারকমের জিনিষপত্তর কিনে দাও; আমি ঘুরে ঘুরে ফেরি ক'রবো।"

"তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না ইলিয়া। হোটেলের হট্টগোলে মাথাটা ঝিম ঝিম ক'রছে। সব সময়ই শুধু দুম্-দাম্ আর ধড়াস্! নিরিবিলিতে ব'সে একটু যে ভাববো তার কি জো আছে? চেষ্টার কসুর করি না, কিন্তু পেরে উঠি না যেন!"

কুঁজো তেরেন্সকে সত্যই বড়ো ক্লান্ত দেখায়। ওর থমথমে মুখখানা দেখে মনে হয়, ও যেন কিছু ভাববার চেষ্টা ক'রছে কিন্তু ভেবে তার কূল পাচ্ছে না।

ইলিয়া মিনতি ক'রে ব'ললো:

"একটু চেষ্টা ক'রে দেখো! আমাকে যেতে দাও।"

ওর ধারণা ফেরিওলা হ'তে পারলে ওকে আর কারও তাঁবে থাকতে হবে না।

"বেশ, তাই হ'ক, ভগবানের হাতেই তোকে সঁপে দিলাম! দেখি চেষ্টা ক'রে।"

আনন্দে ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠলো:

"দেখো এতে ভালো হবে।"

"হায় ভগবান, কি যে হবে!" এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তেরেন্স আর্তকণ্ঠে ব'লতে লাগলো:

"তুই যদি আর একটু তাড়াতাড়ি বড়ো হ'য়ে উঠতিস, তাহ'লে আমি এখান থেকে চ'লে যেতাম। কিন্তু তোর কথা ভাবলেই আমার পা যেন ব'সে যায়। তোর জন্যেই তো আমি এই এঁদো ডোবায় গলা ডুবিয়ে মরতে ব'সেছি। নইলে, আমি চ'লে গিয়ে সাধু সন্ন্যেসীদের সঙ্গ করতাম, তাদের ব'লতাম: 'ওগো আমাকে বাঁচাও, আমি বড়ো পাপী! যন্ত্রণায় ম'রে যাচ্ছি! আমার হ'য়ে ভগবানকে দুটো কথা বলো!' "

এই ব'লে কুঁজো তেরেন্স হঠাৎ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

ইলিয়া আন্দাজে ধ'রতে পারে ওর কাকার পাপটা কি। সংগে সংগে অতীতের অনেক কথাই ওর মনে প'ড়ে যায়, আর ব্যথায় বুকটা মোচড়

দিয়ে ওঠে। কাকার জন্যে তার দুঃখ হয় সত্যি, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার মতো একটি কথাও খুঁজে পায় না সে, তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে; কিন্তু যখন দেখে যে কাকার কান্না আর থামছে না, তখন তার কোটরগত করুণ চোখ-দুটোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে :

"তবে আর কান্না কেন? একটু সবুর করো, ব্যবসা ক'রে আমি আগে বড়োলোক হই, তারপর তোমার যেখানে খুশি তুমি যেও।"

এই ব'লে একটু ভেবে নিয়ে, সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"ও নিয়ে মন খারাপ ক'রো না। দেখো, ঠিক পার পেয়ে যাবে।"

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো তেরেন্স :

"সত্যি পেয়ে যাবো?"

"যাবে না তো কি! এর চেয়ে কতো বড়ো বড়ো পাপ ক'রে লোক ত'রে যাচ্ছে!"

ইলিয়া ফেরিওলা হ'লো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গলায় একটা বাক্সো ঝুলিয়ে হাতে একজোড়া ঠেকো নিয়ে ও ঘুরে বেড়াতো শহরের রাস্তায় রাস্তায় আর কালো চোখদুটো কুঁচকে নাক তুলে সগর্বে তাকাতো পথিকদের দিকে। টুপিটা প্রায় চোখ বরাবর নামিয়ে, গলা ফুলিয়ে, পরিষ্কার তাজা কণ্ঠে ও হাঁকতো :

সাবান চাই, কালি চাই
পোমাটুম চাই, আলপিন চাই
চুলের কাঁটা চাই, পাওডার চাই
ছুঁচ চাই, সুতো চাই,
ভালো ভালো বই চাই
সাবান চাই.........

ইলিয়ার চারপাশে জীবনটা ব'ইতে থাকে খল-খল ক'রে, সফেন ঝর্ণার মতো, আর তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার দিতে দিতে ইলিয়া অনুভব

ক'রে, যে-কোনো মানুষের মতো সে-ও একটা মানুষ, হ্যাঁ সে-ও একটা মানুষ! হাট-বাজারে ঘুরতে ঘুরতে কোনো হোটেলে ঢুকে প'ড়ে ও হুকুম করে: "দু পেয়ালা চা আর কিছু সাদা রুটি দেখি!" রুটি আর চা-টুকু ও এমন ধীরে-সুস্থে খায় যেন ও যে-সে লোক নয়, নিজের দর বোঝে। বেশ লাগে জীবনটা, তরতরে ঝর্ণার মতোই তা স্বচ্ছ এবং সাবলীল। ওর সাদাসিধে চিন্তাগুলোতেও রঙীন আমেজ লাগে। ইলিয়া ভাবে: কয়েক বছরের মধ্যেই সে একটা ছোট্টো পরিষ্কার দোকান খুলবে কোনো ভালো রাস্তায়, যেখানে বিশেষ হট্টগোল থাকবে না, আর দোকানটা হবে জরি, রেশম, লেস্ প্রভৃতি এমন সব জিনিষের যা হাল্‌কা অথচ পরিষ্কার এবং যাতে ওর পোষাকে দাগ-দোগ লাগবে না; শুধু দোকান কেন, ও নিজেও হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরুষ, সবাই তাকে সম্মান ক'রবে, মেয়েরা তার দিকে চাইবে কোমল দৃষ্টিতে, তারপর সন্ধ্যাবেলা দোকান বন্ধ ক'রে একখানা ঝকঝকে ঘরে ব'সে চা খেতে খেতে ও বই প'ড়বে। তবে হ্যাঁ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ওকে হ'তেই হবে, নইলে জীবন সুন্দর হবে কি ক'রে? দোকান-খানিও হবে যেমন পরিপাটী, ও নিজেও থাকবে তেমনি ফিটফাট হ'য়ে। ব্যবসার অবস্থা ভালো থাকলে এবং কেউ ওকে অপমান না ক'রলে ইলিয়া এই-সব স্বপ্ন দেখতো।

কিন্তু যেদিন এক পয়সাও বিক্রি হ'তো না, সেদিন ক্লান্ত হ'য়ে কোনো হোটেলে কিংবা রাস্তার ফুটপাথে ব'সে ও যখন পুলিশের গুঁতো আর খিস্তি, খদ্দেরগুলোর দুর্ব্যবহার আর অহেতুক সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বী ফেরিওলাদের গালমন্দ আর বিদ্রূপের কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া ক'রতো তখন হতাশায় এবং দুঃখে কেমন যেন মুষড়ে প'ড়তো ও। তখন চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে জীবনটাকে আরও তলিয়ে দেখবার চেষ্টা ক'রতো ইলিয়া, অভিজ্ঞতাগুলোকে যাচাই করবার চেষ্টা ক'রতো মনের কষ্টিপাথরে। যে-ব্যাপারটা ওর চোখের সামনে খুব স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিতো সেটা হচ্ছে এই: ওর মতো সকলের উদ্দেশ্যই এক। সকলেই চেষ্টা ক'রছে এমন একটি জীবন লাভ ক'রতে যা শান্ত এবং পরিচ্ছন্ন, এবং যেখানে না খেয়ে মরবার ভয় নেই; তাই কেউ কাউকে রেয়াত ক'রছে

না, যাকে পথের কাঁটা ব'লে মনে হ'চ্ছে তাকেই উপড়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রছে। তারা সকলেই লোভী ও নির্দয়, বিনা কারণে এ ওকে আঘাত ক'রছে, দুঃখ দিচ্ছে, লাভ হ'চ্ছে না কিছুই, কিন্তু অপরকে আঘাত দিয়েই তাদের যেন আনন্দ; কাউকে কাতরাতে দেখলে তারা হাসছে, ঠাট্টা ক'রছে এবং কচিৎ কদাচিৎ এ ওর দুঃখে সমবেদনা জানাচ্ছে।

এই সব চিন্তা ওর মনে ভিড় ক'রে এলেই ওর মনে হ'তো ব্যবসা করাটা ঝকমারি, আর সংগে সংগে ওর সেই ছোট্টো পরিষ্কার দোকানখানির স্বপ্নও যেতো মিলিয়ে, খাঁ খাঁ ক'রতো ওর বুকটা এবং দুঃসহ শ্রান্তিতে ও যেন নেতিয়ে প'ড়তো। তখন ওর মনে হ'তো দোকান খুলবার মতো পয়সা ও কোনোদিনই রোজগার ক'রতে পারবে না সারা জীবনটাই ওকে গলায় বাক্‌শো ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে শহরের নোংরা এবং গুমোট রাস্তাগুলোয়, আর এমনি ক'রে অবসাদে ও যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে ক'রতে ও একদিন বুড়িয়ে যাবে। কিন্তু মোটামুটি ভালো বিক্রি হ'লেই ওর সাহস আবার ফিরে আসতো, আর চিন্তায় লাগতো রঙীন আমেজ।

একদিন শহরের একটা সবচেয়ে হট্টগোলে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওর সংগে দেখা হ'য়ে গেলো পাশ্‌কা গ্রাৎচফের। দেখলো: ফুটপাথের ওপর দিয়ে পাশ্‌কা 'হেলা খেলা সারা বেলা, একি খেলা আপন মনে'—গোছের ভংগিতে হেঁটে আসছে। তার হাতদুটো ছেঁড়া পাতলুনের পকেটে গোঁজা, নোংরা বালিশের ওয়াড়ের মতো নীল রঙের একটা ফতুয়া তার গায়ে, তাতে তার কেবল কাঁধ দুটোই ঢাকা প'ড়েছে, আর পাথুরে ফুটপাথের ওপর তার চাষাড়ে বুট জোড়ার শব্দ হ'চ্ছে খট-খট ক'রে; ভাঙা টুপিটা কায়দা ক'রে তার মাথার কার্ণিশ ঘেঁষে থেবড়ে বসানো, মাথার কামানো অংশের অর্ধেকটা চকচক ক'রছে রোদ্দুরে এবং তার মুখে গলায় লেপ্‌টে র'য়েছে পুরু একপর্দা তেলচিটে। দূর থেকে ইলিয়াকে চিনতে পেরে পাশ্‌কা সানন্দে মাথা নাড়ে, কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না তার চলনে।

ইলিয়া ব'ললো: "গুড্‌-মর্নিং। খুব যে চালের মাথায় চ'লেছো দেখছি!"

ইলিয়ার হাতখানা সজোরে চেপে ধ'রে খুশিতে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে

পাশ্‌কা। সেই সংগে ওর তেলচিটে মুখোশের মধ্যে থেকে দাঁতগুলোও চকচক ক'রে ওঠে, আর নাচতে থাকে ওর চোখের তারা দুটো।

"কেমন আছো?"

"আছি যতোটা ভালো থাকা সম্ভব ততোটা। যেদিন কিছু জোটে, খাই। আর যেদিন কিছু না জোটে চেঁচাই আর খালি-পেটে বিছানা ধামসাই!—হা-হা-হা! যাক তোমার সংগে দেখা হ'য়ে গিয়ে ভালোই হ'লো।"

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো ইলিয়া:

"আমাদের ওখানে আর আসো না কেন?"

কবেকার সেই খেলার সাথীটিকে এতো হাসিখুশি আর নোংরা দেখে খুশি হয় ইলিয়া। পাশ্‌কার চাষাড়ে বুটজোড়ার দিকে একবার চেয়েই ও নিজের নতুন জুতোজোড়ার দিকে তাকায়। করকরে সাড়ে তেরোটি টাকা খরচা ক'রে ও কিনেছে এই জুতো। একটা আত্মপ্রসাদের হাসি খেলে যায় ইলিয়ার ঠোঁটে।

গ্রাৎচফ্‌ ব'ললো: "আমি কি ক'রে জানবো তুমি কোথায় আছো?"

"সেই সেইখানেই—ফিলিমনফের ডেরায়।"

"তাই না কি? জাকব যে ব'ললো তুমি কোন্‌ মাছওয়ালার দোকানে চাকরি নিয়েছো?"

তখন ইলিয়া বেশ গর্বের সংগে স্ত্রোগানফ-সংক্রান্ত ব্যাপারটা ব'ললো পাশ্‌কাকে, সেই সংগে ওর বর্তমান জীবনের কাহিনীটাও ব'লতে ভুললো না।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পাশ্‌কা:

"বেশ ক'রেছো। যেমন মুখ তার তেমনি জুতো! আমার দশাও তাই। কি-একটা এদিক-ওদিক ক'রে ফেলার জন্যে ছাপাখানার চাকরিটা গেলো; তখন কাজে লাগলাম এক আর্টিষ্টের দোকানে; রং গুঁড়োতাম, তাছাড়া ফাইফরমাশও খাটতাম একটু-আধটু। কিন্তু শালার এমন বরাত, একদিন ব'সলাম তো ব'সলাম একখানা ভিজে সাইনবোর্ডের ওপরই! আর যাবে কোথা? তখন ধোলাই! মনিব, তার মাগ, তার চাকর—সবাই মিলে এইসা মারটাই মারলো আমাকে যে কহতব্য নয়। মারতে মারতে হাঁপাচ্ছে, তবু শালাদের বিরাম নেই! যাক সেখানেও কাজে জবাব হ'য়ে গেলো।

আজকাল এক পাইপওয়ালার দোকানে কাজ ক'রছি, মাইনে মাসে দশটাকা। একটু আগে খেতে গিয়েছিলাম, এখন আবার কাজে চ'লেছি।"

"দেখে মনে হ'চ্ছে তোমার কোনো তাড়া নেই যেন।"

"রাখো তোমার 'তাড়া'! সব সময় সব কাজ ঠিক সময়ে শেষ করা যায় না কি? তোমার ওখানে যাবো একদিন।"

"এসো কিন্তু", বন্ধুর মতো ব'ললো ইলিয়া।

"এখনো বই-টই পড়ো?"

"নিশ্চয়ই! আর, তুমি?"

"আমিও উলটেপালটে দেখি একটু-আধটু।"

"তারপর তোমার কবিতা লেখার খবর কি?"

"তা-ও লিখছি মাঝে মাঝে।"

পাশ্‌কা আবার খোসমেজাজী হাসি হেসে উঠলো।

"তাহ'লে আসছো তো ঠিক? আসবার সময় তোমার কবিতাও এনো।"

"মাইরি ব'লছি আনবো, আর কিছু ভদ্‌কাও আনবো।"

"মদ খাও?"

"খাও মানে? গিলি। কিন্তু এবার আমাকে যেতেই হবে, চলি।"

ইলিয়া ব'ললো: "আচ্ছা।"

হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়া পাশ্‌কার কথাই ভাবতে থাকে। আশ্চর্য! নিজের পরণে ছেঁড়া শার্ট-পাতলুন থাকা সত্ত্বেও পাশ্‌কা ওর পরিচ্ছন্ন পোষাক কিংবা চকচকে জুতো জোড়ার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, চোখ টাটানো তো দূরের কথা। তাছাড়া তাকে ওর স্বাধীন জীবনের কথাটা ব'লতে পাশ্‌কা এক খুশি হওয়া ছাড়া আর কিছুই ব'ললো না। তবে কি, যে-জীবনের পিছনে সবাই হন্যে হ'য়ে ছুটেছে, পাশ্‌কা তার পিছনে ছুটছে না? ইলিয়ার মনে খটকা লাগলো। একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিরিবিলি, স্বাধীন জীবন ছাড়া মানুষের আর যে কি কাম্য থাকতে পারে—তা ও সত্যই বুঝে উঠতে পারলো না, আর এ-কথাটা ভেবে ও যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো।

ইলিয়ার এ-সব চিন্তা আরও ফেঁপে উঠতো গির্জা থেকে ফেরার পর। প্রায় প্রতি সকাল-সন্ধ্যাতেই ও গির্জায় যেতো, অবশ্য উপাসনা করবার জন্যেও নয়

কিংবা কোনো বিশেষ চিন্তা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করবার জন্যেও নয়। এক কোণে দাঁড়িয়ে ও গান শুনতো, আর নীরব নিশ্চল জনমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে ভাবতো প্রত্যেকেই যেন একমনে একই কথা চিন্তা ক'রছে। গানে গানে আর ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের সুগন্ধে ভ'রে যেতো গির্জাটা, গানের শব্দগুলো ভেসে বেড়াতো ঘরময়, আর, ইলিয়ার মাঝে মাঝে মনে হ'তো সেও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে সেই প্রাণারাম সুরজগতে, যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছে তার মধ্যে। গির্জার গম্ভীর, রহস্যময় এবং স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় ও এমন কিছুর সন্ধান পেতো যা জীবনের তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলো অনুপস্থিত। প্রথম প্রথম এই নিবিড় অভিজ্ঞতাটা তার কোলাহলমুখর দৈনন্দিন জীবনে তেমন ছায়াপাত করেনি, তা নিয়ে সে তেমন মাথাও ঘামায় নি, কিন্তু ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি ক'রলো তার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন, ভ'রু সত্তা র'য়েছে যা কোলাহলের বাইরে থেকে তাকে অহরহ নীরবে নিরীক্ষণ ক'রছে, গির্জাতে এলেই এই সত্তাটি যেন তাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে, এবং এমন কতকগুলো অদ্ভুত ও দুঃখময় চিন্তায় তার মনটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে যে, জীবনের সবচেয়ে দরকারী কথাগুলো মনে রাখাও শক্ত হ'য়ে উঠছে তার পক্ষে, এই সময়ে ইলিয়ার মনে প'ড়ে যেতো আন্তিপ সন্ন্যাসী সম্বন্ধে নানান কাহিনী এবং ঈশ্বর সম্পর্কে জেরেমিয়া-ঠাবুর্দার দরদভরা কথাগুলো :

"ভগবান সর্বদ্রষ্টা। সবকিছুর যাচাইও করেন তিনি। তিনি ছাড়া আর তো কেউ নেই।"

এই বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে ইলিয়া মর্মে মর্মে অনুভব ক'রতো ওর সেই জরি-রেশমের দোকানের স্বপ্নটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, তাতে যেন আর কোনো আকর্ষণই নেই, আর সেই জায়গায় চেপে ব'সেছে একটা নতুন, রহস্যময় অনুভূতি। কিন্তু আবার কাজে লেগে গেলেই ওর মনটা যেতো থিতিয়ে এবং সেই বিষণ্ণ চিন্তাটাও যেতো হারিয়ে ওর আত্মার গভীরে। জাকবকে অনেক কথা খুলে ব'ললেও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাটা ও তাকে কোনোদিনই জানতে দেয় নি। ও কখনো স্বেচ্ছায় এই গুরুভার চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিতো না, কিংবা তার রহস্য ভেদ করবার জন্যেও মরিয়া হ'য়ে উঠতো না।

যাই হ'ক, ইলিয়ার সন্ধ্যাগুলো কাটতো বেশ আনন্দেই। শহর থেকে ফেরার পর মাশার এঁদোঘরে ঢুকে, ঘরের ছেলের মতোই ও হুকুম চালাতো:

"কি মাশু, চায়ের কদ্দ‍ূর ?"

"কদ্দ‍ূর আবার, সব তৈরি !"

টেবিলে-বসানো ধূমায়মান চায়ের কেৎলিটার দিকে চেয়ে ইলিয়া রোজই মুচকি হাসতো। প্রায় প্রতিদিনই ও আসবার সময় খাবার-দাবার কিনে আনতো—কোনোদিন মাখনরুটি, খাস্তাবিস্কুট ; কোনোদিন-বা কেক, মোরব্বা। মাশাও খুশি হ'য়ে ওকে চা দিতো। আজকাল মেয়েটা নিজেও কিছু কিছু রোজগার ক'রছিলো। মাতিৎসা ওকে কাগজের ফুল বানাতে শিখিয়ে দেওয়ায় মাশা খরখরে পাতলা কাগজ দিয়ে রঙবেরঙের গোলাপফুল বানাতো, এবং কখনো কখনো দিনে দশ পয়সা পর্যন্ত উপায় ক'রতো। মধ্যে ওর বাবা একবার টাইফয়েডে প'ড়লো। প্রায় আড়াইটি মাস হাসপাতালে কাটিয়ে সে যখন ফিরে এলো তখন তার হাড়-গোড় বেরিয়ে গেছে সত্যি, তবে মাথাটি গিশ্‌গিশ্ ক'রছে সুন্দর একরাশ খয়েরী রঙের কোঁকড়াচুলে। তাছাড়া দেখা গেলো পের্ফিশ্‌কা ওর সেই কুখ্যাত, ছোট্টো, খসখসে দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছে ; তবে বিবর্ণ হ'য়ে ওর গালদুটো গেছে চুপ্‌সে। কিন্তু দেখে মনে হ'লো ওর বয়স যেন কমে গেছে বছর পাঁচেক। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পের্ফিশ্‌কা আবার দিন-মজুরি খাটতে শুরু ক'রলো কারখানায় কারখানায়, সারাদিনটাই থাকতো বাইরে বাইরে, এমন কি রাত্রে ঘুমোতেও আসতো না বাড়িতে। অগত্যা সংসারের সমস্ত ভার প'ড়লো ওর মেয়ের ঘাড়েই। মাশা ওর বাবার ছেঁড়া শার্ট-পাতলুনগুলো সেলাই ক'রে দিতো এবং সবায়ের মতো তাকে ডাকতো পেফিশ্‌কা ব'লেই। কুঞ্চিতকেশী কন্যাটির পাকা পাকা কথাবার্তা শুনে মুখ টিপে হাসতো পের্ফিশ্‌কা এবং কেমন যেন সম্মানও ক'রতো মেয়েটাকে। এদিকে মাশা ছিলো ওর বাবার মতোই স্ফূর্তিবাজ, সারাদিনটাই কাজকর্ম ক'রতো ঘরে ব'সে এবং সেই সংগে গানও গাইতো।

প্রতি সন্ধ্যায় মাশার সংগে চা খাওয়াটা ইলিয়া এবং জাকভের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। ওরা চা-ও খায় গল্পও করে এক নাগাড়ে, [illegible]

তেতেও ওঠে মাঝে মাঝে। ইলিয়া বর্ণনা করে শহরের অভিজ্ঞতাগুলো; আর জাকব সারাদিন বই নিয়ে থাকে ব'লে শোনায় বইয়ের গল্প, সেই সংগে অবশ্য সে হোটেলের কেচ্ছাগুলোও বর্ণনা ক'রতে ভোলে না, এবং ফাঁক পেলেই জানিয়ে দেয়, ওর বাবার বিরুদ্ধে ওর নানান অভিযোগ আছে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই জাকব এমন উদ্ভট উদ্ভট কথা বলে যা ইলিয়া এবং মাশার মাথায় ঢোকে না। মাশা চুপটি ক'রে ব'সে এদের কথাবার্তা শোনে, নিজে বিশেষ কিছুই বলে না এবং হাসির খোরাক পেলেই হেসে ওঠে। গল্পগুজব জমেও ভালো, তার কারণ চা-টাও আশ্চর্যরকম সরেস। কখনো কখনো কেৎলিটা চোঁ চোঁ ক'রে ওঠে এবং বোঝা যায় চায়ের জল ফুরিয়েছে। তখন মাশা কেৎলিটা আবার ভ'রে আনে। এই ভাবে বহুবারই তাকে কেৎলি ভ'রতে হয়। আকাশে চাঁদ থাকলে ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে এক চিলতে চাঁদের আলো এসে পড়ে ওদের গায়ের ওপর। ঘরখানা এঁদো গর্তবিশেষ, দেয়ালগুলো পচা, ভারি কড়িকাঠটা ঝুলে পড়েছে মাথার ওপর, আলো-বাতাস-জল-রুটি-চিনি ইত্যাদি নানান জিনিষের অভাব-অনটনও লেগেই আছে এখানে, তবুও হাসিতে খুশিতে, মিতালিতে, যৌবনের নানান সুকুমার চিন্তায় ঘরখানা গমগম ক'রতে থাকে।

মাঝে মাঝে পের্ফিশ্কাও হাজির থাকে এই চায়ের আসরে। ঘরের একটা অন্ধকার ঘুপচিতে ভাঙা-ধ্বসা উনুনটার পাশে একটা ফাটা-বাক্শোর ওপর জড়োসড়ো হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে ব'সে সে এদের কথাবার্তা শোনে; আর গোধূলির আলোয় চকচক ক'রতে থাকে তার খুদে খুদে সাদা দাঁতগুলো। মাশা তাকে এক ঘটি চা এবং খানিকটা রুটি দিলে কন্যার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলে পের্ফিশ্কা:

"ধন্যবাদ, দয়াময়ী, ধন্যবাদ। মারিয়া পের্ফিলিএফ্নার জয় হ'ক।"

মাঝে মাঝে সে ঈর্ষান্বিত গলায় বলে:

"বেড়ে আছিস্ তোরা,—হাসছিস কাশছিস, চা খেতে খেতে গল্পগুজবও ক'রছিস,—দেখলে হিংসে হয়! এতো তবু মানুষের জীবন, আরামের জীবন!"

তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসতে হাসতে আবার ব'লতে থাকে সে:

"দিনদিন জীবনটা যেন ভালোর দিকেই যাচ্ছে! এক একটি বছর কাটছে,

আর আরামও বাড়ছে। তোরা তো বেশ জমিয়ে গল্প ক'রছিস, কিন্তু তোদের মতো বয়েসে আমি কার সংগে গল্প ক'রতাম জানিস? মুচির কালবুদের সংগে—স্রেফ মুচির কালবুদের সংগে! ধাঁই ধাঁই ক'রে আমার পিঠে প'ড়তো সেটা, আর আমি হিহি ক'রে হাসতে হাসতে প্রাণপণ চেঁচাতাম। যে-ই বুঝতাম পিঠের ওপর কালবুদচাঁদের আনাগোনা থেমেছে, অমনি ব'লতাম তার উদ্দেশে: 'কি দোস্ত, থামলে কেন, প'ড়ছিলে পড়ো!' হাজার হ'ক মুচির কালবুদ তো, তাই আবার না প'ড়েই পারতো না। হা-হা-হা! কি সুখেই যে আমার জীবন কেটেছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন! তোরা বড়ো হ'য়ে উঠে ভাববি কতো হাসি-গল্প আরামেই না তোদের দিন গেছে; কিন্তু আমি যখন বড়ো হ'য়ে উঠলাম তখন আমার আশাও ছিলো না ভরসাও ছিলো না, জোনাকির আলোটুকু পর্যন্ত দেখতে পাই নি কোথাও। আর দেখতে দেখতে আজ আমাব বযেস ছত্রিশ হ'য়ে গেলো! ব'লতে কি, তোদের মতো বয়েসে আমি চোখ থাকতেও ছিলাম অন্ধ, কান থাকতেও ছিলাম কালা। শুধু মনে পড়ে কনকনে ঠাণ্ডায় আর পেটের জালায় আমার দাঁতকপাটি লেগে যেতো, আর থেঁতলানো মুখখানা দপদপ ক'রতো যন্ত্রণায়। কি ক'রে যে আমার হাডক'খানা, এই কানদুটো আর মাথার চুলগুলো আস্তো থেকে গেছে তা আমি আজও বুঝতে পারি না! হাতের কাছে যা পেতো তা-ই দিয়েই ওরা মারতো আমায়, কেবল উনুনটা দিয়েই মারতে বাকি রেখেছিলো; তবে কথায় কথায় এই চাঁদবদনখানি উনুনে ঘ'ষে দিতো ঠিকই। দড়ির মতো ক'রে ওরা আমায় পাকাতো দিনরাত। মার খেতাম, গায়ের ছালচামড়া উঠে যেতো, মেঝেতে ফেলে বুকের ওপর ব'সে ওরা আমার রক্তটুকুও শুষে নিতো—কিন্তু হ'লে হবে কি, আমি যে নিরীহ রাশিয়ান! তাকে মারো-ধরো, হামান্‌দিস্তেতে ফেলে গুঁড়োও, তবুও সে সুড়সুড় ক'রে নিজের জায়গাটিতে এসে দাঁড়াবে। বহুৎ মজবুত আদমী কি না সে! আমার দিকেই চেয়ে দেখো না, এত মার-ধোর খেয়েছি তো, তবুও কেমন কোকিলটির মতো ডালে ডালে গান গেয়ে বেড়াচ্ছি! এক হোটেল থেকে যাই আর-এক হোটেলে, দুনিয়ার সংগে কোনো ঝগড়াই নেই আমার! আমি হ'লাম ভগবানের পেয়ারের লোক। মনে হয়, তিনি আমার দিকে একবার চেয়েও ছিলেন—তবে

সে একবারই—তারপর হয়তো হেসে ব'লেছিলেন: 'বলিহারি যাই, তুমি একখানি চীজ বটে!' বাস্, তারপর তিনি আমার দিকে আর একটিবারও ফিরে তাকান নি। হা-হা-হা!"

পের্ফিশ্‌কার কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া আর জাকব হেসে সারা হয়। কিন্তু হাসলেও ইলিয়ার মনে আবার খটকা লাগে; মনে হয় একটা নাছোড়বান্দা, আবছা চিন্তা যেন ওকে হয়রাণ ক'রে মারছে! মনে মনে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়াই ভালো, এই ভেবে ইলিয়া একদিন জিজ্ঞাসা ক'রলো মাশার বাপকে:

"আচ্ছা পের্ফিশ্‌কা, তোমার কি কোনো সাধ নেই?"

"কে ব'ললো নেই? বলে, ঠোঁটদুটো আমার সদাই চুলবুল ক'রছে এক চুমুক মদের জন্যে!"

"না, না, সত্যি ক'রে বলো, তুমি কি কিছুই চাও না?"

"সত্যি ক'রে ব'লতে হবে? তবে বলি শোনো, আমি একটা হারমোনিয়াম চাই—বেশ সুন্দর একটা হারমোনিয়াম! তার দাম প'ড়বে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা। তেমন একটা হারমোনিয়াম যদি পেতাম, তাহ'লে শুনিয়ে দিতাম বাজনা কাকে বলে!"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পের্ফিশ্‌কা আস্তে আস্তে খোসমেজাজী হাসি হাসতে লাগলো, তারপর মনে মনে কি-একটা-যেন ভেবে ঠিক ক'রে, ব'ললো ইলিয়াকে:

"না হে ছোকরা না, হারমোনিয়ামের কথা বাদ দাও। জিনিষটা দামী হ'লেই তো বেচে দেবো, তারপর টাকাটা হুস্ ক'রে মদেই উড়ে যাবে। তাছাড়া, পুরণোটার চেয়ে নতুনটা যে ভালো হবে তা-ই বা কে হলপ ক'রে ব'লতে পারে? যা আছে তা-ই থাক। ভাঙা হ'ক পুরণো হ'ক, আমার হারমোনিয়ামটা হ'লো গিয়ে সাতরাজার ধন এক মাণিক। ও আমার প্রাণ, আমি ওর প্রাণ; চাবিটি টিপেছি কি ও গান গেয়ে ওঠে। হয়তো সারা দুনিয়ায় এমন হারমোনিয়াম আর একটিও নেই। ও আমার বউ! এককালে আমার একটা সত্যিকারের বউও ছিলো বটে—মানুষ নয় দেবী ছিলো সে! এখন আবার বিয়ে ক'রতে চাইলেও—না, না, তা-ই বা কি ক'রে হয়? তার মতো বউ পাবোই

বা কোথায় ? ছুধের সাধ কি ঘোলে মেটে ? কি জালা বলো তো ? শোঁকো হে, যা ভালো তা ভালো নয়, আসলে যা ভালোবাসি তা-ই হ'লো ভালো।"

ভাঙা হ'ক, পুরণো হ'ক, পেফিশ্‌কার হারমোনিয়ামটা যে ভালো তা ইলিয়া হাজার বার স্বীকার করে। বাজনাটা সত্যিই বাজতে জানে,—যেমন স্থরেলা তেমনি মিষ্টি তার আওয়াজ। কিন্তু ইলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারে না যে পেফিশ্‌কার কোনো সাধ নেই। ও ভাবে: একটা লোক জীবনভোর ন্যাকড়া-কানি প'রবে, খোঁয়াড়ে থাকবে, ভদ্‌কা গিলবে, আর হারমোনিয়াম বাজাতে জানে ব'লে কিছুই চাইবে না—এও কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে ? কথাটা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া ক'রতে ক'রতে ইলিয়া ভাবলো, পেফিশ্‌কা যেন বড়ো বিদকুটে রকমের খামখেয়ালী। তবে, এই ঝাড়া-হাতপা মুচিটাকে ক্রমান্বয়ে দেখতে দেখতে ইলিয়ার স্থির ধারণা হ'লো যে, মাতালই হ'ক আর অপদার্থই হ'ক, পেফিশ্‌কার মতো দিল্‌খোলা মানুষ এ বাড়িতে আর একটিও নেই।

এই ধরণের নানান গুরুগম্ভীর প্রশ্ন স্থড়স্থড়ি দিতো ওদের মনে, আর ওরাও প্রচুর উৎসাহ ও কৌতূহল নিয়ে সেগুলো তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা ক'রতো; কিন্তু হ'লে হবে কি, প্রশ্নগুলো যেমন রহস্যময় তেমনি অতল ; তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যেতো, প্রশ্নের তল খুঁজতে গিয়ে ওরাই তলিয়ে গেছে প্রশ্নের মধ্যে। সাধারণত, এই ধরণের প্রশ্ন জাকবই তুলতো বেশি। তার আবার কতক-গুলো মুদ্রাদোষ ছিলো। ঠেস না দিয়ে সে ব'সতে পারতো না, ব'সে ব'সে জুতোর ডগা দিয়ে মেঝেটায় এমনভাবে চাপ দিতো যেন পায়ের তলায় চোরাবালি আছে কি না দেখছে, হাঁটবার সময় ফুটপাথের ঠেকো-পাথরগুলো এমনভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতো যেন গুনছে সেগুলো, কিংবা পথে যেতে যেতে রেলিং প'ড়লে এমনভাবে সেটা চেপে ধ'রতো যেন রেলিংটা টেকসই কি না পরখ ক'রছে। মাশার ঘরে ব'সে চা খাওয়ার সময় সে রোজই ব'সতো জানলার ধারে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তারপর তার লিকলিকে আঙুলগুলো দিয়ে চেয়ার কিংবা টেবিলের একটা প্রান্ত চেপে ধ'রে, সোনালী রঙের নরম চুলে ভর্তি হেঁড়ে মাথাটাকে কাত ক'রে সে তাকাতো তার বন্ধুদের দিকে, আর সেই সংগে পালা ক'রে তার নীল চোখদুটো খুলতো বোঁজাতো। মাঝে,

মাঝে চাঁদের আলো এসে প'ড়তো তার ফ্যাকাশে মুখের ওপর। জাকব আজও তার স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনাতো বন্ধুদের, কিন্তু কোনো বইয়ের বিষয়বস্তু বর্ণনা করবার সময় তাতে রং না চড়িয়ে ব'লতে পারতো না। সে-রংটাও ছিলো আবার যেমন সৃষ্টিছাড়া তেমনি অবোধ্য। আসলে সেটা ছিলো তার নিজেরই [illegible]। ইলিয়া প্রায়ই ব'লতো: "কি ব'লছো জাকব, বইখানায় তো এ[illegible]থা নেই?" কিন্তু জাকব এতে এতোটুকুও বিব্রত না হ'য়ে জবাব দিতো:

"আমি যে-ভাবে ব'ললাম সেইটাই আরও ভালো। শাস্ত্রই না হয় বদলানো যায় না, তাই ব'লে বইয়ের কথা খুশিমতো বদলানো যাবে না কেন? বই লেখে কারা?—মানুষ তো? আর আমিও মানুষ। তাই, যা ভালো লাগছে না তা ব'দলে নেবো। সে-কথা যাক্। আচ্ছা বলো তো, যখন ঘুমোও, তখন তোমার আত্মাটা কোথায় থাকে?"

ইলিয়া জবাব দিতো: "তা কি ক'রে জানবো?" ব'লতে কি, এই ধরণের প্রশ্ন ওর ভালো লাগতো না, কারণ এতে ওর মনটা বেফায়দা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতো।

জাকব ব'লতো: "শোনা যায়, ঘুমোলে না-কি আত্মাটা উড়ে চ'লে যায়। আমার বিশ্বাস এটা সত্য।"

"সত্যই তো," দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে ব'লতো মাশা।

বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা ক'রতো ইলিয়া:

"কি ক'রে জানলে?"

"কি ক'রে আবার? মনে হয়, তাই।"

চিন্তিতভাবে হাসতে হাসতে ব'লতো জাকব:

"হ্যা, আত্মাটা উড়ে চ'লে যায়। তারও তো বিশ্রামের দরকার। আর, সেইজন্যেই আমরা স্বপ্ন দেখি।"

জাকবের সবজান্তাপনায় দুঃখ না পেলেও ইলিয়া বুঝতে পারতো না এর জবাবে কি ব'লবে; তাই সে মুখ বুঁজে থাকতো, যদিও ওর খুবই ইচ্ছা ক'রতো জাকবের কথায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকতো সকলেই। অন্ধকার খুপরিটা হ'য়ে যেতো আরও অন্ধকার। এককোণে

বাতিটা জ্ব'লতো মিটমিট ক'রে। একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরুতো কেৎলিটা থেকে; আর হোটেলের কিম্ভূতকিমাকার গুঞ্জন ও গর্জনের শব্দ চুঁয়ে-চুঁয়ে ঢুকতো ঘরখানায়।

ধীরস্থিরভাবে আবার ব'লতো জাকব:

"বাঁচবার জন্যে মানুষ হন্তদন্ত হ'য়ে খাটে—ঘোড়ার মতো খাটে। একেই বলে জীবনসংগ্রাম। তারপর হঠাৎ—ধপাস্! অর্থাৎ, সে ম'রে যায়। এর মানে কি? ইলিয়া, তোমার কি মনে হয়?"

"কিছুই না। বুড়ো হ'লে মানুষ ম'রেই থাকে।"

"শুধু কি বুড়োরাই মরে? বাচ্চা ছেলেমেয়ে মরে না? জলজ্যান্ত জোয়ানগুলো মরে না?"

"যারা মরে তারা জলজ্যান্তও নয় জোয়ানও নয়।"

"কিন্তু তারা বাঁচে কিসের আশায়?"

এতোক্ষণ পরে একটা জুতসই প্রশ্ন পেয়ে তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিতো ইলিয়া:

"শোনো কথা! লোকে বাঁচে আবার কিসের আশায়?—বাঁচবার জন্যেই বাঁচে। আর, খাটে সুখে থাকবে ব'লে, বড়োলোক হবে ব'লে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন ক'রবে ব'লে।"

"তুমি তো গরিব লোকের কথা ব'লছো। কিন্তু বড়লোক? তাদের তো সবই আছে। তারা খাটে কিসে আশায়?"

"হুঁ, ভারি সেয়ানা তুমি! বড়লোকের কথা ব'লছো তো?—কিন্তু সে না থাকলে গরিব লোক খাটবে কার জন্যে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে জাকব জিজ্ঞাসা ক'রতো:

"তার মানে তুমি ব'লতে চাও সকলেই বাঁচে কাজের জন্যে?"

"নিশ্চয়ই। এইটাই সব নয়। কেউ কাজ করে, আবার কেউ কিছুই ক'রে না। যারা করে না, বুঝতে হবে, তাদের কাজ ফুরিয়েছে, তারা টাকা জমিয়েছে এবং তাই সুখে দিন কাটাচ্ছে।"

"কিন্তু কিসের আশায়?"

জাকবের ওপর চ'টে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতো ইলিয়া:

প্রশ্নটা ইলিয়াকে কাবু ক'রে ফেলতো। ঘৃণার ভাবটা স'রে যেতো ওর মুখের ওপর থেকে। বাতির দিকে চেয়ে ব'লতো ইলিয়া:

"শিখাটা যদি সবসময় বাতাসেই থাকতো তাহ'লে বাতাসটাও হামেশা গরম থাকতো, কিন্তু ঠাণ্ডায় নদী জ'মে গেলেও মানুষ দেশলাই জ্বালাতে পারে। এর থেকে প্রমাণ হ'চ্ছে শিখাটা বাতাসে থাকে না।"

বন্ধুর দিকে আশান্বিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতো জাকব:

"তাহ'লে কোথায় থাকে?"

এমন সময় মাশা ব'লে উঠতো: "দেশলায়ের কাঠিতেই।" অবশ্য জীবনের রহস্য নিয়ে কথাবার্তা চ'লতে থাকলে তাতে সে যোগ দিতো না এবং ঠিকমতো জবাব দিতে না পারলেও দ'মে যেতো না।

ইলিয়া চ'টে-ম'টে জাকবের প্রশ্নের জবাবে ব'লতো:

"কোথায় থাকে তা আমি জানি না এবং জানতেও চাই না। শুধু এইটুকু জানি যে আগুনে হাত দেওয়া উচিত নয়, তবে তার কাছাকাছি থাকা ভালো কারণ এতে দেহটা গরম থাকে। বাস্, এ-ছাড়া আমার আর-কিছু বলবার নেই।"

বিরক্ত হ'য়ে টিপ্পনী কাটতো জাকব:

"তাহ'লে আব কি, জানতে চাই না ব'ললেই বুঝি সব ল্যাঠা চুকে গেলো? আশ্চর্য। এ-রকম জবাব যে কোনো গবেটও দিতে পারে। কিন্তু ও-সব চলবে না, তোমায় ব'লতেই হবে আগুন আসে কোথেকে। আমি তো আর রুটির কথা জিজ্ঞেস ক'রছি না। সবাই জানে রুটি কি ক'রে তৈরি হয়। গম থেকে ময়দা, ময়দা থেকে নেচি—আর তারপরই রুটি।—কিন্তু মানুষ জন্মায় কি ক'রে?"

ঈর্ষায় এবং বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে ইলিয়া ওর বন্ধুর প্রকাণ্ড মাথাটার দিকে তাকাতো এবং জাকবের প্রশ্ন-বাণে বিপর্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাটক্যাট ক'রে ও নানান কথা শুনিয়ে দিতো জাকবকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, ওর বিশাল বলিষ্ঠ কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে, কোঁকড়া-চুলে ভর্তি মাথাটা নাড়তে নাড়তে, গোটা-গোটা ক'রে ব'লতো ইলিয়া:

"তুমি আমার সবকিছু গুলিয়ে দাও, মনটা যেন অশান্ত হ'য়ে ওঠে। ভারি

আজব ছেলে তুমি, বুঝলে? তোমার কোনো কাজকর্ম নেই কি না, তাই যতো উদ্ভট কথা গিশগিশ করে তোমার মাথায়। কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকাটা আবার কোনো কাজ না কি? আর, জীবনভোর তুমি ঐখানে, ঠিক একইভাবে লগার মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু আমার মতো তোমাকেও যদি দুটো পয়সার জন্যে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হ'তো, তাহ'লে এই সব আবোল-তাবোল না ব'কে সোজাসুজি বুঝতে চেষ্টা ক'রতে কি ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। এইজন্যেই তোমার মুণ্ডুটা অতো বড়ো, আর যতো রাজ্যের ছাইপাঁশ বোঝাই তাতে। বাজে কথার লম্বা বহর, কিন্তু কাজের কথা হয় ছোটো ছোটো; আর সেগুলোকে রাখবার জন্যে হাঁড়ির মতো একটা মাথারও দরকার হয় না।"

চেয়ারে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে, টেবিলের কোণটা চেপে ধ'রে জাকব মুখ ব'জে শুনতো ইলিয়ার কথাগুলো। মাঝে মাঝে ন'ড়ে উঠতো তার ঠোঁটদুখানা, পিটপিট ক'রতো চোখদুটো, কিন্তু রা কাটতো না তার মুখে। কথা শেষ ক'রে ইলিয়া যখন আবার চেয়ারে ব'সে প'ড়তো, তখন পুনরায় শুরু হ'তো জাকবের দার্শনিক কচকচি:

"শোনা যায় বিজ্ঞান নামে না-কি একটা বই আছে—তুক-তাকের বই,—তাতে 'কি', 'কেন', 'কেমন ক'রে' সবকিছুরই জবাব লেখা আছে। এই বই একখানা যদি পেতাম তাহ'লে প'ড়তাম। তুমি প'ড়তে না, ইলিয়া? মনে হয় এ-বই বড়ো ভীষণ, না?"

এই ধরণের কথা কাটাকাটি চ'লতে মাশা চেয়ার ছেড়ে উঠে তার বিছানায় এসে ব'সতো এবং সেখান থেকে তার কালো কালো, ডাগর চোখদুটো নামিয়ে একবার তাকাতো ইলিয়ার দিকে একবার তাকাতো জাকবের দিকে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে হাই তুলতে তুলতে, সামনে-পিছনে ঢুলতে ঢুলতে অবশেষে সে নেতিয়ে প'ড়তো তার বালিশের ওপর।

ইলিয়া ব'লতো: "এবার ওঠা যাক, ঘুমোবার সময় হ'লো।"

"যাচ্ছি, একটু সবুর করো, মাশার গায়ে চাদরটা দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।"

কিন্তু ইলিয়াকে দরজা খুলতে দেখে জাকব তাড়াতাড়ি, করুণভাবে ব'লে উঠতো :

"এই—একটু দাঁড়াও! আমার একা-একা ভয় ক'রছে—বড্ডো অন্ধকার।"

সংগে সংগে ঘৃণাভরে জবাব দিতো ইলিয়া লুনেফ :

"আচ্ছা জ্বালা দেখছি! ষোলো বছর বয়েস হ'লো তোমার, কিন্তু তুমি এখনো যেন কচি খোকাটি আছো। কৈ, আমার তো ভয় করে না কোনো কিছুতে? ভূতের সংগে মোলাকাত হ'লেও আমি ঘাবড়াতাম না! কিন্তু তুমি—"

ইলিয়া চ'লে গেলে জাকব শশব্যস্ত হ'য়ে খানিকটা ঘুরঘুর ক'রতো মাশার আশপাশে, তারপর তাড়াতাড়ি নিবিয়ে দিতো বাতিটা। শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হ'য়ে যেতো ঘরভর্তি নিঃশব্দ অন্ধকারে। মাঝে মাঝে একফালি নীল-জোছনা জানলা দিয়ে গ'লে এসে কাঁপতো মেঝের ওপর।

কি একটা পর্বের জন্যে ছুটি ছিলো সেদিন।'

ফ্যাকাশে মুখে, দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ি ফিরে এসে ইলিয়া লুনেফ পোষাক না বদলেই আছড়ে পড়ে বিছানার ওপর। রাগে তার বুকটা জ্ব'লে যেতে থাকে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটুকু পর্যন্ত যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায়, ঘাড়ের দপদপে ব্যথায় মাথাটা নাড়তে পারে না সে এবং মনে হয় অপমানে যন্ত্রণায় তার সর্বাংগ যেন টনটন ক'রছে।

ব্যাপারটা ঘ'টেছিলো সেদিন সকালে, একটা সার্কাসের তাঁবুর সামনে। ভিতরে তখন খেলা চলেছিলো। এক টুকরো সাবান এবং এক ডজন হুকের বিনিময়ে একটা জমাদার ওকে সার্কাসের প্রবেশ-পথের সামনে সওদা নিয়ে দাঁড়াতে দেওয়ায় ইলিয়া সেখানে সবেমাত্র বেশ জমিয়ে হাঁকছে, এমন সময় একটা সার্জেণ্ট এসে ওর ঘাড়ে মারলো এক রদ্দা, তারপর লাথি মেরে উলটে দিলো ঠেকনা জোড়া। ফলে বাক্শো-শুদ্ধ ওর জিনিষপত্র ছ'টকে প'ড়লো কাদায়: কতক নষ্ট হ'য়ে গেলো, কতক গেলো হারিয়ে! জিনিষগুলো কুড়োতে কুড়োতে ইলিয়া ব'ললো সার্জেণ্টটাকে:

"এটা অধর্ম ক'রলেন, হুজুর!"

গোঁফে তা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা ক'রলো সার্জেণ্টটা:

"কি—কি ব'ললি?"

"ব'লছি, এভাবে জিনিষপত্তর নষ্ট করার কোনো হক নেই আপনার।"

শান্তভাবে জবাব দিলো সার্জেণ্টটা:

"বটে? মিগুনফ্, একে থানায় নিয়ে যা!"

আর, সংগে সংগে যে-জমাদারটা ওকে সার্কাসের সামনে দাঁড়াতে দিয়েছিলো সে-ই আবার ওকে থানায় নিয়ে গেলো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ইলিয়াকে থাকতে হ'লো হাজতে। পুলিশের সংগে সংঘর্ষ এর আগেও ওর হ'য়েছে কয়েকবার, কিন্তু এতোটা রাগও ওর কখনো হয় নি, আর এতোটা অপমানিতও ও কখনো বোধ করে নি।

চোখ বুঁজে বিছানায় শুয়ে ইলিয়া কেবলই ভাবতে থাকে এই ঘটনাটার কথা, আর একটা যন্ত্রণাদায়ক ভারী বোঝায় টনটন ক'রতে থাকে ওর বুকটা। দেয়ালের ওপাশে হোটেলে তখন হুল্লোড় চ'লেছে পুরোদমে। মনে হ'লো পাহাড় থেকে কতকগুলো ঘোলা নদী যেন হুড়হুড় ক'রে নামছে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাকালে। লোহার ট্রেগুলোর শব্দ হয় ঝনঝন ক'রে, ঠুংঠুং ক'রে বাজতে থাকে কাপ-ডিশগুলো। কেউ ব'লে ওঠে 'ভদ্‌কা লাও', কেউ বলে 'আরে আমার চা কোথায়?' কেউ বলে 'বীয়ার কোথা, মেরী জান?' আর, খানসামাগুলো জবাব দেয় 'এক মিনিট, হুজুর। এখুনি আনছি।'

আর সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যায় কে একজন যেন চেঁচিয়ে, কাঁপা-গলায়, বিষণ্ণভাবে কাটা-কাটা-স্বরে গাইছে :

"ভাবি নি তো কাটবে আমার যৌবনের এই দিনগুলো
ঘোড়ার মতো ক্লান্তিতে—"

সংগে সংগে আর-একজন হট্টগোলের সাগর মথিত ক'রে চাপা গলায় মিষ্টি স্বরে জোগান দিলো :

"উঃ, কাটলো আমার যৌবনটা এমনি ক'রেই ক্লান্তিতে—"

তারপর কণ্ঠগুলো এক বিষণ্ণ-সুন্দর ঐকতানে মিশে গিয়ে, হৈ-হুল্লোড় ছাপিয়ে, ফেটে প'ড়লো কান্নায় :

"পেলাম না কো সোনাদানা, একটু সুখের ঠাঁই ;
কাটলো জীবন সঙ্গীবিহীন, দুঃখ নিয়ে যাই !"

কে একজন ভাঙা কাঁসির মতো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো :

"মিছে কথা ব'ললে মুখ খ'সে যাবে, সাবধান! শাস্তরে আছে : 'তুমি আমার কথা রেখেছো, তাই আমিও তোমায় প্রলোভন থেকে রক্ষা ক'রবো।' "

আর-একজন তখুনি চ'টে-ম'টে গোটা-গোটা ক'রে জবাব দিলো :

"মিছে কথা ব'লছো তুমি নিজেই। ঐ একই জায়গায় আবার বলা হ'য়েছে : 'তুমি ঠাণ্ডাও নও গরমও নও, ঠাণ্ডা-গরমের মাঝামাঝি, তাই

আমি তোমাকে আমার মুখ দিয়ে বের ক'রবো।' তাহ'লে? কি হে, এতে তোমার কোন্ লাভটা হ'লো শুনি?"

সংগে সংগে একটা অট্টহাস্য শোনা গেলো এবং একটু পরেই কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো চিলের মতো গলায়:

"আর তারপর, মাগীর চাঁদবদনে ঝেড়ে দিলাম এক মুহব্বতের ঘুষি! প্রথমে তার কানের ওপর, তারপর তার চোয়ালে: ধাঁই, ধাঁই, ধাঁই!"

"ওরে—শ্—শালা! হা-হা-হা-হা! তারপ-র্?"

"মাগী তখন ছটকে প'ড়লো মেঝেতে, আর তারপর আরও গোটা চারেক কষিয়ে দিলাম তার ছোট্টো, মিষ্টি মুখখানায়! ব'ললাম: লাগছে কেমন?—যে-মুখখানায় আমিই প্রথমে চুমু খেয়েছি, সেই মুখখানা আমিই থেঁতলে দেবো!"

সংগে সংগে কে একজন ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে ব'ললো:

"বাহবা, ধর্মাবতার বাহবা!"

"না, না, এটা আমার হক কি না বলো! মরদ হ'য়ে জন্মেছি যখন, একটা মাগীকে শা'স্তা ক'রবো না?"

"ভুলে গেছো এই কথাটা: 'যাকেই ভালোবাসি তাকেই আমি বকিঝকি, শা'স্তা করি?' কিংবা এই কথাটা: 'কারোর খুঁত ধ'রো না, তাহ'লে সে-ও তোমার খুঁত ধ'রবে না।' আর, তাছাড়া রাজা ডেভিডের কথাগুলোও কি মনে নেই?"

ইলিয়া অনেকক্ষণ ধ'রে এইসব কথাবার্তা, গান আর হাসি শুনলো; কিন্তু এগুলো ওর মনে এতোটুকুও দাগ কাটতে পারলো না। কেবল অন্ধকারে ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগলো সেই সার্জেণ্টটার শীর্ণ মুখখানা—তার আঁকশির মতো নাকটা, চকচকে সবুজ চোখদুটো, আর তার একজোড়া লাল গালপাট্টা। দাঁতে দাঁত চেপে রাগে ফুলতে ফুলতে ও যেন তাকিয়ে রইলো সেই মুখখানারই দিকে। এদিকে দেয়ালের ওধারে গানের শব্দটা ক্রমেই জোরালো হ'তে থাকে, গায়করা যেন আরো তেতে ওঠে, মেতে যায়। ধীরে ধীরে সেই গানের বুকফাটা করুণ শব্দগুলো ইলিয়ার হিমীভূত, ক্রুদ্ধ, অভিমানী মর্মটিকে স্পর্শ ক'রলো। চড়া গলায় যে গাইছিলো সে গাইলো:

"হন্যে হ'য়ে ঘুরে মরি—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি যোগান দিলো :

"দিকে দিকে চারিদিকে—"

তারপর দুটো গলা মিশে গিয়ে ফেটে প'ড়লো কান্নার সুরে :

"গোটা সাইবেরিয়ায়—
খুঁজে ফিরি পথ, যে-পথ মিশেছে গিয়ে
আমারই গাঁয়ের পথে—
কোথা, কোথা সেই পথ ?"

আকুল হ'য়ে ইলিয়া শুনতে লাগলো এই বিষণ্ণ গান। হোটেলের একটানা হট্টগোলের মধ্যে ওর মনে হ'লো এ তো শুধু গান নয়, এ যেন মেঘাবৃত আকাশে আকস্মিক এক ঝাঁক তারা—উজ্জ্বল একঝাঁক তারা! মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলোকে কখনো দেখা যায় আবার কখনো দেখা যায় না :

"মাগো, পেটের জ্বালায় চিবিয়ে ফেলেছি জিভ,
কনকনে শীতে টনটন করে হাড়।"

এইভাবে গানের রেশটা বেহালার তারের মতো কাঁপতে থাকে।

কে একজন সমবেদনার সুরে ব'লে উঠলো :

"থেমো না দোস্ত, চালিয়ে যাও। আহা কোকিল যেন—"

শুনতে শুনতে ইলিয়া ভাবে, যারা এখন এমন সুন্দর ও মর্মস্পর্শী গলায় গান গাইছে, তারাই কিছুক্ষণ পরে মাতাল হ'য়ে হয়তো ধস্তাধস্তি শুরু ক'রে দেবে। মানুষের মধ্যে ভালোটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

চড়া গলা যার, সেই গায়কটি আবার গাইলো :

"ওগো, আমার কপালখানা পোড়া,"

সংগে সংগে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর্তনাদের সুরে জোগান দিলো :

"ভাগ্য যেন লোহার হাতকড়ি!"

এই সময় ইলিয়ার মনে প'ড়ে গেলো জেরেমিয়া-ঠাকুর্দাকে। গলদশ্রুলোচন বুড়ো জেরেমিয়া তার মাথাটা নেড়ে ব'লতো :

"জীবনভোর খুঁজলাম, কিন্তু সত্যের দেখা পেলাম না।"

সংগে সংগে ইলিয়ার এটাও মনে হ'লো যে জেরেমিয়া-ঠাকুর্দা ভগবানকে ভালোবাসলেও চুপিচুপি টাকাও জমাতো; আর তেরেন্স-কাকা ভগবানকে ভয় ক'রলেও টাকা চুরি ক'রতেও ছাড়েনি; প্রত্যেকেরই যেন তুটো ক'রে স্বভাব আছে: একবার ভালোর দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর একবার মন্দের দিকে। ভালো-মন্দের এই দাঁড়িপাল্লা যেন সকলেরই বুকে আছে, আর হৃদয়টা হ'লো সেই দাঁড়িপাল্লার কাঁটা!

ইলিয়া এই সব ভাবছে এমন সময় হোটেলে 'গেলো, গেলো, গেলো' ব'লে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো। সংগে সংগে ধপাস্ ক'রে একটা পতনের শব্দ হ'লো, আর সেই মুহূর্তে ইলিয়ার খাটখানা কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে।

"আঃ, থামো। কি হ'চ্ছে এসব?"

"ছাডিয়ে নাও না ওকে, দেঁড়িয়ে দেঁডিয়ে দেখছো কি?"

"বাঁচাও, বাঁচাও।"

তারপর সোরগোলটা হঠাৎ আরও ফেঁপে উঠলো—এক সংগে বহু লোকের চীৎকারে। ধুপ-ধাপ, দুম-দাম, দাঁতখিঁচুনি, আর্তনাদ—সবশুদ্ধ মিলিয়ে এমন একটা শব্দের সৃষ্টি হ'লো যেন এক পাল ক্ষুধার্ত কুকুর নিজেদের মধ্যে খেয়ো-খেয়ি ক'রে মরছে। ঐ বিকট চীৎকারের মধ্যে আলাদা ক'রে কারোর গলা চেনবার উপায় রইলো না।

সোরগোলটা শুনে মনে মনে খুব খুশি হ'লো ইলিয়া, কারণ ও যা ভেবেছিলো ঠিক তাই-ই ঘ'টেছে; ফলে, লোকজন সম্বন্ধে ওর যে ধারণাটা ছিলো তা আরও বদ্ধমূল হ'লো।

মাথার নিচে হাত তুটো জড়ো ক'রে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ইলিয়া আবার চিন্তায় ডুবে গেলো:

"মনে হয় আস্তিপ-ঠাকুর্দা খুব বড়োরকমের একটা পাপ ক'রেছিলো, তাই একনাগাড়ে আটটি বছর মুখ বুঁজে তাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'লো ক্ষমা লাভের আশায়। তারপর লোকজন তাকে ক্ষমাও ক'রলো, আবার পুণ্যবান ব'লে শ্রদ্ধাও জানালো। কিন্তু তারা আস্তিপ-সন্ন্যাসীর ছেলে তুটোকে গোল্লায় দিয়েছে; একটাকে তারা পাঠালো সাইবেরিয়ায়, আর অন্যটাকে তাড়ালো তাদের গাঁ থেকে।"

মাছের কারবারী স্ত্রোগানফের গুরুগম্ভীর কথাগুলো মনে প'ড়লো ইলিয়ার:

"বিশেষ ক'রে এই ব্যাপারটা আরও ভালো ক'রে বোঝা দরকার। দশ-জনের মধ্যে যদি একজন সৎ আর ন'জন হয় রাস্কেল, তা'হলে জেতে না কেউই, কিন্তু সৎ লোকটা নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। মনে রেখো বেশির ভাগ লোক যা ব'লবে তা-ই ঠিক।"

মুখ টিপে হেসে মনে মনে ব'ললো ইলিয়া: তুনিয়ায় কেউ ভালো নয়। সংগে সংগে রাগে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠলো ওর মনটা। আর এই সময় ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো আরও কয়েকটা দৃশ্য: নোংরা উঠানটার মাঝ-খানে শুয়ে বিশালবপু, কদাকার মাতিৎসা গোঁঙাচ্ছে:

"মা-মা গো! তুই এখন কোতায় মা রে। এসে একবার দেখে যা তোর মেয়ের কি দশা হ'য়েছে।"

আর মাতাল পের্ফিশ্‌কা তার সামনে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে ব'লছে:

"শালী এন্তার গিলেছে দেখছি।"

আর এদিকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে নাতুসহুতুস, পেত্রুহা হাসছে ঘৃণাভরে।—

দৃশ্যটা মনে প'ড়তেই ইলিয়া আরও রেগে গেলো এবং সেই সংগে ওর মনটাও হ'যে উঠলো আরও কঠিন।

খানিক পরে হোটেলের সেই ঝগড়াটা শেষ হ'য়ে যায়। আর, তুজন নারী আর একজন পুরুষ মিলে আবার একটা গান ধরবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে-গান আর জমে না। কে একজন আনাড়ির মতো খানিকক্ষণ ব্যাঞ্জো বাজিয়েও থেমে যায়।

এমন সময় ইলিয়া শুনতে পেলো দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে তুজন লোক ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চাপা গলায় কথাবার্তা ব'লছে। রাগে টং হ'য়ে ইলিয়া শুনতে লাগলো সেই কথাবার্তা।

"সারাজীবন ধ'রে খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায়, কিন্তু তাতে লাভ হয় না কিছুই। কম বেশি সকলেই যে যার সুখে আছে, আর আমরা? আমরা যেন দিনরাত বুকে হাঁটছি, সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার ক্যামতাটুকু পর্যন্ত যেন আমাদের নেই!"

"তা—তা বটে।"

"আর ঘোড়ার মতো হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটি ; দু'দণ্ড যে চোখ মেলে কিছু দেখবো তারও কি জো আছে ? কেবল এইটুকু বুঝি সৎ পথে থাকলে বাড়িও হবে না গাড়িও হবে না, আর একদিন হয় তো বেমালুম কড়িকাঠ চাপা প'ড়েই মারা যাবো !"

"পোড়া কপাল ! এর কি শেষ নেই ?"

"তাছাড়া অসৎ পথে যাবার মতো সাহস বা বুদ্ধিও নেই সকলের। ফলে যা হ'চ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছো : বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা !"

"হায় ভগবান, হায় ভগবান !"

নিজের অজান্তে ইলিযাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। এমন সময় শোনা গেলো হোটেলের হট্টগোল ছাপিয়ে পের্ফিশ্কা চডা গলায় সুর ক'রে ব'লছে :

"ওগো পেয়ালা-সুন্দরী, মদ ঢালো, আরও মদ ; মনিবের তবিল নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি। মদ খাবো আর মাগীদের ভালোবাসবো, যতক্ষণ না ভিখিরি ব'নে যাই। ভিখিরির আবার গলার দড়ির জন্যে ভাবনা কি ? সকলেই যদি এক গাছা ক'রে সুতো দেয় তাহ'লেই ফাঁস তৈরি হ'য়ে যাবে ! আর সুতোর ফাঁসটাকে যদিও বা এড়ানো যায়, দড়ির মতো পেশীগুলো তো রয়েছেই, তাই দিয়েই তখন ফাঁসের কাজ চ'লবে !"

সংগে সংগে একটা হাসির গর্‌রা উঠলো—খোসমেজাজী বাহবার হাসি !

আর তার একটু পরেই শোনা গেলো দেয়ালের ওধারে সেই লোক দুটো আবার চাপা গলায় কথাবার্তা শুরু ক'রেছে :

"সেই ছেলেবেলা থেকে বেদম খাটছি। দেখতে দেখতে বয়েস হ'লো চল্লিশ। কিন্তু এখনো এমন সঙ্গতি হ'লো না আমার যে পেট ভ'রে দুবেলা দুখানা রুটি খাই ! ঝামেলা লেগেই আছে ফি-রোজ, কিন্তু বাঁধাকপির ঝোলটুকু জোটে না সব দিন। বাড়িতে শান্তি নেই, সব যেন নিঝুম মেরে থাকে। ছেলেপুলেগুলো কাঁদে, ঘ্যানঘ্যান করে, বউটা খিটখিট করে হামেশাই। চোখ দুটো যদি একবার বুঁজতে পারতাম !—এই তো জীবনের হাল। সইতে সইতে যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, তখন একদিন চুটিয়ে ফূর্তি ক'রে ফেলি। আর তারপর ? তারপর বাড়িতে এসে দেখি সংসারের হাল আরো

সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। ফ‍ূর্তিই করো :আর দুঃখ ভোলবার জন্তে মদই গেলো, দারিদ্র্যকে ফাঁকি দেবে কি ক'রে? লেড়িকুত্তার মতো সে যেন সব সময়ই দাঁত খিঁচিয়ে আছে!"

"তা সত্যি!"

"তখন মানুষ বে-কায়দায় প'ড়ে প্রার্থনা করে: 'হে ভগবান, হে করুণাময় ঈশ্বর আমার বরাতে এতো খোয়ার কেন? কি ক'রেছি আমি?' —কিন্তু আমার ধারণা ভগবান তাতে কানও দেন না।"

"হ্যাঁ, আমারও ধারণা তাই।"

এইভাবে একজন হতাশভাবে ফাঁপা-গলায় কাঁদুনি গাইতে থাকে, আর অপরজন আরও হতাশ হ'য়ে একঘেয়েভাবে তার জবাব দিতে থাকে। শুনতে শুনতে যাতনায় অস্থির হ'য়ে উঠলো ইলিয়া। বিছানায় শুয়ে ছটফট ক'রতে ক'রতে ইচ্ছে ক'রেই সে দেয়ালে মারলো কনুইয়ের এক ধাক্কা। আর সংগে সংগে কথাবার্তাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু দুঃখে অশান্তিতে মনটা বেজায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠায় ইলিয়া বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলো না। উঠানে চ'লে এসে ইঁটের ধাপির ওপর দাঁড়িয়ে ও ভাবলো কোথাও যদি চ'লে যেতে পারতো! কিন্তু যাবে কোন্ চুলোয়, যাবার কি জায়গা আছে?

রাত বাড়তে থাকে। মাশা ঘুমিয়ে প'ড়েছে। মাথার যন্ত্রণার দরুণ জাকব শুয়েছে নিজের ঘরে। ইলিয়া সেখানে গেলো না, কারণ ওকে দেখলেই পেত্রুহা রাগে ভ্রূকুটি ক'রতো। শরতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। উঠানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশটাও দেখা যাচ্ছে না। বা'রমহলের খুপরিগুলো কালো কালো ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। স্যাঁতসেতে বাতাসে ভাসছে কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ—জীবনের বিরুদ্ধে মানুষ যেভাবে ফিশফিশ ক'রে নালিশ জানায় ঠিক সেই রকমের অস্ফুট শব্দ। মাঝে মাঝে হাততালির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, আর সেই সংগে শোনা যায় অদ্ভুত একটা খস্‌খসানি।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপট লাগলো ইলিয়ার মুখে; শিরশিরিয়ে উঠলো ওর ঘাড়টা। হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগলেও ঘরে ফিরে না গিয়ে ইলিয়া সেইখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো এ-ভাবে বাঁচা অসম্ভব; এই নোংরামি আর

তাড়াহুড়োর মধ্যে থেকে দূরে স'রে গিয়ে নির্জনে নিশ্চিন্তভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ওকে বাঁচতেই হবে।

এমন সময় হঠাৎ কে যেন ফাঁপা-গলায় জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো :

"ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?"

"আমি। তুমি কে ?"

"আমি—মাতিৎসা।"

"কিন্তু তুমি কোথায় ?"

"এই-যে এখানে তক্তার ওপর ব'সে আছি।"

"কেন ?"

"এমনি।"

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে মাতিৎসার গলা ভেসে এলো :

"আজ কোন্ বার ?"

"শনিবার।"

"ঠিক এমনি এক শনিবারে আমার মা মারা গিয়েছিলো।"

কিছু না ব'ললে অশোভন হবে, তাই ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তোমার মা কি খুব বেশি দিন হ'লো মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, প্রায় পনেরো বছর আগে, কি তারও বেশি। তোমার মা বেঁচে আছেন ?"

"না, আমার মা-ও মারা গেছেন।—তাহ'লে তোমার বয়স কতো ?"

খানিক নীরব থেকে, তারপর একটা শিস্ দিয়ে ব'ললো মাতিৎসা :

"প্রায় তিরিশ। হ'লে হবে কি, বুড়িয়ে গেছি। এদিকে আবার বাঁ পা-টারও দফারফা হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে তরমুজের মতো ফুলে ওঠে আর কটকট ঝনঝন করে। কতো রকমের মলম দিয়েই তো মালিশ করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না।"

"তোমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত।"

"কিন্তু অতো দূরে যাবো কি ক'রে ?"

"গাড়ি ক'রে চ'লে যাও।"

"পয়সা নেই।"

কে একজন হোটেলের দরজাটা খুলতেই এক ঝলক হট্টগোল ফেটে প'ড়লো উঠানের মধ্যে, তারপর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

মাতিৎসা জিজ্ঞাসা ক'রলো: "এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?"

"এমনি। ভালো লাগছে না, তাই।"

"আমারও সেই দশা; ঘরখানাকে যেন শ্মশান মনে হয়।"

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাতিৎসা আবার ব'ললো:

"চলো আমার ঘরে যাই।"

আনমনে জবাব দিলো ইলিয়া: "তাই চলো।"

তারপর ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে—মাতিৎসা আগে আগে আর ইলিয়া তার পিছনে। ওঠবার সময় মাতিৎসা তার ডান পা-টা আগে তোলে, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে তোলে বাঁ পা-টা। ইলিয়াও উঠতে থাকে ধীরে ধীরে, আর ওর মনে হয় পায়ের ব্যাথায় মাতিৎসার যেমন উঠতে কষ্ট হচ্ছে তেমনি ওর পা দুটোও যেন উঠছে না একটা পাথুরে ক্লান্তিতে।

মাতিৎসার চিলেঘরখানা সরু গলির মতো, কড়িকাঠটা যেন শবাধারের ঢাক্না। ঘরে বিশেষ কিছুই নেই। দরজার ধারে একটা উনুন, উনুনের পাশে দেয়াল ঘেঁষে একখানা চওড়া তক্তপোশ, তার লাগাও একখানা টেবিল, আর টেবিলের দুধারে দুখানা চেয়ার। চেয়ার অবশ্য আরও একখানা আছে—সেই জানলার ধারে; অন্ধকারে সেটা ঠিক ঠাওর হয় না। ছাদের ওপর বাতাসের শব্দটা আরও জোরালো মনে হ'লো;—যেন হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাতাসটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ইলিয়া ব'সলো জানলার ধারের চেয়ারখানাতেই। তারপর এদিক-উদিক চাইতেই ওর চোখে প'ড়লো দেয়ালের এক কোণে একটা ছোট্টো ছবি ঝোলানো রয়েছে। ছবিখানা দেখিয়ে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো মাতিৎসাকে:

"ওটা কার ছবি?"

সসম্ভ্রমে, আস্তে আস্তে জবাব দিলো মাতিৎসা:

"সেণ্ট আন্-এর।"

"আর, তোমার নাম কি?"

"ঐ আন্-ই। কেন, তুমি জানতে না?"

"না।"

বিছানার ওপর ঝুপ ক'রে ব'সে প'ড়ে মাতিৎসা ব'ললো:

"কেউই জানে না।"

ইলিয়া স্ত্রীলোকটার দিকে দেখলো দু একবার, কিন্তু কথা ব'লতে ইচ্ছা হ'লো না ওর। এদিকে মাতিৎসাও নীরব। এইভাবে চুপচাপ দুজনে ব'সে রইলো খানিকক্ষণ—অন্ততপক্ষে মিনিট তিনেক—অন্যমনস্কভাবে। অবশেষে মাতিৎসা জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তারপর, এখন আমরা কি ক'রবো?"

বিব্রতভাবে ইলিয়া জবাব দিলো: "জানি না।"

মুচকি হেসে ঠাট্টার সুরে ব'ললো মাতিৎসা:

"সে তো নিশ্চয়ই, জানবে কি ক'রে।"

"বুঝলাম। তারপর?"

"আমাকে কিছু খাওয়াও। এক পাঁট মদ কিনে আনো। না, না, কিছু খাবারই কিনে আনো বরং। আর কিছু নয়, শুধু এক ঠোঙা খাবার।"

মাতিৎসার গলাটা ভেঙে যায়। কাশতে কাশতে অপরাধীর মতো ব'লতে থাকে সে:

"বুঝলে, পায়ে চোট লাগার পর থেকে অথর্ব হ'য়ে পড়েছি। তাই কোথাও বেরুতেও পারি না। তাছাড়া, পুঁজিও ফুরিয়ে গেছে। আজ পাঁচদিন হ'লো ঘরে ব'সে আছি। ধরতে গেলে কাল কিছুই খাই নি—এক টুকরো বাসি রুটি ছাড়া, আর আজ তো তাও জুটলো না—মাইরি, ভগবানের দিব্যি!"

কিন্তু ইলিয়ার মনে প'ড়ে গেলো মাতিৎসা 'খারাপ' জীবন যাপন ক'রতো। স্ত্রীলোকটার তোলো-হাঁড়ির মতো মুখখানার দিকে চেয়ে ও দেখলো তার কালো-কালো চোখ দুটো চিকচিক ক'রছে, আর ঠোঁট দুখানা নড়ছে থেকে থেকে, মনে হ'লো মাতিৎসা যেন হাওয়ায় কিছু চুষছে। আশঙ্কায় এবং অস্বস্তিতে ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলো ইলিয়া।

"একটু ব'সো, আমি চট ক'রে কিছু খাবার নিয়ে আসছি। খানিকটা বীয়ারও আনবো।"

এই ব'লে ইলিয়া তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে তরতর ক'রে নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে হোটেলের দরজার মুখে; একবার ভাবে চিলেঘরে ফিরে গিয়ে আর কাজ নেই, কিন্তু চিন্তাটা মনের অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্ব'লে উঠেই নিবে যায়। তখন ও রান্নাঘরে গিয়ে বাবুর্চীর কাছ থেকে স্রেফ দশটি পয়সায় রুটি মাংস এবং কর্মতি-পড়তি আরও দু একটা খাবার কিনে ফেলে; তারপর চটচটে কাগজে-মোড়া খাবারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে এবার মদটা জোগাড় করা যায় কিভাবে; নিজে কিনতে গেলেই তেরেন্স জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সবেঃ "কে খাবে রে?" তাই ও ভাঁড়ারের লোকটাকে পাঠায় মদ কেনবার জন্যে। লোকটা দৌড়ে গিয়ে দু পাঁট মদ কিনে আনে, তারপর বোতল দুটো ইলিয়ার হাতে নিঃশব্দে গুঁজে দিয়ে রান্নাঘরের দরজার হাতলটা ধ'রে দাঁড়ায়।

ইলিয়া ব'ললোঃ "যেও না, শোনো, এটা আমার জন্যে নয়। আমার এক বন্ধু এসেছে, সে-ই খাবে।"

ভাঁড়ারের লোকটা জিজ্ঞাসা ক'রলোঃ "কি ব'লছো?"

"ব'লছি, আমার এক বন্ধু এসেছে, তারই জন্যে মদ নিয়ে যাচ্ছি।"

"যাচ্ছলে—তাতে আমার কি?"

ইলিয়া বুঝলো মিছে কথাটা না ব'ললেও চ'লতো; তাই অস্বস্তিতে ওর মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। চোরের মতো পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার সময় ওর কেবলই ভয় ক'রতে লাগলো পাছে কেউ টের পেয়ে ওকে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলে। কিন্তু সিঁড়িটা নির্জন, নিস্তব্ধ চারিধার, শব্দের মধ্যে কেবল বাতাসের একটানা গোঙানি। তাই ইলিয়া নিরাপদেই ছাদে এসে পৌছলো। তারপর, ঘরে ঢোকবার সময় মাতিৎসার জন্য কামনায় ওর দেহটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। সে-কামনাটুকু যতো ভীরুই হ'ক না কেন, ইলিয়া নিজের কাছে নিজে ধরা প'ড়লো ঠিকই।

চটচটে ঠোঙাটাকে কোলের ওপর নিয়ে মাতিৎসা নিঃশব্দে পাঁশুটে খাবারগুলো টেনে টেনে বের ক'রতে লাগলো, তারপর এক একটা ক'রে

খাবারের টুকরোগুলো মুখে ফেলে চিবোতে লাগলো সশব্দে। তার দাঁত-গুলো যেমন বড়ো তেমনি ধারালো, মুখের হাঁ টাও কোলা ব্যাঙের মতো। মুখে ফেলবার আগে প্রত্যেকটি টুকরোকে সে এমনভাবে ধীরেসুস্থে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো যেন সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারটুকুর সন্ধান ক'রছে সে।

মাতিৎসার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ইলিয়া ভাবতে থাকে স্ত্রীলোকটাকে জাপ্‌টে ধ'রে চুমু খেলে কেমন হয়, কিন্তু ওর ভয় হ'লো পাছে আনাড়ির মতো কিছু ক'রে ফেলে। তাহ'লে মাতিৎসা নিশ্চয়ই ওর মুখের ওপর খিলখিল ক'রে হেসে উঠবে। এ কথাটা ভাবতেই ওর গায়ের উত্তাপ ক'মে আসে। এদিকে বাতাসের ঝাপ্‌টায় জানলা-কপাট থেকে থেকে কেঁপে উঠতে থাকে, আর কপাটটা ন'ড়ে উঠলেই ইলিয়ার মনে হয় এই বুঝি কেউ ঘরে ঢুকে দেখে ফেললো ও এখানে ব'সে আছে।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো : "দরজাটা দিয়ে দেবো ?"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে সায় দিলো মাতিৎসা, তারপর ঠোঙাটাকে উনুনের পাশে রেখে, সেণ্ট আন্‌-এর ছবিখানার সামনে মাথা নুইয়ে ব'ললো :

"যাক্, ভগবানের দয়ায় মাগীর পেটটা তবু ভ'রলো। মানুষের চাহিদা কতো সামান্য, তাই না ?"

ইলিয়া চুপ ক'রে থাকে।

ওর দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্ত্রীলোকটা আবার ব'ললো :

"যার নোলা যতো বেশি তার কাছ থেকে চাওয়াও হয় ততো বেশি।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো : "কে চাইবে ততো বেশি ?"

"কেন, ভগবান।—এটা জানো না ?"

ইলিয়া এর কোনো জবাব দিলো না, কিন্তু মাতিৎসার মুখে ভগবানের নাম শুনে ও এমন আঁৎকে উঠলো যে স্ত্রীলোকটাকে জাপটে ধরার সকল বাসনাই উবে গেলো সংগে সংগে।

তক্তপোশে ভর দিয়ে তার ভারী গতরটাকে বিছানায় তুলে, দেয়াল ঘেঁষে জবুথবু হ'য়ে ব'সে আনমনে ব'লতে লাগলো মাতিৎসা :

"খেতে খেতে পের্ফিশ্‌কার মেয়েটার কথাই শুধু ভাবছিলাম। কেবল আজ নয় বহুদিন ধ'রেই ওর কথা ভাবছি। মেয়েটা তোমার সংগেও

শোয়, জাকবের সংগেও শোয়; কিন্তু এতে ওর এতোটুকুও ভালো হবে না। তোমরা অকালেই ওকে নষ্ট ক'রে দেবে, তারপর আমার যে-দশা হ'য়েছে ওরও ঠিক সেই দশাই হবে। আমি যে-পথে আছি, সে-পথ নোংরাও বটে, দুঃখেরও বটে। এ-পথে মাগী আর ছুঁড়িরা সোজা হ'য়ে হাঁটে না, হাঁটে পোকার মতো বুকে ভর দিয়ে।"

ক্ষণিকের জন্য চুপচাপ থাকে মাতিৎসা। তারপর কোলের ওপর ছড়ানো হাতদুখানার দিকে চেয়ে আবার ব'লতে থাকে :

"কিছুদিন বাদেই মেয়েটা ডাগর হ'য়ে উঠবে। আমার জানা-শোনা যে-কটা বাবুর্চী আর মাগী আছে তাদের বল'লাম যদি তারা ওর একটা চাকরির খোঁজ দিতে পারে, কিন্তু তারা সবাই ব'ললো চাকরি নেই। তাদের এক কথা: 'ছুঁড়িটাকে বেচে দে'। ওর পক্ষে এটা অবিশ্যি মন্দের ভালো, কারণ টাকা পয়সাও পাবে, মাথা গোঁজবার একটা মানানসই ঠাঁইও পাবে, আর ভালো ক'রে সাজগোজও ক'রতে পারবে। কারো কারো বরাত যে এভাবে না খুলেছে তা নয়। মাঝে মাঝে কোনো পয়সাওলা লোক যখন অশক্ত হ'য়ে পড়ে, রোগে জেরবার হ'য়ে যায়, আর মাগীরা যখন মিনি-মাগ্‌নায় তাকে ভালোবাসতে নারাজ হয়, তখন এই পোকা-খেকো মিন্‌সে কোনো ছুঁড়িকে কেনে, আর কিনে তার সর্বনাশ করে। হয়তো এতে ছুঁড়িটার ভালোই হয়, তবে গোড়ায় গোড়ায় বড়ো খারাপ লাগে। যাই হ'ক, এ-পথে না যাওয়াই ভালো। না খেতে পাও না খাবে, তবু খাঁটি থাকলে একটা কূল তো বজায় থাকবে; কিন্তু—"

এই ব'লে মাতিৎসা এমনভাবে কাশতে লাগলো যেন তার গলায় কোনো কথা আটকে গেছে। যাই হ'ক, হাঁপাতে হাঁপাতে অন্যমনস্কভাবে বাকি কথাটুকুও শেষ ক'রলো সে :

"কিন্তু আমার মতো যারা নষ্টও হয় অথচ খেতেও পায় না, তাদের এ-কূল ও-কূল দুকূলেই জলাঞ্জলি।"

এমন সময় বাতাসের ঝাপ্‌টায় থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো চিলেঘরের দরজাটা। ছাদের ওপর বৃষ্টি প'ড়তে লাগলো পতপত শব্দে, আর সেই সংগে শোনা গেলো জানলার বাইরে একটা করুণ শব্দ হাহাকার ক'রে ফিরছে।

মাত্তিৎসা ব'কছে তখনও।

তার গলার আওয়াজটা একঘেয়ে, অনাসক্ত। ভারী গতরটা নিশ্চল, অসাড়। দেখে শুনে দমে গেলো ইলিয়া। স্ত্রীলোকটার কাছ থেকে এতোটুকুও উৎসাহ বা সাড়া না পেয়ে তার কামনাটুকু মিইয়ে যেতে লাগলো। মনে হ'লো মাত্তিৎসা যেন ইচ্ছে ক'রেই ওকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এটা লক্ষ্য ক'রে ইলিয়া চটে গেলো স্ত্রীলোকটার ওপর।

আল্‌তো ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাত্তিৎসা ব'লে উঠলো :

"ভগবান, হায় ভগবান। উঃ, মাগো।"

ক্রুদ্ধভাবে চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে ইলিয়া ক্যাটকেটে গলায় ব'ললো :

"এদিকে ব'লছো বটে তুমি নষ্ট মেয়েমানুষ, কিন্তু ভগবানের নাম তোমার মুখে লেগেই আছে। তুমি কি ভাবো ভগবান বোকা?"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে মাত্তিৎসা চুপচাপ মাথা হেঁট ক'রে ব'সে র'ইলো। তারপর ব'ললো ধীরে ধীরে :

"কি ব'লছো বুঝতে পারছি না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"বোঝাবুঝির কিছু নেই। তোমরা সবাই এক গোয়ালের গরু। সারাটা জীবন নষ্টামি ক'রে বেড়াবে, তারপর শেষটায় ভগবানকে ডাকবে। ভগবানকে যদি ডাকতেই চাও, তাহ'লে নষ্টামি ক'রো না।"

যাতনায় অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো মাত্তিৎসা :

"আঃ, কি ব'লছো তুমি?—পাপী ছাড়া ভগবানকে ডাকবেই বা কে? তুমিই বলো, ডাকবে?"

ইলিয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা হ'লো এই স্ত্রীলোকটাকে এবং সেই সংগে মানুষ-জাতটাকে অপমান করে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে ব'ললো :

"তা আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে তোমাদের মতো লোকের মুখে ভগবানের নাম শোভা পায় না—কক্ষণো শোভা পায় না। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে তোমরা ভগবানের নামের পিছনে লুকোও। তুমি কি ভেবেছো এই সোজা কথাটা আমি বুঝি না? আমাকে কি বাচ্চা ঠাওরেছো? সকলেই প্যানপ্যান ক'রে নালিশ জানায়, কিন্তু সেই সংগে এ ওর ক্ষতি

ক'রতেও ছাড়ে না। ঠকাবে, চুরি ক'রবে, একটা আধলার লোভে নোলা দিয়ে এক কলসী জল ঝরাবে, তারপর পাপ ক'রে লুকোবে গিয়ে কোণটিতে; আর ব'লবে, 'হে ভগবান, দয়া করো!' আহা, যেন মাছটি উল্‌টে খেতে জানো না। যাও যাও, এরকম অনেক জোচ্চোর আর শয়তান আমি দেখেছি! এরা মানুষকেও ঠকায় ভগবানকেও ঠকায়, কিন্তু তবুও—"

ইলিয়ার কথাগুলো শুনে মাতিৎসা একেবারে তাজ্জব ব'নে যায়; তার মুখে যেন কথা সরে না। গলা বাড়িয়ে, চোখদুটো ছানাবড়া ক'রে, বোকার মতো সে চেয়ে থাকে ইলিয়ার দিকে।

ইলিয়া আর কোনো কথা না ব'লে ছিট্‌কিনিটা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। সংগে সংগে ধড়াস্ ক'রে ওঠে কপাটখানা। ইলিয়া জানে মাতিৎসাকে সে অপমান ক'রেছে, কিন্তু তাতে খুশিই হয় সে। ভাবে: যাক বাঁচা গেলো, বুকের বোঝাটাও নামলো, আর মাথাটাও সাফ হ'লো। রেগে টং হ'য়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইলিয়া ফোঁস-ফোঁস ক'রে নিশ্বাস নিতে থাকে, আর অনর্গল অভিশাপও দেয় গোটা দুনিয়াটাকে। চাপা-গর্জনের সংগে ওর মুখ থেকে বেরুতে থাকে অপমানের ছিটেগুলি। মুখ দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি অপমানের কথা বেরুচ্ছে ব'লে এতোটুকুও ক্ষুব্ধ হয় না সে, বরং ভাবে, কথাগুলো আগুন হ'য়ে তার মনের অন্ধকার দূর ক'রছে এবং তাকে এমন একটা পথের সন্ধান দিচ্ছে যা সকলের থেকে আলাদা। তাছাড়া এই অপমানকর কথাগুলো সে তো কেবল মাতিৎসাকেই ব'লছে না, ব'লছে তেরেন্স-কাকা, পেত্রুহা, স্ত্রোগানফ্—দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষকেই।

উঠানে এসে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো:

"বেশ হ'য়েছে। তোদের সংগে আবার ভালো মুখে কথা কইবো কি রে? যত্তো ছোটোলোক, জোচ্চোর—"

নিষ্ঠুর অট্টহাসির মতো শব্দ ক'রতে ক'রতে বাতাসটা উঠানময় নেচে বেড়াতে থাকে।

১২

মাতিৎসার সংগে দেখা করার পর থেকেই ইলিয়া ঘনঘন নারীসঙ্গ ক'রতে লাগলো। হাতেখড়ি হ'লো এইভাবে: একদিন ও বাড়ি ফিরছে এমন সময় একটা স্ত্রীলোক ওর কাছে এসে ব'ললো:

"কি নাগর, এসবে না কি?"

ইলিয়া স্ত্রীলোকটার দিকে একবার তাকালো, তারপর মুখ বুঁজে মাথা হেঁট ক'রে হাঁটতে লাগলো তার পাশাপাশি। কিন্তু হাঁটবার সময় ওর চোখদুটো রইলো সজাগ, পাছে চেনাশোনা কারোর সংগে দেখা হ'য়ে যায়। খানিকটা দূর গিয়েই স্ত্রীলোকটা ব'ললো:

"পুরো একটি টাকা প'ড়বে কিন্তুক!"

ইলিয়া জবাব দিলো: "আচ্ছা, আচ্ছা! তাড়াতাড়ি চলো।"

স্ত্রীলোকটার বাড়ি পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে একটি কথাও হ'লো না দুজনের মধ্যে। তারপর—যা হবার হ'লো।

মাগীগুলোর পিছনে ক্রমাগত হুড়হুড় ক'রে টাকা খরচ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ইলিয়া শেষটায় ভেবে ঠিক ক'রলো, তার যে ব্যবসা তাতে সময়-স্বাস্থ্য দুইই নষ্ট হ'চ্ছে, আর এ-ভাবে চ'লতে থাকলে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জীবন যাপনের স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। সে একবার ভাবলো অন্যান্য ফেরিওলাদের মতো সেও লটারির ব্যবসা ফেঁদে খদ্দের ঠকাবে; কিন্তু ভেবেচিন্তে আবার ঠিক ক'রলো যে এ-ফন্দি সুবিধের নয়, কারণ এতে ঝুঁকিও আছে ঝামেলাও বেশি। হয়-তাকে পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, আর নয়-তো তাদের মন পাবার জন্যে ঘুষ দিতে হবে। কিন্তু দুটোর কোনোটাই ইলিয়ার পছন্দ হ'লো না। কারোর সামনেই মাথা হেঁট ক'রতে সে রাজী নয়। আর ক'রবেই বা কেন? দু-দশটা ফেরিওলার মতো সে-কি ভদ্‌কা গেলে, না লোক ঠকায়? তাছাড়া কে না জানে যে তাদের চেয়ে সে সাজগোছও করে ভালো, আর সাফ-সুতরোও থাকে বেশি?—এ-সব মিথ্যা নয়, তাই এ নিয়ে তার মনে একটা বিরাট গর্বও ছিলো। রাস্তায় রাস্তায় সে ফেরি ক'রতো বটে কিন্তু তার চাল-

চলন ছিলো ধীরস্থির; মুখে থাকতো একটা মৌন গাম্ভীর্য; কালো কালো চোখ-দুটো কপালে না তুলে সে কথাই ব'লতো না, এবং কথা কম ব'ললেও সে-কথা হ'তো অব্যর্থ। ইলিয়া প্রায়ই ভাবতো সে যদি হঠাৎ কোনোরকমে হাজার দুয়েক টাকা পেয়ে যায় তাহ'লে কি ভালোই না হয়। তাই ডাকাতির গল্প প'ড়লেই সে উত্তেজিত হ'য়ে উঠতো। খবরের কাগজ কিনে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প'ড়তো ডাকাতির খবরগুলো এবং ডাকাতগুলো শেষটায় ধরা প'ড়লো কি না তা জানবার জন্যে এক নাগাড়ে বহুদিন ধ'রে পরের পর খবরের কাগজ প'ড়ে যেতো। আর যদি দেখতো যে ডাকাতগুলো ধরা প'ড়ে গেছে, তাহ'লে রেগে গিয়ে তাদের গালমন্দ ক'রতে ক'রতে বলতো জাকবকে :

"বেকুব, বেকুব, নইলে ধরা পড়ে! ধরাই যদি প'ড়বি তাহ'লে অমন কাজে হাত দিতে যাওয়া কেন বাপু? ডাকাত না ছাই, গাড়োল।"

একদিন জাকবের সংগে নিজের ঘরে ব'সে ব'ললো ইলিয়া :

"যাই বলো না কেন, সাধুর চেয়ে অসাধুরাই বেশি সুখে থাকে।"

জাকবের মুখখানা ব্যথায় কুঁচকে গেলো। চোখদুটো কপালে তুলে যে-রহস্যময় ও চাপা গলায় সে হামেশা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতো সেই গলায় ব'ললো :

"এই সেদিন তোমার কাকা এক বুড়োর সংগে চা খাচ্ছিলো। দেখে মনে হ'লো লোকটার বেশ পড়াশুনো আছে। বুড়ো কি ব'ললো জানো? ব'ললো, বাইবেলে লেখা আছে : 'ডাকাতের কেল্লা মজবুত ঠাঁই, আর যারা ভগবানকে খোঁচায় তারাই সুখে থাকে'; তাদেরই হাতে ভগবান ঝুলি ঝেড়ে দেন।' "

মন দিয়ে বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"মিছে-কথা ব'লছো না তো?"

বাতাসে ছিপ ফেলার মতো ক'রে হাতটা নেড়ে ব'লতে লাগলো জাকব :

"কথাগুলো তো আমার নয়, আর আমি বিশ্বাসও করি না যে এ-সব বাইবেলে লেখা আছে। সমস্তটাই হ'য়তো সেই বুড়োর মন-গড়া। দু একবার তাকে খোঁচালামও, কিন্তু সে একই কথা ব'ললো বারেবার। তবে আমার বিশ্বাস কথাগুলো সত্য। দেখতে হবে বাইবেলে আছে কিনা!"

তারপর ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে মৃদু স্বরে ব'ললো জাকব :

"আমার বাবার কথাই ধরো না। নিজে বেশ শান্তিতেই আছেন, কিন্তু ভগবানকে জ্বালায় হরদম !"

সংগে সংগে ইলিয়া ব'লে উঠলো :

"জ্বালায় ব'লে জ্বালায়, একেবারে তিতিবিরক্ত ক'রে মারে !"

"বাবা শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলারও হ'লো।"

তারপর গভীরভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মাথা নুইয়ে ব'লে চ'ললো জাকব :

"মানুষ যে-কাজই করুক না কেন, তাতে তার এতোটুকুও দ্বিধা থাকা উচিত নয়, কিন্তু আমার হ'য়েছে এক জ্বালা, সবটাতেই আমার দোমনা। ছাইপাঁশ কিছুই যেন বুঝতে পারি না। জীবন যেন এক ঝক্কি, আর হোটেল-ফোটেলও ভালো লাগে না আমার। কিন্তু বাবার সেই এক কথা : 'অনেক ভেরেণ্ডা ভেজেছো, এবার কাজে মন দাও, নইলে পস্তাবে।' কিন্তু কি কাজ ক'রবো বলো ? তেরেন্স না থাকলে মদ বেচি। কাজটা ভালো লাগুক আর না লাগুক মুখ বুঁজে স'য়ে যাই। কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে যে কিছু ক'রবো তা যেন আমার দ্বারা হ'য়ে ওঠে না।"

মুরুব্বীর মতো ব'ললো ইলিয়া :

"তা কি হয় ? ক'রতে শেখো।"

জাকব আস্তে আস্তে ব'ললো :

"আমার জীবন বড়ো দুঃখের।"

সংগে সংগে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে বন্ধুর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ব'লতে লাগলো ইলিয়া :

"দুঃখের ? তোমার জীবন দুঃখের ? এটা ডাহা মিথ্যে কথা। হ্যাঁ, আমার জীবনটা দুঃখের ব'লতে পারো। কিন্তু তোমার কথা আলাদা আজ বাদে কাল তোমার বাবা যখন বুড়ো হ'য়ে যাবে তখন তুমিই হবে হোটেলটার মনিব, তারপর বাবা মারা গেলে তুমিই হবে তার মালিক। কিন্তু আমি ? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি আর দেখি দোকানের জানলায় ভালো ভালো পাতলুন সাজানো র'য়েছে, ভালো ভালো ওয়েস্টকোট, ভালো ভালো ঘড়ি—আরও কতো কি ! দেখি আর মনে মনে বলি : 'ইলিয়া, এমন পাতলুন তুমি কোনোদিনই প'রতে

পাবে না, এমন ঘড়ি তুমি কোনোদিনই কিনতে পারবে না'।—বুঝলে? এ-সব জিনিষ আমিও চাই, কিন্তু সবার আগে যা চাই তা হ'লো সম্মান। আমি চাই লোকে আমায় সম্মান করুক। কেন, আমি কি কারোর চেয়ে খারাপ? মোটেই না, বরং অনেকের চেয়েই ভালো। আমি কি একটা রাস্কেল? মোটেই না। কিন্তু রাস্কেলরা আমাকে দেখে নাক সিটকোয়, তারা হয় কাউন্সিলার! তাদের নিজের নিজের বাড়িও আছে হোটেলও আছে। এই রাস্কেলগুলো সুখে থাকবে, আর আমি থাকবো খোঁয়াড়ে—এটা কেমন ধারা? আমারও সাধ আছে, আমিও ভালো ভালো জিনিষ চাই—সত্যিকারের ভালো জিনিষ, সত্যিকারের—!"

বন্ধুর দিকে চেয়ে জাকব হঠাৎ গম্ভীরভাবে ব'লে উঠলো:

"প্রলোভন থেকে ভগবান তোমায় যেন রক্ষা করেন।"

বিছানার দিকে যেতে যেতে ঘরের মাঝখানে থ'মকে দাঁড়িয়ে, বন্ধুর দিকে উত্তেজিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কি? কেন?"

জাকব ব'ললো: "তুমি লোভী, কোনোদিনই তোমার খাঁই মিটবে না।"

চ'টে গিয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠে জবাব দিলো ইলিয়া:

"কি ব'ললে, আমার খাঁই মিটবে না? বেশ, তোমার বাবাকে বলো সে আর আমার কাকা মিলে জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার যে-টাকাটা চুরি ক'রেছে তার আদ্ধেকটা আমায় দিতে, তারপর দেখবে আমার খাঁই মেটে কি না। আমি লোভী, কেমন? আর তোমার বাবা—"

কিন্তু এইখানে জাকব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর মাথা হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো দরজার দিকে। ইলিয়া দেখলো জাকবের কাঁধদুটো কাঁপছে এবং তার মাথাটা এমনভাবে কাত হ'য়ে র'য়েছে যেন কেউ তার ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরেছে।

বন্ধুর হাতটা চেপে ধ'রে বিব্রতভাবে ব'ললো ইলিয়া:

"সবুর ক'রো, যাচ্ছো কোথায়?"

প্রায় ফিশফিশ ক'রে জবাব দিলো জাকব:

"আমাকে যেতে দাও, ভাই।"

তারপর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সে একবার তাকালো ইলিয়ার দিকে। জাকবের মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, ঠোঁটদুখানা আঁটসাট বন্ধ। দেখে মনে হ'লো তাকে যেন কেউ একেবারে থেঁতলে দিয়েছে।

জাকবকে সযত্নে দরজা থেকে ফিরিয়ে এনে, আবার চেয়ারে বসিয়ে, অপরাধীর মতো ব'ললো ইলিয়া:

"ব'সো ব'সো, কিছু মনে ক'রো না। আমার ওপর রাগ ক'রে লাভ কি? যা ব'ললাম তা সত্য।"

জাকব উত্তর দিলো: "তা জানি।"

"জানো?"

"হ্যাঁ।"

"কে ব'ললো তোমায়?"

"সকলেই তো বলে এ-কথা।"

"কথাটা সত্য; কিন্তু যারা বলে তারা নিজেরাই এক একটি রাস্কেল।"

করুণভাবে ইলিয়ার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো জাকব:

"প্রথম প্রথম আমি বিশ্বাস করি নি; ভাবতাম লোকে বুঝি হিংসায় এ-সব কথা ব'লছে, কিংবা ঘেন্নায়। কিন্তু পরে বিশ্বাস ক'রতে শুরু ক'রলাম; আর এখন তুমিও যদি তা-ই ব'লো, তাহ'লে—তার মানে—"

এই ব'লে জাকব মুখটা ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে, তারপর মাথাটি হেঁট ক'রে নিশ্চলভাবে ব'সে রইলো চেয়ারটাকে জাপটে ধ'রে। জাকবের কাছ থেকে স'রে এসে ইলিয়া বিছানার ওপর ব'সলো এবং কি ব'লে বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবে তা বুঝতে না পেরে নীরব হ'য়ে রইলো।

এদিকে দেয়ালের ওপাশে তখন হট্টগোলের নোংরা ফোয়ারা ছুটেছে: চীৎকার, গর্জন, ঘশ্‌ঘশ্‌, ঝনঝন—সব-কিছু মিলিয়ে সে যেন এক নিষ্ঠুর কেচ্ছা। একটা মাতাল স্ত্রীলোকের কর্কশ গলা শোনা গেলো:

"ঘুমোতে পারি না, জিরোতেও পারি না। ঘুম আমায় ভুলেছে!"

ফিশফিশ ক'রে জাকব ব'ললো:

"এর মধ্যে কি টেঁকা যায় ইলিয়া?"

ইলিয়াও ফিশফিশ ক'রে জবাব দিলো:

"তা সত্যি। তুমি যে সুখে নেই তা বুঝি। সান্ত্বনা একটিমাত্রই আছে জাকব; আর সে-সান্ত্বনা যে সবায়ের পক্ষেই এক, তা চোখদুটো খুলে রাখলেই বোঝা যায়। নিয়তি সকলেরই এক।"

বন্ধুর দিকে না চেয়েই ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"জেরেমিয়ার টাকার ব্যাপারটা তুমি নিশ্চিত ক'রে জানো ইলিয়া ?"

"আমি ? আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। তোমার মনে পড়ে সেই যখন আমি দৌড়ে চ'লে গেলাম ? গিয়ে ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম একদিকে বুড়ো মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর অন্যদিকে তারই পাশে দাঁড়িয়ে ওরা বালিশের মুখটা সেলাই ক'রছে।"

জাকব একটি কথাও না ব'লে কেবল একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সলো। এইভাবে চুপচাপ কেটে গেলো অনেকক্ষণ। ইলিয়া ব'সে তার বিছানায়, আর জাকব ব'সে তার চেয়ারে। খানিক বাদে জাকব চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়লো, তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে ব'ললো ইলিয়াকে :

"এবার চলি।"

"আচ্ছা, ভাই। অতোটা উতলা হ'য়ো না। কি-ই বা করা যাবে, বলো ?"

দরজাটা খুলতে খুলতে জাকব জবাব দিলো :

"না, আমি ঠিকই আছি।"

জাকব চ'লে যেতে ইলিয়া খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে ব'সে রইলো, তারপর ঝুপ ক'রে শুয়ে প'ড়লো বিছানার ওপর। জাকবের জন্যে দুঃখ হ'লো ওর, আর সেই সংগে ওর কাকা, পেত্রুহা এবং সকলের ওপরই রাগে ওর দেহটা আবার জ'লে উঠলো। ইলিয়া বুঝতে পারলো জাকবের মতো একটা দুর্বলচেতা নিরীহ ভদ্রলোকের পক্ষে এদের মধ্যে টি'কে থাকা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে লোকজন সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে ওর এমন অনেক ঘটনা মনে প'ড়ে যেতে লাগলো যার থেকে বহুবারই প্রমাণ হ'য়েছে মানুষ নীচ, নির্দয় এবং ভণ্ড। এ-ধরণের ঘটনা ও অনেক দেখেছিলো ব'লেই মানুষের সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করা ওর পক্ষে সহজ হ'য়েছিলো। নিজের নিঃসঙ্গ, তিক্ত ও বিষণ্ণ জীবনের দিকে চেয়ে ইলিয়া ভয় পেতো এবং ওর মনে হ'তো জীবনটা যেন

গর্জমান ঘূর্ণিবাত্যার মতো চারিধারে তাণ্ডব-নৃত্য নেচে বেড়াচ্ছে। আর ঘটনাগুলোকে যতোই ওর কুৎসিত মনে হ'তো ততোই ওর পক্ষে ঝেড়ে ফেলা শক্ত হ'তো এই তিক্ততা, বিষণ্ণতা এবং নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ বোঝাটাকে।

অবশেষে, ভাবতে ভাবতে ইলিয়া যখন বুঝলো যে এঁদোঘরের এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা এবং হোটেলের এই জঘন্য, বেঢপ হট্টগোল সে আর সইতে পারছে না, তখন সে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলো। সেই রাত্রে সে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে বেড়ালো রাস্তায় রাস্তায় এবং সেই সংগে প্রাণপণ যুঝতে লাগলো তার বিষণ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিগুলোর সংগে।

চিন্তামগ্ন হ'য়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়ার মনে হ'লো, কোনো দুশমন যেন কেবলই ওকে নির্মমভাবে জীবনের এমন একটা গর্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা বিষাদময় এবং কুৎসিত। এটা ভাবতেই রাগে দুঃখে ওর বুকটা টনটন ক'রে উঠলো। এতো বড়ো পৃথিবীতে এতটুকু ভালো নেই এ কখনো হ'তে পারে? ভালো নিশ্চয়ই আছে—ভালো লোক, ভালো কাজ, আর আনন্দও আছে নিশ্চয়ই। ইলিয়া নিজেকে প্রশ্ন ক'রলো: "তবে আমি কেন তা দেখতে পাই না? যা খারাপ যা বিষণ্ণ কেবল তারই সংস্পর্শে কেন আসি আমি? কে আমাকে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের যতো হতাশা, নোংরামি আর মন্দের দিকে?"

এই সব চিন্তায় বিভোর হ'য়ে হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়া শহর ছাড়িয়ে একটা মাঠে এসে প'ড়লো। এই মাঠের ওপর গির্জা-সমেত যে-মঠটা আছে তার পাথুরে পাঁচিলটার পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় ওর মনে হ'লো, ঐরাবতাকৃতি মেঘগুলো যেন কোনো বিষণ্ণ গুহা থেকে বেরিয়ে ওরই দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

আকাশে মেঘ উঠেছে। হেথা-হোথা তারার চুমকি-বসানো নীল বেনারসীর আঁচলটা ক্ষণিকের জন্য ঝলমলিয়ে উঠেই আবার অন্তর্হিত হ'য়ে যাচ্ছে মেঘের বাকৃশোর মধ্যে। মাঝে মাঝে গির্জার ঘণ্টাটা বেজে উঠছে ঢংঢং ক'রে। এ-ছাড়া আর কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই। কিন্তু রাতও এমন কিছু বেশি হয় নি। পিছনে-ফেলে-আসা শহরের থোকা-থোকা আবছা বাড়িগুলোতে এখনো কোনো না কোনো শব্দ হ'চ্ছে নিশ্চয়ই; কিন্তু জীবনের কোনো কোলাহলই ইলিয়ার কানে এসে পৌঁছলো না। ঠাণ্ডা কনকনে রাত। হাঁটতে

হাঁটতে জ'মে-যাওয়া কাদায় কেবলই হোঁচট খেতে লাগলো ইলিয়া এবং নিঃসঙ্গতায়, ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে মঠের ঠাণ্ডা, পাথুরে পাঁচিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ও বুঝতে চেষ্টা ক'রলো, যে-শক্তিটা ওর জীবনের হাল ধ'রে আছে এবং ওকে কেবলই দুঃখ ও নোংরামির দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেই শক্তিটা কী!

ভয়ে শিরশির ক'রে উঠলো ইলিয়ার সর্বাংগ। কোনো ভয়াবহ আশংকায় চ'মকে উঠে সে তাড়াতাড়ি স'রে এলো মঠের পাথুরে পাঁচিলটা থেকে; তারপর পকেটে হাতদুটো গুঁজে, কাদায় হোঁচট খেতে খেতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো শহরের দিকে। যেতে যেতে একবারও পিছনে তাকালো না সে, তাকাবার মতো সাহসও হ'লো না তার।

কয়েক দিন পরে এক সন্ধ্যায় পাশ্‌কা গ্রাংচফের সংগে ইলিয়ার দেখা হ'য়ে গেলো। বাতাসে তখন ঝুরঝুর ক'রে ভেসে বেড়াচ্ছিলো তুষারের সরু সরু আঁশ, চিকচিক ক'রছিলো সেগুলো রাস্তার আলোতে। ঠাণ্ডা প'ড়েছে বেশ, কিন্তু পাশ্‌কার গায়ে একটা কোমরবন্ধহীন 'ফাষ্টিয়ান' শার্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। যেন রাস্তায় কিছু খুঁজছে এইভাবে সামনে ঝুঁকে ধীরে ধীরে হাঁটছিলো সে। ইলিয়া যখন কাছে এসে তাকে ডাকলো, পাশ্‌কা মুখ তুলে ইলিয়ার দিকে চেয়ে উদাস গলায় ব'ললো :

"ও! তুমি।"

পাশ্‌কার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"কেমন আছো ?"

"এর চেয়ে খারাপ নেই কেন তাই ভাবছি। তারপর, তুমি কেমন আছো ?"

"ব্—বেশ ভালোই।"

"মনে হ'চ্ছে তোমার হালও খুব সুবিধের নয়।"

কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে দুজনে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো।

ইলিয়া ব'ললো : "আমাদের এখানে আসো না কেন ? বাপ্‌স্, সেধে সেধে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম !"

"সময় পাই না, ভাই। তুমি তো জানো আমাদের অবসর কতো কম।"

তিরস্কারের সুরে ব'ললো ইলিয়া :

"মন ক'রলে ওরই মধ্যে একটু সময় ক'রে নিতে পারতে।"

"শোনো শোনো, রাগ ক'রো না। তোমার ওখানে আমাকে যেতে বলো ঠিকই, কিন্তু আমি কোথায় থাকি তা তুমি একবারও জিজ্ঞেস করো নি, এসে আমার সংগে দেখা করা তো দূরের কথা।"

মুচকি হেসে ইলিয়া ব'ললো :

"তা অবিশ্যি সত্যি !. তাই ব'লে—আচ্ছা লোক যা হ'ক তুমি !"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে একটু হেসে আরও উৎফুল্লভাবে ব'ললো পাশ্‌কা :

"আমি একেবারে একা থাকি, বন্ধু নেই বান্ধব নেই, আমার সংগে খাপ খায় এমন একটি মানুষেরও দেখা পাই না কোথাও। বেশ কিছুদিন ভুগলামও, হাসপাতালেই কেটে গেলো প্রায় তিনটি মাস। এর মধ্যে কেউ একবার গিয়েও দেখে নি বেঁচে আছি কি ম'রে গেছি।"

"কি হ'য়েছিলো ?"

"ঐ একটু রঙে ছিলাম আর কি, ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিলো। তার থেকে হ'লো টাইফয়েড। যতোদিন রোগটা আঁকড়ে ছিলো, ছিলাম একরকম; কিন্তু যে-ই সেরে উঠতে লাগলাম—ব'লবো কি সে যেন এক বিষম যন্ত্রণা! সারা দিনরাত একা-একা প'ড়ে থাকতে হ'তো—বোবা, অন্ধ সেজে,—মনে হ'তো একটা কুকুরছানাকে যেন কেউ গর্তে ফেলে দিয়েছে। ওখানকার ডাক্তারবাবুটি যদি আমায় বইপত্তর না দিতেন, তাহ'লে হয় তো ক্লান্তিতেই অক্কা পেতাম।"

ইলিয়া লুনেফ জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"বইগুলো ভালো ছিলো ?"

"হ্যাঁ ভাই, তা ভালো ছিলো। ভারি চমৎকার বইগুলো! প'ড়তাম—কবিতা—লের্মন্তফের*, নেক্রাসফের*, পুশ্‌কিনের*।—প'ড়তাম আর মনে হ'তো যেন মিষ্টি দুধের বাটিতে চুমুক দিচ্ছি। বুঝলে ভাই, এমন কবিতাও আছে যা প'ড়তে প'ড়তে মনে হবে তোমার প্রিয়া যেন তোমায় চুমু খাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে কোনো কোনো কবিতা তোমার বুকে এমন ধাক্কা দিয়ে যাবে যে মনে হবে তুমি দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলে।"

ইলিয়া ব'ললো : "আমি আর আজকাল তেমন বইপত্তর ঘাঁটি না।"

এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সে।

"বটে ?"

"সত্যি। প'ড়েই বা লাভ কি ? কেতাবে প'ড়ি এক, বাস্তব জীবনে দেখি আর।"

* পুশ্‌কিন্ (১৭৯৯-১৮৩৭), লের্মন্তফ্ (১৮১৪-১৮৪১), নেক্রাসফ্ (১৮২১-১৮৭৮)—এঁরা তিনজনই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি।

"সেইটাই তো লাভ। চলো একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকা যাক। ব'সে খানিকক্ষণ গাঁজানো যাবে। আমাকে আবার একটা জায়গায় যেতে হবে, বুঝলে? তবে তার দেরি আছে অনেক। চাই কি দুজনে এক সংগেও যেতে পারি সেখানে।"

ইলিয়া রাজী হ'লো: "রেস্টুরেন্টে যাবে? আচ্ছা চলো।"

তারপর বন্ধুর মতো পাশ্কার হাত ধ'রে হাঁটতে লাগলো সে।

ইলিয়ার মুখের দিকে আর একবার চেয়ে, মুচকি হেসে ব'ললো পাশ্কা:

"তুমি-আমি কোনোদিনই হরিহর-আত্মা ছিলাম না, কিন্তু তাহ'লেও তোমার সংগে দেখা হ'লে মন্দ লাগে না।"

"তা হবে, জানি না আমার সংগে দেখা হ'য়ে যাওয়ায় তুমি খুশি হ'য়েছো কি না। মনে হ'চ্ছে যেন হও নি। কিন্তু আমি—"

পাশ্কা তাকে থামিয়ে দিয়ে ব'ললো:

"এ এক ঝুট-ঝামেলা, ভাই! যখন আমি এই সবই ভাবছিলাম, তুমি আমায় ডাকলে। এ-সব কথা মনে না রাখাই ভালো।"

এই ব'লে পাশ্কা কথা উড়িয়ে দেবার ভংগিতে একবার হাত নাড়লো। তারপর মুখ বুঁজে হাঁটতে লাগলো আরও ধীরে ধীরে।

প্রথম যে-রেস্তঁরাটা প'ড়লো তাতেই ওরা ঢুকে গেলো, এবং এক কোণে ব'সে খানিকটা বীয়ার চেয়ে পাঠালো। ইলিয়া দেখলো পাশ্কার মুখখানা রোগা-রোগা, থমথমে, চোখদুটো উৎকণ্ঠায় ভরপুর এবং তার যে-ঠোঁট-দুখানা সাধারণত ঠাট্টার ভংগিতে অর্ধ-উন্মুক্ত থাকতো, তা এখন আঁটসাঁট বন্ধ।

ইলিয়া গ্রাৎচফ্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"এখন কোথায় কাজ ক'রছো?"

বিষণ্ণভাবে জবাব দিলো পাশ্কা:

"আবার ছাপাখানায়।"

"খুব খাটতে হয়?"

"ন্-না। এ-কাজে ক্লান্তি কম, ঝামেলা বেশি।"

যে-পাশ্কা একদিন ছিলো দুর্দান্ত এবং সদানন্দ তাকে এখন এমন হতাশ ও ক্লিষ্ট দেখে ইলিয়া যেন কেমন একটু খুশিই হ'লো। ওর ইচ্ছা হ'লো

পাশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা করে কেন তার এমন পরিবর্তন হ'য়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে ইলিয়া ক্রমাগত গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে চ'ললো পাশ্‌কাকে।

"তারপর তোমার কবিতা লেখা চ'লছে কেমন?"

"ছেড়ে দিয়েছি, তবে আগে আগে লিখতাম প্রচুর। সেই ডাক্তারটিকে দেখাতে তিনি সেগুলোর তারিফও ক'রেছিলেন। একবার তিনি আমার একটা কবিতা কাগজে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। আর, তার জন্যে দক্ষিণা পেয়েছিলাম একটা আধুলি।"

ইলিয়া ব'লে উঠলো: "বাহবা! এই তো চাই! দাও, কবিতাটা শুনিয়ে দাও।"

কয়েক গেলাস বীয়ার এবং ইলিয়ার সহৃদয় কৌতূহল গ্রাৎচফ্‌কে চান্‌কে দিলো। সংগে সংগে চকচক ক'রে উঠলো তার চোখদুটো এবং রং ফিরে এলো তার বিবর্ণ গালে।

কপালখানা বেশ ক'রে মুছতে মুছতে পাশ্‌কা জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কোন্ কবিতাটা বলো তো? সে কি আর মনে আছে এখনো? হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই, স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু সবুর করো, হয়তো মনে প'ড়ে যাবে এক্ষুনি। শব্দগুলো কিন্তু আমার মগজেই র'য়েছে—গুন্‌গুন্ ক'রে বেড়াচ্ছে মৌমাছির মতো! মাঝে মাঝে, লিখতে শুরু ক'রলেই এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠি যে মাথা গরম হ'য়ে যায়, আর চোখেও জল এসে পড়ে।"

কথাটা বিশ্বাস ক'রতে না পেরে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"সত্যি? কিন্তু কেন?"

"তা বলা মুশকিল। মনে হয় আমার মধ্যে কিছু জ্ব'লছে, সেটাকে প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা করি আপ্রাণ, কিন্তু ভাষা খুঁজে পাই না, তাই বিরক্ত হ'য়ে উঠি।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে আবার ব'ললো পাশ্‌কা:

"মনে আমার ভাবের অভাব নাই, কিন্তু লিখতে গেলে কেবল হোঁচট খাই।"

ইলিয়া তাকে বারেবার ব'লতে থাকে:

"শোনাও শোনাও, দু একটা শোনাও!"

পাশ্‌কার দিকে সে যতোই তাকায় তার কৌতূহলটাও যায় ততোই বেড়ে এবং মনে মনে সে পাশ্‌কাকে প্রশংসা তো ক'রতে থাকেই, উপরন্তু তার জন্য একটা সমবেদনাও অনুভব করে।

বিব্রতভাবে একটু হেসে পাশ্‌কা ব'ললো:

"বেশির ভাগ সময়েই মজার মজার কবিতা লিখি—নিজের জীবন সম্বন্ধে।"

"আচ্ছা তাই সই, একটা মজার কবিতাই শোনাও।"

তখন গ্রাৎচফ্‌ চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, একটু কেশে, বুকের ওপর ডানহাতখানা বার দুই ঘ'ষে, বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়েই, চাপা গলায়, হুড়হুড় ক'রে ব'লতে শুরু ক'রলো:

"এখন রাত্রি কতো? রুগ্ন শুয়ে আমি!
খিন্ন চাঁদের আলো আসে মোর ঘরে
জানালার আবছায়া ঝিলিমিলি দিয়া।
হাঁসে চাঁদ—কি মধুর সে-হাসি—আঁকে আলপনা—
নীল জোছনার ফিকে আলপনা
স্যাঁতসেতে দেয়ালের পিচ্ছিল বুকে।
হাসে চাঁদ—কি করুণ সে-হাসি!
একা আমি; যাতনায় ঘুম আসে না-কো,
জেগে থাকি। জোছনার আলপনা কাঁপে!"

তারপর একটু থেমে, গভীরভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে, আরও মৃদু স্বরে এবং আর একটু ধীরে ধীরে, ব'লতে লাগলো সে:

"নিয়তি! ক্ষান্ত হও। ফেটে গেলো বুক।
বাকি শুধু প্রাণটুকু; তাও নেবে ছিঁড়ে?
প্রিয়ারে আমার দাও, তারে চাই ফিরে।
সুরা দেবে? তাই দাও। পাত্র-ভরা সুরা
চাঁদের আলোতে হাসে চাঁদেরি মতন।

সুরার মায়ায় যেন দুঃখ যাই ভুলে,
মনে হয় মন-তরী কুয়াশায় দুলে
চ'লেছে ঘুমের দেশে। ঘুম আসে চোখে।
চিন্তা এসে কেড়ে নেয় আঁখি হ'তে ঘুম,
যাতনায় অন্তর ছটফট করে,
সুরা চাই চিন্তারে ভুলিবার তরে ;
মদ বিনা ঘুম নাই। সুরা চাই আরো !"

আবৃত্তি শেষ ক'রে গ্রাৎচফ্ ক্ষণিকের জন্য তাকালো ইলিয়ার দিকে, তারপর মাথাটা আরও নুইয়ে আস্তে আস্তে ব'ললো :

"শুনলে তো—বেশির ভাগই ঐ রকম—কেমন যেন—কুচ্ছিত !"

টেবিলের কিনারায় টোকা মারতে মারতে পাশ্কা উশখুশ ক'রতে লাগলো অস্বস্তিতে।

যুগপৎ সন্দেহ ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ইলিয়া কয়েক মুহূর্ত ধ'রে গ্রাৎচফের মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। নিষ্ঠুর অথচ সুসমঞ্জস শব্দগুলো তখনো ওর কানে বাজতে থাকে এবং ওর বিশ্বাস ক'রতে কষ্ট হয় যে, রোগা দাড়ি-গোঁফহীন, অস্থিরনেত্র যে-যুবকটি গায়ে একটা পুরণো 'ফাষ্টিয়ান' শার্ট আর পায়ে এক জোড়া ভারী বুট প'রে ওর সামনে ব'সে আছে, সেই যুবকটিই এই কবিতাগুলো লিখেছে ! আশ্চর্য !

পাশ্কার দিকে তাকিয়ে ধীরস্থিরভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"যাই বলো ভাই, এগুলোকে তুমি যতো মজার মনে ক'রছো ততো মজার নয়। কবিতাগুলো ভালোই। সত্যি ব'লছি, এগুলো আমার মর্ম স্পর্শ ক'রেছে ! আর একবার বলো, আর একটি বার।"

চট ক'রে মাথাটা তুলে ইলিয়ার দিকে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চেয়ে, বন্ধুর আরও কাছে স'রে এসে, মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো পাশ্কা :

"কি যে বলো, না, না, সত্যি তোমার ভালো লেগেছে ?"

"ভগবানের দিব্যি ব'লছি ভালো লেগেছে। আচ্ছা লোক তো তুমি ! মিছে কথা ব'লে আমার লাভ কি ?"

"আচ্ছা, নাও, বিশ্বাস ক'রছি।—জানি, তোমার মুখে এক পেটে আর নয়। মানুষটা তুমি সত্যিই ভালো।"

"আরও দু একটা শোনাও।"

পল্ গ্রাৎচফ্ তখন চিন্তিতভাবে এবং মৃদু স্বরে আবৃত্তি শুরু ক'রলো। ব'লতে ব'লতে দরকার মতো থামলো, মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলো দম নেবার জন্যে। তারপর পল্ থামতেই, কবিতাটা সে সত্যিই নিজে লিখেছে কি না এ-বিষয়ে ইলিয়ার সন্দেহটা আরও বেড়ে গেলো।

নাছোড়বান্দার মতো ব'ললো ইলিয়া: "আর একটা শোনাও।"

"শোনো, আমি ববং একদিন তোমার ওখানে যাবো খাতাটা নিয়ে। কবিতাগুলোর সব ক'টাই বড়ো, তাছাড়া এবার আমায় উঠতেই হবে! ঠিক ঠিক মনেও প'ডছে না সবগুলো, শুরু-শেষ সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা শেষ হয়—আর একটা ধরি—মনে হয় যেন কোনো রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে হারিয়ে গেছি গভীর বনে—আর, আর, ভয় ক'রতে থাকে আমার—চারিধার নিস্তব্ধ, আমি নিঃসঙ্গ—ভাগ্যকে ধিক্কাব দিই—আর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে মরি—

"বুকে গুরুভার,
ক্লান্ত চরণ—
খুঁজি পথ। বলো ধরিত্রী,
কোথায় পাবো শরণ?
বলো মাতা, ব'লে দাও
কোথা পথ?
আমি রাখি শির
নবযৌবনা যুবতীর
সুধাময় বুকে। ডাকে প্রিয়া।
শুনি অন্তর দিয়া;
ডাকে প্রিয়া; বলে: 'কি তোমার নাম?
এসো এসো, বুকে মোর লহ বিশ্রাম'।"

"এটা কিন্তু সত্য! জীবনটা যেন অক্ষত এক বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলা; আলো দেখতে পাই, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথ খুঁজে পাই না। শোনো ইলিয়া, আমার সংগে চলো। কি, যাচ্ছো তো? চলো একসংগে যাই।, তোমাকে এখন ছাড়তে ইচ্ছে ক'রছে না।"

এই ব'লে গ্রাংচফ্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং হন্তদন্ত হ'য়ে ইলিয়ার শার্টের আস্তিনটা ধ'রে টানাটানি ক'রতে ক'রতে ইলিয়ার মুখের দিকে তাকায় সস্নেহ দৃষ্টিতে।

ইলিয়া ব'ললো :

"চলো যাবো! আমারও ইচ্ছে ক'রছে তোমার সংগে থাকতে। সত্যি ব'লতে কি—তোমাকে বিশ্বাস ক'রতেও মন চায়, আবার অবিশ্বাস ক'রতেও মন চায়। ভারি অদ্ভুত লোক তুমি! আর, তারপর তোমার কবিতাগুলো – "

"তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি ওগুলো আমার লেখা? তাতে কিছু যায় আসে না! নিজের চোখে দেখলেই তখন বিশ্বাস ক'রবে।"

এই ব'লে পল্ রাস্তায় পা দিলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সরল মনে ব'ললো ইলিয়া :

"যদি তোমার নিজের লেখা হয়, তাহ'লে ব'লবো : হ্যাঁ, লেখবার শক্তি আছে বটে তোমার! থামলে কেন, বলো, যারা আসল মানুষ, তারা কি-ভাবে দিন-গুজরান করে।"

"শোনো ভাই, এদের সম্বন্ধে যখন আরও বেশি ক'রে জানবো তখন লিখবো, তখন সবাইকে জাগিয়ে তুলবো!"

"দূর ছাই, দেরি ক'রছো কেন, তাদের জানতে দাও!"

"মাঝে মাঝে মনে মনে বলি : 'হেই হুঁশিয়ার! তুমি তো খুব পেটটি ট্যাপা ক'রে কাত্তিকটি সেজে চ'লেছো'—কিন্তু আমি?"

"ঠিকই তো!"

"আমি কি মানুষ নই?"

"সবাই সমান।"

"যার গায়ে মখমল আর সিল্কের জামা সে কালিয়া পোলাও মারবে, আর যার গায়ে জামা নেই তাকে বাঁচতে হবে খালি পেটে? না, এসব চ'লবে না।"

"চ'লবে না-ই তো! সবাই সমান।"

"ব'লবো কি ইলিয়া, আমার মাথাটা যদি আর-একটু সাফ হ'তো!"

তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে গরম গরম কথাবার্তা ব'লতে লাগলো ওরা, সেই সংগে ওদের উত্তেজনাটা যেমন বাড়তে লাগলো, তেমনি গাঢ়তর হ'তে থাকলো ওদের বন্ধুত্বটাও। দুজনের চিন্তাধারাই এক, এতে খুশি হ'লো দুজনই। ফলে ওদের কথাবার্তা আরও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠলো। এদিকে তখন ঝিরঝির ক'রে চাকা-চাকা বরফ প'ড়ছে। বরফের আঁশগুলো কখনো ওদের মুখের ওপর প'ড়ে গ'লে যাচ্ছে, কখনো-বা ওদের জামায় জুতোয় লেগে থাকছে। এইভাবে কুয়াশা ও কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চ'ললো দুই বন্ধু।

পল্ ব'লে উঠলো:

"বুঝি সবই!"

ইলিয়া লুনেফ জোগান দিলো:

"এভাবে বাঁচা অসম্ভব।"

"তুমি যদি ইস্কুলে প'ড়ে থাকো, তাহ'লে তুমিও ভদ্দরলোক—সে তোমার বাপ ভিস্তিই হ'ক আর আরদালীই হ'ক।"

"আলবত! কিন্তু ধরো, আমি যদি ইস্কুলে না-ই বা প'ড়তাম, তাতে আমার দোষটা কেন হ'তো শুনি?"

"দোষটা এই: তোমার বিদ্যে লাভ হ'য়েছে, আর আমার লাভ হ'য়েছে এইটা—" ব'লে গ্রাৎচক্ ইলিয়াকে তার বুড়ো আঙুলটা দেখালো। তারপর ব'ললো: "দাঁড়াও, একটু সবুর করো—।"

এদিকে কাদা-ভর্তি একটা গর্তে পা দিয়ে ফেলেই ইলিয়া ব'লে উঠলো:

"শালার গর্তের নিকুচি ক'রেছে!"

"বাঁ ধার দিয়ে হাঁটো।"

"কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোন্ চুলোয়?"

"সিদোরিহার বাড়ি।"

"কোথায়?"

"সিদোরিহার বাড়ি—নাম শোনো নি কখনো?"

একটু থেমে জবাব দিলো ইলিয়া:

"না, ওখানে আমি কখনো যাই নি।" তারপর দুএক পা এগিয়েই হেসে ব'ললো: "মানে, আমাদের চালচলনে তো একটু তফাৎ আছে, ভাই।"

পল্ শান্তভাবে ব'ললো:

"কী জ্বালা! তা জানি। কিন্তু আমাকে ওখানে যেতেই হবে; কাজ আছে।"

"ন্-না, আ্-আমারও তাতে কোনো আপত্তি নেই। যাচ্ছি যখন যাবো ঠিকই!"

"তোমাকে একটা কথা ব'লবো ইলিয়া! ব'লতে কষ্ট হ'লেও ব'লবো।"

থুক্ ক'রে রাস্তায় এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে খানিক চুপ ক'রে থাকে পল্।

কান খাড়া ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কথাটা কী?

একটু ভেবে পল্ ব'লতে লাগলো:

"বুঝলে, ওখানে একটা মেয়ে আছে। তাকে দেখলেই অবিশ্যি বুঝতে পারবে সে কেমন; মেয়ে তো নয় যেন আগুন। যে-ডাক্তারটি আমার চিকিৎসা ক'রেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই ও চাকরাণীর কাজ ক'রতো। সেরে ওঠবার পর তাঁর কাছ থেকে বই-টই আনতে যেতাম, কখনো কখনো তাঁর অপেক্ষায় ব'সে থাকতে হ'তো রান্নাঘরে; সেইখানে দেখতাম এই মেয়েটি খিলখিল ক'রে হাসছে, আর কাঠবেরালির মতো নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে। নিজের দিকে চেয়ে মনে হ'তো, আগুনের পাশে যেন একখানা কাঠের চোকলা হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছি। একদিন এগিয়ে গেলাম ওর দিকে, আর ও কথাটি না ব'লে ধরা দিলো আমার কাছে। তারপর থেকেই শুরু হ'লো ব্যাপারটা! মনে হ'তো আকাশে যেন আগুন লেগেছে। পতঙ্গের মতো আমি ছুটতাম আগুনের পানে। দুজনে দুজনকে জাপটে ধ'রে চুমু খেতাম—যতক্ষণ না ঠোঁট-দুখানা পিষে যায়, যতক্ষণ না হাড়গুলো টনটন ক'রে ওঠে! উঃ, সে যে কী! ও ছিলো ছোটোখাটো পুতুলটির মতো—পরিপাটী, তুলতুলে। ওকে যখন জাপটে ধ'রতাম, মনে হ'তো ও আমার দেহের সংগে মিশে গেছে—একেবারে! পাখির মতো উড়ে এসে আমার বুকটি জুড়ে ব'সে ও গান গাইতো—সে যে কী আশ্চর্য গান তা কি ব'লবো…!"

ব'লতে ব'লতে একটু থেমে পল্ এমন একটা শব্দ ক'রে উঠলো যেন সে এক-ডিশ মুরগীর মাংস সামনে নিয়ে ব'সেছে।

খাসা গল্প, তাই ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তারপর?"

"তারপর একদিন ডাক্তারের বেকুব বউটা আমাদের হাতে-নাতে ধ'রে ফেল্‌লো—গতরখাকী! এমনিতে মাগীটার শরীরে দয়ামায়া ছিলো, মাঝে মাঝে আমার সংগে হেসে হেসে কথাবার্তাও ব'লতো। মাগীর রূপও ছিলো—ডাইনী।"

ইলিয়া ব'ললো: "তারপর?"

"তারপর আর কি, মাগী একটা গোলমাল পাকিয়ে তুললো; আর, ভেরা-কে আমাকে দুজনকেই তাড়িয়ে দেওয়া হ'লো বাড়ি থেকে। দুজনে গালমন্দও খেলাম খুব। ভেরা চ'লে এলো আমার কাছে, কিন্তু আমি তখন বেকার। অগত্যা দুজনে উপোস দিতে লাগলাম! দেখতে দেখতে দুজনার যা-কিছু ছিলো সবই বেচতে হ'লো—ঘটি-বাটিটি পর্যন্ত। কিন্তু ভেরা-টা আবার পযলা নম্বরের একরোখা। ও পালিয়ে গেলো। পাত্তাই পেলাম না ওর প্রায় দু'হপ্তা। তাবপর ও যখন ফিরে এলো, দেখি ওর গায়ে হাল-ফ্যাশানের জামা, হাতে ব্রেস্‌লেট্—আরও কতো কি—ব্যাগে টাকা-কড়ি।"

এই ব'লে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে, শূন্যগর্ভ গলায় আবার ব'ললো পাশ্‌কা:

"তখন ওকে বেধড়ক মার দিলাম।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"এর পর কি ও চ'লে গেলো?

"ন্-না, ও চ'লে গেলে আমি নদীতে ঝাঁপ দিতাম!"

"তাহ'লে ও তোমার কাছেই থেকে গেলো?"

"শোনো, ভেরা ব'ললো আমায়—'হয় আমাকে মেরে ফেলো, আর নয় তো আমায় ছুঁয়ো না। আমি তোমার বোঝা, এটা সত্যি; কিন্তু তাই ব'লে আমার আত্মাটা আমি কাউকে বিলিয়ে দেবো না।"

"তখন তুমি কি ক'রলে?"

"যা যা পারলাম তা-ই ক'রলাম: ওকে মারলাম, নিজে কাঁদলাম।

তাছাড়া আর করবারই বা কি ছিলো? ওকে যে কিছু খেতে দেবো এমন সঙ্গতি আমার ছিলো না তখন।"

"ও কোনো চাকরি-বাকৃরি কর'তে চায় না?"

"চায় কি না চায় যমই জানে! ও ব'ললো: 'ধরো তুমি যা ব'লছো তা-ই না হয় ক'রলাম, আর আমাদের ছেলেপুলেও হ'লো—কিন্তু তাদের নিয়ে তখন ক'রবোটা কি? তার চেয়ে যেমন আছি তেমনি থাকি। সবই তোমার থাকবে, অথচ ছেলেপুলেও হবে না।"

একটু ভেবে ইলিয়া লুনেফ ব'ললো:

"কথাটা ভাববার মতো। ওর জ্ঞানগম্যি আছে।"

হিমেল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাশ্‌কা মুখ বুঁজে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো। ঝোঁকের মাথায় ইলিয়াকে পিছনে ফেলে সে গজ তিনেক এগিয়ে গিয়েছিলো। সেটা বুঝতে পেরে, পিছু ফিরে এসে, আবার ইলিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, সেই শূন্যগর্ভ গলায়, ফিশফিশ ক'রে ব'ললো সে:

"যখন ভাবি যে অন্য লোকেরা ওকে চুমু খাচ্ছে তখন আমার বুক ধসে যায়।"

"ওকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারো না?"

অবাক হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো পল্‌:

"কাকে, ভেরাকে?"

পাশ্‌কার বিস্ময়ের কারণটা ইলিয়া ভালো ক'রেই বুঝলো যখন ও নিজে দেখলো মেয়েটাকে।

হাঁটতে হাঁটতে শহরতলীর একখানা একতলা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো। বাড়িটার ছ'টা জানলাই একদম বন্ধ, তাই বাড়িখানাকে দেখালো লম্বা একটা চালাঘরের মতো। দেয়ালগুলোয় এবং ছাদে পুরু এক পর্দা বরফ লেপ্‌টে থাকায় মনে হ'লো, বরফের বর্মটা হয় বাড়িখানাকে লুকোতে চাচ্ছে আর নয় তো চাচ্ছে পিষে দিতে। দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে পাশ্‌কা ব'ললো:

"অন্যান্য বাড়ি থেকে এ-বাড়িটা একেবারে আলাদা। মেয়েগুলোকে সিদোরিহা ঘর দিয়েছে, খেতে দেয়, আর থাকা-খাওয়া বাবদ এদের প্রত্যেকের

কাছ থেকে মাসে পঞ্চাশটি ক'রে টাকা নেয়। মাত্র চারজন মেয়ে থাকে এখানে। এখানে তুমি মদও পাবে বীয়ারও পাবে, চাইকি মেঠাইও পাবে নানা রকমের। তাছাড়া আর যা যা দরকার তা তো পাবেই। তবে সিদোরিহা মেয়েগুলোর ওপর কোনো কড়াকড়ি নিয়ম খাটায় না: যার ইচ্ছে বাইরে যায়, যার ইচ্ছে বাড়িতেই থাকে, কিন্তু মাসের শেষে তাকে ঐ পঞ্চাশটা টাকা গুনে দেওয়া চাইই চাই। তাহ'লেই বুঝতে পারছো বেশ-কিছু টাকা না খসালে এখানে দাঁত ফোটানোই মুশকিল, আর মেয়েগুলো টাকা উপায়ও করে অনায়াসে। ধরো না কেন, এদেরই একজন—ওলিম্‌পিয়াদা—সে তো তিরিশ টাকার কম রাজীই হয় না।"

পোষাক থেকে তুষারের আঁশগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"আর তোমারটি—তাঁর দর কতো?"

একটু ভেবে মৃদু স্বরে জবাব দিলো গ্রাৎচফ্‌:

"জানি না, তবে সেও মাগগি।"

এমন সময় দরজার পিছনে খশ্‌খশ্‌ ক'রে একটা শব্দ হ'লো এবং একফালি সোনালী আলো কেঁপে উঠলো বাতাসে।

"কে?"

"আমি, ভাস্কা সিদোরফ্‌না,—আমি গ্রাৎচফ্‌!"

"ও!"

সদর দরজাটা খুলে যেতেই দেখা গেলো মোমবাতি হাতে নিয়ে একটি বিপুল-নাসা, লোলাঙ্গী বৃদ্ধা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্‌কার দিকে বাতিটা উঁচিয়ে ধ'রে মোলায়েম গলায় ব'ললো বুড়িটা:

"কি খবর পাশ্‌কা? এদিকে ভেরা তো তোমার জন্যে ছট্‌ফটিয়ে ম'রছে। তোমার সংগে উটি কে?"

"আমার এক বন্ধু।"

অন্ধকার লম্বা দালানটা থেকে কে একজন সুরেলা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো:

"কে এয়েচে গো?"

বুড়ি ব'ললো : "ভেরাকে খুঁজছে, লিপচ্‌কা।"

দালান থেকে আবার সেই সুরেলা গলার শব্দ ভেসে এলো :

"ভেরা, তোর মরদ এয়েচে রে!"

এবার চলনপথের এক-টেরের একটা দরজা চট্‌ ক'রে খুলে গেলো এবং দেখা গেলো আলোর কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি শুক্লবসনা তন্বী, যার দুটি কাঁধে ছড়িয়ে র'য়েছে সোনালী কেশের গুচ্ছ। জড়ানো গলায়, খেয়ালীর মতো, ফিশফিশিয়ে ব'ললো মেয়েটি :

"বাব্বা, তোমার যেন আসার সময়ই হয় না!"

তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ছিপছিপে দেহটি তুলে, পাশ্‌কাব কাঁধে দুখানি হাত রেখে, মোলায়েম বাদামী-চোখদুটি মেলে সে তাকালো ইলিয়ার দিকে।

পল্‌ ব'ললো :

"উটি আমার বন্ধু—ইলিযা লুনেফ। ওর সংগে দেখা হ'য়ে যাওয়াতেই তো আমার এতো দেরি হ'যে গেলো।"

স্বাগত জানিয়ে মেয়েটি ইলিযার দিকে তার হাতখানি বাড়িয়ে দিতেই তার সাদা ব্লাউজেব ঢিলে হাতাটা প্রায় তার কাঁধ পর্যন্ত হ'ড়কে গেলো। নিঃশব্দে, সসম্মানে এবং সতর্কভাবে তার করমর্দন করবার সময় ইলিয়া অনুভব ক'রলো মেয়েটার হাতখানা শুকনো এবং গরম। কোনো গভীর বনে উৎপাটিত গাছ-গাছড়ার মধ্যে একটা সুঠাম ও সুগন্ধ বার্চবৃক্ষকে দেখে মানুষ যেভাবে মুগ্ধ হয়, ঠিক তেমনি মুগ্ধ হ'য়ে ইলিয়া পলের সাথীটির দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ভিতরে ঢুকবার সময় মেয়েটি যখন একপাশে স'রে গিয়ে ওর যাবার জায়গা ক'রে দিলো, তখন ও নিজেই একপাশে স'রে এসে সসম্ভ্রমে মাথাটা নুইয়ে ব'ললো তাকে :

"তুমি আগে যাও!"

সংগে সংগে হেসে উঠে ব'ললো মেয়েটি :

"এ যে দেখছি ভদ্রতার চূড়ান্ত।"

তার হাসিটি বেশ—যেমন তরতরে তেমনি প্রফুল্ল।

হাসতে হাসতে পল্‌ও ব'ললো :

"ভেরা, তুমি ওকে স্রেফ জাদু ক'রে দিয়েছো। দেখছো না ও কি-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে ?—যেন মধুভাণ্ডের সামনে ভাল্লুক !"

মেয়েটি তখন দুষ্টুমি-ভরা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে :

"তাই না কি ?"

মুচকি হেসে জবাব দিলো ইলিয়া :

"একেবারে তা ই। তোমার রূপে আমি কুপোকাত।"

সংগে সংগে খুশির হাসি হাসতে হাসতে পল্ শাসালো ইলিয়াকে :

"একবার ওর প্রেমে প'ড়ে দেখো দেখি, তাহ'লে তোমায় খুন ক'রে ফেলবো।"

ওর প্রিয়ার সৌন্দর্য যে ইলিয়াকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে এতে যারপর নাই খুশি হ'লো পল্। ভেরার দিকে চেয়ে ওর বুকখানা গর্বে ফুলে উঠলো। এদিকে ভেরা যেন নিজেকে নিয়েই নিজে মেতে থাকে, তার হাবভাবে প্রকাশ পায় একটা নির্দোষ নির্লজ্জতা। সে যে নারী এবং নারীর যে একটা বিশেষ শক্তি আছে, সে-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। বরফের মতো সাদা শেমিজের ওপর তুষারশুভ্র একটি ব্লাউজ ছাড়া ওর গায়ে আর কিছুই নেই ; তারপর ব্লাউজের বোতামগুলো খোলা থাকায় ওর মজবুত এবং দৃপ্ত যৌবনটা কেবলই উঁকি মারতে থাকে ভেতর থেকে, সর্বোপরি, ছেলেমানুষের মতো একটা আত্মপ্রসাদের হাসিতে ফুরফুর ক'রতে থাকে ওর লাল-টুকটুকে ঠোঁটদুখানা। একটা বাচ্চা মেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার পুতুলটাকে যেমন অক্লান্তভাবে তারিফ করে, মনে হ'লো ঠিক তেমনি ক'রে ভেরাও নিজেকে নিজে তারিফ ক'রছে। ইলিয়া ওর দিক থেকে চোখদুটো যেন ফিরিয়ে নিতে পারলো না, ব'সে ব'সে দেখতে লাগলো কি লীলায়িত ভংগিতেই না ভেরা মাথা উঁচু ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে পলের দিকে, কখনো হাসছে, আবার কখনো কথা ব'লছে। নিজের যে এমন একটি সংগিনী নেই এটা ভাবতেই ইলিয়া বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো, এবং চুপচাপ ব'সে ধিক্কার দিতে লাগলো নিজের অদৃষ্টকে।

সাজানো-গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় আলো থইথই ক'রতে থাকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে র'য়েছে চাদর-ঢাকা একখানা টেবিল এবং টেবিলের ওপর বসানো র'য়েছে একটা ধূমায়মান, মুখর কেৎলি। কেৎলিটা থেকে শুরু ক'রে

সবকিছুই চকচকে নতুন—কাপ ডিশ মদের বোতলটা পর্যন্ত। একখানা রেকাবিতে র'য়েছে খানিকটা রুটি আর মাংসের কাবাব। সব কিছুই এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ইলিয়া খুশি না হ'য়ে পারলো না। সেইসংগে ওর হিংসাও হ'লো পলের ওপর। এদিকে পল্ আনন্দে মশগুল হ'য়ে একটা কবিতা আওড়াতে লাগলো :

"দেখলেই তোমাকে
মনে হয় রোদ্দুর
হাসছে !
ভুলে যাই দুঃখ,
মনে হয় অন্তর
নাচছে !
ভালো লাগে বাঁচতে
যদি দেখি তোমাকে
একবার !
ভালো লাগে ব'লতে :
'তুমি প্রিয়া আমারি'
লাখবার।"

শুনেই খুশিতে ফেটে প'ড়লো ভেরা :

"পাশ্‌কা, সোনার পাশ্‌কা—কী সুন্দর কবিতা !"

"তাজা—হাতে গরম !—ওহে ইলিয়া, এখনো কি তোমার আশ মিটলো না ওকে তারিফ ক'রে ? ওর দিকে আর নজর নয়, এবার নিজের একটি জোগাড় করো।"

ইলিয়ার চোখের ওপর চোখ রেখে মেয়েটি কেমন একটা অদ্ভুত নতুন গলায় ব'ললো :

"আর—বেশ—সুন্দোর একটি !"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুচকি হেসে ব'ললো ইলিয়া :

"কিন্তু তোমার চেয়ে সুন্দর মেয়ে পাবো কোথায় ?"

মৃদু স্বরে ভেরা ব'ললো :

"যার বিষয়ে কিছুই জানো না তাকে নিয়ে কথা ব'লো না।"

তখন ইলিয়ার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে ব'ললো পাশ্‌কা:

"ও জানে। বুঝলে, আছি বেশ আছি, কিন্তু কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়লেই বুকে যেন ছুরি বেঁধে!"

ইলিয়া দেখলো ভেরার কানদুটো লাল হ'য়ে গেছে।

টেবিলের ওপর মাথা নুইয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে ব'ললো ভেরা:

"ও নিয়ে দুঃখ ক'রো না। মনে মনে বলো: একদিনের জন্যে হ'লেও সে আমার! তুমি কি ভাবো আমিই সুখে আছি?—না। কিন্তু তাহ'লেও সুখের সংগে দুঃখকে মেশাতে আমি নারাজ। জানো তো একটা গানে আছে: 'দুঃখ পাই একা পাবো, সুখের দিনে ভাগ দেবো'।"

ভেরার কথাগুলো শুনতে শুনতে পল্ ভ্রূ কোঁচকাতে থাকে।

ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো ওদের এমন কিছু বলে যাতে ওরা আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ও ব'ললো:

"বাঁধন যখন খুলতেই পারবে না, তখন করাই বা কী যাবে? তবে তোমাদের দুজনকে শুধু এইটুকু ব'লতে পারি যে, আমার যদি দু হাজার কি দশ হাজার টাকা থাকতো তাহ'লে ব'লতাম: 'নাও, সব নাও, নিয়ে তোমরা সুখী হও!' কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের ভালোবাসাটা খাঁটি, তোমাদের বিবেক সাফ।—আব, এ-ছাড়া ভাববারই বা কী আছে!"

ব'লতে ব'লতে ইলিযার দেহের মধ্যে দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়। তারপর ও যখন দেখলো যে ভেরা মুখখানা তুলে ওর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এবং পল্ ওর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আরও কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে, তখন ও উত্তেজনা চাপতে না পেরে চেয়ার ছেড়েই উঠে প'ড়লো এবং ব'লতে লাগলো হুড়হুড় ক'রে:

"তোমার মতো রূপ আমি এই প্রথম দেখলাম, মানুষ যে মানুষকে কতোটা ভালোবাসে তাও দেখলাম এই প্রথম, আর পল্—তোমার যে দর কতো তাও বুঝলাম এই প্রথম। এই—এইখানে দাঁড়িয়ে আমি খোলাখুলি ব'লছি—তোমার ওপর আমার হিংসা হ'চ্ছে পল্। দুঃখও হ'চ্ছে যতোটা, আনন্দও হ'চ্ছে ততোটা। ভগবানের কৃপায় তোমরা যেন সুখী হও। কিন্তু এ-ছাড়া আমার

যা বলবার আছে তা হ'লো এই : চুভাশ আর মর্দ্‌এৎ-দের আমি ঘৃণা করি, তাদের দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে! তাদের চোখগুলো ফুলোফুলো, দেহগুলো নোংরা। কিন্তু তারা যে-নদীতে চান করে আমিও সে নদীতে চান করি, তারা যে-জল খায় আমিও সে-ই জল খাই। তারা নোংরা ব'লে কি আমি নদীর জল ব্যবহার ক'রবো না? ক'রবো। কিন্তু কেন? আমার বিশ্বাস ভগবান তা শুচি ক'রে দেন!"

উত্তেজিতভাবে পল্ ব'ললো :

"ঠিক ব'লেছো ইলিয়া! তুমি মানুষ ভালো!"

মৃদু স্বরে ভেরা ব'ললো :

"তবে তোমাকে পরিষ্কার ঝর্ণার জলও খেতে হবে।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কিন্তু পাবো কোথা? তার চেয়ে বরং তুমি নিজের হাতে আমাকে এক পেয়ালা চা দাও, ভেরা।"

মেয়েটি ব'লে উঠলো :

"লক্ষ্মী ছেলে! সত্যি কত্তো ভালো তুমি!"

গম্ভীরভাবে ইলিয়া ব'ললো : "ধন্যবাদ!"

তারপর ভেরাকে অভিবাদন জানিয়ে ব'সে প'ড়লো চেয়ারে।

ইলিয়ার বক্তৃতা এবং গোটা দৃশ্যটাই পলের মনের ওপর মদের মতো কাজ ক'রলো। রাঙা হ'য়ে উঠলো তার মুখখানা, চোখদুটো চকচক ক'রতে লাগলো উত্তেজনায়। তিড়িং ক'রে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, ঘরময় পায়চারী ক'রতে ক'রতে ব'লতে লাগলো সে :

"ধুত্তোর্! মাঝে মাঝে যেন ভূতে পায় আমাকে! যতক্ষণ মনটা ছেলেমানুষের মতো থাকে, ততক্ষণই বেঁচে আরাম এই দুনিয়ায়! দেখছি, তোমাকে এখানে এনে ভালোই ক'রেছি, ইলিয়া; মনে তবু একটু শান্তি পেলাম। এসো, এক চুমুক মদ খাওয়া যাক! ভেরা, লক্ষ্মীটি, ঢেলে দাও না।"

পলের দিকে মিষ্টি ক'রে তাকিয়ে, একটু মুচকি হেসে ব'ললো ভেরা :

"যাক্, ওর মুখে আবার হাসি ফুটেছে!"

তারপর ইলিয়ার দিকে চেয়ে ব'ললো সে :

"ওর ধরণই ঐ : কখনো রামধনু, আবার কখনো বা কালো মেঘের মতো থমথমে, ক্রুদ্ধ।"

গম্ভীরভাবে ইলিয়া ব'ললো : "কিন্তু সে তো ভালো কথা নয়!"

আর তারপরই তিনজনের হাসিতে খুশিতে কথায় গল্পে ঘরখানা মুখর হ'য়ে উঠলো; মনে হ'লো যেন তিনটে ঝর্ণা পরস্পর পরস্পরকে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। কে-একজন জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"ভেরা, আসতে পারি কি?"

"এসো এসো!—ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌—ইনি আমার সখী লিপা।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই ইলিয়া দেখলো একজন ঢ্যাঙা ছিপছিপে মেয়েমানুষ ওর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো স্ত্রীলোকটির বেশবাস থেকে। তার চোখের তারাদুটো নীল; দৃষ্টিটা স্থির; গালদুখানা তাজা আর গোলাপী, এবং তার খয়েরী রঙের চুলগুলো মাথার ওপর চূড়ো ক'রে বাঁধা, যার জন্যে তাকে আরও ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।

"একলাটি ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠছিলাম; তারপর শুনতে পেলাম তোমরা বেশ গলা ছেড়ে হাসছো, গল্প ক'রছো। তাই চ'লে এলাম। এসে তোমাদের আলাপে ব্যাঘাত ক'রলাম না তো? ওমা, এখানে যে দেখছি আরেকটা মানুষও একলা ব'সে র'য়েছে—বিবিহীন হ'য়ে। ভেরা, তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তাহ'লে এই ভদ্দরলোককে আমি একটু আপ্যায়েত করি।"

এই ব'লে, অনায়াসে একখানা চেয়ার টেনে এনে, ইলিয়ার মুখোমুখি ব'সে জিজ্ঞাসা ক'রলো সে :

"কি, একা-একা ব'সে থাকতে ভালো লাগছে এমনি ক'রে? বলোই না আমায়? ওরা তো দুটিতে মিলে খুব প্রেম ক'রছে। ওদের ওপর তোমার হিংসে হ'চ্ছে, না?"

এমনধারা গায়ে-পড়া আলাপে ইলিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলো। ব'ললো :

"এদের কাছে থাকলে খারাপ লাগবার তো কোনো কারণ নেই।"

স্ত্রীলোকটি শান্তভাবে ব'ললো: "বেচারী!"

তারপর ইলিয়ার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভেরাকে ব'লতে লাগলো সে:

"বুঝলে, কাল সন্ধ্যেবেলা এক মঠে গিয়েছিলাম—ঐ যে গো, কুমারী মেরীর মঠ। গিয়ে দেখলাম এক দঙ্গল মেয়ে গান গাইছে। তাদের মধ্যে একটি সন্ন্যাসিনীকে দেখে আমার চক্ষু স্থির হ'য়ে গেলো। আহা, মেয়েটার কি রূপ! তার দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম: এই মেয়েটা সন্ন্যাসিনী হ'লো কোন্ দুঃখে? তার জন্যে বড়ো মায়া হ'লো আমার।"

ভেরা ব'ললো: "আমি হ'লে তার জন্যে দুঃখ ক'রতাম না।"

"হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই! তবে তোমাকে কি আর আমার চিনতে বাকি আছে?"

লিপার পোষাকের মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাসটা আমোদিত হ'য়ে ওঠে, আর সেই গন্ধটুকু মদের মতো গিলতে গিলতে ইলিয়া লিপার পানে আড়চোখে চেয়ে তার কথাবার্তা শুনতে থাকে। লিপার গলার আওয়াজটা আশ্চর্যরকমের শান্ত এবং এক সুরে বাঁধা; কিন্তু তাতে এমন একটা মাদকতা আছে যা ঢুলুনি এনে দেয়। শুধু পোষাক নয়, তার কথাগুলো থেকেও এমন একটা মন-মাতানো কড়া মিষ্টি গন্ধ ছাড়ে যা নেশা ধরিয়ে দেয়।

"বুঝলে ভেরা, কেবলই ভাবছি পলুএক্‌তফের কাছে যাবো কি না। যাবো কি?"

"আমি জানি না।"

"হয়তো যাবো। প্রথমত, সে বুড়ো; দ্বিতীয়ত, তার পয়সা আছে। কিন্তু লোকটা লোভী। আমি তাকে ব'লছি: 'ব্যাংকে আমার নামে হাজার আষ্টেক টাকা রেখে মাসে মাসে আমায় শ আড়াই ক'রে দিয়ে যাও'। কিন্তু তার কথা হ'লো ব্যাংকে পাঁচ হাজার, আর মাসিক দেড় শো।"

ভেরা ব'ললো: "লিপ্‌চকা! এসব কথা এখন থাক্।"

লিপা শান্তভাবে জবাব দিলো: "বেশ, থাক্।" তারপর ইলিয়ার দিকে আবার ফিরে ব'ললো:

"এসো ইয়ং ম্যান, তার চেয়ে বরং তোমার সংগেই একটু গল্প করি। তোমাকে আমার ভালোই লাগছে, বুঝলে? তোমার মুখখানি যেমন স্থন্দোর, চোখদুটিও তেমনি গম্ভীর। তোমার নিজের কি মনে হয়?"

বিব্রতভাবে হাসতে হাসতে ব'ললো ইলিয়া :

"কিছুই না।"

ওর মনে হ'লো স্ত্রীলোকটা যেন ওকে মেঘের মতো আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে।

"কিছুই না? এঃ, একেবারে নিরামিষ তুমি! কি কাজ করো?"

"আমি ফেরিওলা।"

"ও! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি কোনো ব্যাংকে কিংবা কোনো ভালো দোকানে চাকরি করো। যাই হ'ক, এদিকে তো বেশ ফিটফাট থাকো দেখছি?"

ইলিযা ব'ললো : "আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'যে থাকতে ভালোবাসি।"

গরমে ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে, আর মিষ্টি গন্ধে ওর মাথাটা যেন ঝিমঝিম ক'রতে থাকে।

"তাই না কি? তা ভালো। কিন্তু তোমার আক্কেল আছে তো?"

"তার মানে?"

নীলচোখো স্ত্রীলোকটি শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"মানে, এখানে যে তোমাকে কুলোচ্ছে না—এটা বুঝতে পারছো না?"

থতমত হ'য়ে ইলিযা ব'ললো :

"তাই তো! আচ্ছা, তাহ'লে আমি উঠি!"

"যেয়ো না একটু দাঁড়াও! ভেরা, এই ছোকরাটিকে আমি নিয়ে যেতে পারি?"

"ও যদি যায় নিয়ে যাও!"—এই ব'লে ভেরা হেসে উঠলো।

বিপন্নভাবে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কোথায়?"

"ন্যাকা যেন, গিয়েই দেখো না কোথায়!"—চড়া গলায় ব'ললো পল্।

ইলিয়া স্রেফ তাজ্জব ব'নে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো বোকার মতো। কিন্তু স্ত্রীলোকটা ওর হাত ধ'রে ওকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ব'লতে লাগলো ধীর গলায় :

"তুমি লাজুক হ'লেও আমি যেমন খামখেয়ালী তেমনি জেদী। যদি ভাবতাম যে সূর্যকে নিবিয়ে দেবো তাহ'লে ছাদে উঠে ফুঁ-এর পর ফুঁ দিয়েই যেতাম, যতক্ষণ না শেষ নিশ্বাসটুকু বেরিয়ে যায়। বুঝলে তো আমি কেমন ধারা মেয়ে?"

লিপার হাতে হাত দিয়ে এগোতে এগোতে ইলিয়া কিছুই বুঝলো না, এমন কি তার কথাগুলো শুনলোও না পর্যন্ত, কেবল অনুভব ক'রলো লিপার দেহটা বেশ তাজা, নরম এবং সুবাসিত।

জীবনে আঘাত তো কম পায় নি ইলিয়া, কিন্তু এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতার প্রথম দিকটায় ও এতোই অভিভূত হ'য়ে প'ড়লো যে, মনে হ'লো আঘাতের দাগটুকুও মুছে গেছে ওর অন্তর থেকে। একটা আত্ম-প্রসাদে এবং বিজয়-গর্বে ওর মনটা ভ'রে তো উঠলোই, উপরন্তু একজন সুন্দরী সুবেশা যুবতী প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখেই ওকে যে স্বেচ্ছায় তার মহার্ঘ চুমুগুলো দেদার বিলিয়ে যাচ্ছে—এতে নিজের সম্বন্ধে ওর ধারণটা আরও উচ্চ গ্রামে পৌছলো। ওর মনে হ'লো ওর জীবনটা যেন কোনো চওড়া নদীর এক শান্ত ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে চ'লেছে, আর সেই ঢেউটা ওকে আদর ক'রছে, শক্তি দিচ্ছে, সাহস যোগাচ্ছে।

ইলিয়ার কোঁকড়া চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে কিংবা ওর হালকা কালো গোঁফটায় আঙুল বুলোতে বুলোতে ব'লতো ওলিম্পিয়াদা :

"বুঝলে মানিক, তোমাকে যতোই দেখছি ততোই ভালো লাগছে। তোমার ভেতরটা যেমন মজবুত, তোমাকে বিশ্বাসও করা চলে তেমনি। তাছাড়া দেখছি, যা চাও তা তুমি জয় ক'রে নিতেও জানো। এটা ভালো। এখানে তোমার আমার মধ্যে বেশ একটা মিল আছে। আমার বয়েস যদি আরও কম হ'তো তাহ'লে আমি তোমায় বিয়ে ক'রতাম, আর আমাদের জীবনটা হ'তো গানের মতোই চিকন।"

ওলিম্পিয়াদাকে ইলিয়া সম্মান তো ক'রতোই, উপরন্তু ওর মনে হ'তো লজ্জাকর জীবন যাপন ক'রলেও স্ত্রীলোকটার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে এবং চালাক-চতুরও সে। ওর জানাশোনা আর যে-কটা স্ত্রীলোক ছিলো তাদের থেকে ওলিম্পিয়াদা ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারণ সে মাতালও হ'তো না, আর নোংরা কথাও মুখে আনতো না কখনো। ওলিম্পিয়াদার দেহটা ছিলো যেমন নরম আর মজবুত, তার গলার আওয়াজটাও ছিলো তেমনি তাজা আর জোরালো। শুধু তাই নয়, তার চরিত্রের মতোই তার দেহখানি ছিলো লালিত্যময়। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে সে ছিলো হিসেবী, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে ভালোবাসতো সে এবং সুশৃংখল জীবনে সে ছিলো বিশ্বাসী। উপরন্তু আলাপ আলোচনায় সে ছিলো যেমন নিপুণ, চালচলনেও ছিলো তেমনি স্বতন্ত্র, এমন কি বেশ কিছুটা গর্বিতও। এ সবই ভালো লাগতো ইলিয়ার। কিন্তু মাঝে মাঝে, ঘরে ঢুকেই ও যখন দেখতো যে ওলিম্পিয়াদা ফ্যাকাশে-মুখে, এলোমেলো-চুলে বিছানায় প'ড়ে আছে, তখন তার প্রতি একটা যন্ত্রণাদায়ক বিতৃষ্ণায় ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠতো এবং স্ত্রীলোকটার নিষ্প্রভ চোখ দুটোর পানে নিঃশব্দে কঠোরভাবে তাকিয়ে গুড্-মর্ণিং-টুকুও বলবার মতো প্রবৃত্তি হ'তো না ওর।

ওলিম্পিয়াদা হয়তো তখন ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারতো, তাই কম্বল মুড়ি দিতে দিতে ব'লতো :

"যাও যাও, ভেরার কাছে যাও! অমনি বুড়িকে ব'লো কিছু বরফ আর জল দিয়ে যেতে।"

তখন ইলিয়া ভেরার ছোটো পরিষ্কার ঘরখানায় চ'লে আসতো এবং ভেরা ওর অপ্রসন্ন বিষণ্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতো নীরবে। একদিন ভেরা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তারপর ইলিয়া য়াকফ্লিচ, গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে মাঝে মাঝে কাঁটা ফোটে, কি বলো?"

ইলিয়া জবাব দিলো :

"যাই বলো ভেরচ্কা, তোমার পাপগুলো হ'লো গিয়ে বরফের মতো—তুমি একটু হাসলেই তা গ'লে যায়!"

অনুকম্পার সুরে ব'ললো মেয়েটি :

"তোমাদের দুজনের জন্যেই ভারি দুঃখ হয় আমার।"

ইলিয়া ভেরাকে ভালোবাসতো; শুধু তাই নয়, একটা বাচ্চা মেয়ের জন্যে মানুষ যে-ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে থাকে, সেও তেমনি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতো ভেরার জন্যে; তাছাড়া ভেরা ও পলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হ'লে ও সত্যি সত্যিই কষ্ট পেতো এবং হামেশাই চেষ্টা ক'রতো তাদের মধ্যে একটা মিটমাট ক'রে দিতে। ভেরা যখন তার সোনালী চুলগুলো আঁচড়াতো কিংবা গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে এটা-ওটা সেলাই

ক'রতো, তখন ইলিয়া ভেরার কাছটিতে ব'সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তার মুখের পানে। মাঝে মাঝে ইলিয়া লক্ষ্য ক'রতো ভেরার বাদামী চোখদুটোয় একটা গভীর দুঃখের ছায়া প'ড়েছে এবং তার ঠোঁট দুখানা কাঁপছে একটা হতাশার তিক্ত হাসিতে। তখন মেয়েটাকে আরও বেশি ক'রে ভালো লাগতো ওর, তার দুঃখটা যে কী তা আরও ভালো ক'রে বুঝতে পারতো ও এবং যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রতো তাকে সান্ত্বনা দিতে। ভেরা ব'লতো :

"এভাবে বাঁচা যায় না, কেউ বাঁচতে পারে না, ইলিয়া য়াকফ্লিচ্। আমার জন্যে আমি ভাবি না, আমি কলংকিনী ; কিন্তু পল্ কেন আমার জন্যে কষ্ট পাবে ?"

"সেটা তার খুশি।"

সংগে সংগে ব'লে উঠতো ভেরা :

"সেটা ওর খুশি ?"

এমন সময় দেখা যেতো, ফিকে-নীল রঙের একটা ঢিলেঢালা ড্রেসিং-গাউন প'রে ওলিম্পিয়াদা এক-ফালি ঠাণ্ডা চাঁদের-আলোর মতো কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগে সংগে ওদের আলাপে ছেদ প'ড়তো।

"চলো মানিক, আমার ঘরে গিয়ে চা খাবে চলো! আর ভেরচ্কা তুমিও এসো—একটু পরে।"

ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে আসার দরুণ ওলিম্পিয়াদার স্বাভাবিক দেহশ্রী আবার ফিরে আসতো—সেই গোলাপী গাল, সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মজবুত দেহবল্লরী এবং সেই প্রশান্ত ধরণধারণ! রাজহংসীর মতো আগে আগে হাঁটতো ওলিম্পিয়াদা এবং তার পিছনে যেতে যেতে ইলিয়া অবাক হ'য়ে ভাবতো :

"এই এক ঘণ্টা আগেও যাকে দেখে এলাম নেহাতই একটা বেশ্যার মতো রাত কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় প'ড়ে আছে, সেই মেয়েটাই কি এই ওলিম্পিয়াদা ?"

চা খেতে খেতে ওলিম্পিয়াদা ব'লতো ইলিয়াকে :

"বড়োই দুঃখের কথা তুমি চাষার ছেলে, তাই পড়াশুনোও ক'রতে পারো নি বেশি দূর। কি ক'রে যে জীবন কাটাবে তাই ভাবছি। কিন্তু সে কথা যাক্, এইবার তোমার ঐ ফেরিওলাগিরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছুর চেষ্টা দেখো। র'সো, আমিই না হয় তোমাকে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেবো, যাতে তুমি ভালো ক'রে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারো। সবুর করো, আগে পলুএক্‌তফের কাছে যাই, তারপর একটা হিল্লে ক'রতে পারবো তোমার।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রতো ঃ

"মানে, ও কি তোমায় সেই আট হাজার টাকা দিতে রাজী হ'য়েছে ?"

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে জবাব দিতো ওলিম্‌পিয়াদা ঃ

"দেবে ঠিকই !"

ঘৃণাভরা গলায় ব'লতো ইলিয়া ঃ

"যাই হ'ক, ওকে যদি কোনোদিন তোমার সংগে দেখি তাহ'লে ওর ছাল চামড়া খুলে নেবো !"

"কেন ? ও তো আর তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে না !"

"নিচ্ছে না মানে ? আলবত নিচ্ছে !"

ঠাট্টার স্বরে ব'লতো ওলিম্‌পিয়াদা ঃ

"দূর, কি বাজে ব'কছো ! ও তো একটা নেহাতই বুড়ো-হাবড়া।"

"ঠাট্টা ক'রছো করো, কিন্তু একবার ধ'রতে পারলে আমি ওকে রেহাই দেবো না, বুড়ো-বয়সে ওর কামুকপনা ঘুচিয়ে দেবো একেবারে ! আর তাছাড়া ওর মতো একটা ছারপোকাকে টিপে মারলে এমন একটা কিছু পাপও হবে না আমার।"

সংগে সংগে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে ব'লতো ওলিম্‌পিয়াদা ঃ

"রক্ষে করো মানিক। অন্ততপক্ষে সেই টাকাটা ও আগে আমায় দিক, তারপর যা করবার ক'রো।"

ওলিম্‌পিয়াদা যা যা চেয়েছিলে সবই পেলো ব্যবসাদার পলুএক্‌তফের কাছ থেকে। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেলো ওলিম্‌পিয়াদার নতুন বাসার একখানা চমৎকার ঘরে ব'সে ইলিয়া মোটা মোটা কার্পেট এবং মখমলে-

মোড়া বিরাট বিরাট আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে ওর 'মনের মানুষ'-এর শান্ত কথাবার্তা শুনছে। ইলিয়া লক্ষ্য ক'রলো অবস্থার পরিবর্তনের সংগে ওলিম্-পিয়াদার মনে কোনো বিরাট পরিবর্তন আসে নি। এ-ক্ষেত্রে আনন্দের আতিশয্যটা হয়তো বেমানান হ'তো না। কিন্তু ওলিম্পিয়াদা আগে যেমন শান্ত ও সংযত ছিলো এখনো ঠিক তেমনিই। তাকে দেখে মনে হ'লো সে যেন কেবল একটা ফ্রক ব'দলে আর একটা ফ্রক প'রেছে। এর বেশি কিছু নয়!

"এখন আমার বয়েস সাতাশ। যখন তিরিশ হবে তখন প্রায় ষোলো হাজার টাকা আসবে আমার হাতে। তখন বুড়োকে তার কাজে পাঠিয়ে দেবো আর আমি হ'য়ে যাবো একেবারে ঝাড়া হাত-পা। বুঝলে ভাবুক, আমার কাছ থেকে শেখো কি ক'রে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়!"

তা সত্যি, মনের অনমনীয় দৃঢ়তা থাকলে যে কি ক'রে নিজের কাজ হাসিল করা যায়, তা ইলিয়া শিখলো এই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও যখন ভাবতো যে ওলিম্পিয়াদা আর-একটা লোককেও আদর-যত্ন করে, তখন অপমানে ও লজ্জায় ওর মাথাটা যেন মাটিতে লুটিয়ে প'ড়তো; তবে সেই সংগে ও স্বপ্নও দেখতো: একদিন ওর নিজের একখানি দোকান হবে আর পরিপাটী একটি বাসা হবে, যেখানে ও ওলিম্পিয়াদাকে আপ্যায়িত ক'রতে পারবে। অবশ্য, ইলিয়া নিশ্চিত ক'রে জানতো না এই মেয়েটাকে ও ভালো-বাসে কি না, তবে এইটুকু বুঝতো যে চতুরা এবং মনোহারিণী সংগিনী হিসাবে ওলিম্পিয়াদা অপরিহার্যা।

আর, এমনি ক'রে দেখতে দেখতে প্রায় তিনটি মাস কেটে গেলো।

তারপর।

সেদিন বুধবার। দিনের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে এসে পেফিশ্কা-মুচির এঁদো ঘরখানায় ঢুকতে গিয়ে ইলিয়া যা দেখলো তাতে সে অবাক না হ'য়ে পারলো না। দেখলো: টেবিলের ধারে ব'সে একটা ভদ্কার বোতল সামনে নিয়ে পের্ফিশ্কা বেশ রসিয়ে রসিয়ে হাসছে, আর তার ঠিক মুখোমুখী ব'সে র'য়েছে—জাকব।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে, মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, বিচলিতভাবে ব'লছিলো জাকব :

"আচ্ছা, বেশ, ভগবান যদি সবই দেখেন—সবই জানেন—তাহ'লে তিনি আমাকেও দেখছেন।—কি ব'লবো দাদা, সবাই আমাকে ত্যাগ ক'রেছে, আমার কেউ নেই—কেউ নেই, আমি একা। বাবা আমাকে ভালোবাসে না,—সে একটা দুশমন, সে চোর, শয়তান একটা। বলো, সত্যি কি না?"

পেফিশ্‌কা মুচি ব'ললো: "একেবারে সত্যি, য়াশা। দুঃখের হ'লেও সত্যি।"

উশকোখুশকো মাথাটা তেমনি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অতি কষ্টে জিভটা নেড়েচেড়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"তাহ'লে বোঝো, এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে? বাঁচবার জন্যে একটা বিশ্বাস চাই, কিন্তু কোথায় পাই সে-বিশ্বাস? বাবাকে বিশ্বাস ক'রতে পারি না। ইলিয়াও চ'লে গেছে। আর, মাশা—সে তো একটা এক-ফোঁটা মেয়ে। কি করি বলো তো? কার কাছে যাই? কার কাছে মনের কথা খুলে বলি? আমার কেউ নেই, পেফিশ্‌কা, দুনিয়ায় আমার কেউ নেই।"

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জাকবের কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো। ঘৃণাও হ'লো তার। দেখলো: জাকবের মাথাটা খেংরা কাঠির ডগায় আলুর চপের মতো দুলছে, আর পেফিশ্‌কার চুপসানো হ'লদে মুখখানায় খেলে বেড়াচ্ছে একটা খোসমেজাজী হাসির আলো। ইলিয়া যেন বিশ্বাস ক'রতে পারলো না যে এ-জাকব সেই আগেকার শান্তশিষ্ট জাকবই। বন্ধুর সামনে গিয়ে তিরস্কারের সুরে ব'ললো ইলিয়া :

"এখানে তুমি কি ক'রছো?"

চ'মকে উঠে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে জাকব তাকায় ইলিয়ার দিকে, তারপর বিষণ্ণভাবে একটু হেসে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে :

"আরে, ইলিয়া যে—না, কিছু না। ভাবলাম বাবা বুঝি!"

ইলিয়া আবার জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"বলি, এখানে তুমি ক'রছো কি?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ট'লতে ট'লতে ব'ললো পেফিশ্‌কা :

"ওকে আর জ্বালিয়ো না ইলিয়া য়াকফ লিচ্। ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। ও তো কারোর পাকা ধানে মই দেয় নি! ওর ইচ্ছে ও মদ খাবে, তাতে কার কি? হায় ভগবান!"

সংগে সংগে ককিয়ে উঠলো জাকব:

"ইলিয়া, বাবা—বাবা আমায় মেরেছে।"

ছাতিতে একটা ঘুষি মেরে পের্ফিশ কা ব'ললো:

"মেরেছেই তো, আমি তার সাক্ষী। নিজের চোখে আমি গোটা ব্যাপারটা দেখেছি,—চাই কি হলপ্ ক'রেও ব'লতে পারি! পেত্রুহা ওর দাঁত উপড়ে দিয়েছে, নাক ভেঙে দিয়েছে—"

ওপরের ঠোঁটখানা সমেত জাকবের গোটা মুখটা সত্যিই ফুলে উঠেছিলো। বন্ধুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে করুণভাবে একটু হেসে ব'ললো জাকব:

"আমাকে মারবে কেন? আমি কি কচি ছেলে? উনিশ বছর বয়স হয় নি আমার? তাছাড়া, আমি তো কোনো দোষ করি নি!"

ইলিয়া বুঝলো জাকবকে সান্ত্বনা দেওয়াও যেমন অসম্ভব, তাকে ঘৃণা করাও তেমনি শক্ত। কিছুই বুঝতে না পেরে ব'ললো সে:

"কিন্তু তোমার বাবা তোমাকে মারলো কেন? কি ক'রেছিলে?"

জাকবের ঠোঁট দুখানা ন'ড়ে ওঠে, কিন্তু কোনো কথাই বলে না সে। তার মুখখানা কাঁপতে থাকে, যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে যায়। তারপর চেয়ারে ব'সে প'ড়ে, হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধ'রে, ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে কাঁদতে শুরু ক'রে দেয় জাকব।

গেলাশে খানিকটা ভদ্কা ঢেলে ব'ললো পের্ফিশ্কা:

"কাঁদছে কাঁদুক, ওকে একটু কাঁদতে দাও। কাঁদলে পরে বুকটা হালকা হ'য়ে যাবে। ওদিকে মাশাও কাঁদছে—বেচারী মাশা—। মেয়েটা সব দেখে শুনে ব'ললো কি জানো? ব'ললো: 'নিকুচি ক'রেছে ওর বাবার। চোখ দুটো আমি খাবলে নেবো তার!' সে এক ফ্যাসাদ, আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম মাতিৎস্যার কাছে।"

ইলিয়া তবু জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কিন্তু আমি এখনো কিছু বুঝতে পারলাম না। বাপ-বেটায় লাগলো কেন?"

"বলছি, সবুর করো। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। অবিশ্যি যতো নষ্টের গোড়া তোমার ঐ তেরেন্স-কাকাই। সে হঠাৎ পেত্রুহাকে ব'লে ব'সলো: 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কিয়েভের মঠে চ'লে যাই!' শুনে পেত্রুহা অবিশ্যি খুশিই হ'লো। কুঁজোটা বহুদিন ওর পথের কাঁটা হ'য়ে র'য়েছে; আর সত্যি ব'লতে কি, তেরেন্স বিদেয় হ'লে পেত্রুহাও বাঁচে। কে আর চায় ব্যবসাতে ভাগীদার থাকুক? কেমন কি না? হা-হা-হা! তাই পেত্রুহা ব'ললো: 'আ-আচ্ছা, যাবে যাও। গিয়ে আমার জন্যেও একটু-আধটু প্রার্থনা ক'রো।' আর ঠিক এই সময় জাকবও হঠাৎ ব'লে বসে: 'আমাকেও যেতে দাও।'"

এই ব'লে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে পের্ফিশ্কা। তারপর মারাত্মক রকমের একটা ভ্রূকুটি ক'রে ফাঁপা গলায় ব'লতে থাকে:

"বেটার কথা শুনে বাপ তো রেগে টং। বলে: 'কি—কি ব'ললি হারামজাদা? তুই যাবি মঠে? তার মানে—তার মানে?' জাকব ব'ললো: 'আমিও তোমার জন্যে প্রার্থনা ক'রতে চাই!' তখন পেত্রুহা গর্জন ক'রে উঠলো: 'দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি কি ক'রে প্রার্থনা ক'রতে হয়!' কিন্তু জাকব তবুও নাছোড়বান্দা। ব'লতে থাকে: 'আমাকে যেতে দাও, ভগবান আমার প্রার্থনা গ্রহণ ক'রবেনই।' তারপরই শুরু হ'লো মার। ধাঁই ধাঁই ধাঁই। অবশেষে, ওর মুখের চেহারাটা যা হ'য়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছো।"

জাকব কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে ব'ললো:

"আমি ওর সংগে থাকতে পারবো না! আমি চ'লে যাবো এখান থেকে, গলায় দড়ি দেবো! আমাকে ও মারলো কেন? কেন, কেন, কেন? আমার মনের কথাটাই আমি ওকে ব'লেছিলাম। তাতে দোষের কি আছে?"

জাকবের কান্নাকাটি শুনে মুষড়ে প'ড়লো ইলিয়া, তারপর এঁদো ঘরখানা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কাঁধদুটো ঝাঁকালো অসহায়ভাবে। কাকা তীর্থ করতে যাচ্ছে শুনে অবশ্য খুশিই হ'য়েছে সে। গেলেই বাঁচা যায়। তখন সেও এই বাড়িখানার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, আর তারপর অন্য কোথাও গিয়ে ছোটোখাটো একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আলাদা হ'য়ে থাকবে—একা নিরিবিলিতে।

এই সব ভাবতে ভাবতে ইলিয়া যখন তার ঘরে ঢুকলো, তার পিছনে পিছনে এলো তেরেন্সও। তেরেন্সের মুখে হাসি যেন আর ধরে না, চোখের তারাদুটো আনন্দে যেন লাফাচ্ছে। কুঁজ ঝাঁকিয়ে ইলিয়াকে ব'ললো সে:

"আমি এখান থেকে চললাম ইলিয়া। উঃ, এ যে আমার কি আনন্দের দিন তা জানেন শুধু ভগবান! মনে হ'চ্ছে যেন জেল থেকে ছাড়া পেলাম, যেন অন্ধকার পাতাল থেকে আলোয় এলাম! সবই তাঁর ইচ্ছা—সেই ভগবানের। এখান থেকে আমার পালিয়ে যাওয়ায় যদি তাঁর সায় থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে আমার প্রার্থনাও তিনি না-মঞ্জুর ক'রবেন না।"

কাকার উত্তেজনায় এতোটুকুও উত্তেজিত না হ'য়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কিন্তু এদিকে জাকবের কোনো খোঁজ রাখো?"

"কেন কি হ'য়েছে?"

"মদ খেয়ে মাতাল হ'য়েছে।"

"হায় হায় হায়! ছি ছি, এসব খারাপ, বড়ো খারাপ! যত্তো সব ছেলেমানুষের কাণ্ড। জাকব ওর বাবাকে ব'লছিলো বটে আমার সংগে ওকে যেতে দিতে।"

"তোমার সামনেই কি ওর বাবা ওকে মারধোর ক'রেছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু মদ—"

ইলিয়া কঠোরভাবে ব'ললো:

"বুঝতে পারছো না? এই জন্যেই তো ও মদ খেয়েছে।"

"এই জন্যে? ছি ছি, কাণ্ড দেখো একবার!"

ইলিয়া দেখলো জাকবের কি হ'লো না হ'লো তা নিয়ে ওর কাকার এতোটুকুও মাথাব্যথা নেই। আর সেইজন্যে কুঁজোটার প্রতি ঘেন্নায় ওর মনটা কুঁচকে গেলো। এর আগে আর কখনো ও তেরেন্সকে এতোটা আনন্দিত হ'তে দেখেনি। তাছাড়া, জাকবের চোখে জল দেখে আসার ঠিক পরেই কাকার এতো ফূর্তি দেখে ইলিয়া গেলো চ'টে। কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে ভ'রে গেলো ওর মন। জানলার ধারে ব'সে কাকাকে ব'ললো ইলিয়া:

"হোটেলে যাও।"

"সেখানে মালিক আছে। কয়েকটা জরুরী কথা ছিলো তোর সংগে।"

"তাতে কি হ'য়েছে ?"

তখন কুঁজো তেরেন্স ভাইপোর কাছটিতে স'রে এসে রহস্যময় কণ্ঠে ব'লতে শুরু ক'রলো :

"আমাকে এখুনি তৈরি হ'য়ে নিতে হবে। এখন থেকে তুই তো একেবারে একলাটি প'ড়ে গেলি, তাই,—মানে—"

ইলিয়া ব'ললো :

"যা ব'লবে সোজাসুজি বলো।"

চোখ পিটপিটিয়ে প্রায় ফিশফিশ ক'রে ব'ললো তেরেন্স :

"সোজাসুজি ! তা—সেভাবে ব'লতে পারলে তো বেঁচেই যেতাম। কিন্তু সোজাসুজি বলা সহজ নয়।"

"আমার সম্বন্ধে কিছু ব'লবে ?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে প্রথমে - মানে আমি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছি—খুব বেশি নয় যদিও—।"

কাকার দিকে চেয়ে ইলিয়া কুৎসিতভাবে মুচকি হাসলো।

চ'মকে উঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো তেরেন্স :

"অমন ক'রে হাস্‌লি কেন ? হ্যাঁ, যা ব'লছিলাম—"

"জানি। যাক্, ধ'রে নেওয়া গেলো তুমি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছো।" 'জমিয়ে রেখেছো' শব্দ দুটো বেশ একটু টিপে টিপে উচ্চারণ ক'রলো ইলিয়া।

ভাইপোর দিকে না তাকিয়ে ব'লতে থাকে তেরেন্স :

"হ্যাঁ, তাই। মানে, শ তিনেক টাকা আমি মঠে দেবো স্থির ক'রেছি।"

"ও !"

"আর, শ দেড়েক টাকা দিয়ে যাবো তোকে।"

চট ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলো ইলিয়া : "দেড় শো ?"

সংগে সংগে সে উপলব্ধি ক'রলো এত্তোদিন ধ'রে নিজেরই অজান্তে মনের গভীরতম প্রদেশে সে এই আশাটাই পোষণ ক'রে এসেছে যে, কাকার কাছ

থেকে সে দেড় শোর বেশি টাকাই পাবে। নিজের ওপর চ'টে গেলো ইলিয়া। ছি ছি, এ-আশা সে ক'রলো কি ক'রে? এ-আশা অন্যায়, এ-আশা পাপ। সেই সংগে সে চ'টে গেলো কাকারও ওপর। কাকা কি না মাত্র দেড়শোটি টাকা দিতে চায় তাকে! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ইলিয়া শিরদাঁড়া সোজা ক'রে; তারপর ক্রুদ্ধভাবে দৃঢ় স্বরে ব'ললো কাকাকে:

"আমি তোমার চোরাই সম্পত্তি নেবো না, বুঝলে?"

কুঁজো তেরেন্সের মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো ভাইপোর দিকে। কথা ব'লবে কি, জিভে যেন পক্ষাঘাত হ'য়েছে। কাকাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ইলিয়া ব'ললো:

"হাঁ ক'রে দেখছো কি? তোমার টাকা আমি চাই না।"

ফাটা কাঁসির মতো গলায় ব'ললো তেরেন্স:

"দোহাই ভগবানের, একটু দাঁড়া ইলিয়া, আমার কথা শোন্।"

"শুনলাম তো।"

ইলিয়া দেখলো তেরেন্স কি-যেন ব'লতে গিয়েও ব'লতে পারছে না।

অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ফিশফিশ ক'রে ব'লতে থাকে তেরেন্স:

"ইলুশা, তুই আমার ছেলের মতো। তোরই মুখের দিকে চেয়ে, তোরই ভবিষ্যতের জন্যে আমি সেই পাপের বোঝা কাঁধে নিয়েছিলাম। টাকাটা নে, অমত করিস্ নি, আমার কথা রাখ্! নইলে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা ক'রবেন না।"

সংগে সংগে ব্যংগের স্বরে ব'ললো ইলিয়া:

"স্বীকার ক'রছো তাহ'লে! দোষটা ভাগাভাগি ক'রতে চাও, কি বলো? হায় ভগবান! আমি কি তোমায় ঠাকুর্দার টাকা চুরি ক'রতে ব'লেছিলাম? একবারও কি ভেবে দেখেছো কার টাকা চুরি ক'রেছিলে তুমি?"

হাস্যকরভাবে হাত দুটো বাড়িয়ে ব'ললো তেরেন্স:

"এটা বলা না-বলার কথা নয় ইলুশা। জন্মাবার আগে তুইও কি ব'লেছিলি যে আমায় জন্ম দাও? না, না, এ-টাকা তোকে নিতেই হবে। যীশুর দোহাই, টাকাটা নে ইলিয়া, নইলে আমায় অনন্ত নরক ভোগ ক'রতে হবে। ফিরে এসে আমি সমস্তটাই দিয়ে দেবো তোকে। কিন্তু আপাতত এই ক'টা টাকা রাখ্। মানিক আমার, সোনা আমার, আমার কথা

শোন্। তুই যদি এ-টাকাটা নিস্ তাহ'লে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করবেন। নইলে—।"

এইভাবে ইনিয়েবিনিয়ে মিনতি জানাতে থাকে তেরেন্স। কাঁপতে থাকে তার ঠোঁট দুখানা, ভয়ে তার চোখ দুটো ছানাবড়া হ'য়ে যায়। ইলিয়া বুঝতে পারে না কাকার দুঃখে সে হাসবে না কাঁদবে। অবশেষে সে ব'ললো :

"আচ্ছা, নেবো।"

আর, সংগে সংগে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। টাকাটা সে নিতে চায় নি, কিন্তু নেবার সংকল্প ক'রতেই নিজের কাছে কেমন যেন ছোটো হ'য়ে গেলো সে। তাছাড়া মাত্র দেড়শোটি টাকায় তার হবেই বা কি? দেড়শোর বদলে কাকা যদি তাকে হাজার দেড়েক টাকা দিতো তাহ'লে না-হয় সে এই নোংরা বিষণ্ণ জীবন থেকে বেরিয়ে, অন্য কোথাও গিয়ে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারতো। সে একা থাকতে চায়, ভিড় থেকে স'রে থাকতে চায়, সে চায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক শান্ত জীবন। হ্যাঁ, হাজার দেড়েক টাকা পেলে এ-জীবন সে পেতে পারতো বটে! একবার ও ভাবলো কাকাকে জিজ্ঞাসা করে চোরাই সম্পত্তির কতোটা প'ড়েছে তার ভাগে, কিন্তু এ কথাটা চিন্তা ক'রতেও ওর ঘৃণা বোধ হ'লো।

ওলিম্পিয়াদার সংগে তার পরিচয় হবার প্রথম দিনটি থেকেই সে ফিলিমনফের বাড়িখানাকে আর সহ্য ক'রতে পারছে না। নোংরামি, হৈ-হট্টগোল, ভিড়—এ সব আর আদৌ ভালো লাগছে না তার। মনে হ'চ্ছে, ঠাণ্ডা, ময়লা এবং চটচটে কতকগুলো হাত যেন অহরহ ওর দেহটাকে আঁকড়ে ধ'রে র'য়েছে।

এই চিন্তাটা আজ ওকে যেন বড়ো বেশি ক'রে পেয়ে ব'সলো। কি ক'রবে, কোথায় গিয়ে একটু শান্তি পাবে কিছুই ঠিক ক'রতে না পেরে প্রায় বিনা কারণেই ইলিয়া মাতিৎসার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ও ভাবতে লাগলো কোথায় যেন একটা অদ্ভুত আশংকা ঘাপটি মেরে রয়েছে, তাছাড়া এই বাড়িখানা হয়তো ওকে একদিন এমন কিছুর দিকে ঠেলে দেবে যা অপ্রত্যাশিত এবং ভয়াবহ।

এই সব ভাবনা ভাবতে ভাবতে মাতিৎসার ঘরে ঢুকে ইলিয়া দেখলো স্ত্রীলোকটা তার চওড়া বিছানাটার পাশে নড়বড়ে চেয়ারখানায় ব'সে র'য়েছে। ইলিয়া ঘরে ঢুকতেই মাতিৎসা তার দিকে তাকালো এবং একটা আঙুল নেড়ে ফিশ্‌ফিশিয়ে ব'ললো :

"আস্তে। ও ঘুমোচ্ছে।"

মাতিৎসার গলার আওয়াজটা বাতাসের খশ খশ্‌ শব্দের মতো শোনায়।

ইলিয়া দেখলো, জড়োসড়ো হ'য়ে বিছানার ওপর ঘুমোচ্ছে—মাশা।

চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে, চোখের তারাদুটো মারাত্মকভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে, ফিশফিশ ক'রে ব'ললো মাতিৎসা :

"কেমন দেখছো? আজকাল নিজের ছেলেপুলেকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না ওরা। যেন এক একটা কংস। কচি কচি ছেলে মেয়েগুলোর কি দোষ ব'লতে পারো? এমন বাপের মাথায় বাজ যে কেন ভেঙে পড়ে না তাই ভাবছি।"

উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে মাতিৎসার ফিশ্‌ফিশে কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া মাশার কম্বল-মোড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ভাবে মেয়েটার দশা কি হবে।

"জানো, শয়তানটা মাশার চুলের মুঠি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনেছে! অমন মিন্‌সের মুখে লাথি মারি আমি। ও একটা চোর, দুশমন, মাতাল! নিজের ছেলেটাকে তো মেরে আধমরা ক'রেছেই, তার ওপর এই কচি মেয়েটাকেও ঠেঙিয়েছে। ব'ললো কি না : 'তোদের দুটোকেই ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো বাড়ি থেকে।' বুঝলে? এখন এই মেয়েটা যায় কোথায় বলো তো?"

ওলিম্পিয়াদা একটা চাকরানীর খোঁজ ক'রছিলো সেটা মনে ক'রে ইলিয়া চিন্তিতভাবে ব'ললো :

"চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আমি হয়তো ওর একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দিতে পারি।"

তিরস্কারের সুরে ব'ললো মাতিৎসা :

"তুমি আর নাক নেড়ো না বাপু। কার্ত্তিকটি সেজে তো ঘুরে বেড়াচ্ছো।

না দাও ছায়া না দাও ফল, তুমি এমনই একটি গাছ। মাশার জন্তে তুমি কি আর একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারতে না? পারতে অনেক আগেই। মেয়েটার জন্তে দুঃখ হয় না তোমার?"

যাক, এখুনি ওলিম্পিয়াদার কাছে যাবার একটা ভালো ছুতো পাওয়া গেলো এই ভেবে তিরিক্ষে গলায় ব'ললো ইলিয়া:

"থামো দেখি, অতো ঘ্যানঘ্যান ক'রো না!"

এই ব'লে জিজ্ঞাসা ক'রলো সে:

"মাশার বয়স কতো হ'লো?"

"কতো আর, পনেরো। তবে তাতে কি যায় আসে? দেখে মনে হয় যেন বারো বছরের মেয়েটি, যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। এখনো নেহাতই বাচ্চা ও। ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে ব'লে তো আমার মনে হয় না। তাছাড়া ও বাঁচবেই বা কিসের আশায়? তার চেয়ে বরং ও ঘুমোক্, যদ্দিন ভগবান ওকে ডেকে না নিচ্ছেন ও ঘুমোক। এইটাই হয়তো ভালো ওর পক্ষে!"

চোখ-ভর্তি কুয়াশা নিয়ে ইলিয়া নেমে আসে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পৌছয় ওলিম্পিয়াদার বাড়ির দরজায়। অনেকক্ষণ ধ'রে কড়া নাড়ার পরও দরজাটা খুলে দেয় না কেউ। অবশেষে কে একজন চড়া গলায় সাড়া নেয় ভিতর থেকে:

"কে?"

গলাটা কার ঠিক ঠাহর ক'রতে না পেরে বিব্রতভাবে জবাব দেয় ইলিয়া:

"আমি।"

ওলিম্পিয়াদার কুৎসিত ঝিটা এসে দরজা খুলে দেয় আর কোনো প্রশ্ন না ক'রেই। দরজার পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করে সে:

"কাকে চাই?"

"ওলিম্পিয়াদা দানিলফ্না বাড়ি আছেন?"

এইবার দরজাটা হঠাৎ দু-হাট খুলে যায়, সেই সংগে এক ঝলক আলো এসে পড়ে ইলিয়ার মুখে। কিন্তু সামনে চাইতেই ওর মাথাটা যেন লাট্টুর মতো ঘুরে ওঠে।

ইলিয়া দেখলো ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা বুড়ো, তার হাতে

একটা লণ্ঠন, গায়ে ঢিলেঢালা টকটকে লাল একটা ড্রেসিং-গাউন। লোকটার মাথাজোড়া টাক, তার। ধারে ধারে অবশ্য পাকা চুলের বাহার। তাছাড়া থুতনিটা তার চ্যাপ্‌টা আলুর মতো। ইলিয়া দেখলো বুড়োর নোংরা পাকা দাড়িটা কাঁপছে ধূমায়মান প্রদীপ-শিখার তালে তালে। লোকটা ইলিয়ার দিকে তাকালো ধারালো চোখ দুটো কুঁচকে, সেই সংগে ঝাঁটার কাঠির মতো এক টুকরো গোঁফ-সমেত তার ওপর-ঠোঁটটা ন'ড়ে উঠলো ঠাট্টার আমেজে। এদিকে সরু ডাঁটার মতো তার কাল্‌চে হাতে লণ্ঠনটা কাঁপতে লাগলো থরথর ক'রে। জিজ্ঞাসা ক'রলো সে :

"কে হে তুমি? আচ্ছা, এসো ভেতরে এসো। কি চাই? পরিচয় কি তোমার?"

ইলিয়ার বুঝতে কষ্ট হ'লো না কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সংগে সংগে রাগে এবং লজ্জায় তার মুখখানা লাল হ'য়ে গেলো। তাহ'লে এই বুড়োটাই ওলিম্‌পিয়াদার সোহাগ চুমুতে ভাগ বসায়! ঘৃণায় রি-রি ক'রে ওঠে তার সর্বাঙ্গ।

চৌকাঠ পার হ'তে হ'তে বিষণ্ণ গলায় জবাব দিলো ইলিয়া :

"আমি একজন ফেরিওলা।"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা টিপে মুচকি হাসলো বুড়ো। তার চোখের পাতা দুটো লাল, তাতে লোম নেই একটিও, তাছাড়া তার মুখের ভিতরটা যেমন হ'লদে তেমনি নোংরা।

লণ্ঠনটা ইলিয়ার মুখের সামনে ধ'রে শেয়ালের মতো হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা ক'রলো সে :

"ফেরিওলা বুঝি? বেশ বেশ! তা,—কি ফেরি করা হয় শুনি?"

মাথা নুইয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে জবাব দিলো ইলিয়া :

"এই কুচো-কাচা সব জিনিষ—যেমন : চুলের ফিতে, স্নো, পাওডার—এই আর কি।"

"বটে বটে—বেড়ে জিনিষ তো সব—যাকে বলে একেবারে মিষ্টি জিনিষ।—হা-হা-হা! চুলের ফিতে, স্নো—বেশ বেশ। তা—ফেরিওলাসায়েব, এখানে আসা হ'য়েছে কোন্‌ প্রয়োজনে?"

"আমি ওলিম্‌পিয়াদা দানিলফ্‌নার সংগে একটু দেখা ক'রতে চাই।"

"বটে, বটে,—তার সংগে দেখা ক'রতে চাও? বেশ বেশ। কিন্তু কি জন্যে তা তো ব'ললে না?"

অস্তি কষ্টে ব'ললো ইলিয়া:

"আমার কিছু টাকা পাওনা আছে, সেটা নিতে এসেছি।"

এই কুচ্ছিত বুড়োটাকে কেমন যেন ভয়-ভয় ক'রতে থাকে ইলিয়ার। সেই সংগে ঘৃণায় মনটা যেন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। বুড়োর গলার আওয়াজটা শান্ত হ'লে হবে কি, তা যেন সাপের বিষে ভর্তি; তাছাড়া তার খুদে খুদে চোখ ছুটোর ব্যংগভরা দৃষ্টিটা এমনই ধারালো যে সেটা ইলিয়ার বুকে ছুঁচের মতো বেঁধে! লজ্জায় ও অপমানে ছটফট ক'রতে থাকে ইলিয়া।

"কি ব'ললে?—টাকা? পাওনা আছে? আচ্ছা, বেশ!"

তারপর বুড়ো ঝট ক'রে লণ্ঠনটা সরিয়ে নেয় ইলিয়ার মুখের সামনে থেকে, আল্‌তো ক'রে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় উঁচু হ'য়ে, তারপর তার থলথলে হ'লদে মুখখানা ইলিয়ার মুখের কাছে এনে, বিষাক্ত হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে:

"কিন্তু তোমার বিল কোথায়? দাও, বিলটা আমাকে দাও!"

ভয়ে ভয়ে এক-পা পেছিয়ে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া:

"কিসের বিল?"

"কিসের আবার? ওলিম্‌পিয়াদা দানিলফ্‌নার জন্যে তোমার মনিব তোমাকে দিয়ে কোনো বিল পাঠায় নি?—কোনো চিঠি? নিশ্চয়ই আছে তোমার কাছে। দাও, সেটা আমাকে দাও, আমি নিজেই নিয়ে যাবো ওলিম্‌পিয়াদার কাছে। বের করো, বের করো, ঝট্‌পট্ বের করো!—"

ব'লতে ব'লতে বুড়ো যতোই কাছে আসতে লাগলো, ইলিয়া ততোই পেছিয়ে যেতে লাগলো ভয়ে। শেষটায় প্রায় দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে হতাশ হ'য়ে, চীৎকার ক'রে ব'ললো ইলিয়া:

"আমার কাছে কোনো বিলও নেই, আর কোনো রকমের কোনো চিঠিও নেই!"

ইলিয়ার মনে হ'লো হয়তো বা কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের পিছনে যে এসে দাঁড়ালো সে আর কেউ নয়, তন্বী ওলিম্-

পিয়াদা নিজেই। এতোটুকুও বিব্রত না হ'য়ে ইলিয়ার পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে, শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো ওলিম্‌পিয়াদা :

"ব্যাপার কি, ভাসিলি গাভ্রিলোভিচ্? এতো হট্টগোল হ'চ্ছে কেন এখানে?"

"এই দেখো না, এক বেটা ফেরিওলা এসে ব'লছে তোমার কাছে টাকা পায়। তুমি না কি ওর কাছ থেকে চুলের ফিতে কিনে দাম দাও নি! হা-হা! নাও, এইবার ও নিজেই এসে হাজির, এই যে এইখানে।"

ব'লে, বুড়ো একবার ওলিম্‌পিয়াদার দিকে চায় একবার ইলিয়ার দিকে চায়। ওর চারধারে তাকে এভাবে ঘুরঘুর ক'রতে দেখে ওলিম্‌পিয়াদা ডান হাতের একটি দৃপ্ত ভংগিতে সরিয়ে দেয় বুড়োটাকে, তারপর সেই হাতখানা ড্রেসিং-গাউনের পকেটে গুঁজে কঠোরভাবে বলে ইলিয়াকে :

"তুমি অন্য কোনো সময়ে এলে না কেন?"

সংগে সংগে বুড়ো চিলের মত গলায় চেঁচিয়ে বলে :

"সত্যিই তো! বেকুব আর বলে কাকে! এমন সময়টিতে এসে হাজির যখন তোমাকে এতোটুকুও দরকার নেই! গাধা কোতাকার!"

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে ইলিয়া।

"এতো চেঁচিও না ভাসিলি গাভ্রিলোভিচ্, এতে তোমার শরীর খারাপ হ'তে পারে," এই ব'লে ইলিয়ার দিকে ফিরে ওলিম্‌পিয়াদা ব'ললো :

"কতো টাকা তুমি পাবে আমার কাছে? পাঁচ টাকা তো? এই নাও।"

সংগে সংগে বুড়ো আবার খেঁকিয়ে ওঠে :

"পেয়েছো তো? যাও, এবার বিদেয় হও! থাক, থাক, আমিই দরজাটা দিয়ে দিচ্ছি,—নিজেই দিচ্ছি!"

এই ব'লে ড্রেসিং-গাউনটা আরো ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে, দরজাটা খুলে ধ'রে ইলিয়াকে ব'ললো সে :

"যাও, বেরোও!"

বাইরে তখন হিম প'ড়ছে। বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া ভাবলো এই একটু আগে যা ঘ'টে গেলো তা কি স্বপ্ন না সত্য? এক হাতে টুপি নিয়ে অন্য হাতের মুঠোয় ওলিম্‌পিয়াদার দেওয়া টাকাটা শক্ত ক'রে ধ'রে

এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর ঠাণ্ডায় যখন তার মাথাটা টনটন ক'রে উঠলো, কনকনিয়ে উঠলো পা ছুটো, তখন সে টুপিটা মাথায় দিয়ে টাকা-সমেত হাত দুখানা পকেটে গুঁজে, মাথা নুইয়ে, ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলো। মনে হ'লো একটা বিকট যন্ত্রণা তার শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে প'ড়ছে, হৃদয়টা যেন জ'মে যাচ্ছে বরফের মতো। বাতাসটা ঠাণ্ডা তো নিশ্চয়ই, চারধারের আলোটুকু পর্যন্ত ঠাণ্ডা ঠেকলো। হাঁটতে হাঁটতে কেবলই ওর সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেই কুচ্ছিত বুড়োর টেকো হ'লদে মাথাটা, আর মনে হ'লো বুড়োটা মিটমিট ক'রে হাসছে—বিজয়গর্বে, হিংসায় এবং শয়তানিতে।

অন্যান্য দিন জিনিষপত্র ফেরি করবার সময় ইলিয়া হাঁকতো এটা চাই ওটা চাই ব'লে। কিন্তু সেই বুড়োটার সংগে দেখা হবার পরদিন বড়ো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে হাঁকলো না একটিবারও। তার বদলে সে বারেবার বিষণ্ণ-ভাবে তাকাতে লাগলো তার গুরুভার বাক্শোটার দিকে, আর সেই সংগে অনুভব ক'রতে লাগলো ঐ গুরুভার বাক্শোর মতোই একটা বোঝা যেন চেপে ব'সে আছে ওর বুকের ওপর। হাঁটতে হাঁটতে ও কেবলই মনে করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো সেই বুড়োটার কুটিল চাহনি, ওলিম্পিয়াদার শান্ত নীল চক্ষু দুটি, আর আগের দিন ওর পাওনা-টাকাটা মিটিয়ে দেবার সময় তার হাতের ভংগিটা। ঠাণ্ডাও প'ড়েছে বেশ। হিমেল বাতাসে উড়ন্ত বরফ কুচিগুলো ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকে ইলিয়ার মুখে।

দেখতে দেখতে ও পার হ'য়ে যায় কতো ল্যাম্প-পোস্ট, কতো বাড়ি, কতো দোকান। হঠাৎ, একখানা ছোটো দোকান পিছনে ফেলে আসতেই ওর কি-যেন মনে প'ড়ে যায়। দোকানটা ঘাপটি মেরে আছে গির্জা আর ব্যবসাদার লুকোভিন্-এর প্রকাণ্ড বাড়িটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। দরজায় লটকানো মরচে-ধরা পুরোনো সাইনবোর্ডটায় লেখা র'য়েছে :

"বি, জি, পলুএক্‌তফের পোদ্দারী দোকান। এখানে সোনা রূপার পুরাতন গহনা, সাচ্চা জরী, ছবির দামী ফ্রেম, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী এবং পুরাতন মুদ্রা ক্রয় করা হয়।"

দোকানটার দিকে চাইতেই ইলিয়ার মনে হ'লো কাঁচের দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে ছোট্টো মাথাটা নড়ে, কুচুটে হাসি হাসতে হাসতে সেই বুড়ো লোকটা যেন ওকে অভিবাদন জানালো। ইলিয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় দোকানে ঢুকে বুড়োটাকে আরও কাছ থেকে দেখে। কিন্তু ঢুকবে কোন্ অছিলায়? আরে, তাইতো, পকেটে যে কতকগুলো পুরোনো মুদ্রা র'য়েছে। সুতরাং, আর ঠেকায় কে তাকে? অন্যান্য ফেরিওলার মতো জিনিষপত্র বেচবার সময় তার হাতেও দুটো-একটা পুরোনো মুদ্রা এসে প'ড়তো। বেশ কয়েকটা জ'মলে সেগুলো সে বেচে দিতো

কোনো পোদ্দারের কাছে, লাভ থাকতো টাকায় প্রায় দু-আনা ক'রে। পকেটে হাত দিয়ে মুদ্রাগুলোর উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে ইলিয়া সেই ছোটো দোকানটার দিকে ফিরে চ'ললো।

কপাট সরিয়ে বাক্শো-সমেত নিজের দেহটাকে কোনোরকমে চৌকাঠ পার ক'রে, টুপিটা খুলে সে অভিবাদন জানালো বুড়োকে :

"কেমন আছেন ?"

অপরিসর কাউণ্টারের পিছনে ব'সে একটা বাচ্চা বাটালির ফলা দিয়ে পেরেকগুলো খুলতে খুলতে একখানা ছবির ফ্রেম ছাড়াচ্ছিলো বুড়োটা। কাজে একেবারে ডুবে ছিলো সে। ছবিখানা কোনো দেবতার। সদ্য-আগত যুবকটির পানে এক-পলক চেয়ে আবার সে ডুবে গেলো তার কাজে, তারপর মুখ না তুলেই কেঠো গলায় ব'ললো :

"ধন্যবাদ। কি চাই ?"

"আমাকে চিনতে পারলেন না ?" জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া।

বুড়ো ওর দিকে আর একবাব তাকালো আড়চোখে।

"হয়তো পেরেছি। কিন্তু কি চাই ?"

"কিছু মুদ্রা কিনবেন ?"

"কৈ, দেখাও।"

বাক্শোটাকে পিঠের ওপর ঠেলে দিয়ে ইলিয়া মনিব্যাগটা হাতড়াতে থাকে এ-পকেটে ও-পকেটে, কিন্তু পকেটটা যেন ও আব খুঁজে পায় না, কাঁপতে থাকে ওর হাতখানা, ঢিপ্‌ঢিপ ক'রে ওঠে ওর বুকটা, বুড়োর প্রতি ঘৃণায় ওর মনটা যায় কুঁচকে, কেমন যেন ভয় ক'রতে থাকে বুড়োটাকে, সেই সংগে নিশপিশ ক'রতে থাকে ওর ডান হাতখানা। কোটের ভিতর-পকেটটা হাতড়াতে হাতড়াতে ইলিয়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ছোট্টো টেকো মাথাটার দিকে, আব অনুভব করে ওর শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে যেন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে।

হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলো বুড়োটা :

"কৈ, তোমার হ'লো ?"

অতি কষ্টে, শান্তভাবে জবাব দিলো ইলিয়া :

"এই যে এখুনি দিচ্ছি !"

অবশেষে মনিব্যাগটা খুঁজে পেলো ইলিয়া, তারপর একটু স'রে এসে মুদ্রাগুলো ঢেলে দিলো কাউন্টারের ওপর।

তখন মুদ্রাগুলোর দিকে চেয়ে বুড়ো বললো:

"আর নেই তো? আচ্ছা সরো, দেখি..."

তারপর তার সরু সরু দুটো হ'লদে আঙুল দিয়ে একটা রূপোর আধুলি চেপে ধ'রে, মুদ্রাগুলো পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ব'লতে থাকে সে:

"ক্যাথ্রাইন্, অ্যান্, ক্যাথ্রাইন্, পল্, এটাও তো দেখছি সেই, ও— এটাতে আবার ক্রুশ আঁকা, বত্রিশ—হুঁ-হুঁ—, এটা আবার কোন্ মুদ্রা?— জ্বালালে দেখছি! ওহে—এটা আমি নিতে পারবো না, একেবারে ঘষা।"

ইলিয়া কঠোরভাবে ব'ললো:

"কিন্তু সাইজ্ দেখেই তো বুঝতে পারছেন এটা একটা আধুলি।"

"না না, বড়ো জোর সিকি হিসেবে নিতে পারি।"

এই ব'লে বুড়ো মুদ্রাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একধারে, তারপর ঝট্ ক'রে কাউন্টারের একটা টানা খুলে সেটা হাতড়াতে থাকে হন্তদন্ত হ'য়ে।

রেগে টং হ'য়ে যায় ইলিয়া। সে-রাগ লোহার সাঁড়াশির মতো। ডান হাতখানা ছুঁড়ে দেয় সে, তারপর মুঠো পাকিয়ে বুড়োর রগে মারে প্রচণ্ড এক ঘুষি। দেয়ালের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায় পোদ্দারটা, কপালখানা ঠুকে যায় ঠক্ ক'রে, কিন্তু সংগে সংগে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর দৌড়ে এসে দুহাতে কাউন্টারটা আঁকড়ে ধ'রে, বকের মতো তার সরু গলাটা বাড়িয়ে দেয় ইলিয়া লুনেফের দিকে। ইলিয়া দেখলো বুড়োর চোখদুটো ধক্ধক্ ক'রে জ্বলছে, কাঁপছে তার ঠোঁট দুখানা, সেই সংগে শুনতে পেলো ভাঙা গলায় ফিশফিশ ক'রে ব'লছে বুড়োটা:

"ভালোবাসার খাতিরে—মানে—ভালোবাসার জন্যে—"

ঘৃণায় জ্ব'লে ওঠে ইলিয়া। "তবে রে রাস্কেল" এই ব'লে সে বুড়োর গলাটা চেপে ধ'রে ঝাঁকাতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে। ইলিয়ার বুকে হাতের ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বুড়ো, কিন্তু অকৃতকার্য হ'য়ে হাঁপাতে থাকে ঘোড়ার মতো। একটু পরে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে, লাল হ'য়ে যায় চোখের কোণগুলো, জল গড়িয়ে প'ড়তে থাকে

তার দুগাল বেয়ে, জিভটা বেরিয়ে আসে অন্ধকার মুখবিবর থেকে, মনে হয় হত্যাকারীর দিকে চেয়ে সে যেন জিভ ভেংচাচ্ছে। ইলিয়ার হাতে খানিকটা গরম থুতু এসে পড়ে, আর সেই সংগে বুড়োর গলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ। ইলিয়ার মনে হয় কে যেন ওর গলাটাও সাঁড়াশির মতো চেপে ধ'রেছে। তখন দাঁতে দাঁত চেপে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে আরো জোরে সে চেপে ধরে বুড়োর গলাটা, আর সেটা ঝাঁকাতে থাকে বারেবার। বুড়োর তখন ত্রিশংকুর দশা। এই সময় কেউ যদি পিছন থেকে ইলিয়ার মাথায় ডাণ্ডা মারতো তাহ'লেও হয়তো সে বুড়োর গলাটা ছাড়তো না। এতোটা ঘৃণা আর শংকায় ভ'রে গিয়েছিলো তার মনটা! পলুএকৃতফের চোখ দুটো যতোই ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়, ইলিয়া তার গলাটা ততোই জোরে চেপে ধরে। দেখতে দেখতে পোদ্দারের দেহটা ভারি হ'য়ে উঠলো, আর সেই সংগে ইলিয়ার মনে হ'লো ওর বুকের বোঝাটা যেন ক্রমেই হাল্‌কা হ'য়ে আসছে।

অবশেষে ইলিয়া বুড়োর গলাটা ছেড়ে দিলো, আর সংগে সংগে বুড়ো প'ড়ে গেলো কাউণ্টারের ওপর। পড়বার সময় বিশেষ শব্দও হ'লো না। এইবার ইলিয়া তাকালো চারিধারে। খাঁ-খাঁ ক'রছে রাস্তাঘাট। তুষার প'ড়ছে হুহু ক'রে। ইলিয়া দেখলো মেঝের ওপর দুখানা সাবান, একটা মনিব্যাগ এবং এক বাণ্ডিল তুলো প'ড়ে র'য়েছে; ভাবলো এগুলো নিশ্চয়ই প'ড়ে গেছে ওরই বাক্‌শো থেকে; তাই সেগুলো আগে যথাস্থানে গুঁজে রাখলো, তারপর কাউণ্টারের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তাকালো বুড়ো লোক-টার দিকে। দেখলো পোদ্দারের দেহটা কাউণ্টার আর দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় আটকে র'য়েছে, মাথাটা ঝুলছে বুকের ওপর, আর চকচক ক'রছে হ'লদে টাকটা। এইবার ইলিয়ার চোখ প'ড়লো কাউণ্টারের খোলা ড্রয়ারটার ওপর; দেখলো সোনারূপোর মুদ্রা আর নানা সাইজের নোটে থই থই ক'রছে ড্রয়ারটা। আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রথমে একটা প্যাকেট তুলে নিলো সে, তারপর আর একটা, তারপর আরও একটা। তুলে নিয়ে, সেগুলো শার্টের পকেটে লুকিয়ে ইলিয়া আর একবার দেখে নিলো তার চারিধার। এদিকে ভয়ে ঢিপঢিপ ক'রতে লাগলো তার বুকটা।

এর একটু পরেই ইলিয়া ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এলো দোকানটা থেকে। খানিকদূরে গিয়েই ও থামলো; সেখানে অয়েলক্লথ দিয়ে নিজের জিনিষপত্র-গুলো বেশ ক'রে ঢেকে আবার হাঁটতে লাগলো রাস্তার এক পাশ দিয়ে। তুষার প'ড়ছে তো প'ড়ছেই,—এতো ঘন হ'য়ে যে, সামনের কোনো জিনিষ দেখবারই জো নেই। যেতে যেতে শিউরে ওঠে ইলিয়া একটা বিষণ্ণ বোঝা চেপে বসে ওর বুকের ওপর। হঠাৎ ওর চোখদুটো ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে। আঙুল দিয়ে একটা চোখ ছুঁতেই ও যেন ভয়ে একেবারে বরফের মতো জ'মে যায়। ইলিয়ার মনে হ'লো পলুএক্তফের মতো ওর চোখদুটোও যেন করুণ-ভাবে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, কে জানে চোখদুটো হয়তো আর কোনোদিন বুঁজবেই না, আর হয়তো এই চোখ দেখেই লোকজন তার অপরাধের নিশানা পাবে! আঙুল দিয়ে চোখের তারা দুটো স্পর্শ ক'রতেই যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে ইলিয়া, কিন্তু চোখের পাতা ফেলতে পারে না শত চেষ্টা ক'রেও। ফলে, ভয়ে দুশ্চিন্তায় ওর দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। অবশেষে চোখের পাতা দুখানা ফেলতে পারে ইলিয়া। হঠাৎ রাশি রাশি অন্ধকার এসে গ্রাস ক'রে ফেলে ওকে। এতে খুশিই হয় সে। কিন্তু আর-একটু এগিয়েই ও হঠাৎ থ'মকে দাঁড়ায় ভয় পেয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে, আর ওর চোখ দুটো এক পলকের জন্য যেন অন্ধ হ'য়ে যায়। কে-একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে গেলো। চ'মকে উঠে চোখ ফেরাতেই ইলিয়া দেখলো খাটো ফার-কোট-পরা একজন লোক চ'লে গেলো তার পাশ দিয়ে। দেখতে দেখতে লোকটা অদৃশ্য হ'য়ে গেলো ঝরন্ত তুষারের ঘন পর্দার অন্তরালে। তখন মাথায় টুপিটা সোজা ক'রে বসিয়ে ইলিয়া আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিলো ফুটপাথের ধার ঘেঁষে। চোখদুটো তখনো টনটন ক'রছে, ঝিমঝিম ক'রছে মাথাটা। কাঁধ দুখানা কেঁপে উঠতেই ইলিয়া নিজের অজান্তে হাতের আঙুলগুলোকে নিয়ে পাকাতে লাগলো, আর সেই সংগে একটা বেপরোয়া অনুভূতি এসে ওর মন থেকে ভয়ের বোঝাটাকে যেন সরিয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

রাস্তার মোড়ে পৌঁছে ইলিয়া দেখতে পেলো পাহারাওয়ালার পাঁশুটে মূর্তিটা। নেহাতই অকারণে, পা টিপে টিপে ও এগুলো তার দিকে—সোজা-সুজি। আশংকায় ওর বুকটা দুড়দুড় ক'রতে লাগলো।

পাহারাওয়ালাটির সামনে গিয়ে, একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ব'ললো ইলিয়া :

"কী তুষারই না প'ড়ছে !"

গোঁফ-দাড়ি-ভর্তি প্রকাণ্ড লাল মুখখানা নেড়ে, খোশমেজাজে জবাব দিলো পাহারাওয়ালাটি :

"যা ব'লেছো, যেন তুষারের বৃষ্টি !"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"ক'টা বাজলো বলো তো ?"

কোটের আস্তিন থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে জবাব দিলো পাহারাওয়ালা :

"দাঁড়াও দেখছি।"

এই ব'লে সে কোটের পকেটে তার ডান হাতখানা চালিয়ে দেয়। লোক-টার সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়ার যেমন ভয়ও ক'রতে থাকে তেমনি আনন্দও হয়। তারপর ও হঠাৎ হেসে ওঠে হো-হো ক'রে।

নখ দিয়ে ঘড়ির ঢাকনাটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করে পাহারাওয়ালাটা :

"কি ব্যাপাব, হাসছো কেন ?"

"তুষারের পলস্তারায় তোমাকে যা দেখাচ্ছে !"

"তা বটে। তুষার তো কম পড়ে নি !—এখন বেজেছে দেড়-টা। আর একটু পরে আমি হয়তো তুষারের পুতুল ব'নে যাবো। তোমার আর কি, তুমি তো এখান থেকে কোনো হোটেলে গিয়ে, ঢুকবে তারপর আরাম ক'রে গরমে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সবে সেখানে, কিন্তু আমাকে এখানে এই অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সেই ছ'টা পর্যন্ত !······আরে তোমার পিঠে ওটা কি ? বাক্শো মনে হ'চ্ছে যেন! খুব ভারি, না ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে পাহারাওয়ালা ক্লিক্ ক'রে ঘড়ির ঢাক্‌নাটা দিয়ে দিলো। তারপর খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

বিষণ্ণ হাসি হেসে ইলিয়া ব'ললো :

"ঠিকই ধ'রেছো, আমি একটা হোটেলের দিকেই যাচ্ছি বটে। ঐ যে ঐখানে, ঐ হোটেলটায়।"

"যাও, আর দেরি ক'রছো কেন ?"

হোটেলে এসে ইলিয়া জানলার ধারে বসে। এখান থেকে গির্জাটা দেখা যায়। ঐ গির্জার পাশেই পলুএকৃতফের দোকান। কিন্তু এখন তুষারের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইলিয়া ব'সে ব'সে দেখে তুষার প'ড়ছে হু হু ক'রে, আর সব কিছুই অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে সেই তুষারের সাদা চাদরের তলায়। ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুত হ'তে থাকে, কিন্তু ভয়ের ভাবটা যেন অনেক ক'মে গেছে ইতিমধ্যেই। মনটা খাঁ খাঁ ক'রতে থাকে ইলিয়ার। ব'সে ব'সে ও প্রতীক্ষা করে ভবিষ্যতের, কে জানে এর পর কি ঘটবে! একটু পরে হোটেলের খানসামা যখন ওকে চা দিয়ে গেলো ও তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলো না :

"রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন? খারাপ না কি?"

"না, না, খারাপ কেন, বেশ ভালোই" ব'লে খানসামাটি তাড়াতাড়ি হোটেলের রান্নাঘরের দিকে চ'লে যায়। ক্লান্তিতে, উৎকণ্ঠায় ইলিয়ার চোখদুটো ঝামরে পড়ে, মনে হয় মাথার মধ্যে ঝাঁকেঝাঁক ঝিঁঝি-পোকা ডাকছে যেন। আর-এক কাপ চা ঢেলে নেয় ইলিয়া, কিন্তু খেতে ভুলে যায়, চায়ের কাপটা সামনে নিয়ে নিশ্চল পাষাণের মতো ব'সে থাকে। হঠাৎ ওর খুব গরম লাগে, মনে হয় বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোটের বোতাম খুলতে খুলতে ও শিউরে ওঠে। মনে হয় আঙুলগুলো যেন ওর নয়, আর কা'রোর —কোনো দুশমনের। মুখের সামনে আঙুলগুলো তুলে ধ'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে ইলিয়া। পরিষ্কারই তো র'য়েছে সেগুলো; কিন্তু তাহ'লেও, ইলিয়া ভাবে আঙুলগুলোকে বেশ ক'রে সাবান-জলে ধোয়া দরকার।

এমন সময় কে-যেন হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'ললো :

"পলুএকৃতফ খুন হ'য়েছে!"

চ'মকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ইলিয়া। সারা হোটেলে তখন হুড়ো-হুড়ি-ছুটোছুটি শুরু হ'য়ে গেছে। মাথায় টুপি দিতে দিতে সকলেই তখন দরজার দিকে ঠেল মারছে। যেন একটা পড়ি-কি-মরি ভাব! খানসামার ট্রে-টার ওপর একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে, কাঁধে বাকৃশোটা ঝুলিয়ে, আর সকলের সংগে সে-ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো হোটেল থেকে।

পোদ্দারী দোকানখানার আশপাশে তখন একটা বেশ ভিড় জ'মে গেছে। 'হট্‌ যাও, মত্‌ যাও' ক'রতে ক'রতে পাহারাওয়ালাগুলো হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরঘুর ক'রছে এ-ধারে ও-ধারে। তাদের মধ্যে সেই দাড়িওলা পাহারাওয়ালাটিকেও দেখতে পাওয়া যায়। তাকেই ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো কটা বেজেছে। পাহারাওয়ালাটা মুখ হাঁড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে দোকানের দরজা আগ্‌লে, কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না ভিতরে, আর বাঁ-গালটা চুলকোতে চুলকোতে তাকাচ্ছে প্রত্যেকের দিকেই কেমন একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া লোকজনের কথাবার্তা শুনতে লাগলো। এদিকে ওর পাশে দাঁড়িয়ে কালো দাড়িওয়ালা ঢ্যাঙা-মতো এক ব্যবসায়ী ভ্রূ কুঁচকে তার গম্ভীর মুখখানা ঝুঁকিয়ে ফার-কোট-পরা একজন বেঁটে-সেটে বুড়োর চাঞ্চল্যকর গল্প শুনতে থাকে।

"চাকরটা ভাবলো মনিব বুঝি ফিট্‌ হ'য়ে গেছে, তাই সে দৌড়ে গেলো পেত্তের্‌ স্তেফানোভিচ্‌কে ডাকতে। পেত্তের্‌ অবিশ্যি এলো সংগে সংগে, কিন্তু একবার নজর দিতেই বুঝলো সব শেষ। কী কাণ্ড! না, না, ভেবে দেখুন,—কী সাহস! ব্যাপারটা ঘ'টলো কি না এই ভর্‌-দুপুরে, আর এমন একটা গমগমে রাস্তায়! তাজ্জব ব্যাপার, তাজ্জব ব্যাপার!"

কালো দাড়িওলা ব্যবসায়ীটি বার দুই কেশে তিরিক্ষে গলায় ব'ললো:

"তা বটে। তবে, মারে হরি রাখে কে? পাপের শাস্তি, মশাই, পাপের শাস্তি!"

এক পা এগিয়ে গিয়ে ইলিয়া ঐ ব্যবসায়ীর মুখখানা আর একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে বাকৃশো দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই, ইলিয়াকে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে কঠোরভাবে চেয়ে ব'লে ওঠে লোকটা:

"কি হে, মতলব কি তোমার?"

এই ব'লে সে আবার বুড়ো লোকটার দিকে ফিরে ব'লতে থাকে:

"কথায় বলে: ঈশ্বরের অমতে কেউ তোমার মাথার একগাছি চুলেও হাত দিতে পারবে না!"

মাথা নেড়ে বুড়ো সায় দেয়:

"সে-কথা সত্যি—হাজারবার।"

তারপর চোখ টিপে, আবার ফিশফিশিয়ে বলে সে :

"সবাই জানে পাপীকে ঈশ্বর রেহাই দেন না। একটা না একটা চিহ্ন তিনি রেখে যাবেনই তার ওপর। এ-ভাবে কথা বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু না ব'লে থাকিই বা কি ক'রে?—ভগবান যেন আমায় ক্ষমা করেন!"

সংগে সংগে সেই দাড়িওলা, গম্ভীর ব্যবসায়ীটা ব'লে উঠলো :

"আর আমার কথাটাও শুনে রাখুন : এই অপরাধ যে ক'রেছে তাকে কেউ কোনোদিন খুঁজেও পাবে না। ইচ্ছে ক'রলে এ-কথাটা লিখে রাখতে পারেন!"

ইলিয়া লুনেফ মুচকি হাসলো। এ-ধরণের কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগছিলো তার, কেমন যেন একটা সাহসও পাচ্ছিলো মনে মনে। অবশ্য সেই সংগে বুকও যে একটু-আধটু কাঁপছিলো না তা নয়। ইলিয়ার মনে হ'লো কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে :

"পোদ্দারটাকে তুমিই কি গলা টিপে মেরেছো?"

তাহ'লে সে নির্ভয়ে জবাব দেবে :

"হ্যাঁ, আমিই মেরেছি!"

মনের এই অবস্থায় ভিড় ঠেলে অতি কষ্টে ইলিয়া সেই দাড়িওলা পাহারাওয়ালাটার সামনে গিয়ে থামলো। ইলিয়ার দিকে চেয়ে তার কাঁধে একটা ধাক্কা মেরে ক্রুদ্ধভাবে ব'ললো পাহারাওয়ালাটা :

"যাচ্ছো কোথায়? এখানে তোমার কি দরকার শুনি? যাও, ভাগো এখান থেকে!"

হোঁচট খেয়ে কার যেন গায়ের ওপর প'ড়ে গেলো ইলিয়া। কে একজন তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে ব'ললো :

"দাও তো বেটার ঘাড়ে এক রদ্দা!"

ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে গির্জার সিঁড়িতে ব'সে ইলিয়া লোক-গুলোর দিকে চেয়ে মনে মনে হাসতে লাগলো। লোকজনের পায়ের চাপে মচমচ ক'রতে থাকে বরফের কুচি। সেই সংগে ইলিয়া শুনতে পায় নানান্ গলার নানান্ উক্তি :

"কাণ্ড দেখো, শয়তানটা আর সময় খুঁজে পেলো না, আমি যখন ডিউটিতে ঠিক তখনই এই ফ্যাসাদ বাধিয়ে ব'সলো।—"

"মহাজনী কারবারেই বলো আর বন্ধকী কারবারেই বলো, এ-শহরে ওর জুড়ি ছিলো না কেউই।"

"বলিহারি!"

"উঃ, কী কাণ্ড!"

"আচ্ছা তুষার প'ড়ছে যা হ'ক! একটু যে উঁকি মারবো তারও জো নেই। দোকানটা যেন বরফের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে!"

"যাই বলো, লোকটার শরীরে কিন্তু দয়ামায়া ব'লে কোনো পদার্থ ছিলো না। যেন পাষাণ—"

"তাহ'লেও মানুষ তো বটে, তাই দুঃখ হয়।"

"তা হয়,—মানে—করুণা করতে ইচ্ছে করে।"

"সকলেই ক্ষুধার্ত, আর সকলেই লোভী।"

"আরে, ওদিকে দেখো, ওর স্ত্রী এসেছে!"

"হায়, হায়!"

শতচ্ছিন্ন কোট-পাতলুন-পরা একজন চাষী চেঁচিয়ে ব'ললো :

"আহা, মাগীর জন্যে দুঃখ হয়!"

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু ক'রে ইলিয়া দেখলো, ঘাগরার ওপর একখানা কালো শাল জড়িয়ে একজন মাঝ-বয়সী মোটাসোটা স্ত্রীলোক একটা পুলিশ-সার্জেণ্ট এবং একজন লাল-জুল্‌ফিওলা লোকের হাতে ভর দিয়ে চওড়া চামড়ার-হুড্‌-দেওয়া একখানা শ্লেজ্‌-গাড়ি থেকে অতি কষ্টে নামছে।

স্ত্রীলোকটির ভীত-কম্পিত কণ্ঠ বাতাসে শিরশিরিয়ে ওঠে :

"একি হ'লো, একি হ'লো!"

কারোরই মুখে তখন কথা নেই। বুড়িটার দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবলো ওলিম্পিয়াদার কথা।

কে যেন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"ওর কি কোনো ছেলেপুলে নেই?"

"শোনা তো যায় মস্কোয় আছে।"

"আমার মনে হয় সে এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলো!"

"সে তো নিশ্চয়ই!"

এই সব মন্তব্য শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনে প্রীতিকর অপ্রীতিকর নানান্ চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। পলুএক্তফের জন্যে কেউই যে দুঃখিত নয়, এতে খুশিই হ'লো ইলিয়া, কিন্তু সেই সংগে ও এটাও বুঝলো যে ঐ কালো দাড়িওলা ব্যবসায়ীটি ছাড়া এখানকার বাদবাকি লোকগুলো হাঁদা তো বটেই, এমন-কি বিরক্তিকরও। ব্যবসায়ীটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ঋজু এবং সত্যসন্ধ। কিন্তু অন্যান্য লোকগুলো যেন কাটা-গাছের নাড়া, তারা কেবল কুচুটে জিভগুলো নেড়ে বিষাক্ত কথাই ব'লতে জানে।

অবশেষে পোদ্দারের ক্ষুদ্র লাসটা যখন দোকান থেকে বা'র ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো, তখন ইলিয়া পা বাড়ালো বাড়ির দিকে। তার আগে নয়। যেতে যেতে ঠাণ্ডায় ক্লান্তিতে টন্‌টনিয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্যটা তখন আর একেবারেই নেই। বাড়ি এসে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে ইলিয়া গুনতে আরম্ভ ক'রলো টাকাগুলো। প্রথম দুটো প্যাকেটে ছিলো সাড়ে সাত শো টাকা, তৃতীয়টায় প্রায় তেরো শো। এ-ছাড়া আরও একটা ছোটো প্যাকেটে অনেকগুলো কুপন ছিলো। কিন্তু সেগুলো আর গুনলো না ইলিয়া। সবশুদ্ধ একটা কাগজে বেশ করে মুড়ে, টেবিলে কনুই দুটো চেপে, ও এইবার ভাবতে ব'সলো টাকাগুলো লুকিয়ে রাখা যায় কোথায়?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই দপদপ ক'রে উঠলো ওর রগ দুটো, ইচ্ছা হ'লো ঘুমিয়ে পড়ে। অবশেষে ও ঠিক ক'রলো টাকাগুলো লুকিয়ে রাখবে চিলে-কোঠায়। যে কথা সেই কাজ। প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে ও তৎক্ষণাৎ দৌড়লো সেইদিকে। দালানের পার্টিশান-দরজাটায় ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় ওর সংগে দেখা হ'য়ে গেলো জাকবের।

জাকব ব'ললো:

"আরে, তুমি যে এর মধ্যেই ফিরে এসেছো দেখছি!"

"তা এসেছি।"

"মুখখানা ফ্যাকাশে, অসুখ ক'রেছে না কি তোমার?"

"ন্—না, সে-রকম কিছু নয়।"

"তোমার হাতে ওটা কি?"

প্যাকেট-করা টাকাগুলোর দিকে চেয়ে ব'ললো ইলিয়া:

"এইটার কথা ব'লছো?"

বলেই ও হঠাৎ যেন শিউরে উঠলো পাছে মুখ ফ'স্‌কে আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ে। তারপর প্যাকেটগুলো নিয়ে লোফালুফি ক'রতে ক'রতে চট্‌ ক'রে ব'ললো ইলিয়া:

"কিছু না—চুলের ফিতে— সামান্য জিনিষ কয়েকটা।

জাকব জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"চা খেতে আসছো তো ?"

"আমি ? ও হ্যাঁ, এক্ষুনি আসছি।"

ব'লেই ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল পার্টিশান-দরজাটার ফাঁক দিয়ে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রছে, পা দুটো যেন ট'লছে—মাতালের মতো। চিলেকোঠায় যাবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ইলিয়া পা ফেলতে থাকে বেড়ালের মতো, পাছে শব্দ হয়, পাছে কারোর সংগে দেখা হ'য়ে যায়। চিম্‌নির কাছাকাছি মেঝেটার এক কোণে টাকাগুলো পুঁতে রাখবার সময় ওর হঠাৎ মনে হ'লো কে যেন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ব'সে ওকে দেখছে; ভাবলো একখানা থান-ইট ছুঁড়ে মারে সেইদিকে। কিন্তু ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ অলীক এটা বুঝতে পেরে ও নিজেকে সামলে নেয়, তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে ছাদ থেকে। এখন ওর মনে ভয়ও নেই উৎকণ্ঠাও নেই। ইলিয়া ভাবলো ভয়টাকে ও যেন টাকাগুলোর সংগেই পুঁতে রেখে এসেছে চিলে-কোঠার মেঝেতে। কিন্তু তাহ'লেও কয়েকটা চিন্তা ওর মনে এখনো ঘুরঘুর করতে লাগলো।

নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"লোকটাকে গলা টিপে মারলাম কেন ?"

এর একটু পরেই ও মাশার এঁদো ঘরে এসে হাজির হয়। মাশা তখন উন্থন আর কেৎলি নিয়ে প্রায় গলদঘর্ম হ'য়ে উঠেছে। ইলিয়াকে দেখেই মেয়েটা সানন্দে ব'লে উঠলো :

"আরে, আজ এতো সকাল-সকাল যে !"

"কি রকম বরফ প'ড়ছে দেখছো তো", ব'লেই ইলিয়া চ'টে গিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে :

"সকাল-সকাল কি রকম ? রোজ যে-সময় আসি আজও সেই সময় এসেছি। কি যে বলো হাঁদার মতো ! দেখছো না একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে ?"

"এখানে সব সময়ই অন্ধকার—কি দুপুর কি রাত্তির। কিন্তু তুমি অতো চ'টছো কেন ?"

"চ'টছি তার কারণ তুমি ডিটেক্‌টিভের মতো সওয়াল করতে আরম্ভ

ক'রেছো : কেন সকাল-সকাল এলে? কোথায় যাচ্ছো? হাতে ওটা কি? এতো খবরে তোমার দরকার কি শুনি?"

ইলিয়ার চোখের ওপর চোখ রেখে তিরস্কারের সুরে ব'ললো মাশা :

"যাই বলো ইলিয়া, এতো দেমাকী হ'য়ে উঠেছো তুমি যে বলার নয়!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, নিজের চরকায় তেল দিগে যাও"—এই ব'লে ইলিয়া টেবিলের সামনে ব'সে প'ড়লো।

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ইলিয়ার দিকে পিছন ক'রে মাশা হাওয়া দিতে লাগলো উনুনের মুখে। ধোঁয়ায় তার চোখ দুটো জ্বালা ক'রতে থাকে। ঝট্‌কা দিয়ে মুখখানা সরিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতেই তার মাথার কোঁকড়া চুলগুলোয় ঢেউ খেলে যায়, আর সেই সংগে কেঁপে ওঠে তার ছোট্টো ছিমছাম দেহটা। মাশার মুখখানি রোগা-রোগা, চোখের কোলে কালো কালো রিং, তাতে অবশ্য ওর চোখদুটোকে আরও জল্‌জ্ব'লে দেখায়। ওকে দেখে মনে হয়, বাগানের কোনো পরিত্যক্ত কোণে আগাছার মধ্যে যে সব ফুল ফোটে ও যেন সেই রকমেরই একটা ফুল। মাশাকে দেখতে দেখতে ইলিয়া ভাবে : এই একফোঁটা মেয়েটা একাই থাকে এঁদোপুরীতে, খাটে একটা জোয়ান মেয়েমানুষের মতো, জীবনে না আছে আনন্দ না আছে অবসর, সারা জীবনে এ-দুটোর কোনোটাই হয়তো ও পাবে না কোনোদিন, ঠিক এইভাবেই কাটিয়ে যাবে গোটা জীবনটা—এই একঘেয়ে নোংরা দারিদ্র্যের মধ্যে। আর সে?—সে যদি চায় তাহ'লে এখন শান্তিতেই জীবন কাটাতে পারে—সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন—যার স্বপ্ন সে এতোদিন দেখে এসেছে! কথাটা ভাবতে ইলিয়ার আনন্দও হয় যেমন, মাশার সামনে নিজেকে অপরাধীও মনে হয় তেমনি।

এই সব ভাবতে ভাবতে ইলিয়া মিষ্টি ক'রে ডাকলো :

"মাশা!"

মেয়েটা জবাব দিলো :

"কেন, কি চাই?—আর একবার মুখ শোনাবে?"

"তুমি জানো না মাশা আমি একটা বদ লোক"—ব'লতে ব'লতে ইলিয়ার গলাটা ভেঙে আসে, আর ওর বুকের মধ্যে একটা প্রশ্ন খাঁচায়-বন্দী পাখির মতো ছটফট ক'রতে থাকে : "ওকে ব'লবো কি ব'লবো না?"

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো মাশা।

"বাব্বাঃ, তোমার সংগে পারে কার সাধ্যি! বুঝলে হুলো বেড়াল?"

ইলিয়া ব'ললো:

"না না, আমার কথাটা আগে শোনো।"

"শোনাশুনির দরকার নেই আর," এই ব'লে তাড়াতাড়ি ইলিয়ার কাছে এসে মিনতির স্থরে ব'লতে থাকে মাশা:

"ইলিয়া, ইলুশা, মানিক আমার, তার চেয়ে বরং আমার একটা কথা রাখো। তোমার কাকাকে বলো আমাকেও সংগে নিতে। তোমার দুটি পায়ে প'ড়ছি, আমার এ-কথাটা রাখো!"

ইলিয়া তখন নিজের চিন্তাতেই বিভোর। মাশার কথাগুলো ওর কানে যায় নি। তাই ক্লান্ত গলায় ব'ললো সে:

"কোথায় যাবে?"

"তোমার কাকার সংগে। তাকে তুমি একবার বলো, মানিক!"

হাতজোড় ক'রে মাশা এমনভাবে ইলিয়ার সামনে দাঁড়ায় যেন ইলিয়া কোনো দেব্‌তা। সংগে সংগে মাশার চোখদুটোয় অশ্রু চিক্‌চিক্‌ ক'রে ওঠে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে মাশা ব'লতে লাগলো:

"শুধু হাঁটবো আর হাঁটবো, হাঁটতে হাঁটতে বসন্ত এসে যাবে, তখনও হাঁটবো —মাঠ পেরিয়ে, বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সারাটা দিন আমি এই স্বপ্নই দেখি, ভাবি শুধু হাঁটছি আর হাঁটছি। সে ভারি স্থন্দর, ভারি স্থন্দর! ইলুশা, মানিক আমার, তোমার কাকাকে শুধু একটিবার বলো, তিনি নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখবেন, নিশ্চয়ই আমাকে তাঁর সংগে নেবেন। আমি তাঁর রুটিতে ভাগ বসাবো না, নিজেরটা নিজেই যোগাড় ক'রবো ভিক্ষে ক'রে। ভিক্ষে পাবোও ঠিক—আমি বাচ্চা মেয়ে না? ইলুশা, তুমি যদি চাও, তোমার হাতে আমি চুমু খেতে পারি।"

এই ব'লে মাশা খপ্‌ ক'রে ইলিয়ার একখানা হাত ধ'রেই ঝুঁকে প'ড়লো। মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঝট্‌ ক'রে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, চীৎকার ক'রে ব'ললো ইলিয়া:

"বেকুব কোতাকার! কি ক'রছো? আমি—আমি একটা লোককে গলা টিপে মেরেছি।"

কথাগুলো ব'লেই চ'মকে ওঠে ইলিয়া, তারপর তাড়াতাড়ি বলে :

"মানে—ধরো, এমন একটা কাজ আমি যদি এই হাত দিয়ে ক'রেই থাকি, তা হ'লেও কি তুমি এ-হাতে চুমু খাবে ?"

ইলিয়ার কাছটিতে এসে মাশা ব'ললো :

"তাতে কি যায় আসে ? আর, চুমু খাবো না-ই বা কেন ? পেত্রুহা তো তোমার চেয়েও বদ, কিন্তু যতোবারই ও আমায় এটা-ওটা দেয় আমি ততোবারই ওর হাতে চুমু খাই। ঘেন্না করে অবিশ্যি, কিন্তু ও যে হুকুম দেয় : 'খা, চুমু খা!' তারপর আমার সর্বাঙ্গ টিপে-টাপে দেখে, চিমটি কাটে—মিন্‌সের লজ্জাও নেই।"

ভয়াবহ শব্দগুলো উচ্চারণ করার জন্যেই হ'ক, কিংবা মনের কথাটা মনেই থেকে গেলো তার জন্যেই হ'ক, ইলিয়ার হঠাৎ মনে হ'লো ওর বুকখানা যেন খুশিতে হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। মুচকি হেসে, মিষ্টি ক'রে ও ব'ললো মাশাকে :

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোমার যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। ভগবানের দিব্যি, ক'রে দেবোই! তুমিও যাবে কাকার সংগে তীর্থ ক'রতে। পথের খরচা বাবদ আমি তোমায় কিছু টাকাও দেবো, আর কাকাকেও ব'লবো কিছু দিতে।"

"তুমি একটা আস্তো মানিক", এই ব'লে লাফিয়ে উঠে মাশা ইলিয়ার গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধ'রলো।

সংগে সংগে গম্ভীরভাবে ব'লে উঠলো ইলিয়া :

"ছাড়ো, কি ক'রছো ? ব'ললাম তো—তুমিও যাবে। আমার জন্যে প্রার্থনা ক'রো মাশুৎকা।"

"তোমার জন্যে ক'রবো না তো আর কার জন্যে ক'রবো বলো তো ?"

এমন সময় ঘরে ঢুকে জাকব মাশাকে জিজ্ঞাসা ক'রলো অবাক গলায় : "এতো চেঁচাচ্ছো কেন ? উঠানে পর্যন্ত তোমার গলা শোনা যাচ্ছে।"

খুশিতে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ললো মাশা :

"বিদায়, য়াশা, বিদায়। আমি যে চ'লে যাচ্ছি এখান থেকে। ইলিয়াকে জিজ্ঞেস করো, ও কথা দিয়েছে কুঁজো-তেরেন্তকে রাজী করাবে। তাই না ইলিয়া ?"

ব'লেই মাশা হেসে ওঠে।

চিন্তিতভাবে জাকব জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে :

"তোমার কাকা কি রাজী হবে ?"

"কেন, না হবার কি কারণ আছে ? ও তো আর কাকার ক্ষতি ক'রতে যাচ্ছে না! তাছাড়া এতে মাশার ভালোও হবে। একবার চেয়ে দেখো না মাশুৎকার দিকে ? ওটা কি মানুষের চেহারা ?"

"তা বটে", এই ব'লে জাকব একটু পরেই শিস্ দিয়ে উঠলো।

"তোমার আবার হ'লো কি ?" জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া।

"আমার সব গেলো। এবার আমাকে একলাটি থাকতে হবে—একেবারে একলাটি—আকাশে চাঁদের মতো।"

অবজ্ঞার সুরে ব'ললো ইলিয়া :

"তার চেয়ে বরং একটা নার্স ভাড়া করো।"

মাথা নাড়তে নাডতে ব'ললো জাকব :

"এখন থেকে মদ ধ'রবো—কেবল ভদ্‌কা !"

জাকবের দিকে একবার চেয়ে, মাথাটি নিচু ক'রে দরজার দিকে যেতে যেতে বিষণ্ণ অথচ তিরস্কারের সুরে ব'ললো মাশা :

"ছি ছি, কি দুর্বল তুমি জাকব !"

"আর ভারি সবল তুমি ! কথা নেই বার্তা নেই একটা মানুষকে বুঝি ফেলে চ'লে গেলেই হ'লো ? তোমার জন্যে যদি আমার মন কেমন করে, তাহ'লে ?"

তারপর বিষণ্ণভাবে টেবিলের ধারে ইলিয়ার মুখোমুখী ব'সে জাকব ব'ললো :

"আচ্ছা, আমিও যদি চুপিচুপি তেরেন্সের সংগে চ'লে যাই তাহ'লে কেমন হয় ?"

"যাও। আমিও যাবো।"

"তুমি ! কিন্তু বাবা যে আমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে !"

খানিকক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ থাকে।

অবশেষে জাকব এক-ফালি মেকি-হাসি হেসে ব'ললো :

"যাই বলো ভাই, মদ খেয়ে আরাম আছে। তখন ভাবনাও থাকে না

চিন্তাও থাকে না, কোনো কিছু বোঝবারও দরকার হয় না। ভারি মজাদার, না?"

টেবিলের ওপর কেৎলিটা রেখে মাশা মাথা ঝাঁকিয়ে ব'ললো:

"আচ্ছা বেহায়া মানুষ তো তুমি!"

চ'টে গিয়ে জাকব চেঁচিয়ে উঠলো:

"মুখ সামলে কথা ব'লবে। তোমার বাবা তো থেকেও নেই। তাই ব'লে কি সে তোমার বাঁচার পথে বাগড়া দিচ্ছে?"

মাশা জবাব দিলো:

"আমার কথা ব'লছো? তাহ'লে শোনো, আমার জীবন খুবই সুন্দর! একবার যদি এই জীবনের হাত থেকে মুক্তি পেতাম, তাহ'লে আর ফিরে আসতাম না, পালিয়ে যেতাম যেদিকে দুচোখ যায়, ভুলেও পিছনে তাকাতাম না।"

"জীবনে কারই বা সুখ আছে বলো?" আস্তে আস্তে এই কথাগুলো ব'লে ইলিয়া আবার চিন্তায় ডুবে যায়।

"সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে গেলেই সবচেয়ে ভালো হ'তো। মনে করো ব'সে আছি একটা বনের মধ্যে, ছোট্টো একটা নদীর ধারে।—কথাটা ভাবতেও ভালো লাগে!"

সংগে সংগে ইলিয়া ব'লে ওঠে ঘৃণার সুরে:

"জীবন থেকে পালাবার কি আহা-মরি পথই না বাৎলালে?—বেকুব!"

ভয়ে ভয়ে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললো জাকব:

"জানো, একখানা বই পেয়েছি।"

"কি বই?"

"বইখানা পুরণো, মলাটটা চামড়ার, দেখে মনে হয় যেন উপাসনার বই। কিন্তু বইখানায় নাস্তিকতার গন্ধ আছে। আছে কেন, আছেই। একজন তাতারের কাছ থেকে এক টাকায় কিনেছি।"

অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"বইটার নাম কি?"

কথা বলবার আদৌ ইচ্ছা নেই ইলিয়ার। তবুও, ও ভাবলো: এ-অবস্থায়

চুপ ক'রে থাকাটা অশোভনও বটে আর বিপজ্জনকও বটে! তাই একরকম বাধ্য হ'য়েই ও বন্ধুকে প্রশ্নটা ক'রলো।

চাপা গলায় জবাব দেয় জাকব:

"নামের পাতাটা ছেঁড়া। তবে যতদূর মনে হয় বইখানা বস্তুর উদ্ভব সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে লেখা। প'ড়তে প'ড়তে কেবলই হোঁচট খেতে হয়, তাছাড়া ব্যাপারটা ভয়াবহও বটে। লেখা হ'য়েছে মিলিটাসের থেল্‌স্‌ সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন বস্তুর আদি কী? তিনি ব'লেছেন: জল থেকেই সবকিছু এসেছে এবং আসছে। ঈশ্বরকে তিনি ব'লেছেন একটা ভাব, অর্থাৎ আইডিয়া। এই ভাব-ই জল থেকে নানান বস্তু সৃষ্টি ক'রেছে। তাছাড়া নাস্তিক ডায়াগোরাসের কথাও আছে। উপরন্তু এপিকিউরাসের কথাও বলা হ'য়েছে। তিনি ব'লতেন: 'যাহা সত্য তাহাই ভগবান, কিন্তু ভগবান কাহাকেও কিছু দেন না, কাহারও ভালো করেন না, কোনো কিছুর জন্য তাঁহার মাথাব্যথাও নাই।' তার মানে—ভগবান আছেন, কিন্তু তাঁর সংগে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই—অর্থাৎ—মানুষের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমি তো এই বুঝেছি। অতএব বলা চলে: তুমি তোমার খুশি মতো জীবন কাটাও। কেউ তোমার দিকে ফিরেও দেখবে না, কেউ তোমার জন্যে মাথাও ঘামাবে না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কঠোরভাবে ভ্রূ কুঁচকে, বন্ধুর কথায় বাধা দিয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"ইচ্ছে ক'রছে ঐ বইখানা দিয়েই তোমায় চড়িয়ে দিই।"

"কেন?"—জাকবের গলায় বিস্ময় আর ক্রোধ যেন উপচে পড়ে!

"যাতে এসব বই তুমি আর না পড়ো। তুমি একটা বেকুব, আর এ-বই যে লিখেছে সেও একটা বেকুব!"

এই ব'লে, জাকবের মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, রাগে ফুলতে ফুলতে ব'লতে লাগলো ইলিয়া:

"ভগবান আছেন। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই! জীবনটা হ'লো পরীক্ষা—পাপের পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান পাপের প্রলোভন থেকে আমরা নিজেদের সামলাতে পারছি কি না! যদি না পারি, তাহ'লে শাস্তি পেতেই হবে আমাদের। হয় আজ আর

[illegible] কাল, কিন্তু শাস্তির হাত থেকে রেহাই নেই। মানুষের কাছ থেকে এ-শাস্তির আশা ক'রো না, শাস্তি দেবার মালিক ভগবানই। বুঝলে? র'য়ে-ব'সে ভাখো এ-শাস্তি আসে কি না।"

ইলিয়ার কথাগুলো জাকবের প্রকাণ্ড মাথাটায় হাতুড়ির বাড়ির ম'তো প'ড়তে থাকে।

শুনে চীৎকার ক'রে ব'ললো জাকব:

"থামো! আমি এ-সব কথা বলি নি, ব'লতে চাইও নি।"

"তাতে কিছুই যায় আসে না। ব'ললে কি না: 'থামো'! তুমি কোন্ বিচার করবার মালিক হে?" ব'লতে ব'লতে ইলিয়ার মুখখানা উত্তেজনায় বিবর্ণ হ'য়ে যায়, ক্রোধে হঠাৎ সে যেন দিশাহারা হ'য়ে পড়ে। শোনা যায় ইলিয়া তখনো ব'লছে:

"ঈশ্বরের অমতে কেউ তোমার মাথার একগাছি চুলেও হাত দিতে পারবে না। শুনেছো এ-কথাটা? আর, আমি যদি পাপ ক'রে থাকি, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ক'রেছি। যতো সব বেকুব!"

ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'লে ওঠে জাকব:

"তুমি পাগল হ'য়ে গেলে না কি? তুমি আবার কোন্ পাপ ক'রে ব'সলে?"

ইলিয়ার কানছুটো তখন ভোঁ-ভোঁ ক'রছে। জাকবের প্রশ্নটা শুনে সে কেমন যেন হকচ'কিয়ে যায়, তারপর জাকব ও মাশার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে উদাস গলায় বলে:

"সে-সব কিছু না, এমনি উদাহরণ হিসেবে ব'ললাম।"

এই ব'লে ইলিয়া নিজের চেয়ারে ব'সে পড়ে। তার চীৎকারে এবং শাসানিতে মাশাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ইলিয়া ব'সতেই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো মাশা:

"মনে হ'চ্ছে তোমার শরীর খারাপ।"

ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে জাকবও ব'ললো:

"তোমার চোখছুটোও কেমন যেন ঘোলাটে-ঘোলাটে দেখাচ্ছে।"

নিজের অজান্তেই চোখছুটো স্পর্শ ক'রে ইলিয়া শান্তভাবে ব'ললো:

"না কিছু না, এখুনি ঠিক হ'য়ে যাবে।"

এর একটু পরেই ইলিয়া অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগলো। ওর ভালো লাগলো না কাউকেই—মাশাকেও না জাকবকেও না। তাই মাশা যখন ওর সামনে এক পেয়ালা চা রেখে ব'ললো "নাও, খেয়ে নাও", তখন ও "না, থাক্, খাওয়ার ইচ্ছে নেই" এই ব'লে সেখান থেকে উঠে চ'লে এলো নিজের ঘরে।

বিছানায় ও সবে শুয়েছে এমন সময় ঘরে ঢোকে তেরেন্স। আজকাল তেরেন্সের চেহারায় একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। কুঁজো যেদিন থেকে ঠিক ক'রেছে যে তীর্থে গিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে সেদিন থেকেই ওর চোখে-মুখে যেন একটা অতীন্দ্রিয় হাসিখুশির ভাব লেগেই আছে। ভাবখানা এই: ইতিমধ্যেই ও যেন শান্তির স্বাদ পেয়ে গেছে।

মুচকি হেসে, ধীরে ধীরে ভাইপোর বিছানার কাছে এসে, নোংরা দাড়িটায় হাত বুলিয়ে, মোলায়েম গলায় ব'ললো তেরেন্স:

"তোকে আসতে দেখে ভাবলাম: যাই, ওর সংগে গোটাকতক কথা ব'লে আসি। আর ক'টা দিনই বা আছি তোর সংগে!"

রুক্ষ গলায় ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো কাকাকে:

"তুমি কি তাহ'লে যাচ্ছোই?"

"একটু গরম প'ড়লেই রওয়ানা হবো। আমার ইচ্ছেটা কল্পতরু-উৎসবের আগেই কিয়েভে পৌছোই।"

"শোনো, মাশাকে তোমার সংগে নাও।"

হাত নাড়তে নাড়তে জবাব দেয় তেরেন্স:

"কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই!"

"যা ব'লছি শোনো। এখানে ও মিছিমিছি প'ড়ে আছে, তাছাড়া ওর মতো বয়সের মেয়ের পক্ষে—বুঝতেই তো পারছো—জাকব র'য়েছে পেত্রুহা র'য়েছে—মানে—বুঝলে তো? এটা তো বাড়ি নয়, যেন ফাঁদ—যেন একটা অভিশপ্ত কারাগার! ওকে সংগে নাও। তাছাড়া ও হয়তো আর ফিরেও আসবে না।"

"কিন্তু ওকে সংগে নেবো কি ক'রে?"

নাছোড়বান্দার মতো ব'লতে লাগলো ইলিয়া:

"নাও, নাও, ওকে তোমার সংগে নাও! আমাকে তুমি যে দেড়শোটা টাকা দেবে ব'লেছিলে সেটা তুমি ওর জন্যেই রেখে দাও। আমি তোমার টাকা চাই না। তাছাড়া মেয়েটা তোমার জন্যে প্রার্থনাও ক'রবে, আর ওর প্রার্থনার দামও অনেক।"

এইবার কুঁজোকে একটু চিন্তিত দেখায়। খানিক পরে সে বলে :

"দাম অনেক,—তা বটে। তুই ঠিক কথাই ব'লেছিস্। কিন্তু তোকে আমি যে-টাকাটা দেবো ব'লেছিলাম তা আমি ফিরিয়ে নিতে পারবো না তোর কাছ থেকে। তবে মাশার কথাটা ভেবে দেখবো নিশ্চয়ই।"

তারপর তেরেন্সের চোখদুটো হঠাৎ আনন্দে চক্‌চক্ ক'রে ওঠে। ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ফিশফিশ ক'রে ব'লতে থাকে সে :

"এবার একটা অন্য কথা বলি শোন্। কাল একজন মানুষের মতো মানুষকে দেখলাম রে! পেতের ভাসিলিচ্ লিসফ্-এর নাম শুনেছিস্? তাঁর সংগেই দেখা হ'য়েছে কাল। ধর্মের ব্যাখ্যা যদি শুনতে হয় তাহ'লে ওঁর মতো লোকের মুখেই শোনা উচিত। কি জ্ঞান পেতের্ লিসফের! মনে হ'লো স্বয়ং ঈশ্বর যেন ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে আমার বুকের বোঝাটা হাল্‌কা ক'রে দিতে, আমার পাপেব ভার লাঘব ক'রে দিতে। আমি পাপী তা জানি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার এটাও মনে হ'য়েছে যে, ঈশ্বর বুঝি আমার প্রতি একেবারেই নির্দয়, তাই তাঁব করুণায় সন্দেহ ক'রেছি আমি। কিন্তু পেতের্ লিসফের কথায় বুঝলাম আমি কতো বড়ো অবিচার ক'রেছি ঈশ্বরের ওপর।"

কোনো কথা না ব'লে ইলিয়া চুপচাপ শুয়ে থাকে। ভাবে : কাকা যাচ্ছে না কেন? গেলেই বাঁচা যায়। আধো-বোঁজা চোখদুটি জানলার দিকে তুলতেই ইলিয়া দেখলো ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে বা'র-বাড়ির উঁচু কালো দেয়ালটা।

উত্তেজিতভাবে, ফিশ্‌ফিশ্ ক'রে তখনো ব'লছে তেরেন্স :

"আমাদের মধ্যে নানান্ কথা হ'লো,—বিশেষ ক'রে পাপ, পুণ্য, আত্মার মুক্তি নিয়ে। খানিক পরে তিনি আমাকে ব'ললেন : ভোঁতা বাটালিতে শান দেবার জন্যে যেমন পাথরের দরকার, তেমনি আত্মার সদ্‌গতির জন্যে

এবং আত্মাকে পরম করুণাময় ঈশ্বরের পদপ্রান্তে ধূলোর মতো লুটিয়ে দেবার জন্যে পাপেরও দরকার।"

কাকার দিকে চেয়ে, অবজ্ঞার হাসি হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"তোমার এই ধর্মব্যাখ্যাতাটির চেহারা কি রকম বল তো?—শয়তানের মতো?"

চ'মকে উঠে, ভাইপোর কাছ থেকে একটু স'রে এসে তেরেন্স ব'লে উঠলো:

"ছি ছি, এ-কথাটা তুই ব'ললি কি ক'রে? উনি একজন পুণ্যবান লোক। এমন কি ওঁর খ্যাতি তোর ঠাবুর্দার খ্যাতির চেয়েও আরও অনেক বেশি ছড়িয়ে প'ড়ছে। ছি ছি—!"

এই ব'লে তিরস্কার করার ভংগিতে মাথাটা নাড়তে নাডতে কুঁজো তেরেন্স ঠোঁটের ওপর জিভ বুলোতে লাগলো।

রুক্ষ গলায় ব'ললো ইলিয়া—দুশমনের মতো:

"ছি ছি রাখো। তারপর তিনি আর কি ব'ললেন?"

ব'লেই ও বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো। অবাক হ'য়ে, ভাইপোর কাছ থেকে আর একটু স'রে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো তেরেন্স:

"তোর হ'য়েছে কি?"

"কিছু না। ভাবছি তোমার ধর্মব্যাখ্যাতাটি বেশ সেয়ানা লোক। বেড়ে যুতসই কথা ব'লেছেন তিনি। তাঁর কথাগুলো আমার বেলায় পুরোপুরি খাটে।—শয়তান কোতাকার! আমিও ভাবি ঠিক ঐভাবে—একেবারে ঐভাবে।"

কথাগুলো ব'লে, কাকার দিকে একবার চেয়ে, দেয়াল ঘেঁষে শুলো ইলিয়া।

ভয়ে ভয়ে তেরেন্স আবার ব'লতে লাগলো:

"আর তিনি ব'ললেন: পাপ না ক'রলে অনুতাপ আসে না, অর্থাৎ পাপ ক'রলে অনুতাপ আসে, আর সেই অনুতাপের ডানায় ভর দিয়ে মানুষের আত্মা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সিংহাসনের নাগাল পায়।"

হঠাৎ কাকার কথায় বাধা দিয়ে ইলিয়া ব'লে উঠলো:

"তোমার নিজের চেহারাটা একবার দেখেছো? দেখলে বুঝতে পারতে তোমাকে ঠিক শয়তানের মতোই দেখাচ্ছে!"

ব'লেই ও মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

একটা বিরাটকায় পাখি যেভাবে ডানা ঝাড়ে, ঠিক সেইভাবে নিজের হাতদুখানা ঝাড়তে লাগলো কুঁজো তেরেন্স। কি ক'রবে ভেবে পেলো না সে, ভয়ে পেছোতে গিয়ে রাগে এগিয়ে এলো খানিকটা। তখন বিছানায় উঠে ব'সে, ধাক্কা মেরে কাকাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে, কঠোরভাবে ব'ললো ইলিয়া লুনেফ্‌:

"স'রে যাও একটু!"

এক লাফে তেরেন্স স'রে এলো ঘরের মাঝখানে। সংগে সংগে কেঁপে উঠলো তার কুঁজটা। দেখলো: বিছানার চাদরটা চেপে ধ'রে কাঁধ দুখানা উঁচিয়ে, মাথা নিচু ক'রে ওর ভাইপো যেন বাঘের মতো ওত পেতে ব'সে আছে।

ধীরে ধীরে ব'লতে লাগলো ইলিয়া:

"কিন্তু আমি যদি অনুতাপ ক'রতে না চাই, তাহ'লে? ধরো যদি বলি: 'আমি পাপ ক'রতে চাই নি, যা ঘটেছে আপনা-আপনিই ঘ'টেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘ'টেছে', তাহ'লে আমাকে অনুতাপ ক'রতেই বা হবে কেন? ভগবান সব জানেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘ'টছে; তাই আমিও ব'লবো তিনি যদি দরকার মনে ক'রতেন তাহ'লে আমাকে তিনি নিরস্ত ক'রতেনই। কিন্তু তা যখন তিনি করেন নি তখন বুঝতে হবে আমার কোনো দোষও হয় নি। যাকে দেখো সে-ই পাপের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে, কিন্তু অনুতাপ ক'রছে কে?—এ-সম্বন্ধে তোমার মতটা কি শুনি? কৈ, বলো?"

দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বিষণ্ণভাবে ব'ললো তেরেন্স:

"তুই কি ব'লছিস আমি বুঝতে পারছি না। ঈশ্বর যেন তোর মঙ্গল করেন!"

শুনে, ইলিয়া মুচকি হাসে।

"তা যদি না বোঝো তাহ'লে আমার সংগে কথা ব'লতেও এসো না।"

এই ব'লে বালিশে আবার মাথা দিয়ে ইলিয়া ব'ললো ওর কাকাকে:

"আমার শরীর ভালো নেই।"

"সেটা আমার আগেই মনে হ'য়েছিলো।"

"আমি একটু ঘুমবো—তুমি যাও—আমাকে ঘুমতেই হবে।"

একা একা শুয়ে ইলিয়া অনুভব ক'রলো ওর মাথার মধ্যে যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার তাণ্ডব শুরু হ'য়েছে। গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে ওর মনে হয়, সেগুলো যেন অদ্ভুতভাবে তালগোল পাকিয়ে গেছে, আর সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা লেলিহান শিখার মতো সেগুলো যেন ওর মগজটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ইলিয়া ভাবলো, ও যেন বহুদিন অসুস্থ, আর সেই বুড়ো পোদ্দারটাকে ও যেন সেদিন গলা টিপে মারে নি, মেরেছে অনেক—অনেক দিন আগে।

চোখ দুটো বুঁজে ও চুপচাপ শুয়ে থাকে বিছানার ওপর, আর যেন শুনতে পায় সেই পোদ্দারটা কর্কশ গলায় ব'লছে :

"কৈ, তোমার হ'লো ?"

আর তারপর সেই ঘড়ঘড়ানি :

"ভালোবাসার খাতিরে—মানে—ভালোবাসার জন্যে—"

আশ্চর্য, সব যেন জড়িয়ে যাচ্ছে !

সেই কালো দাড়িওলা ব্যবসায়ীটার গলা জড়িয়ে যাচ্ছে মাশার কাকুতি-মিনতির সংগে, জাকবের এপিকিউরাস্-মার্কা বইখানার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে লিসফের উক্তির সংগে। অবাক কাণ্ড! ইলিয়ার মনে হয়, ওর চারপাশে সব কিছু যেন দুলছে, কাঁপছে, আর ওকে যেন কেউ হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিচে। তবে কি ও ভয় পেয়েছে ? না, তা তো নয়! ও শুধু একটু শান্তি চায়, একটু ঘুমোতে চায়, আর ভুলতে চায় সব কিছু। অবশেষে ও সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই জানলার মুখোমুখী দেয়ালটার ওপর রোদ্দুরের চম্‌কানি দেখে ইলিয়া বুঝতে পারে হিমেল হ'লেও দিনটা মন্দ শুরু হয় নি। মাথাটা ওর তখনো ঝিমঝিম ক'রছে, তবে মনটা বেশ থিতিয়ে গেছে। আগের দিন যা যা ঘ'টেছিলো তার সব কিছুই মনে প'ড়লো ওর এবং সেই সংগে এই ভেবে ও নিশ্চিন্ত হ'লো যে, নিজের সম্বন্ধে ও ইতিমধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচে।

আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেলো গলায় বাকশো ঝুলিয়ে ইলিয়া রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তুষারের ওপর রোদ্দুর পড়ায় ওর চোখদুটো তাতে ধাঁধিয়ে যায়।

যেতে যেতে ভ্রূ কুঁচকে ও রাস্তার লোকজনের দিকে তাকাতে থাকে—শান্ত-ভাবে, স্থিরদৃষ্টিতে। গির্জা দেখলেই ও মাথা নোয়ায়। পলুএক্‌তফের বন্ধ দোকানটার পাশে যে-গির্জাটা তার পাশ দিয়ে যাবার সময়ও ও মাথা নোয়ালো। কিন্তু আজ ওর ভয়ও নেই উৎকণ্ঠাও নেই, করুণাও হ'চ্ছে না কারোর জন্যে, কোনো রকমের কোনো অস্বস্তিই বোধ ক'রছে না ও। এইভাবে সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে।

দুপুরবেলা একটা হোটেলে ব'সে ইলিয়া খবরের কাগজে প'ড়লো:

"দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড! পোদ্দার পলুএক্‌তফ্‌ খুন!"

ঘটনাটার বিবৃতি দিয়ে শেষে লেখা হ'য়েছে:

"পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।"

প'ড়ে, মাথাটা একটু নেড়ে মুচকি হাসলো ইলিয়া, কারণ ও নিশ্চিত জানে যে এই হত্যাকারীকে কেউই কোনোদিন খুঁজে ব'ার ক'রতে পারবে না, যদি না সে নিজের থেকে ধরা দেয়।

সেই সন্ধ্যায় ওলিম্‌পিয়াদার চাকর ইলিয়াকে একখানা চিঠি দিয়ে গেলো। তাতে লেখা ছিলো :

"সাধারণ স্নানাগারের কাছাকাছি, কুস্‌নেৎস্কি স্ট্রীটের কোণটায় ন'টার সময় থেকো।"

চিঠিখানা প'ড়েই ইলিয়া শিউরে উঠলো—যেন কেউ এক গেলাশ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে ওর শার্টের তলায়! ওর সামনে ভেসে উঠলো ওলিম্‌পিয়াদার অবজ্ঞাভরা মুখখানা, আর কানে বাজতে থাকলো স্ত্রীলোকটার চোখা-চোখা অপ্রীতিকর কথাগুলো :

"তুমি অন্য কোনো সময়ে এলে না কেন?"

চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে ইলিয়া কিছুতেই বুঝতে পারলো না ওলিম্‌পিয়াদা কেন ওর সংগে দেখা ক'রতে চায়। বুঝতে পারলো না তো বটেই, তাছাড়া ভয়ে বোঝবার চেষ্টাও ক'রলো না। ফলে, উৎকণ্ঠায় টিপটিপ ক'রতে লাগলো ওর বুকটা। যাই হ'ক, ন'টার সময় নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে ও দেখলো জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রীপুরুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চ'লেছে, অবশ্য অনেকে যাচ্ছে একা-একাও। এমন সময় এদের মধ্যে ওলিম্‌পিয়াদার দীর্ঘ মূর্তিটা চোখে প'ড়তেই ওর দুশ্চিন্তা গেলো বেড়ে। ওলিম্‌পিয়াদার গায়ে ছিলো একটা পুরণো কোট, মাথায় জড়ানো ছিলো একখানা শাল। তাই তার চোখদুটি ছাড়া বাদবাকি মুখখানা দেখতে পেলো না ইলিয়া। ওলিম্‌পিয়াদা আর একটু এগিয়ে আসতেই ও চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়ালো তার সামনে।

ওলিম্‌পিয়াদা ব'ললো : "এসো আমার সংগে!"

আর, প্রায় সংগে সংগেই আবার ব'ললো অত্যন্ত চাপা গলায় :

"কোটের কলার দিয়ে তোমার মুখখানা ঢেকে নাও।"

স্নানাগারের দালানটা দিয়ে দুজনে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো—যে যার মুখ লুকিয়ে—যেন লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে চায় না এইভাবে। তারপর ওরা চট্‌ ক'রে একখানা নির্জন ঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। ঘরে ঢুকেই

ওলিম্‌পিয়াদা ছুঁড়ে ফেলে দিলো তার শালখানা। ইলিয়া দেখলো ঠাণ্ডায় ওলিম্‌পিয়াদার মুখখানা গোলাপী হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সে-মুখ ঠিক আগের মতোই শান্ত। যাক্, এতে যেন সাহস ফিরে পেলো ইলিয়া; কিন্তু ওর সঙ্গিনীর মুখে এতোটুকুও চাঞ্চল্যের ভাব দেখতে না পেয়ে উৎকন্ঠিতও হ'লো খানিকটা। সোফায় ইলিয়ার পাশে ব'সে, তার মুখের দিকে মিষ্টি ক'রে চেয়ে, ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"তারপর, তোমার খবর কি মানিক ? এদিকে যে তোমাকে-আমাকে খুব শিগ্‌গিরই করোনারের সামনে হাজির করা হবে !"

হাতের চেটো দিয়ে গোঁফের ওপর থেকে হিমের বিন্দুগুলো মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"কেন ?"

"শোনো একবার হাঁদারামের কথা !" এই ব'লে ওলিম্‌পিয়াদা গম্ভীরভাবে ভ্রূ কুঁচকে, ফিশফিশ ক'রে ব'ললো ইলিয়াকে :

"জানো, আজ একটা ডিটেক্‌টিভ এসেছিলো আমার কাছে ? এর মানে বোঝো ?"

স্ত্রীলোকটার দিকে চেয়ে নির্বিকার গলায় জবাব দিলো ইলিয়া :

"শোনো, তুমি আর তোমার ডিটেক্‌টিভ কি ক'রছো না ক'রছো তার সংগে আমার এতোটুকুও সম্বন্ধ নেই। সোজাসুজি বলো—এখানে আমায় ডেকে পাঠাবার কারণটা কি, আর কেনই বা এতো লুকোচুরি ?"

ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে এক-ফালি অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে ওলিম্‌পিয়াদা :

"ও, বুঝেছি !—তুমি রাগ ক'রেছো ! যাই হ'ক, ও-সব মান-অভিমানের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা আমার এখন নেই। শোনো : তোমায় যখন করোনার জিজ্ঞেস ক'রবে আমার সংগে তোমার কবে পরিচয় হ'য়েছে, তুমি প্রায়ই আমার সংগে দেখা ক'রতে কি না, তখন সত্যিকথাটা ব'লবে, যা যা ঘ'টেছে—সবকিছু—সবিস্তারে। বুঝলে ? কি, শুনছো আমার কথাগুলো ?"

"হ্যাঁ, শুনছি।"

"কিন্তু পোদ্দার-বুড়োটার কথা যদি জিজ্ঞেস করে, তাহ'লে ব'লবে তার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না—জানা তো দূরের কথা, তাকে চোখেও দেখোনি কোনোদিন। তাছাড়া মনে রেখো, আমি যে কারোর রক্ষিতা ছিলাম এটা তোমায় একেবারে ভুলে যেতে হবে। বুঝলে ?"

ইলিয়া বুঝতে পারলো ওলিম্‌পিয়াদা উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে। তার প্রমাণ তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আর চোখের ছট্‌ফটে চাহনি। ওলিম্‌পিয়াদা যে মনে মনে ওকে ডরাচ্ছে এটা ভাবতেই ও খুশি হ'লো বটে, তবে ওর বুকের মধ্যেটা যেন জ্ব'লতেও লাগলো থেকে থেকে। ইলিয়া ভাবলো মেয়েটাকে আর-একটু যন্ত্রণা দিলে কেমন হয়! তাই চোখদুটো কুঁচকে, একটা কথাও না ব'লে, ও হাসতে লাগলো মৃদু মৃদু। সংগে সংগে ওলিম্‌পিয়াদার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে। ইলিয়ার কাছ থেকে একটু স'রে ব'সে ফিশফিশে গলায় জিজ্ঞাসা করে সে :

"কি ব্যাপার, ইলিয়া ? অমন ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন ? ইলিয়া, ইলিয়া ?"

দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলো ইলিয়া :

"কিন্তু তোমার জন্যে আমি মিছে কথা ব'লতে যাবো কেন ? বুড়োটাকে আমি তো সত্যিই তোমার বাড়িতে দেখেছি ; তুমিই বলো দেখেছি কি না !"

এই ব'লে টেবিলের শ্বেতপাথরখানার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, রাগে দুঃখে ভিতরে-ভিতরে জ্ব'লতে থাকলেও সেটা বাইরে প্রকাশ না ক'রে, ধীরস্থিরভাবে ব'লতে লাগলো ইলিয়া :

"বুড়োটাকে তোমার ওখানে দেখেই আমার কি মনে হ'য়েছিলো জানো ? মনে হ'য়েছিলো : এই লোকটাই আমাব পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আমার জীবনের সকল আনন্দ নষ্ট ক'রতে চ'লেছে।"

এই পর্যন্ত ব'লেই ও এইবার ফেটে পড়ে :

"সেদিন অবিশ্যি আমি ওকে গলা টিপে মারি নি, কিন্তু—"

হাতের চেটো দিয়ে টেবিলটা চাপড়ে জোর গলায় ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"মিছে কথা—মিছে কথা ব'লছো তুমি! ও তোমার পথের কাঁটা হ'য়ে দাঁড়ায় নি।"

"তার মানে?"

"তার মানে, তুমি যদি চাইতে তাহ'লে ও আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না। তোমায় কি আমি ঠারেঠোরে জানাই নি কিংবা সরাসরি বলি নি যে যখন খুশি আমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি? তুমি তখন রা কাটো নি, ব'লে ব'লে শুধু হেসেছিলে। তুমি আমায় কোনোদিনই সত্যি ক'রে ভালোবাসো নি। ঐ বেহায়া লোকটা যে তোমার আনন্দে ভাগ্ বসিয়েছিলো তার জন্যে দায়ী

"থামো, চুপ ক'রো!" এই ব'লে ইলিয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই আবার ব'সে প'ড়লো। ওর মনে হ'লো তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে ওলিম্পিয়াদা যেন ওকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে।

কিন্তু ওলিম্পিয়াদা থামবে কি, আরও জোর গলায় ব'লতে লাগলো:

"চুপ করো ব'ললেই আমি চুপ ক'রবো ভেবেছো না-কি? আমার জন্যে তুমি কোন্‌দিন কি ক'রেছো শুনি? কিন্তু আমি তোমায় ভালোবেসেছি—আমার যৌবন দিয়ে—এই মজবুত দেহটা দিয়ে। একটা দিনের জন্যেও কি তুমি ব'লেছিলে: 'ওলিম্পিয়াদা বেছে নাও - হয় ও থাক্, আর নয়-তো আমি থাকি?' বলো, এ-কথাটা ব'লেছিলে কোনোদিন? নাঃ, পুরুষ জাতটাই এই রকম!"

রাগে কাঁপতে থাকে ইলিয়া, চোখে যেন অন্ধকার দেখে; সংগে সংগে মুঠো দুটো পাকিয়ে ও উঠে পড়ে চেয়ার থেকে।

"থামো! কি ব'লছো যা-তা?"

ওলিম্পিয়াদার চোখ্ দিয়ে তখন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাঁত বের ক'রে, প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীর মতো ব'লে উঠলো ওলিম্পিয়াদা:

"ও, তুমি আমাকে মারতে চাও? বেশ, মারো। কিন্তু মনে রেখো, আমার গায়ে হাত তুলেছো কি আমি দরজা খুলে এই ব'লে চেঁচিয়ে উঠবো যে আমার পেড়াপীড়িতে তুমিই ঐ বুড়োকে খুন ক'রেছো।—কৈ, মারো?"

প্রথমটায় ইলিয়া ভয় পেয়ে গেলো, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সে-ভয়টা আর রইলো না। কেবল ওর বুকের মধ্যেটা একবার যেন খ্যাচ্ ক'রে উঠলো। দম নিতে গিয়ে ওর মনে হ'লো একজোড়া অদৃশ্য হাত যেন ওর গলাটা টিপে ধ'রেছে।

এবারও কোনো কথা না ব'লে, সোফার ওপর আবার ব'সে প'ড়ে ইলিয়া টেনে টেনে হাসতে লাগলো। দেখলো ওলিম্‌পিয়াদা ঠোঁট কামড়াচ্ছে, আর তার হাতদুখানা যেন নিশপিশ ক'রছে আঁচড়ে দেবার জন্যে। ভাপস্ত কাঠ আর সাবান-জলের গন্ধে-ভর্তি নোংরা ঘরখানায় তাকে অদ্ভুত দেখালো। দরজার ধারের সোফাটায় ব'সে, মাথা নিচু ক'রে ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"হাসো, খুব হাসো—শয়তান !"

"হাসবোই তো !"

"আর—তোমাকে দেখে আমি কিনা ভেবেছিলাম, তুমি—তুমি আমায় সাহায্য ক'রবে !"

"লিপা !" আস্তে আস্তে ডাকলো ইলিয়া।

কোনো সাড়া না দিয়ে, পাথরের মূর্তির মতো ব'সে থাকে ওলিম্‌পিয়াদা।

"লিপা" ! আর-একবার ডাকলো ইলিয়া। তারপরই ওর মনে হ'লো ও যেন আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়তে যাচ্ছে। ব'ললো ধীরে ধীরে :

"বুড়োটাকে যে গলা টিপে মেরেছে সে আমি, ভগবানের দিব্যি, সে আমি !"

শুনে শিউরে ওঠে ওলিম্‌পিয়াদা, তারপর মাথাটা তুলে, চোখদুটো বড়ো বড়ো ক'রে চেয়ে থাকে ইলিয়ার দিকে। ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে তার, তারপর অতি কষ্টে, যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে এইভাবে সে বলে ইলিয়াকে :

"বেকুব কোথাকার ! তুমি ভয় পেয়ে গেছো !"

ইলিয়া বুঝলো ওর কথা শুনে ভয় পেয়েছে ওলিম্‌পিয়াদাই, আর সে বিশ্বাসও ক'রতে পারছে না ওর কথাটা। উঠে গিয়ে ওলিম্‌পিয়াদার পাশে ব'সে ও করুণভাবে হাসতে লাগলো—একান্ত হতাশার হাসি। এমন সময় ওলিম্‌পিয়াদা হঠাৎ ইলিয়ার মাথাটা টেনে নিয়ে চেপে ধ'রলো তার বুকে, তারপর ওর চুলে চুমু খেতে খেতে, ধরা গলায় ব'লতে লাগলো ফিশফিশ ক'রে :

"ইলুশ্‌কা, ইলুশ্‌কা, আমি বুঝতে পারি না কেন তুমি আমাকে দুঃখ দাও ! সত্যি ব'লতে কি, বুড়ো ঢেমনাটাকে কেউ গলা টিপে মেরেছে শুনে আমি খুশিই হ'য়েছিলাম !"

মাথা নাড়তে নাড়তে ইলিয়া ব'ললো :

"আমিই মেরেছিলাম।"

উৎকণ্ঠিতভাবে ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"চুপ, চুপ, আস্তে! ওটা ম'রেছে, বেঁচেছি। এমনি ক'রে দম বন্ধ হ'য়ে যদি সব ক'টা ম'রতো—যে-ক'টা আমাকে ছুঁয়েছে সব ক'টা—তাহ'লে খুব খুশি হ'তাম আমি। একমাত্র তুমিই যোগ্য পুরুষ, তোমার মতো মানুষ আমি আর একটিও দেখিনি, মানিক—সারা জীবনেও না।"

ওলিম্‌পিয়াদার কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া তার বুকে নিজের মুখখানা আরও জোরে চেপে দেয়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুখখানা সরিয়ে নিতে পারে না যেন, আর অনুভব করে ওলিম্‌পিয়াদা ছাড়া এ-দুনিয়ায় আর কোনো বন্ধুও নেই ওর, তাছাড়া ওলিম্‌পিয়াদাকে ওর বড়ো দরকার—বড়ো দরকার এখন!

"ইলুশ্‌কা, তুমি যখন আমার দিকে কটমট ক'রে তাকাও, তখন আমি টের পাই আমার জীবন কতো নোংরা। লজ্জায় ম'রে যাই, তবু তোমাকে ভালোওবাসি। ঝলমলে, নবীন ওকগাছের মতোই মজবুত তোমার দেহ, দেমাক্‌ও তোমার যথেষ্ট, কিন্তু তা এতো পবিত্র যে তোমাকে না ভালোবেসে পারি না।"

ইলিয়ার মাথায় টপ্‌টপ্‌ ক'রে চোখের জল প'ড়তেই সে নিজেও কেঁদে ফেলে।

বুকের ওপর থেকে ইলিয়ার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে, ইলিয়ার অশ্রুসিক্ত চোখ, গাল এবং ঠোঁটগুলিতে চুমু খেতে খেতে ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"আমি জানি তুমি আমার দেহটাকে ঘৃণা করো না; কিন্তু সেই সংগে এটা জানি যে, তুমি আমায় অন্তর দিয়ে ভালোবাসো না, কেমন যেন অনুকম্পা করো আমায়, হয়তো-বা ঘেন্নাই করো। জানি, তুমি ক্ষমা ক'রতে পারো না আমার জীবনটাকে, আর সেই বুড়ো পোদ্দারটাকেও, তাই না?"

"ওর কথা তুলো না আমার সামনে!" এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে, ওলিম্‌পিয়াদার শাল দিয়ে মুখখানা মুছে, শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে ব'লতে লাগলো ইলিয়া :

"যা হবার তা তো হবেই। ঈশ্বর যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মানুষের অসাধ্য। অপরাধীকে তিনি খুঁজে নেবেনই, সে যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকুক না কেন। যাই হ'ক্, তুমি যা ব'ললে তার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি, লিপা। তুমি ঠিকই ব'লেছো। তোমার সামনে নিজেকে অপরাধী মনে হ'চ্ছে। ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি কেবল সুখের পায়রা,—কিন্তু না, তুমি তা নও। দোষ আমারই।"

ব'লতে ব'লতে ইলিয়ার গলা ধ'রে আসে, ঠোঁটদুখানা কাঁপতে থাকে, চোখদুটো লাল হ'য়ে যায়। কাঁপা-হাতে ধীরে ধীরে এলোমেলো চুলগুলো ঠিক ক'রে নিয়ে, হঠাৎ হাতদুখানা ছুঁড়ে বিলাপ ক'রে ওঠে ইলিয়া:

"আমিই দায়ী—সবকিছুর জন্যে আমিই দায়ী—দোষ আমারই! কিন্তু কেন?—উঃ শয়তান!"

ওলিম্পিয়াদা ওর ডান হাতখানা চেপে ধ'রতেই ইলিয়া ঝুপ ক'রে ব'সে প'ড়লো তার পাশে, তারপর ব'ললো:

"বুঝলে তো, আমিই ওকে মেরেছি—গলা টিপে। বিশ্বাস হ'চ্ছে না আমায়? আমি মেরেছি, আমিই!"

ভয়ে আঁৎকে উঠে ফিশফিশ ক'রে ব'ললো ওলিম্পিয়াদা:

"অতো চেঁচিও না, চুপ করো। কি ব'লছো তার খেয়াল আছে তোমার?"

এই ব'লে ইলিয়াকে দুহাতে জাপটে ধ'রে ওলিম্পিয়াদা তার ভীত চক্ষুদুটি তুলে ধ'রলো ইলিয়ার পানে।

"শোনো লিপা, আর কেউ না জানুক ভগবান জানেন, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘ'টে গেছে। আমি ওকে মারতে চাই নি। ভেবেছিলাম ওর জঘন্য মুখখানা আর একবার ভালো ক'রে দেখবো, তাই ওর দোকানে ঢুকেছিলাম। ঢোকবার সময় এ-সব চিন্তা আমার মাথাতেই আসে নি। কিন্তু তারপর হঠাৎ শয়তান যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে গেলো ওর দিকে। কৈ, ভগবান তো আমায় তখন বাধা দেন নি? কিন্তু টাকাগুলো কেন নিলাম তাই ভাবছি; না নিলেই ভালো হ'তো—আঃ—!"

ইলিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। ওর মনে হ'লো একটা বিরাট বোঝা যেন নেমে গেলো ওর বুকের ওপর থেকে। ইলিয়ার কাহিনী শুনে

ওলিম্‌পিয়াদা তাজ্জব ব'নে যায়, শিউরে উঠে তাকে আরও জোরে নিজের কাছটিতে টেনে নেয়, তারপর ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলে :

"টাকাটা নিয়ে ভালোই ক'রেছো। বলা যাবে এটা ডাকাতি, নইলে লোকে হয়তো ব'লতো তোমার হিংসে ছিলো বুড়োটার ওপর। আর, তাই—"

চিন্তিতভাবে ইলিয়া ব'ললো :

"কিন্তু আমি অনুতাপ ক'রবো না, ক'রতে চাইও না! ইচ্ছে হ'লে ঈশ্বর আমায় শাস্তি দিতে পারেন, আমি রাজী! মানুষ বিচার ক'রতে পারে না, আর ক'রবেই বা কি ক'রে? মানুষ কি বিচার করবার মালিক? পাপ করে নি এমন মানুষ আছে না কি? কৈ, আমার তো চোখে পড়েনি। দেখি কি হয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওলিম্‌পিয়াদা ব'ললো :

"হায় ভগবান! এ কি হ'লো? জানি না কি হবে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মানিক, কিছু ভাবতেও পারছি না। তার চেয়ে চলো তুমি আমি এখান থেকে চ'লে যাই, এখনো সময় আছে।"

ওলিমপিয়াদা উঠে দাঁড়ালো, ট'লতে লাগলো মাতালের মতো। কিন্তু শালখানা মাথায় জড়াতেই হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠলো সে, তারপর ব'লতে লাগলো আস্তে আস্তে :

"এখন আমাদের কি করা উচিত, ইলুশা? এমনি ক'রে ম'রবো?"

ইলিয়া মাথা নেড়ে ব'ললো : "না।"

"তাহ'লে—তুমি করোনারকে সবকিছুই ব'লবে—যা যা ঘ'টেছে—মানে—ঠিক সবকিছুই না অবশ্য—অর্থাৎ—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই। তুমি কি ভাবো আমি আত্মরক্ষা ক'রতে জানি না? ঐ বুড়ো আর তার দু' হাজার টাকার জন্যে আমি সাইবেরিয়ায় যাবো ভেবেছো না কি? না গো না, এ-ব্যাপারে এখনো আমি শেষ কথাটা বলি নি। বুঝলে?"

উত্তেজনায় ইলিয়ার মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে, চোখদুটো জ্ব'লতে থাকে ধক্‌ধক্ ক'রে। ইলিয়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ফিশফিশ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো ওলিম্‌পিয়াদা :

"মাত্তর দু হাজার ?"

"না, আরও কিছু আছে।—শয়তান !"

জলভরা চোখে, বিষণ্ণ গলায় ব'ললো ওলিম্পিয়াদা :

"বেচারা ! নিলেই যদি তাহ'লে এই ক'টা টাকা—"

"কি আশ্চর্য। আমি কি টাকার জন্যে ও-কাজ ক'রেছিলাম ? তুমি কি কিছুই বোঝো না ?"

এই ব'লে একটু হেসে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"দাঁড়াও ! আমি আগে বেরুবো। পুরুষেরই আগে যাওয়া উচিত।"

বিপর্যস্ত গলায় ব'ললো ওলিম্পিয়াদা :

"শোনো, আবার খুব শিগ্‌গিরই আমার সংগে দেখা ক'রো, বুঝলে ? খুব শিগ্‌গির,—মনে রেখো।"

এর পর ওরা দুজনে দুজনকে অনেকক্ষণ ধ'রে চুমু খেলো—দেহমনের সবটুকু কামনা দিয়ে—গভীরভাবে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ইলিয়া একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রলো। গাড়িতে ব'সে ও কেবলই তাকাতে লাগলো পিছনে, কেউ ওকে অনুসরণ ক'রছে কিনা দেখবার জন্যে। ওলিম্পিয়াদার সংগে খোলাখুলি কথাবার্তা হওয়ায় ওর মনটা বেশ থিতিয়ে গেছে, খানিকটা শান্তিও যেন খুঁজে পেয়েছে সে, সেই সংগে একটা সস্নেহ অনুভূতিও জেগেছে স্ত্রীলোকটার প্রতি। হত্যার ব্যাপারটা নিজের মুখে স্বীকার করতে ওলিম্পিয়াদা কি কথায় কি চাহনিতে ওকে আঘাত দেবার চেষ্টা করে নি, ওকে দূরেও ঠেলে দেয় নি, বরং মনে হ'য়েছে ওর পাপের অর্ধেকটা সে-ও যেন নিয়েছে বুক পেতে ; তবুও, এর একটি মুহূর্ত আগেই, সে যখন এই ব্যাপারের কিছুই জানতো না, তখন সে চেয়েছিলো ওকে বিপন্ন ক'রে তুলতে ; হয়তো-বা তুলতোও ; তার মুখের কঠিন রেখায় এবং চোখের জ্বলন্ত চাহনিতে সেটা বেশ স্পষ্টই হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু এখন ওলিম্পিয়াদার কথা ভাবতে ভাবতে ইলিয়ার ঠোঁটে খেলে গেলো এক টুকরো মিষ্টি হাসি ; তবে সেই সংগে ওর মনে হ'লো, একদল শিকারী যেন একটা বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে চ'লেছে।

পরদিন সকালে পেত্রুহার সংগে হোটেলে দেখা হ'তেই ইলিয়া তাকে অভিবাদন জানালো :

"গুড মর্ণিং।"

তার জবাবে পেত্রুহা ওকে অভিবাদন জানালো কি জানালো না সেটা বোঝা গেলো না। কেবল এইটুকু বোঝা গেলো যে পেত্রুহা ওর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে—কেমন যেন একটু অদ্ভুতভাবে। তেরেন্সও কোনো কথা না ব'লে ওর দিকে চেয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো গোটাকতক। কিন্তু জাকব ওকে মাশার ডেরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে ব'ললো :

"কাল সন্ধ্যেবেলা এক পুলিশ-অফিসার এসেছিলো। তোমার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই জিজ্ঞেস ক'রে গেছে বাবাকে। ব্যাপার কি বলো তো?"

ধীরস্থিরভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"কি জিজ্ঞেস ক'রে গেছে?"

"নানান কথা। কোথায় থাকো, কি কাজ করো, কি ক'রে তোমার চলে, ভদ্কা খাও কি না,—এই সব।—তাছাড়া মেয়েমানুষ সম্বন্ধেও দু-চারটে কথা। ওলিম্‌পিয়াদা না কি কার একটা নামও ক'রেছে যেন। তুমি চেনো না কি ঐ নামের কোনো মেয়েমানুষকে?—কি ব্যাপার বলো তো?"

"যমই জানে!" এই ব'লে ইলিয়া চ'লে এলো সেখান থেকে।

সেই সন্ধ্যায় ওলিম্‌পিয়াদার কাছ থেকে আর-একখানি চিঠি পেলো সে। তাতে লেখা ছিলো :

"আজ তোমার সম্পর্কে আমাকে জেরা করা হয়। আমি সবকিছুই ব'লেছি —সবিস্তারে। ব্যাপারটা ভয়ানক কিছু নয়।—ব'লতে পারো, নেহাত সাদা-সিধেই। ভয় পেও না মানিক। আমার অনেক চুমু নিও।"

প'ড়ে, চিঠিখানা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ইলিয়া।

ফিলিমনফের বাড়িতে এবং হোটেলে হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে সবাই আলোচনা ক'রছে, জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। নানান মিয়ার নানান কাহিনী শুনতে

শুনতে ইলিয়া মনে মনে হেসে খুন হয়, আর একটা অদ্ভুত আনন্দের স্বাদ পায় যেন। লোকজনের মধ্যে ব'সে বেশ গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করে সে:

"তারপর ?"

সংগে সংগে হুড়মুড় ক'রে যে যার মনের মতো ফেনিয়ে ফুলিয়ে হত্যাকাণ্ডটির বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকে,—আর শুনতে শুনতে ইলিয়া ভাবে: "লোকগুলোর কাণ্ড ত্যাখো! এরা জানে না যে এদের পিলে চ'মকে দিতে পারি আমি, যদি বলি: এ-কাজ ক'রেছি আমিই!"

কেউ কেউ হত্যাকারীর সাহস ও চাতুর্যের তারিফ ক'রতে থাকে, কেউ দুঃখ করে হত্যাকারী সমস্ত টাকাটাই আত্মসাৎ করার সময় পায় নি ব'লে, আবার কেউ কেউ উৎকণ্ঠিতভাবে বলে:

"ত্যাখো, শেষটায় ধরা না প'ড়ে যায়!"

যাই হ'ক, যে যা-ই বলুক, পলুএক্‌তফের জন্যে কিন্তু কেউ এতোটুকুও দুঃখ বা সমবেদনা জানায় না। অবশ্য, ঐ বুড়োর জন্যে ইলিয়ারও কোনো দুঃখ নেই। তবুও, একটা লোক খুন হ'লো, অথচ তার জন্যে কেউই দুঃখিত নয়— এতে লোকজনের ওপর কেমন যেন চ'টে যায় ইলিয়া।

ব'লতে কি, পলুএকৃতফ্‌ সম্বন্ধে মাথাই ঘামায় না সে। সে যে একটা গুরুতর পাপ ক'রেছে এবং সেজন্য তাকে যে প্রতিফল পেতেই হবে—এই একটা চিন্তা ছাড়া তার মাথায় অন্য কোনো চিন্তা তিষ্ঠতেই পারে না। অবশ্য, এতেও কাবু হয় না সে। চিন্তাটা যেন থিতিয়ে থাকে তার মগজের মধ্যে, পুকুরের তলায় নিশ্চিন্ত মাছের মতো। নয়-তো মনে হয়, আঘাত লেগে কোথায় যেন ফুলে উঠেছে, কিন্তু যতোক্ষণ না কেউ সেটা টিপে দিচ্ছে তার ব্যাথাটাও টের পাবার উপায় নেই। ইলিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন আসবেই যেদিন ঈশ্বর ওকে শাস্তি দেবেন; কারণ ঈশ্বর সর্বজান্তা তো বটেনই, উপরন্তু অপরাধীকে ক্ষমাও করেন না তিনি। যে কোনো দিন, যে কোন মুহূর্তে শাস্তি বরণ করবার এই সুস্থির প্রস্তুতি অবিচলিত রাখে ইলিয়াকে। মনে মনে সে বলে:

"শাস্তি আসে আসুক। আমি তো প্রস্তুত!"

ফলে, খুন করার আগে ইলিয়ার মনের অবস্থা যা ছিলো এখনও প্রায় তা-ই র'য়েছে। পরিবর্তন যেটুকু ঘ'টেছে সেটা শুধু তার বাড়তি সতর্কতায়, অর্থাৎ

আজকাল সে আরও সতর্কভাবে লোকজনকে লক্ষ্য ক'রে থাকে,—বিশেষ ক'রে তাদের খারাপ দিকটা। এতে সে আনন্দই পায়, কিন্তু এ-ভাবে আনন্দ পাওয়াটা যে ভালোই এটা প্রতিপন্ন করবার কোনো সচেতন চেষ্টা করে না সে।

দিন আসে দিন যায়। আর, ইলিয়াও বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হ'য়ে যেতে থাকে দিন দিন, নিজের মনেই থাকে নিজে লুকিয়ে, নিয়ম-মতো জিনিষপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় শহরময়, এ-হোটেলে সে-হোটেলে ব'সে কান-খাড়া ক'রে লোকজনের কথাবার্তা শোনে চুপচাপ, আর সেই সংগে স্বভাব-মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য ক'রতে থাকে লোকগুলোর ভাব-ভংগী। একদিন ওর মনে প'ড়ে যায় চিলেঘরে লুকনো টাকাটার কথা, ভেবে ঠিক করে সেটা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখবে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বলে মনে মনে :

"দরকার কি, যেমন আছে থাক্। যদি খানাতল্লাসী হয়, আর টাকাটা বেরিয়েই পড়ে, তাহ'লে নিজের দোষ স্বীকার ক'রবো।"

কিন্তু খানাতল্লাসী হ'লো না। তাছাড়া, বেশ কয়েকটা দিন গেলো, তবুও করোনারের সামনে হাজির হবার ডাকও এলো না। অবশেষে ছ'দিনের দিন সমন এলো তার নামে। যাবার আগে ইলিয়া গায়ে চড়ালো তার ধোপদুরস্ত্ সেরা পোষাকটাই, ঘ'ষে ঘ'ষে বুটজোড়াটাকে ক'রে তুললো চক্চকে, তারপর একখানা ভাড়া-গাড়িতে চেপে চ'ললো করোনারের অফিসের উদ্দেশে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়িখানা কেবলই হোঁচট খেতে থাকে, কিন্তু ইলিয়া ব'সে থাকে নিশ্চল পুতুলের মতো, শিরদাঁড়াটি সোজা ক'রে। ওর মনে হয়, ও যেন একটা পাহাড়ের ঠিক কার্নিশে ব'সে আছে যেখানে নড়াচড়া করার অর্থই হলো একেবারে অতল খদে পতন।

খানিক পরে গাড়িখানা করোনারের অফিসের সামনে এসে থেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় এতোটুকুও তাড়াহুড়ো করে না সে, বরং এমন সন্তর্পণে উঠতে থাকে যেন তার গায়ে কাঁচের পোষাক র'য়েছে।

আসতে আসতে ইলিয়া করোনারের চেহারা সম্পর্কে কিছু যে না ভেবেছে তা নয়। কিন্তু এসে দেখলো করোনার যুবক, একরাশ কোঁকড়া চুল তার মাথায়, নাকটা শকুনির ঠোঁটের মতো, আর চোখে সোনার চশমা। ইলিয়াকে দেখে করোনার প্রথমে তার ফর্শা পাতলা হাত দুখানা ঘ'ষে নিলো, তারপর

চশমাটা খুলে কাঁচ দুখানা রুমালে মুছতে মুছতে, তার টানা-নানা দুটি কালো চোখের শিরশিরে চাহনিটুকু ধীরে ধীরে বুলোতে লাগলো ইলিয়ার মুখের ওপর।

নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানালো ইলিয়া।

"গুড্-মর্ণিং! বসুন—এইখানে" এই ব'লে করোনার হাতের লীলায়িত ইশারায় লাল কাপড়ে-ঢাকা বড়ো টেবিলটার কাছে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলো। ব'সে, টেবিলের ধারে যে কাগজপত্র ছিলো সেগুলো অতি সাবধানে কনুই দিয়ে খানিক ঠেলে দিলো ইলিয়া। সেটা লক্ষ্য ক'রে করোনার বিনীত-ভাবে কাগজগুলো সরিয়ে রাখলো এক পাশে, তারপর ইলিয়ার মুখোমুখী ব'সে, চুপচাপ একখানা বইয়ের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে, আড়চোখে তাকাতে লাগলো ইলিয়ার দিকে।

এ-ভাবে চুপচাপ ব'সে থাকতে ভালো লাগে না ইলিয়ার, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে। তখন করোনারের দিক থেকে চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে সে দেখতে শুরু করে ঘরখানার চারিধার। এমন সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র এবং এমন নিখুঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সে এই প্রথম দেখছে। দেয়ালগুলোয় টাঙানো র'য়েছে নানা প্রতিকৃতি এবং নানান ধরণের ছবি। ফ্রেমগুলো চকচক্ ক'রছে আলোয়। একখানা ছবিতে দেখানো হ'য়েছেঃ খ্রীষ্ট চিন্তিতভাবে মাথা নিচু ক'রে হেঁটে চ'লেছেন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে, নিঃসঙ্গ বিষাদের ছায়া তাঁর মুখে, পায়ের কাছে প'ড়ে র'য়েছে কতকগুলো মৃতদেহ আর বাড়, আর পিছনে উঠছে মেঘাকৃতি কালো ধোঁয়া—যেন কিছু পুড়ছে সেখানে। ইলিয়া অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে থাকে ছবিখানার দিকে, বুঝতে চেষ্টা করে তার মর্মার্থ, এমন কি ভাবে ছবিখানার তাৎপর্য বুঝে নেবে করোনারের কাছ থেকেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার আগেই করোনারের বইখানা বন্ধ হ'য়ে যায় সশব্দে।

ইলিয়া চ'মকে উঠে তাকায় তার দিকে।

করোনারের মুখখানা তখন থমথম ক'রছে, একটা বিরক্তির ভাব যেন আভাসিত হ'য়েছে তার কপালের সূক্ষ্ম রেখায়, ঠোঁট দুখানা বেরিয়ে এসেছে হাস্যকর ভংগীতে, এবং সব মিলিয়ে মনে হ'চ্ছে যেন কোনো ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে সে।

টেবিলে আঙুলের টোকা মারতে মারতে ব'ললো করোনার:

"আশা করি, আমি ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌ লুনেফের সামনেই ব'সে আছি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হয়তো বুঝতে পারছেন আপনাকে এখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছি?"

ছবিখানার দিকে আড়চোখে চেয়ে জবাব দিলো ইলিয়া:

"না।"

ঘরখানা ভারি সুন্দর। নিরিবিলি তো বটেই, উপরন্তু ছবির মতো সাজানো। তাছাড়া করোনারের গা থেকে কোনো দামী আতরের মিষ্টি গন্ধও ভেসে আসতে থাকে। এইসব কারণে ইলিয়ার মনটা অন্যদিকে চ'লে যায়, কেমন যেন থিতিয়েও আসে। তবে, সেই সংগে ঈর্ষান্বিতও হয় সে। ভাবে:

"খাসা জীবন দেখছি! লোকটা আছে বেশ! বাঁচবার এও একটা পথ! মনে হয়, চোর-খুনে ধরার কাজটাও বেশ লাভজনক। কে জানে সায়েবের মাইনে কতো!"

যেন অবাক হ'য়েছে এইভাবে ব'ললো করোনার:

"না? কেন, ওলিম্পিয়াদা পেত্রফ্‌না আপনাকে কোনো কথা বলেন নি?"

"না। ওঁর সংগে আমার বহুদিন দেখা হয় নি।"

এবার চেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে, ঠোঁটদুখানা আবার হাস্যকর ভংগীতে ফাঁক ক'রে ব'ললো করোনার:

"কতো দিন?"

"ঠিক বলা মুশকিল, তবে—আট-ন' দিন হবে হয়তো।"

"তাই না কি? আচ্ছা বলুন তো, শ্রীমতী ওলিম্পিয়াদার বাড়িতে বুড়ো পলুএক্‌তফের সংগে কি আপনার বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিলো?"

করোনারের চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"যে বুড়োটি খুন হ'য়েছে তার কথা ব'লছেন কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারই কথা!"

"তার সংগে আমার একবারও দেখা হয় নি।"

"একবারও না?"

"না।"

কপট ঔদাসীন্যের আড়াল থেকে করোনার একটার পর একটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ ক'রতে থাকে; কিন্তু ইলিয়াকে তাড়াহুড়ো না ক'রে নেহাতই ধীরে ধীরে জবাব দিতে দেখে, করোনার অধীরভাবে টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা মারতে থাকে। তারপর হঠাৎ ইলিয়ার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'আপনি কি জানতেন যে পলুএক্‌তফ্‌ ওলিম্‌পিয়াদা পেত্রফ্‌নাকে রক্ষিতা ক'রে নিজের কাছে রেখেছিলো?"

শূন্যগর্ভ গলায় জবাব দিলো ইলিয়া:

"না।"

তিরিক্ষি মেজাজে করোনার ব'ললো:

"হ্যাঁ, আমি ব'লছি পলুএক্‌তফ্‌ ওলিম্‌পিয়াদাকে রক্ষিতা ক'রে রেখেছিলো।"

ইলিয়া চুপচাপ ব'সে থাকে।

তার কাছ থেকে জবাব পাবার কোনো আশা নেই দেখে করোনার আবার ব'ললো:

"আমার মতে এ-কাজটা খুবই খারাপ।"

প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ব'ললো ইলিয়া:

"অবিশ্যি, এতে ভালোরই বা কি আছে!"

"ঠিক বলি নি?"

ইলিয়া আবার চুপচাপ ব'সে থাকে।

"ওলিম্‌পিয়াদার সংগে কি আপনার বহুদিনের পরিচয়?"

"তা বছর খানেকের ওপর হবে বৈ কি।"

"তার মানে পলুএক্‌তফের সংগে ওঁর পরিচয় হবার আগেই আপনি ওঁকে চিনতেন?"

বিরক্ত হ'য়ে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো: "ভারি সেয়ানা দেখছি!"

কিন্তু জবাব দিলো শান্তভাবে:

"তা কি ক'রে ব'লবো বলুন, আমি তো আর জানতাম না যে পলুএক্‌তফ্‌ ওঁকে রক্ষিতা ক'রে রেখেছিলো?"

সংগে সংগে ঠোঁটদুখানা কুঁচকে একটা শিস্ দিয়ে করোনার এক সীট কাগজের ওপর চোখ বুলোতে শুরু করে। ইলিয়া তখন আবার দেখতে থাকে সেই ছবিখানা। ছবিটার দৌলতেই যে ওর মেজাজ এখনো বিগড়ে যায় নি এটা বুঝতে পারে ইলিয়া।

ঘরখানা থমথম ক'রছে। এমন সময় কোথায় যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো একটি শিশু। তারপর শোনা গেলো, খুশি-ভরা মিষ্টি গলায় কোনো নারী ধীরে ধীরে গাইছে :

"সোইন্‌কা আমার, সোনা আমার !"

করোনার ব'লে উঠলো :

"ঐ ছবিখানা আপনাকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে দেখছি ?"

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"খ্রীষ্ট যাচ্ছেন কোথায় বলুন তো ?"

বিষণ্ণ এবং হতাশ দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে চেয়ে, একটু নীরব থেকে, করোনার ব'ললো :

"ও—মানে—. তাঁর উপদেশ মানুষ কিভাবে পালন ক'রেছে সেইটে দেখবার জন্যে খ্রীষ্ট মর্তে নেমে এসেছেন। তিনি হাঁটছেন একটা রণক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে, চারিধারে দেখছেন মানুষের মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপ, আগুন আর লুঠ-তরাজের তাণ্ডব-লীলা।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"এসব কি তিনি স্বর্গ থেকে দেখতে পেতেন না ?"

"মানে—এটা হ'লো—যাকে বলে একটা রূপক। বুঝলেন ? ছবিটা আঁকার উদ্দেশ্য হ'লো এই রূপকের মধ্যে দিয়ে মানুষকে এই কথাটাই ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে খ্রীষ্ট-প্রচারিত জীবন আর সত্যকার জীবনের মধ্যে একটা অসঙ্গতি আছে। কিন্তু সে-কথা যাক্, আপনাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন ক'রতে চাই।"

ছবিখানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ইলিয়া করোনারের মুখের

দিকে চাইলো। তারপর আবার শুরু হ'লো সেই প্রশ্নের একঘেয়ে মনস্থন। প্রশ্ন তো নয়, যেন বর্ষাকালে মাছির ভন্‌ভনানি। শুনতে শুনতে এবং জবাব দিতে দিতে ইলিয়া ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। ওর মনে হয় এইভাবে একঘেয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হ'লো ওকে তাতিয়ে তোলা এবং ওর মনটাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেওয়া। করোনারের ওপর তাই চ'টে গেলো ইলিয়া। কিন্তু উপায় নেই, মাথা গরম ক'রে লাভ কি ?

করোনার প্রশ্ন করে :

"আচ্ছা, সেই বৃহস্পতিবার তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন ব'লতে পারেন ?"

"একটা হোটেলে। চা খাচ্ছিলাম।"

"ও ! কোন্ হোটেলে ? কোথায় ?"

" 'প্লেফ্‌না'-য়।"

"আচ্ছা, ঠিক সেই সময়টায় আপনি হোটেলে ছিলেন এ-কথাটা এতো জোর দিয়ে ব'লছেন কেন ?"

করোনারের মুখখানা থরথরিয়ে ওঠে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে সে ইলিয়ার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন মাছটি তার টোপ গিলেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে, ধীরেসুস্থে জবাব দিলো ইলিয়া :

"হোটেলটায় ঢোকবার আগে একজন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম ক'টা বাজে।"

চেয়ারে আবার ঠেস দিয়ে ব'সে আঙুলের নখের ওপর একটা পেন্সিলের টোকা মারতে শুরু করে করোনার।

ধীরে ধীরে বলে ইলিয়া :

"পাহারাওয়ালাটি ব'ললো ছুটো বেজে গেছে।—ছুটো বেজে কুড়ি হ'য়েছিলো বোধ হয়।"

"পাহারাওয়ালাটা আপনাকে চেনে কি ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার নিজের ঘড়ি নেই ?"

"না।"

"এর আগে আপনি আর কোনোদিন কি তার কাছে সময় জানতে চেয়েছিলেন ?"

"মাঝে-সাঝে।"

"কিন্তু কাউন্সিল-হাউস তো খুব দূরে নয়। তার টাওয়ারেও তো ঘড়ি র'য়েছে।"

"সব সময় মনে থাকে কি ?"

" 'প্লেফ্‌না'-য় কি অনেকক্ষণ ছিলেন ?"

"খুনের ব্যাপারটা নিয়ে চেঁচামেচি হবার আগে পর্যন্ত ছিলাম।"

"তারপর আপনি কোথায় গেলেন ?"

"নিহত লোকটাকে দেখতে !"

"সেখানে—মানে—দোকানটার আশপাশে আপনাকে কি কেউ দেখেছিলো ?"

"হ্যাঁ, সেই পাহারাওয়ালাটি।—এমন কি 'ভাগো' ব'লে সে আমায় ঠেলে সরিয়েও দিয়েছিলো।"

"বেশ, বেশ !" এই ব'লে করোনার ইলিয়ার দিকে না চেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"পাহারাওয়ালাটার কাছ থেকে যে আপনি সময় জানতে চেয়েছিলেন, সেটা খুনের আগে না পরে ?"

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে ইলিয়া ঝট্ ক'রে ঘুরে ব'সলো চেয়ারে। করোনারের চকচকে সাদা শার্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নখ-সমেত তার সরু সরু আঙুলগুলো, সোনার চশমাটা এবং তার কালো কালো ধারালো চোখদুটোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে রেগে গেলো ইলিয়া। প্রশ্নের জবাবে নিজেই একটা প্রশ্ন ক'রলো :

"তা কি ক'রে জানবো ?"

খুক্-খুক্ ক'রে একটু কেশে, আঙুল ম'টুকে, অসন্তুষ্ট গলায় ব'ললো করোনার :

"বাঃ! অপূর্ব! চমৎকার! বুঝলাম।"

তারপর ক্লান্তভাবে চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে সে আবার ব'ললো :

"খাসা। হ্যাঁ, আর দু-একটা প্রশ্ন ক'রেই আমি ছেড়ে দেবো আপনাকে। আচ্ছা, সেই পাহারাওয়ালার নামটা কি ব'লতে পারেন ?"

"এরেমিন্ মাৎভেই ইভানোভিচ্।"

এর পর করোনার আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু আগের মতো হুড়হুড় ক'রে নয়। বেশ বোঝা যায়, করোনার বুঝেছে যে মনের মতো কোনো জবাব পাওয়ার আশাই নেই। এদিকে ইলিয়া জবাব দেয়, আর অপেক্ষা ক'রে থাকে সময়-সংক্রান্ত প্রশ্নের মতো কোনো প্রশ্ন আবার ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় কি না। এক একটি শব্দ ও উচ্চারণ করে, আর ওর মনে হয় বুকের ওপর যেন হাতুড়ির ঘা প'ড়লো। যাই হ'ক, জামাই-ঠকানো প্রশ্ন আর একটিও ক'রলো না করোনার।

"আচ্ছা, সেদিন ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কোনো ঢ্যাঙা লোককে দেখেছিলেন ব'লে কি আপনার মনে পড়ে ?—ধরুন, তার গায়ে ছিলো একটা খাটো কোট আর মাথায় ছিলো কালো পশমের টুপি ?"

বিষণ্নভাবে জবাব দিলো ইলিয়া :

"না।"

"আচ্ছা, এবার তাহ'লে আপনার জবানবন্দীটা শুনে একটা সই ক'রে দিন।"

এই ব'লে করোনার মুখের সামনে একখানা কাগজ তুলে ধরে। কাগজটায় অনেক কিছুই লেখা র'য়েছে। একঘেয়ে গলায় লেখাটা তাড়াতাড়ি প'ড়তে প'ড়তে করোনার দু-একবার নাক সিটকোয়, তারপর পড়া হ'য়ে গেলে একটা কলম বাড়িয়ে দেয় ইলিয়ার দিকে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাগজটায় সই ক'রে ইলিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার থেকে, তারপর করোনারের দিকে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলে :

"গুড্-বাই।"

লর্ডের মতো অবজ্ঞাভরে একবার মাথা নেড়ে করোনার লিখতে শুরু করে।

ইলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। এতোক্ষণ ধ'রে যে-লোকটা ওকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়েছে তাকে দু-একটা কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে ওর।

ঘরখানা যেন বোবা। মাঝে মাঝে শুধু শব্দ হ'চ্ছে কলমের খাঁচড়ের।
ভিতরের ঘর থেকে একটা গানের টুকরো ভেসে এলো :

"পুতুল নাচে, পুতুল নাচে,
মানিক নাচে, পুতুল নাচে—"

হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা ক'রলো করোনার :
"কি ব্যাপার ?"
তিরিক্ষি গলায় জবাব দিলো ইলিয়া :
"কিছু না।"
"ব'ললাম তো আপনি যেতে পারেন।"
"যাচ্ছি।"
"তাই যান।"

এক মুহূর্তের জন্য ওরা এ ওর দিকে তাকালো এক দৃষ্টিতে। ইলিয়ার মনে হ'লো ওর বুকের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি যেন ফাটবার চেষ্টা ক'রছে।

তখন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ইলিয়া রাস্তায় নেমে পড়ে। মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা লাগতে ওর খেয়াল-হয়, সর্বাঙ্গ স্যাঁতস্যাত ক'রছে ঘামে।

আধ ঘণ্টা পরে ইলিয়া এসে হাজির হয় ওলিম্পিয়াদার বাসায়। গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখে ওলিম্পিয়াদা নিজেই দরজা খুলে দেয়। মেয়েটার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, চোখদুটো হ'য়ে উঠেছে বড়ো-বড়ো, তাতে আবার থই থই ক'রছে উৎকণ্ঠা। ইলিয়াকে দেখে উৎকণ্ঠিতা মায়ের মতো খুশি হ'য়ে ওঠে ওলিম্পিয়াদা।

ইলিয়া ব'ললো :
"করোনারের ওখান থেকে সোজা তোমার কাছে চ'লে এলাম।"
শুনে ওলিম্পিয়াদা ব'ললো :
"বেশ ক'রেছো, বুদ্ধিমানের মতোই কাজ ক'রেছো। হ্যাঁ, তারপর ও কি ব'ললো ?"

"লোকটা র‍্যাস্কেল। ফাঁদ পেতেছিলো মন্দ নয়!"

করোনারের প্রতি রাগে এবং ঘৃণায় ইলিয়ার গলাটা কেঁপে ওঠে।

ঠাণ্ডা মেজাজে ব'ললো ওলিম্পিয়াদা:

"ওর ওপর রাগ ক'রে লাভ কি? ওর কাজটাই যে এই রকম জঘন্য।"

"কেন, ও কি সোজাসুজি ব'লতে পারতো না যে: ওহে শুনছো, তোমাকে সন্দেহ করা হ'য়েছে?"

মুচকি হেসে ওলিম্পিয়াদা ব'ললো:

"কিন্তু তুমিও তো বাপু সোজা কথাটা খুব সোজা ক'রে বলো নি!"

ইলিয়া অবাক হ'য়ে বললো:

"আমি? ও—হ্যাঁ, তা বটে! দুত্তোর্—শয়তান!"

মনে হয় কোথায় যেন একটা বড়ো রকমের আঘাত পেয়েছে সে। খানিক নীরব থেকে ইলিয়া আবার ব'ললো:

"কিন্তু আমি যখন ওর সামনে ব'সেছিলাম, তখন ব'লবো কি, ভগবানের দিব্যি, আমার মনে হ'চ্ছিলো আমি কোনো পাপই করি নি। তাছাড়া—ব'লতে গেলে—"

খুশিভরা গলায় ব'ললো ওলিম্পিয়াদা:

"যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে।"

মুচকি হেসে ওলিম্পিয়াদার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ব'ললো ইলিয়া:

"তাছাড়া, বুঝলে, মিছে কথা প্রায় ব'লতেই হয় নি আমাকে। ভাগ্যটা আমার ভালো, লিপা!"

এই ব'লে ইলিয়া অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো।

ওলিম্পিয়াদা ব'ললো ফিশফিশ ক'রে:

"ডিটেক্‌টিভ্‌গুলো আমার ওপর কড়া নজর রেখেছে।—তাই, সাবধান। হয়তো তোমার ওপরেও ওদের নজর আছে।"

তাচ্ছিল্যভরে ব'লে উঠলো ইলিয়া লুনেফ্:

"তা জানি! ওরা গন্ধে গন্ধে ঘুরছে। বনের মধ্যে শিকারী যেমন নেকড়েবাঘকে ঘেরাও করে, তেমনি ওরা চায় আমাকেও ঘেরাও ক'রতে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। তুমিই বলো লিপা, ওদের কী হক্ আছে আমাকে

শাস্তি দেবার? ঘুরছে ঘুরুক, ঘুরে ঘুরে হয়রান হ'ক।—তাছাড়া, আমি তো নেকড়েবাঘ নই, আমি হ'লাম একটা হতভাগ্য মানুষ। আমি তো কাউকে গলা টিপে মারতে চাই নি, ভাগ্যই আমকে মারছে গলা টিপে। পাশ্‌কা একটা কবিতায় ঠিক এই কথাই লিখেছিলো। শুধু আমাকে নয়, ভাগ্য গলা টিপে মারছে পাশ্‌কাকে, জাকবকে, প্রত্যেককে।"

চা তৈরি ক'রতে ক'রতে ওলিম্‌পিয়াদা ব'ললো:

"এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না ইলুশা, আখেরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

সোফা থেকে উঠে জানলার ধারে গিয়ে, রাস্তার দিকে চেয়ে ইলিয়া বিষাদ ও সন্দেহ-ভরা গলায় ব'লতে লাগলো:

"সারাটা জীবন আমাকে একটা না একটা অপমানের মধ্যে দিয়ে কাটাতেই হ'চ্ছে। যা আমি ভালোবাসি না, যা আমি ঘৃণা করি ঠিক তারই মধ্যে যেন ঠেলে দেওয়া হ'চ্ছে আমাকে। আজ পযন্ত এমন কাউকে দেখলাম না যাকে দেখলে মন খুশিতে ভ'রে ওঠে। তার মানে জীবনে কি কোনো সৌন্দর্য নেই, কোনো আনন্দ নেই? এই যে একটা লোককে গলা টিপে মারলাম তাতে আমার কোন্ লাভটা হ'লো শুনি? কাজের মধ্যে যা হ'লো তা এই: নিজেকে কলংকিত ক'রলাম, আর নিজের হাতেই হৃদয়টাকে ছিঁড়লাম টুকরো-টুকরো ক'রে। টাকাটা নিলাম বটে, কিন্তু সেটা আমার না নেওয়াই উচিত ছিলো।"

ওলিম্‌পিয়াদা সান্ত্বনা দেয়:

"দুঃখ ক'রো না। তার জন্যে দুঃখ করবার মতো প্রাণ কারোরই নেই।"

"দুঃখ ক'রছি না লিপা, আমি আত্মসমর্থন ক'রতে চাই। সকলেই চেষ্টা করে আত্মসমর্থন ক'রতে, কারণ সকলকেই হবে বাঁচতে! ঐ করোনারটির কথা ধরো। সে তো বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছে—লেপের তলায় ট্যাপা ছারপোকাটির মতো। ও কাউকে গলা টিপে মারবে না। ওর পক্ষে ধার্মিক হ'য়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আতর মেখে জীবন কাটানো খুবই সম্ভব।"

"একটু র'য়ে-ব'সে থাকো, তারপর আমরা দুজনে একসংগে এ-শহর ছেড়ে চ'লে যাবো।"

ওলিম্‌পিয়াদার দিকে ফিরে দৃঢ় স্বরে ব'ললো ইলিয়া লুনেফ্‌:

"না, আমি কোথাও যাবো না!"

তারপর, যেন কাউকে ভয় দেখাচ্ছে এইভাবে আবার ব'ললো সে :

"না, সবুর করো, আমাকে এখানে থাকতে দাও, আমি দেখবো এর' পরে কি ঘটে!"

কিছুক্ষণের জন্য চিন্তিত দেখায় ওলিম্পিয়াদাকে। টেবিলের ধারে ব'সে কেংলির হাতলটা নিয়ে দু একবার নাড়া-চাড়া করে সে। ঢিলেঢালা সাদা ড্রেসিং-গাউনটায় তাকে দেখায় ভারি সুন্দর—যেন অনন্ত-যৌবনা ভেনাস্টি।

ঘরময় পায়চারী ক'রতে ক'রতে মাথাটা ঝাঁকিয়ে ব'ললো ইলিয়া :

"লড়াই আমি চালিয়ে যাবোই! যা হয় হ'ক।"

আহত স্বরে ব'লে উঠলো ওলিম্পিয়াদা :

"ও, বুঝেছি কেন তুমি এখান থেকে যেতে চাও না; তুমি আমাকে ভয় ক'রছো। ভাবছো, গোটা ব্যাপারটা আমি জানি ব'লে এখন থেকে আমি তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ইচ্ছে মতো ঘোরাবো! তাই না? কিন্তু তুমি ভুল ক'রছো বন্ধু। আমি তোমাকে জোর ক'রে আমার সংগে টেনে নিয়ে যাবো না!"

ওলিম্পিয়াদা কথাগুলো বলে শান্তভাবেই, কিন্তু ওর ঠোঁটদুখানা যেন কাঁপতে থাকে যন্ত্রণায়।

শুনে, ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কি ব'লছো তুমি?"

"ভয় নেই, আমি তোমার ওপর জোর খাটাবো না। দয়া ক'রে তোমার যেখানে খুশি তুমি যেতে পারো!"

ওলিম্পিয়াদার পাশে ব'সে, তার একখানি হাত চেপে ধ'রে ইলিয়া ব'ললো :

"ব'সো ব'সো, আমি বুঝতে পারছি না এ-সব কথা তুমি কেন ব'লছো!"

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে ব'ললো ওলিম্পিয়াদা :

"আর কতো ভান ক'রবে? আমি জানি তুমি যেমন দেমাকী তেমনি নিষ্ঠুর। সেই বুড়োটার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রতে চাও না, আর আমার জীবনটাকেও ঘেন্না করো তুমি। তাই না? এখন তুমি মনে মনে

ব'লছো, ব্যাপারটা ঘ'টেছে আমার জন্তেই। আমি জামি তুমি আমাকে ঘেন্না করো।"

অভিমানে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ইলিয়া জবাব দেয়:

"মিছে কথা, ডাহা মিছে কথা ব'লছো তুমি! কোনো কিছুর জন্তেই আমি তোমাকে দুষছি না। আমি জানি সতী সাধ্বী মেয়েরা আমাদের মতো লোকের জন্তে নয়, তাদের পোষবার মতো সামর্থ্যও আমাদের নেই। তাদের বিয়ে ক'রতে হয়, তারা সন্তান বিয়োয়। যা পবিত্র, যা সুন্দর তা কেবল বড়োলোকদের জন্তেই; আর যা উচ্ছিষ্ট, যা ছিবড়ের মতো, যা সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্—তাই কেবল আমাদের জন্তে।"

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে ব'ললো ওলিম্পিয়াদা:

"বেশ, বেশ, তাহ'লে আমাকে রেহাই দাও, আমি তো একটা সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্ মাল ছাড়া আর কিছু নই! যাও, চ'লে যাও আমার কাছ থেকে!"

কিন্তু চোখদুটি তার জলে ভ'রে আসে। ইলিয়াকে লক্ষ্য ক'রে সে যে-কথাগুলি হুড়হুড় ক রে ব'লতে থাকে তা যেন জলন্ত অঙ্গার বিশেষ:

"আমি স্বেচ্ছায় এ-গর্তে পা দিয়েছি, কারণ এখানে প্রচুর টাকা আছে, এই টাকার সিঁড়ি বেয়ে আমি ধাপে ধাপে ওপরে উঠবো, আবার সুন্দরভাবে বাঁচবো,—আর এতে তুমি আমাকে সাহায্য ক'রেছো। আমি তোমার মহত্বটাকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি তোমার দেমাক আর যৌবনটাকে, তোমার এক মাথা কোঁকড়া চুল আর বলিষ্ঠ বাহু দুটোকে, ভালোবাসি তোমার চোখের কঠিন চাহনিটাকে; তোমার তিরস্কারগুলো আমার বুকে ছুরির মতো বেঁধে—আর, এই সবকিছুর জন্তে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো, তোমার দুটি পায়ে লক্ষবার চুমু খাবো—"

এই ব'লে ইলিয়ার পায়ের ওপর প'ড়ে, তার হাঁটুদুটোয় চুমু খেতে খেতে ব'লতে লাগলো ওলিম্পিয়াদা:

"ভগবান সাক্ষী, আমি যে পাপ ক'রেছি তা নিজেকে উদ্ধার করবার জন্তেই। সারাটা জীবন আমাকে যেন নোংরামির মধ্যে কাটাতে না হয়, আমি যেন এই নোংরামির মধ্যে দিয়ে আবার শুদ্ধ হই—এটা ভগবানের ইচ্ছা—

বিশ্বাস করো—এটা তাঁরই ইচ্ছা! যতোদিন তিনি আমায় ক্ষমা না করেন আমি প্রার্থনা ক'রে যাবো।—জীবনভোর দুঃখ-দারিদ্র্য-নোংরামির মধ্যে আমি থাকতে চাই না! লোকে আমায় নষ্ট ক'রেছে, আমার জীবনটাকে পাঁকের মধ্যে ফেলে চুবিয়েছে, আমায় এতো নোংরা ক'রে দিয়েছে যে, চোখের সমস্ত জল দিয়েও তা বুঝি ধুয়ে ফেলা যায় না!"

ইলিয়া প্রথমে চেষ্টা ক'রলো ওলিম্‌পিয়াদাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে, তারপর চেষ্টা ক'রলো মেঝে থেকে তাকে টেনে তুলতে। কিন্তু ওলিম্‌পিয়াদা ইলিয়ার পা দুটো সজোরে ঝাপ্‌টে ধ'রে তার হাঁটুতে মুখ ঘ'ষতে ঘ'ষতে অনর্গল ব'কতে লাগলো। গলায় তার কথা আটকে আসছে মাঝে মাঝে হাঁপাচ্ছে, তবুও তার কথার বিরাম নেই। নিরুপায় হ'য়ে ইলিয়া ওলিম্‌পিয়াদার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলো, তারপর মেঝে থেকে তাকে তুলে, দুখানি বাহু দিয়ে তার দেহটা জড়িয়ে ধ'রে তার মাথাটা টেনে নিলো নিজের কাঁধের ওপর।

তখন ইলিয়ার গালের ওপর নিজের উত্তপ্ত গালখানি রেখে, ইলিয়ার বলিষ্ঠ বাহু-বন্ধনীর মধ্যে নিঃশেষে ধরা দিয়ে ফিশফিশ ক'রে ব'লতে লাগলো ওলিম্‌পিয়াদা:

"কেউ যদি একবার একটা পাপ ক'রেই ফেলে, তাই ব'লে কি তাকে সারাটা জীবন নোংরামি আর অপমানের মধ্যে দিয়েই কাটাতে হবে? এ কেমন বিচার?···আমি তখন ছোটো, বাবা মারা যেতে মা আবার যাকে বিয়ে ক'রলেন, সেই লোকটা দিনের পর দিন আমার কাছে নানান্ কুৎসিত প্রস্তাব নিয়ে আসতে লাগলো। একদিন সইলাম, দুদিন সইলাম, কিন্তু তিন দিনের দিন আর সইতে না পেরে তাকে মারলাম কাটারি দিয়ে। মারবার ইচ্ছা ছিলো না, তবু মারলাম। কিন্তু সবাই মিলে আমাকে তখন কি ক'রলো জানো? ওষুধ খাইয়ে জোর-জবরদস্তি ক'রে আমাকে কাবু ক'রলো। তখন আমি একফোঁটা মেয়ে—ফুলের মতো পবিত্র—আপেলের মতো নিটোল—গোলাপের মতোই গোলাপী। নিজের দিকে চেয়ে সেদিন কাঁদলাম, দুঃখ হ'লো এই রূপ আর যৌবনের জন্যে। তবুও—তবুও—বাঁচাতে চেষ্টা ক'রলাম নিজেকে। তারপর দেখলাম আর উপায় নেই, বুঝলাম এমন একটা চোরা গলিতে ঢুকেছি যেখান

থেকে ফেরবারও কোনো রাস্তা নেই। তখন ঠিক ক'রলাম: 'উপায় যখন নেইই, তখন সস্তায় বিকবো না নিজেকে, চড়া দাম হাঁকবো এই দেহটার জন্যে!' ঘৃণা ক'রতে লাগলাম সকলকে, টাকা-পয়সা চুরি ক'রে মদ গিলতে লাগলাম হরদম—যতোক্ষণ না মাতাল হ'য়ে পড়ি। তোমার সংগে দেখা হবার আগে আমি কাউকে ভালোবেসে চুমু খাই নি, খেয়েছি বাধ্য হ'য়ে,—আর সেই সংগে কেবল কলংকিত ক'রেছি নিজেকে।"

কথা শেষ ক'রে ওলিম্পিয়াদা এক মুহূর্তের জন্য গুম হ'য়ে রইলো, তারপর হঠাৎ ইলিয়ার বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ব'লে উঠলো:

"ছেড়ে দাও আমাকে!"

কিন্তু ইলিয়া তাকে বুকের ওপর আরও জোরে চেপে ধ'রে তার মুখখানা ভ'রে দিতে লাগলো চুমুতে চুমুতে। উত্তাল আবেগে এবং বিক্ষুব্ধ হতাশায় কাঁপতে লাগলো ওর সর্বাঙ্গ।

ওলিম্পিয়াদা আর একবার ব'ললো:

"ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে,—লাগ্‌ছে!"

উত্তেজিতভাবে ব'ললো ইলিয়া:

"এতোক্ষণ ধ'রে তুমি যে-কথাগুলো ব'ললে তার জবাবে আমার কিছুই বলার নেই। শুধু এইটুকু ব'লতে পারি যে তোমার-আমার জন্যে কেউই দুঃখিত নয়। আর আমাদেরও কোনো প্রয়োজন নেই কারোর জন্যে দুঃখ করবার। তোমার কথাগুলো ভালো লাগলো। মুখখানা ফিরিয়ে নিও না লিপা। অন্ততপক্ষে মুখটায় চুমু খেতে দাও। এ-ছাড়া আর কিভাবেই বা তোমার ঋণ শোধ ক'রবো, বলো? লিপা আমার, আমার—শুধু আমার লিপা, আমি তোমায় ভালোবাসি—কতোটা তা ব'লতে পারবো না—ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।"

ওলিম্পিয়াদার মর্মান্তিক কথাগুলো শোনার পর ইলিয়ার মনটা এইভাবে নরম হ'য়ে আসে, মেয়েটার প্রতি একটা সত্যকার দরদ জাগে ওর অন্তরে। এতোদিন ওদের মাঝখানে যে-প্রাচীরটা ছিলো তা যেন ওলিম্পিয়াদার দুঃখের আঘাতে ভেঙে প'ড়ে যায়, আর মনে হয় ওদের সম্বন্ধটা যেন নিবিড়তর হ'লো।

তুজনে তুজনকে জাপটে ধ'রে ব'সে থাকে ওরা, অস্ফুট স্বরে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করে অনেকক্ষণ ধ'রে ; আর সেই সময় ইলিয়া লুনেফের বুকে একটা অনমনীয় সাহসের ভাব জেগে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে।

হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ব'ললো ওলিম্পিয়াদা :

"আমাদের কপালে সুখ নেই ইলুশা—সুখও নেই শান্তিও নেই।"

"শান্তি না থাক অশান্তি থাকবে তো ? বেশ তাই থাক। কে ভয় করে অশান্তিকে ? সাইবেরিয়ায় যদি যেতে হয়, তুজনে এক সংগে যাবো। বুঝলে ? কিন্তু শোনো, এখন ও-সব তুঃখের কথা বাদ দাও, সব কিছু ভুলে যাও, শুধু মনে করো এখন কেউ নেই কিছু নেই, শুধু আছি তুমি আর আমি, আর আছে আমাদের ভালোবাসা। যা ঘটে ঘটুক, কোনো কিছুর পরোয়া করি না আমি। ইচ্ছে হয় আমাকে আগুনে পোড়াও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার বুকের ভার নেমে গেছে লিপা ; আর অনুতাপ ?—অনুতাপ করবার আদৌ ইচ্ছে নেই আমার !"

এইভাবে আলাপে-প্রলাপে সোহাগে-আদরে তুজনে তুজনকে নিয়ে ওরা এমন মেতে ওঠে যে মনে হয়, ওরা যেন পরস্পর পরস্পরকে দেখছে একটা ঝাপসা কাঁচের টুকরোর মধ্যে দিয়ে। অজস্র আলিঙ্গনের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে ওদের দেহ, উদ্দাম পেষণে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে ওদের।

বাইরে আকাশটা তখন বিষণ্ণ ধূসর। ঠাণ্ডা কুয়াশা নামছে পৃথিবীর বুকে। গাছের ডালে ডালে জ'মছে শুভ্র নীহারকণা। জানালার নিচে বাগানের মধ্যে কাঁপছে শিরশিরে হাওয়া। একটি তরুণ বার্চ-বৃক্ষের লীলায়িত শাখা-গুলি নড়ছে ধীরে ধীরে, আর সংগে সংগে ঝ'রে প'ড়ছে তুষারের কুচি—ঝিরঝির ক'রে।

দেখা যায় একটি শীতের সন্ধ্যা নামছে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে।

কয়েক দিন পরে ইলিয়া লুনেফ্ শুনলো যে পলুএকৃতফের হত্যা সম্পর্কে পুলিশ ভেড়ার চামড়ার টুপি-পরা, ঢ্যাঙা-মতো একজন লোককে খুঁজছে। পলুএকৃতফের দোকানখানা পরীক্ষা করবার সময় এক জোড়া রূপোর ফ্রেম পাওয়া যায় এবং পুলিশের ধারণা সেগুলো চোরাই মাল। দোকানের চাকরটা ব'ললো যে খুনের দু-তিন দিন আগে আন্‌দ্রু নামে খাটো কোট পরা একজন ঢ্যাঙা মতো লোকের কাছ থেকে এই ফ্রেমগুলো কেনা হয়, লোকটা মাঝে মাঝে পলুএকৃতফের কাছে সোনা রূপোর জিনিষপত্র বেচে যেতো এবং পলুএকৃতফ্ তাকে টাকা-পয়সা ধার দিতো। পরে আরও জানা যায় যে হত্যার দিন এবং হত্যার আগের দিন এই চেহারার একজন লোক না কি একটা বেশ্যা-বাড়িতে ফূর্তি ক'রছিলো।

ইলিয়া রোজই এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নতুন নতুন খবর শোনে। দুঃসাহসিক ব্যাপারটা নিয়ে সারা শহরে যেন একটা হুলুস্থূল প'ড়ে গেছে। যেখানে যাও সেখানেই এই খুনের আলোচনা—কি হোটেলে কি রাস্তায়—সর্বত্র। কিন্তু ইলিয়া এ-সব আলোচনা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায় না; বিপদের সমস্ত আশংকাই মুছে গেছে ওর মন থেকে; তার বদলে ও শুধু অনুভব ক'রতে থাকে বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি।

কেউ বলে: "আচ্ছা, লোকটা কি উবে গেলো?"

কেউ বলে: "ও-ধরণের টুপি-পরা ঢ্যাঙা লোকের তো ছড়াছড়ি, কিন্তু কাকে ছেড়ে কাকে ধ'রবে বলো তো?"

কান খাড়া ক'রে ইলিয়া এ-ধরণের নানান কথা শোনে বটে, কিন্তু ওর মাথায় তখন কেবল একটি চিন্তা:

"ভবিষ্যতে কি ক'রবো? কি-ভাবে জীবন কাটাবো?"

সেই সংগে ও নিশ্চিতভাবে জানে যে ত্রিভুবন খুঁজলেও হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিজের দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবে:

"আমার অবস্থাটা হ'য়েছে যুদ্ধের আগে আনাড়ি সেপাই-এর মতো, কিংবা হয়তো আমি এমন এক দেশে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হ'চ্ছি যে-দেশটা অনেক দূরে এবং যা অজানা!"

ইলিয়া এখন আরও বেশি ক'রে নির্জনতা চায়—অন্তত কিছুদিনের জন্য—যাতে ভেবে-চিন্তে নিজের সম্বন্ধে একটা হিল্লে ক'রতে পারে। কিন্তু দেখে, ওর চারধারে জীবনটা যেন ফুটছে কেৎলিতে জলের মতো। তা ছাড়া, প্রায় প্রতিদিনই এমন কিছু ঘটে যা ওর আত্ম-চিন্তায় বিভ্রাট এনে দেয়। ফলে, ইলিয়া দিন দিন রোগা হ'য়ে যেতে থাকে, আর কেমন একটা ফ্যাকাশে ভাব দেখা দেয় ওর চেহারায়।

এদিকে জাকবের হাব-ভাব দেখে ইলিয়া বেশ কয়েকটা দিনের জন্য চিন্তিত হ'য়ে ওঠে। ছেলেটার কি যেন একটা হ'য়েছে। মাথার চুল উশ্‌কো-খুশ্‌কো, পোষাকে-আশাকে যত্নহীন, তাছাড়া কখনো হোটেলে কখনো উঠানে টৈ-টৈ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে আধ-পাগ্‌লার মতো, চোখে কেমন একটা উড়ু-উড়ু দৃষ্টি, সবই দেখছে অথচ যেন কিছুই দেখছে না, দেখেশুনে মনে হয় যেন কোনো গুরুতর মানসিক অশান্তিতে ভুগছে সে। ইলিয়ার সংগে দেখা হ'লেই ছেলেটা কখনো চাপা গলায় কখনো ফিশফিশ ক'রে ব'লে ওঠে:

"দু-চারটে কথা আছে। তোমার সময় হবে?"

"একটু সবুর করো, এখন আমি ব্যস্ত।"

"না, না, শোনো, কথাটা খুব জরুরী।"

"কি কথা?" জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া।

"একখানা বই! তাতে এমন এমন কথা লেখা আছে যা প'ড়লে ভ'ড়কে যেতে হয়," ভয়ে ভয়ে বলে জাকব।

"রাখো তোমার বই! তার চেয়ে বলো তোমার বাবা আমার দিকে অমন বুনো জানোয়ারের মতো তাকিয়ে থাকে কেন?"

কিন্তু বাস্তব জীবনে কি ঘ'টছে না ঘ'টছে সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই জাকবের। বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে কি ব'লবে ভেবে না পেয়ে বিব্রতভাবে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে জিজ্ঞাসা করে সে:

"কেন? আমি তো কিছু জানি না,—মানে—আমি একটিবার শুধু শুনে-

ছিলাম বাবা যেন তোমার কাকাকে ব'লছে, তুমি না কি জাল নোট বেচো,— তবে সে এমনি কথায় কথায়।"

মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া :

"কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে যে 'কথায় কথায়' ?"

"চুলোয় যাক্, এ নিয়ে এতো মাথাব্যথা ক'রে লাভটা কি ? টাকা—টাকায় কি হবে ? যতো সব জঞ্জাল।"

তারপর মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে, উড়্-উড়্ দৃষ্টিতে বন্ধুর আপাদমস্তক দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করে সে :

"হ্যাঁ—যা ব'লছিলাম, একটু আলোচনা করবার সময় হবে তোমার ?"

"সেই বই নিয়ে ?"

"হ্যাঁ। একটা জায়গা বুঝলাম বটে, কিন্তু—। দুত্তোর্, নিকুচি ক'রেছে আমার।"

এই ব'লে জাকব এমন একটা মুখভংগী করে যেন সে হঠাৎ হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। তার সম্বন্ধে ইলিয়ার ধারণা সে একটা পাগল। যখনই দেখো, জাকব ধুঁকছে। মাঝে মাঝে ইলিয়ার মনে হয়, চোখ থাকতেও জাকবটা অন্ধ, তাছাড়া জীবন-যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে সে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তার বাবার যে একজন রক্ষিতা আছে এবং সেই রক্ষিতাটি যে শহরের একটা নামকরা বেশ্যা-বাড়ির মালিক—এ-সংবাদটা কি রাখে জাকব ? হয়তো রাখে, হয়তো রাখে না। বাড়িতে সবাই বলাবলি ক'রছে—কেবল বাড়িতে কেন—সেই রাস্তার প্রত্যেকটি বাসিন্দা জানে যে, পেত্রুহা তার রক্ষিতাটাকে বিয়ে ক'রতে চায়, কিন্তু জাকবের কোনো খেয়ালই নেই সেদিকে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হবে কি না একথাটা জিজ্ঞাসা ক'রতে, জাকবই পাল্টা প্রশ্ন ক'রে ব'সলো :

"কার বিয়ে ?"

"তোমার বাবার।"

"আঃ! কে জানে কবে হবে! ঐ বেহায়া বুড়োটাকে নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি। খুঁজে খুঁজে খুব বউ বের ক'রেছে যা হ'ক—বউ তো নয়, যেন পিকদানি!"

"তাছাড়া জানো, মাগীটার একটা ছেলেও আছে—বেশ বড়ো-সড়ো, সে ইস্কুলে পড়ে ?"

"না, তা তো জানতাম না। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার আর কি, সে-ই তো তোমার বাবার উত্তরাধিকারী হবে।"

"ও!" নির্বিকারভাবে ব'ললো জাকব।

তারপর হঠাৎ তার মুখখানা যেন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

"কি ব'ললে, একটা ছেলে আছে ?"

"হ্যাঁ। তাতে কি ?"

"ছেলে ?—হয়তো তাতে আমার সুবিধেই হবে, কি বলো ? বাবা যদি তার এই ছেলেটাকে কাউণ্টারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে আমার যেখানে খুশি যেতে দেয়, তাহ'লে মন্দ কি ?"

এই ব'লে জাকব এমন তরিবত ক'রে জিভে টাকনা দেয় যেন ইতিমধ্যেই সে মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেছে।

বন্ধুটির দিকে দুঃখিতভাবে চেয়ে অবজ্ঞাভরা গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"লোকে দেখছি সত্য কথাই বলে, অপোগণ্ডকে খোয়া চাইতে মোয়া দিলে সে হাত না বাড়িয়ে প্যান্‌প্যানানি জুড়ে দেয়। তুমি একটা—থাক সে-কথা। জানি না কিভাবে তুমি জীবনের সংগে যুঝবে।"

চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে ফিশ্‌ফিশিয়ে জবাব দেয় জাকব :

"এ-সব নিয়ে আমি আগাপাছতলা ভেবেছি এবং ভেবে যা ঠিক ক'রেছি শোনো। মানুষের প্রথম কাজ হ'লো মনটাকে শান্ত করা। ভগবান তার কাছে কি চান এটা তার ভালো ক'রে জানা দরকার। এখন আমি কি দেখতে পাচ্ছি জানো ? দেখছি, জটপাকানো সুতো নিয়ে যেমন টানাটানি করা হয়, ঠিক তেমনি ক'রে মানুষকে নিয়েও টানাটানি করা হ'চ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষকে ঠিক কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং ঠিক কোন্ কাজে তার লেগে থাকা দরকার—এটা কেউ জানে না। মানুষ কেন জন্মায় এবং কি জন্যেই বা সে বেঁচে থাকে, তাও কেউ ব'লতে পারে না। তারপর একদিন মৃত্যু আসে, আর এসে সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে একশা ক'রে দেয়।—তাই, সর্বপ্রথম আমার জানা দরকার আমি কি জন্যে জন্মেছি। বুঝলে ?"

ইলিয়া ব'ললো : "এ-সব চিন্তা কি ক'রে যে তোমার মাথায় ঢোকে কে জানে! এতে লাভটাই বা কি ?"

কিন্তু ইলিয়া অনুভব করে জাকবের এই রহস্যময় চিন্তাগুলো এখন যেন আরও গভীরভাবে ওর মর্ম স্পর্শ ক'রছে। ফলে, ওর মনে নানান অশান্তির সৃষ্টি হ'তে থাকে। ইলিয়ার মনে হয়, যে সর্বনাশা শক্তিটা এতোদিন ধ'রে এক নাগাড়ে ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বেঁচে থাকার সুকুমার সুখ-স্বপ্নটিতে বাদ সেধে এসেছে, সেই শক্তিটার যেন হুবহু ইংগিত র'য়েছে জাকবের কথাগুলোর মধ্যে। শুধু তাই নয়, সেই শক্তিটা যেন ওর বুকের মধ্যে মাতৃগর্ভস্থিত শিশুর মতো থেকে থেকে ঠেল্ মারছে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে ইলিয়া, ওর মনটা যায় খিঁচড়ে, এবং ওর মনে হয়, এ-সব চিন্তার কোনোই প্রয়োজন নেই। তাই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে জাকবের সংগে এ-সব কথা নিয়ে আলোচনা ক'রতে না হয়; কিন্তু জাকবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি এতোই সোজা?

ইলিয়ার প্রশ্নের জবাবে জাকব ব'লতে থাকে:

"তুমি ব'লছো এতে লাভটাই বা কি? আমি ব'লবো এতে লাভ আছে এবং এর চেয়ে বড়ো লাভ আর কিছুই হ'তে পারে না। বাঁচার কারণটা না জেনে বেঁচে থাকাও যা, আগুন বিনা বেঁচে থাকাও তাই।—কিন্তু তুমি চ'ললে কোথায়? মনে রেখো: কোথায় যাচ্ছো, কেন যাচ্ছো এবং যাওয়াটা উচিত কি না—সে-বিষয়ে তোমার একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।"

"শোনো জাকব, তোমার হাব-ভাব কথাবার্তা যেন বুড়ো মানুষের মতো। তাই তোমার কাছে থাকতে ভালো লাগে না। ঐ যে একটা কথা আছে না: হাতী ঘোড়া গেলো তল ভেড়া বলে কতো জল?—মানে,—যাক্ সে-কথা। আচ্ছা, এখন চলি।"

এ-ধরণের কথাবার্তা আদৌ ভালো লাগে না ইলিয়ার। "মনটাকে মিছি-মিছি উতলা ক'রে লাভ কি?" নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে সে। তাছাড়া, এ-সব আলোচনা শেষ হবার সংগে সংগেই ওর মনে হয় ও যেন এক কাঁড়ি নোন্তা খাবার খেয়ে ফেলেছে। ফলে, একটা অসহ্য তৃষ্ণায় ওর ছাতিটা যেন ফেটে যেতে থাকে। তখন ওর এক চিন্তা: "এ-তৃষ্ণা মেটাবো কি দিয়ে?"

শুধু তাই নয়। ওর বিশ্বাস ঈশ্বর ওকে শাস্তি দেবেনই; কিন্তু শাস্তির চেয়ে শাস্তির উৎকণ্ঠাটাই মর্মান্তিক হ'য়ে ওঠে ওর কাছে। ফলে, তীব্র যন্ত্রণায়

ওর বুকটা যেন পুড়ে যেতে থাকে। তখন ও নির্জনতা চায়। চায়, কিন্তু পায় না। অবশেষে, সর্বপ্রকার অশান্তি ও উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ও আত্মগোপন করে ওলিম্‌পিয়াদার আলিঙ্গনের মধ্যে।

ইলিয়া মাঝে মাঝে ভেরার সংগেও দেখা ক'রতে যায়। মেয়েটা যে দিন দিন এক উচ্ছৃংখল, কদর্য জীবনের গভীর পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝা যায় তার নিজের কথা থেকেই। কতো ধনী ব্যবসায়ী, বুরোক্র্যাট্ এবং অফিসারের সংগে সে মজা লুটেছে, কতো পার্টি, পিক্‌নিক্ এবং রেস্তঁরাতে সে ফূর্তি ক'রে বেরিয়েছে, তাকে ভোগ করবার জন্যে তার প্রেমিকদের মধ্যে কি রকম খেয়োখেয়ি লেগে যায়—ইত্যাদি কাহিনীগুলো ইলিয়ার কাছে বর্ণনা করবার সময় আনন্দে ও উত্তেজনায় ভেরা দিশাহারা হ'য়ে পড়ে, আর তার যৌবনপুষ্ট সুডৌল দেহখানি কাঁপতে থাকে সেই সংগে। তাছাড়া, তার প্রেমিকদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলোও সে ইলিয়াকে দেখায় এবং দেখাতে দেখাতে বলে:

"এই গাউনটা ভালো না? ছাখো, ছাখো, এই ব্লাউজটার রং কি সুন্দর! আচ্ছা, এই জ্যাকেটটা কেমন বলো তো?..."

ভেরার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং খুশির ভাবটাকে ইলিয়া প্রশংসা না করে পারে না। কিন্তু সেই সংগে সে ভেরাকে তিরস্কারও করে সুযোগ-সুবিধা মতো।

কথায় কথায় ইলিয়া একদিন ব'ললো:

"আগুন নিয়ে খেলছো ভেরচ্‌কা। আখেরে তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"তাতে কি যায় আসে? এ-ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই ইলিয়া। মরতে যদি হয়ই, তার আগে অন্তত দেখিয়ে দিয়ে যাবো বাঁচতে হয় কেমন ক'রে! যতোটা পারি লুটেপুটে নি, তারপর—যা কপালে আছে তা-ই হবে।"

"বুঝলাম। কিছু পল্ -"

পলের নাম শুনেই ভেরার ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেলো, আর সেই সংগে উবে গেলো তার যতো হাসি-খুশি।

ভেরা ব'ললো:

"ও যে কেন নিজের চরকায় তেল দেয় না তা-ই ভাবি। দেখছে যে আমাকে

নিয়ে পেরে উঠছে না, তবুও সব জেনেশুনে ও নিজেকে নিজে কষ্ট দিচ্ছে মিছিমিছি। যেটুকু পাচ্ছে তা-ই নিয়েই ও যদি সন্তুষ্ট থাকে তা'হলে হয়, কিন্তু ওর সবকিছু চাই, ওর খাঁই যে অনেক! ব'লছে কি,—থাক্ সে কথা। কিন্তু আমিও আর বাঁধা প'ড়তে রাজী নই। মৌমাছি মধুর সন্ধান পেয়েছে, বুঝলে ইলিয়া?"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তুমি কি পল্‌কে ভালোবাসো না?"

গম্ভীরভাবে জবাব দিলো ভেরা:

"ওর মতো একটা অদ্ভুত মানুষকে ভালো না বেসে থাকতে পারে কেউ?"

"তাহ'লে তোমরা একসংগে থাকো না কেন?"

"একসংগে? ওর সংগে? কি যে বলো! নিজেরটাই ও নিজে যোগাতে পারে না, এর ওপর আমি যদি ওর ঘাড়ে চাপি, তাহ'লে ওর অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখো দেখি? না, না, সত্যি ব'লছি ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।"

ইলিয়া ভেরাকে সাবধান ক'রে দেয়:

"দেখো, শেষটায় যেন মন্দ কিছু না ঘটে।—পল্ যে-রকম একরোখা, তাতে—"

শুনে, হাসতে হাসতে ভেরা ব'ললো:

"পল্ একরোখা? হ'তেই পারে না। ও নেহাতই গোবেচারা। আমার খুশিমতো আমি ওকে চালাতে পারি।"

"তুমি ওকে মারবে।"

চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ভেরা:

"আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! আমি ক'রবোই বা কি? তুমি কি ভেবেছো সবে-ধন-নীলমণি ঐ একটি লোকের মন জুগিয়ে চ'লবার জন্যেই আমি জন্মেছি? প্রত্যেকেই চায় জীবনটাকে উপভোগ ক'রতে। তাই, যে যার খুশি মতো জীবন কাটায়ও। কেবল আমি কেন? তুমি, পল্, প্রত্যেকেই—।"

চিন্তিতভাবে বিষণ্ণ গলায় ব'ললো ইলিয়া:

"এটা কিন্তু ঠিক নয় ভেরা! বাঁচি আমরা সকলেই—কিন্তু কেবল নিজেদের জন্যেই নয়।"

"তবে কার জন্যে শুনি ?"

"তোমার কথাই ধরো। তুমি বাঁচো কতকগুলো ব্যবসাদারের জন্যে, কতকগুলো চরিত্রহীন্ লোকের ফূর্তির খোরাক হ'য়ে—"

"আমি তো নিজেই চরিত্রহীন" এই ব'লে ভেরা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। আর কোনো কথা না ব'লে ইলিয়া বিষণ্ণ বদনে চ'লে এলো সেখান থেকে।

এর মধ্যে পলের সংগেও ওর দেখা হ'লো দু-একবার—কিন্তু তা কিছুক্ষণের জন্য। ভেরার সংগে ইলিয়াকে দেখলে পল্ মোটেই খুশি হয় না, বরং চ'টেই যায়। ইলিয়ার সামনে সে ব'সে থাকে ঠোঁট-দুখানা আঁট-সাট বন্ধ ক'রে, দাঁতে দাঁত চেপে। রাগে তার গাল দুখানা লাল হ'য়ে ওঠে। পল্ যে ওকে হিংসা ক'রছে এটা বোঝে ইলিয়া, আর বোঝে ব'লেই ওর মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। সেই সংগে ও এটাও বুঝতে পারে যে পল্ এমন একটা ফাঁসে গলা দিয়েছে যেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই পলের জন্যে ওর দুঃখ হয়। কিন্তু ভেরার জন্যে ওর প্রাণটা কাঁদে আরও বেশি ক'রে। সব ভেবেচিন্তে ইলিয়া ভেরার কাছে যাওয়া ছেড়ে দিলো এবং আবার পূর্ণোদ্যমে মাখামাখি শুরু ক'রলো ওলিম্পিয়াদার সংগে। কিন্তু এখানে এসেও সে শান্তি পায় না, মাঝে মাঝে তার মনটা তিক্ততায় ভ'রে ওঠে, কথা ব'লতে ব'লতে সে যেন হঠাৎ কোনো বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে যায়। তখন ওলিম্পিয়াদা তাকে মিষ্টি গলায় ফিশফিশ ক'রে বলে :

"শোনো মানিক, ভেবে ভেবে মন খারাপ ক'রো না। পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে যারা নির্দোষ। পাপের কলংক কার হাতে নেই ব'ল্তে পারো ?"

ইলিয়া গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—অবিচলিত কণ্ঠে :

"শোনো, আমি বারণ ক'রছি এসব কথা তুমি আমার সামনে তুলবে না। কার হাতে কোন্ কলংক আছে কি নেই তা নিয়ে এতোটুকুও ভাবছি না আমি। আমি ভাবছি আমার আত্মার কথা। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার মনের কথাটা টের পাও না। সৎভাবে বাঁচতে গেলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বাঁচতে গেলে, কারোর কোনো ক্ষতি না ক'রে শান্তিতে বাঁচতে গেলে আমার কি করা দরকার—সেইটা বলো। পারো ব'লতে ? যদি

না পারো তাহ'লে চুপচাপ থাকো। আর, শোনো, সেই বুড়োটার কথা তুমি কখনো আমার কাছে পাড়বে না।"

ওলিম্পিয়াদা তবু নাছোড়বন্দো, ইলিয়ার কাছে পলুএকৃতফের নামটা তার করা চাইই চাই।

"কি আশ্চর্য, ইলুশা, এখনো পর্যন্ত তুমি সেই বুড়োটাকে ভুলতে পারছো না।"

এরপর ইলিয়া আর থাকতে পারে না, রেগে টং হ'য়ে চ'লে আসে ওলিম্পিয়াদার কাছ থেকে। কিন্তু পরদিন আবার ফিরে গেলেই ওলিম্পিয়াদা রাগে ফুলতে ফুলতে জোব গলায় ব'লতে থাকে :

"তুমি আমাকে এতোটুকুও ভালোবাসো না। মনে মনে হয়তো ভাবো যে ভালোবাসো, কিন্তু সে শুধু আমার ভয়ে কিংবা আমার প্রতি করুণা করবার জন্যে। তবে ব'লে রাখি, এমন ভালোবাসা আমার না পেলেও চ'লবে। থাকো তুমি এই নোংরা শহরে প'ড়ে। আমি আজই চ'লে যাবো এখান থেকে। তুমি কি ভাবো তোমাকে না হ'লে আমার চ'লবে না ?"

এই ব'লে ওলিম্পিয়াদা কেঁদে ওঠে, খিমচে কামড়ে চুমু খেয়ে ইলিয়াকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তারপর উন্মাদের মতো গা থেকে গাউনটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইলিয়ার সামনে সম্পূর্ণ ন্যাংটো হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলে :

"কেন, আমাকে দেখতে কি এতোই খারাপ ? আমার দেহটা কি সুন্দর নয় ? আমি তোমাকে ভালোবাসি, ইলুশা, আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে, আমার সমস্ত রক্ত দি'য়ে। এমন কি তুমি যদি আমাকে খুনও করো, আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দেবো।"

ওলিম্পিয়াদার নীল চক্ষুদুটি থমথম ক'রতে থাকে, কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট-দুখানা এবং সেই সংগে তার মাই দুটো এমনভাবে খাড়া হ'য়ে ওঠে যেন যৌবনের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য দিয়ে ইলিয়াকে সে বিহ্বল ক'রে দিতে চায়। তখন ইলিয়া ওলিম্পিয়াদাকে জাপটে ধরে দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে, তাকে চুমু খেতে থাকে পাগলের মতো; তারপর বাড়ি এসে ভাবে : যে মেয়েটার প্রাণশক্তি এতো অফুরন্ত, যার দেহের শিরা-উপশিরায় এতো অজস্র আবেগ-প্রবাহ, সেই মেয়েটা কি ক'রে পলুএকৃতফের মতো একটা বুড়োর সোহাগ-উদ্দীপনা-লাভ

ক'রতো? সংগে সংগে ওলিম্‌পিয়াদার প্রতি ঘৃণায় ওর সর্বাঙ্গ ঘিন্‌ঘিন্‌ ক'রে ওঠে, তার চুম্বনগুলো স্মরণ ক'রে ও রাগে বিরক্তিতে মাটিতে থুতু ফেলতে থাকে। কিন্তু আবার বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে ওর যৌবনসিন্ধু, আবেগের তরঙ্গগুলো আছড়ে পড়ে ওলিম্‌পিয়াদার দেহতটে।

একদিন ইলিয়া ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদাকে :

"দেখছি সেই শয়তান বুড়োটাকে গলা টিপে মারবার পর থেকেই তুমি যেন আমাকে আরও বেশি ক'রে ভালোবাসছো।"

"কেন?—ও হ্যাঁ।—তাতে কি হয়েছে?"

"কিছু না। শুধু এই কথাটা ভেবে মজা লাগে যে একদল লোক আছে যারা টাট্‌কা ডিমের চেয়ে পচা ডিমই বেশি পছন্দ করে, এবং আরও একদল লোক আছে যারা আপেল খেতে ভালোবাসে, কিন্তু আপেলটা প'চতে শুরু ক'রলে তবেই।—ভারি অদ্ভুত।"

"মানুষের খেয়ালের কি অন্ত আছে? তারওপর খেয়ালও বদলায় ঘড়ি ঘড়ি। কেউ এটা চায় কেউ ওটা চায়। কেউ চায় অফিসার, আবার কেউ চায় তরমুজ।"

এর পর কিন্তু দুজনেই বেশ চিন্তিত হ'য়ে ওঠে।

একদিন শহর থেকে বাড়ি ফিরে ইলিয়া সবে পোষাক বদলাতে শুরু ক'রেছে এমন সময় চুপিচুপি ঘরে ঢুকলো তেরেন্স। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে দরজার পাশেই—যেন আড়ি পেতে কিছু শুনছে এইভাবে; তারপর কুঁজটা নেড়ে-চেড়ে, দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এসে দাঁড়ালো ইলিয়ার সামনে। ইলিয়া এতোক্ষণ ধ'রে কাকার ভাবভংগী লক্ষ্য ক'রছিলো। এখন কাকাকে সামনা-সামনি দেখে ওর মুখে ফুটে উঠলো একটুক্‌রো ঠাট্টার হাসি।

চেয়ারে ব'সে, খুব আস্তে আস্তে ব'ললো তেরেন্স :

"ইলুশা।"

"কি?"

"নানা রকমের যা-তা গুজব শোনা যাচ্ছে তোর নামে।"

মাথাটা নিচু ক'রে কুঁজো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

জুতো খুলতে খুলতে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কি রকম ?"

"নানান লোকে নানান কথা ব'লছে। কেউ বলে সেই পোদ্দারটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তোর না কি হাত ছিলো,—আবার কেউ বলে তুই না কি জাল নোট বেচিস।"

"মানে, লোকে হিংসে ক'রছে আমাকে, কি বলো ?"

"কতকগুলো লোক এসেছিলো—ঠিক যেন ডিটেক্‌টিভের মতন। তারা তোর সম্বন্ধে নানান কথা জিজ্ঞেস ক'রেছে পেত্রুহাকে।"

নির্বিকারভাবে ব'ললো ইলিয়া:

"ক'রেছে ক'রুক।"

"তা তো ঠিকই। দোষ না ক'রলে তাদের আবার তোয়াক্কা করে কে ?"

হেসে উঠে ইলিয়া বিছানার ওপর শুয়ে প'ড়লো।

ভয়ে ভয়ে, অসংলগ্নভাবে ব'লতে থাকে তেরেন্স:

"বার কয়েক এসেছিলো তারা, তবে এখন আর আসে না। কিন্তু এদিকে পেত্রুহা বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু ক'রেছে। যেখানে সেখানে ও যা-তা ব'লে বেড়াচ্ছে। কেবল ফিশির-ফাশুর আর গুজুর গাজুর। তুই যদি এখান থেকে চ'লে গিয়ে অন্য কোথাও একখানা ঘর নিয়ে থাকাতস তাহ'লে ভালো হ'তো। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। পেত্রুহা ব'লছে: 'সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনকে তো আর আমি আমার বাড়িতে ঠাঁই দিতে পারি না, বিশেষ ক'রে আমি যখন একটা কাউন্সিলার!"

"শোনো, তোমার ঐ কাউন্সিলারটাকে ব'লো, যদি তার তোলোহাঁড়ি মুখখানার এতোটুকুও মায়া থাকে, তাহ'লে সে যেন মুখটি বুঁজে থাকে। নইলে, আর কোনোদিন যদি কোনো খারাপ কথা শুনি আমার সম্বন্ধে, তাহ'লে ওর মুণ্ডুটা আমি একেবারে থেঁতো ক'রে দেবো। আমি যা-ই হই না কেন তাতে ওর কি ? ওর মতো একটা রাস্কেল কি-না ক'রবে আমার বিচার ? আর শোনো, এ-বাড়ি ছেড়ে যাবো কি যাবো না তা ঠিক ক'রবো আমিই। কারোর কথায় আমি এ-বাড়ি ছাড়ছি না। আপাতত আমি এখানেই

থাকবো। তার কারণ এখানে আমি আরও কিছুদিন থাকতে চাই। বুঝলে?",

ইলিয়ার রাগ দেখে তেরেন্স ভ'ড়কে যায়। চেয়ারে চুপচাপ ব'সে, কুঁজটা চুলকোতে চুলকোতে, চক্ষুদুটি ছানাবড়া ক'রে সে চেয়ে থাকে তার ভাই-পোর দিকে।—ভয়ার্ত এবং ব্যাকুল মনে হয় তার দৃষ্টিটা। এদিকে ঠোঁট দুখানা আঁটসাট বন্ধ ক'রে বিস্ফারিত নেত্রে ইলিয়া তাকিয়ে থাকে কড়িকাঠের দিকে।

ব'সে ব'সে তেরেন্স তারিফ ক'রতে থাকে ইলিয়ার চেহারাটার। কি সুন্দর একমাথা কোঁকড়া চুল! একফালি গোঁফ আর ধারালো চিবুক সমেত কি সুশ্রী ঐ গম্ভীর মুখখানা। তাছাড়া বুকখানাই বা কি বিশাল!

ভাইপোর মজবুত এবং সুগঠিত দেহখানির ওপর আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে ব'ললো তেরেন্স:

"কি সুন্দর দেখতে হ'য়েছে তোকে ইলুশা! ভাবছি আমাদের গাঁয়ের ছুঁড়িগুলো যদি তোকে একবার দেখতো, তা'হলে তারা একধার থেকে লুটিয়ে প'ড়তো তোর পায়েব ওপর। যদি ফিরে যেতে পারতাম নিজের দেশে!"

ইলিয়া একটি কথাও ব'ললো না।

"সত্যি ব'লছি ইলুশা, সেখানে তুই সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারতিস্। কিছু টাকা জোগাড ক'রে দিতাম তোকে, সেই টাকা দিয়ে তুই একখানা দোকান খুলতিস্, আর পযসাওলা কোনো মেয়েকে বিয়ে ক'রে আরামে দিন কাটাতে পারতিস্! দেখতিস্ তোর জীবনটা যেন ঝর্ণার মতো তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে—।"

বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কিন্তু নামবো কেন? আমি যদি উঠতে চাই?"

সংগে সংগে তেরেন্স ব'ললো:

"না, না, নামবি কেন, তুই তো উঠবিই। আমি ব'লছিলাম জীবনটা তোর আরামের হ'তো। উঠবি তো নিশ্চয়ই, তুই কি নামবার ছেলে!"

ইলিয়া আবার জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কিন্তু উঠতে উঠতে শেষটায় পৌছবো কোথায়? ধরো একেবারে পাহাড়ের চূড়োয় উঠলাম। কিন্তু তারপর?"

ভাইপোর দিকে চেয়ে কুঁজো তেরেন্স কেমন একটা বিরক্তিকর শব্দ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর আবার শুরু হ'লো তার বকবকানি, কিন্তু ইলিয়া কানও দিলো না সেদিকে। ও তখন ভাবছে ওর অতীত জীবনের কথা: দেখতে দেখতে কতো দিন কেটে গেলো, জীবনের কতো চড়াই-উৎরাই পার হ'য়ে এলো সে। তাছাড়া জীবনেব বুননিটা যেন মাছ ধরবার জালের মতো—প্রতিটি সুতো যেন নিখুঁতভাবে সাজানো। পুলিশ যেমন করে অপরাধীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেডায, ঠিক তেমনি ক'রে জীবনের পরিবেশগুলোও যেন মানুষকে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চ'লেছে। এই বাড়ি-ছাড়ার ব্যাপারটাই ধরো না কেন। সে কতোবার ভেবেছে এই বাড়ি থেকে চ'লে গিয়ে অন্য কোথাও থাকবে—একলাটি নিরিবিলিতে। হঠাৎ কোথা থেকে তারও একটা ভালো সুযোগ এসে হাজির হ'লো।......

এইসব ভাবতে ভাবতে ইলিযা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সবে ওর কাকার দিকে চেয়েছে, এমন সময় দরজার কড়াটা ন'ড়ে উঠলো ঝনঝন ক'রে। চ'মকে উঠে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তেবেন্স।

ইলিয়া ক্রুদ্ধভাবে বললো চেঁচিয়ে:

"দাও, দরজাটা খুলে দাও।"

তেরেন্স ছিটকিনিটা যে-ই খুলে দিলো, অমনি দেখা গেলো হ'লদে রঙের একখানা প্রকাণ্ড বই হাতে নিয়ে জাকব চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

বিছানার কাছ বরাবর এসে জাকব উত্তেজিতভাবে ব'ললো:

"ইলিযা, উঠে পড়ো, চলো এখুনি মাশুৎকার কাছে যাই।"

"কেন, তার আবার কি হ'লো?"

"কি ক'রে ব'লবো? জানি না। কিন্তু মাশা বাড়ি নেই।"

মুখখানা বিশ্রীভাবে বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো তেরেন্স:

"সন্ধ্যে না হ'তে হ'তে সে যাচ্ছে কোথায় আজকাল?"

জাকব জবাব দিলো:

"মাশা মাতিৎসার সংগে বেরোয়।"

চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললো তেরেন্স:

"সঙ্গটা তো খুব ভালো ব'লে মনে হ'চ্ছে না!"

"থাক্ ও-কথা। ইলিয়া এসো আমার সংগে।"

এই ব'লে জাকব ইলিয়ার শার্টের আস্তিনটা ধ'রে টানাটানি ক'রতে থাকে।

ইলিয়া ব'ললো :

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, এতো ব্যস্ত কেন? এমন ক'রে লাফালাফি ক'রলে লোকে ব'লবে একটু আগে বোধ হয় শেকলে বাঁধা ছিলে।"

জাকব ফিশফিশ ক'রে ব'ললো :

"বুঝলে ইলিয়া, এটা শ্রেফ ভোজবাজি—শ্রেফ ভোজবাজি।"

জুতো প'রতে প'রতে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"কোন্‌টা?'

"কোন্‌টা আবার? এই বইটা।"

তারপর অন্ধকার চলনপথটা দিয়ে যেতে যেতে, ইলিয়ার শার্টের আস্তিনটা চেপে ধ'রে ব'লতে লাগলো জাকব :

"আগে থেকে ব'লে রাখছি বইখানা অদ্ভুত। এমন কি প'ড়তে প'ড়তে গা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে, মনে হয় যেন নিশি ডাকছে।"

জাকব যে উত্তেজিত হ'যে উঠেছে এটা ইলিয়া বুঝতে পারে তার গলার কাঁপুনি শুনে।

একটু পরে ওরা পের্ফিশ্‌কা-মুচির ঘরে ঢুকলো। বাতিটা জ্বালাতেই ইলিয়া লক্ষ্য ক'রলো জাকবের মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখ দুটো ঘোর-ঘোর, অথচ একটা খুশির আমেজও র'য়েছে সারা মুখে। দেখে মনে হয় জাকব যেন মাতাল হ'য়েছে।

বন্ধুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"এতোক্ষণ মদ খাচ্ছিলে না কি?"

"আমি? না, আজ এক ফোঁটাও খাই নি। তাছাড়া এ সময় খাইও না। মাঝে মাঝে মদ কেন খাই জানো?—সাহস পাবার জন্যে। তাছাড়া বাবা বাড়ি থাকলে দু-এক গেলাশ না খেয়েও পারি না। তবে এমন কিছু খাই না যার থেকে ভদ্‌কার মতো গন্ধ ছাড়ে। বাবা টের পেয়ে গেলে আর রক্ষে রাখবে না। জানো তো বাবাটিকে আমি ভয় করি! আচ্ছা, সে-কথা থাক্।—এখন অন্য কিছু শোনো।"

এই ব'লে জাকব সশব্দে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়লো, তারপর বইখানা খুলে প'ড়তে শুরু ক'রে দিলো উদাস গলায় :

"তৃতীয় অধ্যায় : 'মানব জীবনের গোড়ার কথা।'—মন দিয়ে শোনো!"

বার্ধক্যে বইয়ের পাতাগুলো হ'লদে হ'য়ে গেছে। ঝুঁকে প'ড়ে ডান হাতের একটা আঙুল একখানা পাতার ওপর বুলোতে বুলোতে, বাঁ হাতটা নেড়ে বার দুই দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বেশ চড়া গলায় প'ড়তে লাগলো জাকব: 'দিওদর্ বলিতেছেন যে যাঁহারা বস্তুর উদ্ভব-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির মতে'—শুনছো তো?—'সেই সকল পুণ্যশ্লোক ব্যক্তির মতে মানব জীবনের গোড়ার কথা দ্বিবিধ। কেহ কেহ মনে করিতেন পৃথিবী চিরাগত ও অবিনশ্বর, এবং মানব জাতি অনাদি'।"

বইয়ের ওপর থেকে মাথা তুলে, হাওয়ায় একবার হাত নেড়ে ফিশ্ফিশিয়ে ব'ললো জাকব :

"শুনলে তো?—'অনাদি'।"

চামড়ায় বাঁধানো পুরণো বইখানার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"থামছো কেন? প'ড়ে যাও।"

তখন আবাব জাকবের সোৎসাহ কণ্ঠ শোনা গেলো :

"'চিচেরো বলিতেছেন যে যাঁহারা এই মত পোষণ করিতেন তাঁহারা হইলেন পাইথাগোরাস্, আর্কাইটাস্, প্লেটো, জেনোক্রাটিস্ এবং আরিস্টটল্। আরিস্টটল্ধর্মী আরও অনেক পণ্ডিত এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহারা এই মর্মে শিক্ষা দিতেন যে পৃথিবীতে যাহার অস্তিত্ব আছে এবং যাহার অস্তিত্ব থাকিবে, তাহা অনাদি'—শুনছো?—'তাহা অনাদি। তবে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যাহারা জন্ম দেয় এবং জন্মায়, এবং যাহাদের শুরু-শেষ আমাদের জ্ঞানের অধিগম্যও বটে।'"

হাত বাড়িয়ে বইখানা বন্ধ ক'রে দিয়ে অবজ্ঞাভরা গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"রেখে দাও তোমার বই। অমন বই থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি। কেবল কতকগুলো দার্শনিক কচকচি!—বলে কি না: 'আমাদের জ্ঞানের অধিগম্যও বটে।' অধিগম্য না হাতী! আসলে কিছুই বোঝা যায় না।"

বিস্ফারিত নেত্রে ইলিয়ার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে ব'ললো জাকব :

"অতো উতলা হ'চ্ছো কেন ?—কথাটা বোঝো।"

তারপর চাপা গলায় ইলিয়াকে জিজ্ঞাসা ক'রলো সে :

"তুমি কোত্থেকে এসেছো জানো ? অর্থাৎ, তোমার শুরু কোথায় সেটা জানো ?"

ক্রুদ্ধস্বরে ব'ললো ইলিয়া :

"তার মানে ?"

"অতো চেঁচিও না। কথাটা আগে শোনো। আচ্ছা, আত্মার কথাই ধরো। মানুষ তো আত্মা নিয়েই জন্মায়, তাই না ?"

"বেশ, তারপর ?"

"তাহ'লে মানুষের সর্বাগ্রে জানা দরকার কোথা থেকে এবং কিভাবে সে এসেছে। কেমন কি না ? বলা হ'য়ে থাকে আত্মা অবিনশ্বর, তার অস্তিত্ব ছিলো চিরদিনই—তাই না ? এই ছ্যাখো, তুমি আবার অস্থির হ'য়ে উঠছো! কেমন ক'রে তুমি জন্মেছো সেটা জানাই বড়ো কথা নয়। শুরুতে তুমি কেমন ক'রে বাঁচতে সেইটাই হ'লো বড়ো কথা। জন্মাবার সময় প্রাণ নিয়েই তুমি জন্মেছিলে, এটা সত্য। কিন্তু ঠিক কোন্ সময় তুমি জানতে পাবলে যে তোমার প্রাণ আছে ? মায়েব পেটে ? বেশ, তাই যদি হয়, তাহ'লে জন্মাবার আগে তুমি কিভাবে বাঁচতে সেটা মনে ক'রতে পারো না কেন ? এমন কি জন্মাবার পাঁচ বছর পবেও তুমি তোমার জীবন সম্বন্ধে কিছুই ব'লতে পারো না। এর কারণ কি ? কেন এমন হয় ? তারপর আরও একটা কথা আছে। আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তাহ'লে আত্মাটা ঠিক কোন্ সময় তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে ? দাও, প্রশ্নগুলোর জবাব দাও। কি, চুপ ক'রে কেন ?"

বিজয়-গর্বে জাকবের চোখদুটো জ্ব'লে ওঠে, তার ঠোটে খেলে যায় এক টুকরো খুশির হাসি। আনন্দে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে জাকব :

"নাও, এবার তোমার আত্মার ঠেলা সামলাও!"

কেনই যে জাকব এতো আনন্দিত হ'য়ে উঠেছে তা বুঝতে পারে না ইলিয়া। গোটা ব্যাপারটাই ওর কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকে।

জাকবের দিকে কঠোরভাবে চেয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"আচ্ছা বেকুব তো! এতো ফূর্তি কেন তোমার?"

"ফূর্তির আবার কেন কি? ফূর্তি হ'য়েছে তাই ফূর্তি ক'রছি।"

"তা ভালো। তোমার ফূর্তির বাহাদুরি আছে বটে। তবে শোনো—তোমার ঐ বইখানাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এসো। দেখতেই পাচ্ছো বইটা লেখা হ'য়েছে ভগবানের বিরোধিতা করবার জন্যে। তাছাড়া, কেন বেঁচে আছি-র চেয়ে ঢের বড়ো কথা হ'লো কেমন ক'রে বাঁচবো। কি ক'রলে কারোর ক্ষতি না ক'রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে শান্তিতে জীবন কাটানো যায়, কি ক'রলে অপরে আমার ক্ষতি না ক'রতে পারে—এইগুলোই জানা দরকার সর্বাগ্রে। যে-কেতাবে এই সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা আছে সেই কেতাব প'ড়ে শুনিয়ো আমাকে। বুঝলে?"

জাকব মুখ বুঁজে মাথাটি নিচু ক'রে ব'সে থাকে। তাকে বেশ চিন্তিত দেখায়। ইলিয়ার কাছ থেকে মনের মতো সাড়া না পাওয়ায় ওর হাসি-খুশি কর্পূরের মতো উবে যায়। উপরন্তু ইলিয়ার প্রশ্নের জবাবে যে কি ব'লবে তাও সে বুঝে উঠতে পারে না। অবশেষে খানিক চুপচাপ থাকার পর সে ব'ললো :

"বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমার ভালো লাগে না। তুমি যে কি বলো আর না বলো তা আমি বুঝেই উঠতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝি যে কিছুদিন হ'লো তুমি যেন হঠাৎ কি রকম দেমাকী হ'য়ে উঠেছো। অবশ্য, তোমার দেমাকের কারণটা কি তা আমি জানি না। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় তুমি যেন বেজায় ধার্মিক!"

ইলিয়া হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

"হাসছো কেন? যা ব'ললাম তা সত্য। প্রত্যেকেরই খুঁত ধরো তুমি। তাছাড়া তোমার বিচারের মানদণ্ডটা যেমন কঠোর, তেমনি নিষ্ঠুর। তুমি কাউকে ভালোবাসো না। দেখে শুনে মনে হয় যেন—"

দৃঢ় স্বরে ব'ললো ইলিয়া :

"না, আমি কাউকে ভালোবাসি না। ভালোবাসবোই বা কাকে? কেনই

বা ভালোবাসবো ? লোকে আমায় কি দিয়েছে ? সকলেই চায় পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নাম কিনতে। তারপর বলে : 'আমাকে ভালোবাসো, আমাকে সম্মান করো!' আমি তেমন বেকুব নই! আগে আমাকে সম্মান করো, তাহ'লে আমিও তোমাকে সম্মান ক'রবো। আগে আমার প্রাপ্য আমাকে দাও, তাহ'লে হয়তো আমি তোমায় ভালোবাসবো! যে যার তালে আছে, বুঝলে ? পেটের ধান্দায় আর অপরের কথা মনে থাকে না।"

রাগত স্বরে জবাব দিলো জাকব :

"কিন্তু পেটের ধান্দাটাই তো সব ধান্দার শেষ নয়!"

"তা জানি! ভেতরে যা-ই থাক মুখে মানুষ অন্য রকম। মুখ তো নয়, সব মুখোস! চোখের ওপরই তো নিজের কাকাকে দেখছি। একটা কেরাণীর সংগে তার মনিবের যা সম্বন্ধ, আমার কাকার সংগে ভগবানেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। এই যে সেদিন তোমার বাবা গির্জের ফাণ্ডে কতকগুলো টাকা দিলো, এর থেকে আমি কি বুঝলাম জানো ? বুঝলাম, হয় সে কাউকে ঠকিয়েছে আর নয়-তো ঠকাতে যাচ্ছে। মানুষ মাত্রেই এই রকম। দেবে দু টাকা, কিন্তু ফিরে চাইবে দুশো টাকা। তুমি কি জানো যে ব্যবসাদার মিগুনফ্ হাসপাতালে পাঁচশোটি টাকা দিয়ে তারপর টাউন-কাউন্সিলকে ধ'রেছে ট্যাক্স্ বাবদ তার প্রায় ষোলো শো টাকা মকুফ ক'রে দেবার জন্যে ? এইভাবে যে যার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, বুঝলে ? তারপর সাধুটি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে হেথা-হোথা। তাছাড়া আমার মতে, ইচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক পাপ যদি ক'রে থাকো, তাহ'লে পাপের শাস্তির জন্যেও তৈরি হ'য়ে থেকো।"

চিন্তিতভাবে জাকব ব'ললো :

"তা ঠিক। তাছাড়া তোমার কুঁজো কাকা আর আমার বাবা সম্বন্ধে তুমি যা ব'ললে তা-ও সত্য। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো ? মনে হয়, যেখানে আমাদের জন্মানো উচিত ছিলো সেখানে আমরা জন্মাই নি! তোমার তবু একটা সান্ত্বনা আছে। মানুষকে চাব্‌কে তুমি শান্তি পাও। কিন্তু আমার দ্বারা যে এটাও হয় না। কি ব'লবো, মাঝে মাঝে ভাবি, যদি অন্য কোথাও চ'লে যেতে পারতাম!"

জাকবকে হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে দেখে, মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"কিন্তু যাবে কোথায় শুনি ?"

"তা বটে !"

এর পর ওরা আর কোনো কথাই বলে না, চুপচাপ ব'সে থাকে এ ওর মুখের পানে চেয়ে—হতাশভাবে। এদিকে টেবিলের ওপর চামড়ায় বাঁধানো প্রকাণ্ড হ'লদে বইখানা বিরাট বোঝার মতো প'ড়ে থাকে।

এমন সময় হলঘরের দরজার কাছাকাছি জুতো-ঘষার শব্দ হ'লো। মনে হ'লো কারা যেন মাতালের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে কথা ব'লছে। কে একজন যেন খানিকক্ষণ ধ'রে দরজার হাতলটাও হাতড়ালো। একটু পরে জুতো-ঘষার শব্দটা আরও জোরালো হ'য়ে উঠলো। ইলিয়া ব'ললো জাকবকে :

"কে যেন এদিকে আসছে।"

একটু পরে ঘরের দরজাটা খুলে যায় আস্তে আস্তে, আর ট'লতে ট'লতে এঁদো ঘরখানায় প্রবেশ করে পের্ফিশ্কা মুচি। ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে হাঁটু দুমড়ে প'ড়ে যায় সে, আর সেই সংগে তার গলায়-ঝোলানো হারমোনিয়ামটা মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে।

"কেয়া বাত্ !" এই ব'লে পের্ফিশ্কা হেসে উঠলো—মাতালের হাসি। একটু পরে মাতিৎসাকে দেখা গেলো তার পিছনে। ঝুঁকে প'ড়ে পের্ফিশ্কাকে তুলবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে জড়ানো গলায় মাতিৎসা ব'ললো :

"মদে চুর যে বাবা ! মাতাল হ'য়ে খুব ফূর্তি, না ?"

"ঘট্কী, বারণ ক'রছি, আমায় ছুঁয়ো না। আমি নিজেই উঠবো—স্-স'রে যা ব'লছি।"

তারপর ট'লতে ট'লতে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে উঠে, ইলিয়া এবং জাকবের সামনে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে পের্ফিশ্কা ব'ললো :

"গুড্-মর্ণিং ! কেমন আছো দোস্ত্ ? স্বর্গ কতো দূরে ?"

মাতিৎসা হেসে উঠলো মুখে হাত চাপা দিয়ে।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কোথায় ছিলে তোমরা ?"

মাতাল দুটোর দিকে চেয়ে জাকব মুচকি হাসে।

"কোথায় ছিলাম?—ভেস্কির দেশে, বাবা, ভেস্কির দেশে। কি যেন ব'লছিলাম তখন? ও, কিছুই ব'লছিলাম না বুঝি? কী ফূর্তি!"

এই ব'লে পেফিশ্‌কা মেঝের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে গান ধ'রলো:

"কচি কচি হাড়গুলো বড়ো হ'লে পরে
খোলা হাটে বেচে দেবো যুতসই দরে।"

"ঘটকী! আমার সংগে গাইবে তো গাও, নইলে ভাগো। গাইবে না? তার চেয়ে বরং এসো যে-গানটা তুমি আমায় শিখিয়েছো সেই গানটাই গাই দুজনে। কি, রাজী?"

একটা ভাঙা বাকশোর গায়ে ঠেস দিয়ে ব'সে পেফিশ্‌কা কনুই দিয়ে খোঁচা মারে মাতিৎসার পাঁজরে, আর সেই সংগে হারমোনিয়ামের চাবিগুলোও হাতড়াতে থাকে অন্ধের মতো।

ইলিয়া কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"মাশুৎকা কোথায়?"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে ব'ললো জাকব:

"ওহে শুনছো? মাশা কোথায়?"

কিন্তু মাতালদুটো ওদের কথায় কানও দিলো না। মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে মাতিৎসা গাইতে লাগলো:

"মদটা ভালো, নেশাও ভালো,
সবই ভালো, গল্প বলো।"

সংগে সংগে হারমোনিয়ামটা বাজাতে বাজাতে পেফিশ্‌কাও যোগান দিলো চড়া গলায়:

"মদটা ভালো, মনটা ভালো,
ছুটির দিনে গল্প বলো।"

চেয়ার থেকে উঠে ইলিয়া পের্ফিশ্‌কার ঘাড়টা ধ'রে এমনভাবে নেড়ে দেয় যে তার মাথাটা ঠুকে যায় বাক্‌শোর পিঠে।

"তোমার মেয়ে কোথায় ?"

দুহাতে মাথাটা চেপে ধ'রে অস্ফুটস্বরে ব'ললো পের্ফিশ্‌কা :

"এক যে ছিলো হুতোম, তার ছিলো ভুতুম নামে একটা মেয়ে। মেয়েটা পথে পথে ঘুরে বেড়াতো গভীর রাতে।"

মাত্তিৎসাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে সে শুধু মুচকি হেসে ব'ললো :

"ব'লবো না, ব'লবো না, কিছুতেই ব'লবো না।"

নিষ্ঠুর হাসি হেসে ইলিয়া জাকবকে ব'ললো :

"হয়তো এরা মেয়েটাকে বেচে এসেছে। শয়তান কোতাকার !"

প্রথমে ইলিয়ার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে, তারপর করুণ স্বরে মুচিটাকে জিজ্ঞাসা ক'রলো জাকব :

"পের্ফিলি, শোনো ! মাশুৎকা কোথায় ?"

ঠাট্টার সুরে জড়ানো গলায় ব'ললো মাত্তিৎসা :

"মা-শুৎ-কা ! বলিহারি যাই ! শেষ পর্যন্ত তাহ'লে মনে প'ড়েছে তাকে !"

অত্যন্ত বিচলিতভাবে জাকব ব'ললো :

"ব্যাপারটা যেন গোলমেলে ঠেকছে, ইলিয়া ! কি করা যায় বলো তো ?"

মাতাল তুটোর দিকে বিষণ্ণভাবে চেয়ে ইলিযা জবাব দিলো :

"এখুনি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

হঠাৎ খুশিতে চম্‌কে উঠে ব'ললো পের্ফিশ্‌কা :

"ঘটকী, শুনছো ? এরা পুলিশে খবর দিতে চায়। হা-হা-হা !"

শুনে, ড্যাবরা চোখতুটো বা'র ক'রে একবার ইলিয়ার দিকে চেয়ে একবার জাকবের দিকে চেয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ললো মাত্তিৎসা : "পু-লি-ইশ ?"

তারপর হঠাৎ বিশ্রীভাবে হাত তুখানা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো সে :

"পুলিশ দেখাচ্ছে ! কে কাকে ধরিয়ে দেয় সেইটা ভেবে ত্যাখ্‌ ! যাবি, তোদের যদি থানায় নিয়ে যাই, যাবি ? বেরো আমার ঘর থেকে। এটা আমার ঘর। আমরাও বিয়ে ক'রবো !"

কোমরে হাত চেপে হেসে ওঠে পের্ফিশ্কা।

"হা-হা-হা, হো-হো- হো।"

ইলিয়া ব'ললো :

"চলো জাকব, এখান থেকে চ'লে যাই। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চলো, চ'লে এসো।"

স্রেফ বিহ্বল হ'য়ে করুণ স্বরে ব'ললো জাকব :

"একটু দাঁড়াও। এরা মাশার বিয়ে দিয়ে দেয় নি তো? কিন্তু—ও বিয়ের জানেই বা কি? পের্ফিশ্কা, সত্যি ক'রে বলো মাশার বিয়ে দিয়ে দিয়েছো কি না। বলো, মাশা কোথায়?"

"বলি, ওগো ও মাতিৎসা, শুনছিস্ গা বউ? ধর্ ওদের চেপে, ধ'রে আঁচড়ে কামড়ে একশা ক'রে দে!—হা-হা-হা! মাশা কোথায়?"

এই ব'লে পের্ফিশ্কা শিস্ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা না পেরে জাকবের দিকে চেয়ে জিভ ভেংচে আবার হেসে ওঠে।

এদিকে ইলিয়ার সামনে গিয়ে মাতিৎসা গর্জন ক'রে উঠলো :

"তুই কোথাকার কে রে?"

ধাক্কা দিয়ে মাগীটাকে সরিয়ে দিয়ে ইলিয়া বেরিয়ে গেলো এঁদো ঘরখানা থেকে। একটু পরে অন্ধকার হলঘরের দরজার গোড়ায় জাকব ধ'রলো গিয়ে ইলিয়াকে। ইলিয়ার কাঁধটা চেপে ধ'রে ব'লতে লাগলো জাকব :

"এমন কাজ কি কেউ ক'রতে পারে, ইলিয়া? এক ফোঁটা একটা মেয়ে, তাকে কি না—। না, না, এটা কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? কিন্তু তাহ'লেও —ওরা মাশার বিয়ে দিয়ে দেয় নি তো, ইলিয়া?"

জাকবের কথায় বাধা দিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে ব'ললো ইলিয়া :

"থামো, প্যানপ্যান ক'রো না। এ-সব ভেবে এখন আর লাভ কি? আগের থেকেই ওদের ওপর তোমার নজর রাখা উচিত ছিলো। তুমি যতোক্ষণ শুরু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলে, তার মধ্যে ওরা শেষটুকু সেরে ফেললো।"

জাকবের মুখে যেন আর কথা সরে না। তবে, মিনিট খানেক পরে উঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে জাকব ব'ললো ইলিয়াকে :

"আমার দোষ নেই'। আমি জানতাম ও দিনের বেলায় কোন্ একটা বাড়িতে যেন ঘর-দোর মোছার কাজ নিয়েছে।"

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় ব'ললো ইলিয়া:

"চুলোয় যাও তুমি! তোমার দোষ আছে কি নেই তাতে আমার দরকার কি? এ-বাড়ি থেকে পালাতেই হবে। উচিত হ'চ্ছে বাড়িখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, তা-ই।"

ইলিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ব'ললো জাকব:

"হায় ভগবান, হায় ভগবান!"

মুখ ফিরিয়ে জাকবের দিকে চাইতে ইলিয়া দেখলো জাকব অসহায়ের মতো মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াবার ভংগীটা দেখে মনে হ'লো জাকব যেন প্রহারের প্রতীক্ষা ক'রছে।

"আর কেন, এইবার কাঁদো!" এই ব'লে ইলিয়া জাকবকে সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে একলা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

পরদিন সকালে ইলিয়া পের্ফিশ্‌কার মুখে শুনলো যে তারা সত্যিসত্যিই মাশার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে একটা দোকানদারের সংগে। লোকটার নাম ক্রেনফ্। বয়স হবে তার প্রায় পঞ্চাশ। লোকটার বউ মারা গেছে খুব বেশি দিন হয়নি।

গতরাত্রের মাতলামির পর ঘাড়ে-গর্দানে ব্যথা হওয়ায় মাথাটা নেড়েচেড়ে, তক্তপোশের ওপর শুয়ে অসংলগ্নভাবে ব'ললো পের্ফিশ্‌কা:

"লোকটা আমায় ব'ললো, 'বউ মারা গেছে, তাই কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে দেখবারও কেউ নেই।' ছেলে তার দুটো: বড়োটার বয়স পাঁচ, ছোটোটার বয়স তিন। ক্রেনফ্ ব'ললো, 'ওদের দেখাশুনো করবার জন্যে একটা নার্স তো চাই, আছেও একজন, তবে কোথাকার এক উট্‌কো মেয়েমানুষ তো, আজ ভালো আছে, কাল হয়তো দেখবো চুরি-চামারি ধ'রেছে। তাই, তুমি যদি তোমার মেয়েটাকে রাজী করাতে পারো তাহ'লে—।' তখন মাতিৎসা আর আমি দুজনে বোঝাতে লাগলাম মাশাকে। সহজে কি সে রাজী হয়? তখন মাতিৎসা বুদ্ধি খাটালো। ব'ললো: 'আজ বাদে কাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি

শুনি? দিনকের দিন অবস্থা খারাপই হবে, ভালো তো আর হবে না!' তখন মাশা ব'ললো: 'আচ্ছা, আমি ওকে বিয়ে ক'রবো।' আর, ও বিয়ে ক'রলোও তাকে। তিনদিনের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলো। মাতিৎসা পেলো পাঁচ টাকা, আমিও পেলাম পাঁচ টাকা। আর সেই টাকা দিয়ে কাল আমরা মদ খেয়েছি। তবে হ্যাঁ, মাতিৎসা মদ গিলতে পারে বটে! যেন একটা পিপে!"

চুপচাপ ব'সে কথাগুলো শুনে ইলিয়া বুঝলো যে মাশার এর চেয়ে কোনো ভালো গতি হ'তে পারতো না। কিন্তু তাহ'লেও মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয় ইলিয়ার। গত কয়েকদিন ও মাশাকে দেখেইনি, এমন কি ভাবেওনি তার কথা। কিন্তু আজ মাশা না থাকায় ইলিয়ার মনে হ'লো বাড়িখানা যেন হঠাৎ আরও নোংরা এবং আরও অপবিত্র হ'য়ে উঠেছে।

পের্ফিশ্‌কার মুখখানা ফুলে উঠেছে হ'লদে হ'য়ে। কথা ব'লতে ব'লতে তার গলাটা যাচ্ছে আটকে। মুচিটার দিকে চাইতেই ইলিয়ার অন্তর বিষাদে ভ'রে গেলো।

"ক্রেনফ্‌ আমাকে ওর বাড়িতে পা দিতে মানা ক'রে দিয়েছে। ব'লেছে: 'মাঝে-মাঝে তুমি আমার দোকানে আসতে পারো, এক-আধ গেলাশ মদও দেবো না হয়, কিন্তু সাবধান, আমার বাড়িতে কখনো ঢুকবে না।'—আনা দুয়েক পয়সা দেবে ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌? নেশায় মাথাটা যেন এখনো টনটন করছে। যদি দাও তাহ'লে মাথা-ধরাটা সারাবার বন্দোবস্ত করি। দেবে, ইলিয়া, দয়া ক'রে আনা দুয়েক পয়সা?"

ইলিয়া ব'ললো:

"আচ্ছা, আচ্ছা, দেবো। কিন্তু তুমি এখন ক'রবে কী?"

মেঝের ওপর থুতু ফেলে জবাব দিলো পের্ফিশ্‌কা:

"কী আর ক'রবো? এখন থেকে পুরোদস্তর মাতাল হ'য়ে যাবো। যদ্দিন মাশার কোনো হিল্লে করতে পারিনি, একটু রাশ টেনে ছিলাম। ওর মুখের দিকে চেয়ে তাই মাঝে মাঝে কাজকর্মও নিতাম। কিন্তু এখন জালি ও খেতেও পাবে প'রতেও পাবে, তাছাড়া কোনো বিপদেও প'ড়তে হবে না ওকে। কথায় বলে: বিপদ কিসের সিন্দুকে যদি থাকি? তাই ব'লছি এবার থেকে আমি চুটিয়ে নেশা ক'রবো।"

"মদ খাওয়াটা ছাড়তে পারো না?"

উশকোখুশকো মাথাটা নেড়ে জবাব দেয় পের্ফিশ্‌কা:

"কোনো মতেই না। আর, তাছাড়া ছাড়বোই বা কেন?"

"জীবনে তোমার কোনো সাধ নেই?"

"পয়সা ক'টা দেবে, না কি এই সব বড়ো বড়ো কথা ব'লবে? আপাতত একটা দোআনি ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।"

কাঁধদুটো নেড়েচেড়ে ইলিয়া ব'ললো:

"কিন্তু আমিও বুঝতে পারি না, সে কেমন ধারা মানুষ যে বাঁচে অথচ জীবনে যার কোনো সাধই নেই।"

শান্তভাবে ব'ললো পেফিশ্‌কা—দার্শনিকের মতো:

"তুমি যে-মানুষের কথা ব'লছো সে হ'লো পুরুষসিংহ। কিন্তু আমি তো তা নই, তাই আমার কথা আলাদা। সত্যিকারের মরদের মতো বুক ঠুকে যে-চাইতে জানে ভাগ্য তাকে দেয়ও। কিন্তু যে-বেটার বুকের ছাতি দেড় বিঘত তাকে দেবেই বা কি, আর ভাগ্যই বা কেন মাথা ঘামাবে তার জন্যে? শোনো একটা কথা বলি: একদিন বরাত ঠুকে আমিও একটা কাজে নেমেছিলাম—আমার বউটা তখনো বেঁচে—ভেবেছিলাম জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার জিনিষ-পত্তর কিছু সরাবো। মনে মনে ব'লেছিলাম: 'কেউ না কেউ বুড়োকে তো সর্বস্বান্ত ক'রবেই। আমি যদি না করি ক'রবে আর কেউ। তাই একবার চেষ্টা ক'রেই দেখি না কি ক'রতে পারি।' কিন্তু, ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার আগেই সে-কাজ হাসিল ক'রে নিলো অন্য কেউ। অবিশ্যি, সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এর থেকে আমি যা শিখলাম তা হ'লো এই: মানুষের জানা দরকার কি ক'রে নিজের কাজ হাসিল ক'রতে হয়।"

এই ব'লে হেসে তক্তপোশ থেকে নামতে নামতে পের্ফিশ্‌কা আবার ব'ললো:

"পয়সা ক'টা এবার দিয়ে দাও বাপু, বুক যেন পুড়ে যাচ্ছে!"

মুচিটার হাতে একটা দোআনি দিয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"নাও, এইবার গিয়ে বুকের আগুন নেবাও!"

তারপর পের্ফিশ্‌কার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে আবার ব'ললো:

"শুনলাম তো অনেক কিছুই ; কিন্তু একটা কথা জানো কি ?"

"কি ?"

"তুমি একটি চালিয়াত্ এবং অপদার্থ মাতাল। বুঝলে ? যা ব'ললাম তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।"

ইলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে দোআনিটা শক্ত ক'রে ধ'রে বললো পেফিশ্কা :

"তা যা ব'লেছো। বর্ণে বর্ণে সত্যিই বটে।"

তখন চিন্তিতভাবে গম্ভীর গলায় ইলিয়া বললো :

"কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তোমার চেয়ে ভালো মানুষ আমি আর কখনো দেখি নি।"

ইলিয়ার গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে পেফিশ্কা ব'ললো :

"ঠাট্টা ক'রছো ইলিয়া য়াকফ্লিচ্ ?"

"ঠাট্টা-ফাট্টা বুঝি না। যা মনে হ'য়েছে তা-ই ব'ললাম। এখন বিশ্বাস করা না-করা নির্ভর করে তোমারই ওপর। তবে মনে রেখো প্রশংসা করবার জন্যে আমি ও-কথাটা বলি নি। মানুষজাতটা সম্বন্ধে আমার ধারণা যে কি সেটা বোঝাবার জন্যেই ও কথা ব'লেছি।"

"সেবেছে! এ-সব বোঝবার মতো ক্ষ্যামতা কি আমার আছে ছাই ? বুদ্ধিশুদ্ধি আমার বড়ো কম বাপু। যাই, গলাটা একটু ভিজিয়ে দেখিগে বুদ্ধিটা যদি বাড়ে।"

সংগে সংগে পেফিশ্কার শার্টের আস্তিনটা চেপে ধ'রে ইলিয়া ব'ললো :

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রবো তোমায়। তুমি কি ভগবানকে ভয় করো ?"

একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পা দুখানা নেড়েচেড়ে ধীরে-সুস্থে জবাব দিলো পেফিশ্কা :

"ভগবানকে ভয় করবার মতো কোনো কাজই আমি করি নি। কাউকে আমি দুঃখ দিইও না, আর কখনো দিইও নি।"

গলার আওয়াজটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া লুনেফ্ :

"উপাসনা করো তো ?"

"বুঝতেই পারছো কচিৎ কদাচিৎ করি।"

ইলিয়া বুঝলো কথা বলবার আদৌ ইচ্ছা নেই পের্ফিশ্‌কার, কারণ মনটা তার আনচান ক'রছে মদের গেলাশে চুমুক দেবার জন্যে।

"এই নাও পের্ফিলি, আর একটা সিকি রাখো।"

সংগে সংগে পের্ফিশ্‌কা বেজায় খুশি হ'য়ে ব'ললো:

"হ্যাঁ, এ একটা কথা ব'ললে বটে!"

"কিন্তু এইবার বলো তুমি কিভাবে উপাসনা করো।"

"আমি? কিভাবে উপাসনা করি? খুব সোজা! অত শত জপতপের ধার ধারি না আমি। আগে 'কুমারী মেরী'-র জপটা জানতাম, তাও এখন ভুলে মেরে দিয়েছি। জানার মধ্যে জানি হয়তো ভিখিরিরা যেভাবে উপাসনা করে। অর্থাৎ, 'হে যীশু' ইত্যাদি প্রার্থনাটা। বলা যায় না বুড়ো বয়সে হয়তো সেটা কাজে লাগবে। আমার উপাসনার ধরণ খুবই সোজা। যেমন: 'হে ঈশ্বর, আমাকে দয়া করো।'"

কড়িকাঠের দিকে চেয়ে মাথাটা নেড়ে আবার ব'ললো পের্ফিশ্‌কা:

"এ-ই যথেষ্ট। তিনি যা বোঝবার বুঝে নেন। এবার তা'হলে যাই? সত্যি ব'লছি গলাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

মুচিটার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে বললো ইলিয়া:

"হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। তবে মনে রেখো একদিন আসবে যেদিন তোমাকে ম'রতে হবে। তারপর ঈশ্বর তোমাকে জিজ্ঞেস ক'রবেন: 'ওহে, জীবনটা কাটালে কি ক'রে?'"

"আমি ব'লবো: 'হে ভগবান, জন্মেছিলাম ছোট্টো একটি কীটের মতো, ম'রেছি মাতাল হ'য়ে, এ-ছাড়া আর কিছুই মনে প'ড়ছে না।' তখন তিনি হাসতে হাসতে আমায় মাফ ক'রে দেবেন।"

এই ব'লে খুশির হাসি হাসতে হাসতে পের্ফিশ্‌কা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এঁদো ঘরখানায় একলাটি ব'সে ইলিয়া আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। মাশা যে আর এই দম-বন্ধ-করা নোংরা গর্তটায় ফিরে আসবে না, এটা ভেবে কেমন যেন অবাক হ'য়ে যায় সে। তাছাড়া কে জানে পের্ফিশ্‌কাকেও হয়তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'বে আজ বাদে কাল। দুটো ব্যাপারই বড়ো অদ্ভুত ঠেকে ইলিয়ার কাছে।

জানলা দিয়ে নোংরা মেঝেটার ওপর রোদ্দুর এসে প'ড়েছে। এখানে একটা ভাঙা বাক্‌শো, ওখানে একটা খোঁড়া চেয়ার—সব যেন এলোমেলো অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে ঘরখানায়। এখানে না আছে শান্তি না আছে স্বস্তি। বুকটা যেন খাঁ খাঁ ক'রে ওঠে দুঃখে বেদনায়। মনে হয়, একটু আগেই যেন কাবোর মৃতদেহ বা'র ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে এখান থেকে। এতোটা বিষণ্ণ আর ধূসর এই ঘরখানা!

চেয়ারে সোজা হ'য়ে ব'সে ভাঙা তক্তপোশখানার দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবতে থাকে নানান কথা। কতকগুলো দুশ্চিন্তা এসে যেন ছেঁকে ধরে ওকে।

হঠাৎ ও ভাবে :

"আচ্ছা, গিয়ে যদি অপরাধটা স্বীকারই করি, তা'হলে কেমন হয়?"

কিন্তু সংগে সংগে ও সেই চিন্তাটাকে ওর মনের ত্রিসীমানা থেকে 'দূর্-দূর্' ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

সেই সন্ধ্যাতেই ইলিয়া পেত্রুহা ফিলিমনফের বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিতে বাধ্য হ'লো। ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে। শহরের কাজকর্ম সেরে ইলিয়া সবে বাড়ির উঠানে পা দিয়েছে, এমন সময় ওর কাকা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে ওকে একটা কাঠের গাদার পিছনে নিয়ে গিয়ে ব'ললো:

"ইলুশা, তুই এখান থেকে চ'লে যা। তোকে পই পই ক'রে ব'লছি তুই এখান থেকে চ'লে যা। আজ কি হ'য়েছে শোন্।"

ভয়ে চোখ বুঁজে, হাত দুখানা ওপর দিকে ছুঁড়ে তেরেন্স ব'লতে লাগলো:

"কথা নেই, বার্তা নেই বেহেড্ মাতাল হ'য়ে এসে য়াশ্কা ওর বাবার মুখে সজোরে ঘুষি মেরেছে। তাছাড়া—চোর, জোচ্চোর, বেহায়া, লম্পট, নিষ্ঠুর—যা মুখে এসেছে তাই ও ব'লেছে পেত্রুহাকে। এক কথায় ব'লতে গেলে ছোঁড়াটার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেয়েছিলো আর কি। সে কী চীৎকার! যদি শুনতিস্ তোরও পিলে চ'মকে উঠতো। পেত্রুহাও দিয়েছে য়াশ্কার মুখখানাকে একেবারে থেঁতো ক'রে। শুধু তাই নয়। চুলের মুঠি ধ'রে তাকে মেঝেতে ফেলে তার সর্বাঙ্গ চটকেছে দু পা দিয়ে। রক্তারক্তি হবার পর তবে পেত্রুহা ছেড়েছে ওকে। যাশ্কা এখন শুয়ে শুয়ে কাঁদছে আর গোঙাচ্ছে। ভাবলাম এইখানেই বুঝি ব্যাপারটা চুকে গেলো। কিন্তু তার একটু পরেই পেত্রুহা আমাকে কি ব'ললো জানিস্? ব'ললো: 'ইলিয়াকে তাড়াও এখান থেকে। আমি জানি ঐ ছোঁড়াটাই য়াশ্কাকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।' তার রকম-সকম দেখে আমি তো ভয়েই সারা। তাই ব'লছি আগের থেকে একটু সাবধান হ'য়ে থাক্।"

গলা থেকে চামড়ার ফালিটা খুলে বাক্সোটা কাকার হাতে দিতে দিতে ব'ললো ইলিয়া:

"এটা একটু ধরো!"

"শোন্, শোন্ ইলিয়া! অমন ক'রে যাচ্ছিস কোথায়? ও তোকেও ঠেঙাবে।"

জাকবের জন্তে দুঃখ হয় ইলিয়ার। সেই সংগে পেক্রহার ওপর রাগে ওর সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

"বাজে ব'কো না। চুপ করো।" এই ব'লে কাকাকে ধমকে ইলিয়া তাড়াতাড়ি চ'ললো হোটেলটার দিকে। যেতে যেতে ও এতো জোরে দাঁতে দাঁত চাপে যে ওর গালের হাড় আর চোয়াগুলো ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। সেই সংগে ওর মাথাটাও যেন হঠাৎ বনবন ক'রে ঘুরে যায়।

এদিকে তেরেন্স ব'লতে থাকে :

"এমন ক'রে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনিস্ নি ইলিয়া। আমার কথা শোন্, ফিরে আয়। কিসের থেকে কি হয় তা কি কেউ ব'লতে পারে? যদি একবার পুলিশের খপ্পরে পড়িস্ কিংবা জেলে যাস্, তাহ'লে—"

যেতে যেতে কাকার কথাগুলো অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে শুনতে পায় ইলিয়া, শুধু বুঝতে পারে ওর কাকা পুলিশ, জেল, বিপদ ইত্যাদি সম্পর্কে কি যেন সব ব'লছে।

হোটেলে ঢুকে ইলিয়া দেখলো মদের বোতলগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারে হাত রেখে পেক্রহা একটা লোফারের সংগে হেসে হেসে কথা ব'লছে। আলোটা প'ড়েছে তার মাথার ঠিক টেকো অংশটায়। একটা তৃপ্তির হাসিতে যেন চকচক ক'রছে তার থলথলে মুখখানা।

ইলিয়াকে দেখেই ঠাট্টার স্বরে ব'লে উঠলো পেক্রহা :

"আরে, এ যে স্বয়ং ফেরিওলা-সায়েব!"

তারপর ক্রুদ্ধভাবে ভ্রূ কুঁচকে ব'ললো আবার :

"তোকেই খুঁজছিলাম এতোক্ষণ।"

দেহ দিয়ে অন্দর মহলের দরজাটা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিলো পেক্রহা। সরাসরি তার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"স'রে দাঁড়াও!"

জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো পেক্রহা :

"কি ব'ললি?"

"আমাকে জাকবের কাছে যেতে দাও।"

"দাঁড়া, যাওয়াচ্ছি তোকে জাকবের কাছে!"

কিন্তু ঠিক এই সময়ে ইলিয়া পেত্রুহার গালে হঠাৎ কষিয়ে দিলো একটা প্রচণ্ড চড়। নিজে মেরে নিজেই যেন অবাক হ'য়ে গেলো সে। সংগে সংগে এদিক-ওদিক থেকে দৌড়ে এলো খানসামাগুলো। কে একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো :

"ধরো, ওকে ধরো! মারো বেটাকে!"

উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গেলো। মনে হ'লে কেউ যেন এক বালতি ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছে ওদের মাথায়।

ইলিয়া এতোটুকুও সময় নষ্ট না ক'রে পেত্রুহার পাশ দিয়ে টুক্ ক'রে ঢুকে গেলো দরজার ফাঁক দিয়ে, তারপর ভিতর থেকে দিলো ছিটকিনিটা এঁটে।

নানা সাইজের মদের বোতলে ঠাসা ছোট্টো ঘরখানায় ঢুকে ইলিয়া দেখলো টেবিলের ওপর একটা বাতি জ্ব'লছে, শিখাটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, আর চিমনিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে গেছে একেবারে। আলো-আঁধারির জন্যেই হ'ক কিংবা ওর মনের অস্থিরতার জন্যেই হ'ক ইলিয়া প্রথমটায় জাকবকে খুঁজে পেলো না। ঘরখানা থমথম ক'রছে। কড়িকাঠটাকে মনে হ'লো যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। একটু পরে ইলিয়া দেখলো ছায়ার দিকে মাথা ক'রে জাকব মেঝের ওপর শুয়ে আছে। জাকবের মুখখানাকে দেখাচ্ছে যেমন কালো তেমনি ভয়াবহ। গোড়ালির ওপর ব'সে বাতিটা জাকবের মুখের সামনে ধ'রতেই ইলিয়া দেখলো কী বীভৎস হ'য়ে উঠেছে সেই মুখখানা, চোখ দুটো ফুলে উঠেছে ঢোল হ'য়ে, নাকের পাশটা গেছে থেঁতলে, রগের ওপর কালশিটে প'ড়েছে কাঁকড়া-বিছের মতো, তার ওপর যন্ত্রণায় কপালটা গেছে কুঁচকে। মুখখানাকে মুখ ব'লেই মনে হয় না যেন, মনে হয় একটা বীভৎস মুখোসকে কেউ যেন থেঁতলে থাবড়ে বসিয়ে দিয়েছে জাকবের মুখের ওপর। জাকবের বুকটা উঠছে পড়ছে হাপরের মতো, চোখে দেখতে পাচ্ছে না সে নিশ্চয়ই, কারণ গোঙাতে গোঙাতে জাকব জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কে ওখানে?"

দাঁড়িয়ে উঠে চাপা গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"আমি।"

"একটু জল দাও তো।"

এমন সময় ইলিয়া দেখলো ঘরের দরজাটা মাঝে মাঝে থরথর করে কেঁপে উঠছে। বাইরে থেকে যে ওরা দরজাটা জোর ক'রে খুলতে চেষ্টা ক'রছে এটা বুঝতে পারলো ইলিয়া।

কে একজন ব'লে উঠলো :

"পেছন দিক দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করো।"

"পুলিশে খবর দাও। যাও যাও, এক্ষুণি পুলিশ-সার্জেণ্টটাকে ডেকে আনো।"

সমস্ত হট্টগোল ছাপিয়ে পেত্রুহার কর্কশ গলাটা শোনা গেলো :

"সবাই দেখেছো কিন্তু। আমি ওর গায়ে হাত দিই নি—"

মনে হ'লো একটা নেকড়ে-বাঘ যেন দাঁত খিঁচিয়ে কাঁদছে।

ইলিয়া হেসে ফেলে। পেত্রুহা যে আঘাত পেয়েছে এতে সত্যিই খুশি হয় সে।

ছিটকিনি-আঁটা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া আক্রমণকারীদের বল'লো :

"বলি, শুনছো? চিল্লাচিল্লি থামাও! বুলডগের মুখে না হয় একটা চড়ই মেরেছি, তাই ব'লে সে তো আর অক্কা পাচ্ছে না। তাছাড়া, মেরেছি যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে তো আমায় হাজির করাই হবে। তা সত্ত্বেও তোমরা কেন এ-সব ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছো? যাও, যাও, যে যার নিজের চরকায় তেল দিগে যাও! অমন ক'রে দরজায় চাপ দিও না। আমি এখুনি খুলছি।"

একটু পরেই ইলিয়া দরজাটা খুলে দিয়ে চৌকাঠের ওপর দাঁড়ালো। উত্তেজনার লেশ মাত্র নেই তার মুখে, কেবল হাতের মুঠো দুটো বেশ ক'ষে পাকানো।. ভাবখানা এই : কেউ যদি হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে, তাহ'লে মুঠো দুটোর ত্বরিত সদ্ব্যবহার ক'রবে সে। ইলিয়ার লম্বা-চওড়া মজবুত দেহটা এবং তার মুখের নির্ভীক ভাবটা দেখে লোকজন ভয়ে পিছু হ'টে যায়। কিন্তু পেত্রুহা আস্ফালন ক'রতে ছাড়ে না :

"দাঁড়া রাস্কেল, তোর মজা দেখাচ্ছি। মেরে তোকে আমি—"

একপাশে স'রে গিয়ে ইলিয়া লোকজনকে ব'ললো :

"ওকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিয়ে বরং ভেতরে এসে দেখো, কি বিশ্রীভাবে একটা মানুষকে জখম ক'রেছে ও।"

ইলিয়ার দিকে একবার ক্রুদ্ধভাবে চেয়ে কয়েকটা লোক ঘরে ঢুকে আকমের মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়লো। দেখে শুনে ব'ললো একজন :

"নাঃ, একেবারে থেঁতলে দিয়েছে দেখছি !"

লোকটার গলায় ভয় ও বিস্ময় যেন উপচে পড়ে।

আর একজন ব'ললো :

"বুকের পাটা আছে বটে ! নইলে কেউ নিজের ছেলেকে এ-ভাবে ঠেঙাতে পারে ?"

আরও একজন ব'ললো :

"মুখখানা যেন চেনাই যাচ্ছে না। এর আগেও তো আমি ওকে দু-চারবার দেখেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমটায় আমি ওকে চিনতেই পারি নি !"

ই'লয়া ব'ললো :

"পারো তো একটু জল এনে দাও। তারপর না হয় পুলিশে খবর দিও।"

বেশির ভাগ লোকই যে ওর দিকে, এটা লক্ষ্য করে ইলিয়া চাঁচাছোলা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো :

"তোমরা সকলেই পেত্রুহা ফিলিমনফ্‌কে চেনো এবং এটাও জানো যে ওর চেয়ে বড়ো বদমাশ এ তল্লাটে আর একটিও নেই। কিন্তু ওর ছেলেটার বিরুদ্ধে কি কারোর কোনো অভিযোগ আছে ? বলো, আছে কি ? আমার মনে হয় নেই। আর, সেই ছেলেটাই কিনা আজ এখানে প'ড়ে রয়েছে মড়ার মতন। হয়তো সারাটা জীবন তাকে এইভাবে শয্যাশায়ী হ'য়েই কাটাতে হবে, কিন্তু যার জন্যে আজ তার এই অবস্থা তাকে শাস্তি দিচ্ছে কে ? বেশি নয়, পেত্রুহাকে একটিমাত্র চড় মেরেছি ব'লে হয়তো তার জন্যেই আমাকে শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে। কিন্তু যে লোকটা একজন মানুষকে আর একটু হ'লে মেরেই ফেলেছিলো তার কোনো শাস্তি হবে না হয়তো ! এটা কি ঠিক ? এই কি ন্যায় বিচার ? কিন্তু দেখছি এই রকমটাই হ'য়ে থাকে সচরাচর। একজন যা খুশি ক'রবে, আর অপরজন শুধু স'য়ে যাবে মুখটি বুঁজে। মুখ খোলাটাও তার পক্ষে যেন অপরাধ—!"

ইলিয়ার কথা শুনে কেউ বা সহানুভূতিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, কেউ বা চুপ ক'রে রইলো ওর মুখের দিকে চেয়ে। আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিলো

ইলিয়ার, কিন্তু সেই সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে সবাইকে তাড়াতে তাড়াতে পেত্রুহা কর্কশ গলায় চেঁচাতে লাগলো :

"বেরোও, বেরোও সব এখান থেকে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখা হচ্ছে! আমি ওর বাপ, ও আমার বেটা। আমার ব্যাপার আমি বুঝবো। তোমরা এর মধ্যে নাক গলাতে আসো কোন্ আক্কেলে শুনি? পুলিশকে আমি ডরাই না, তাছাড়া বিচার-ফিচারেও আমার কোনো দরকার নেই। বুঝলে? কোনো দরকার নেই।"

তারপর ইলিযার দিকে ফিরে বললো :

"আর, ফেরিওলাসায়েব, তোমাকেও দেখে নেবো আমি।—বিনা বিচারেই দেখে নেবো। দাঁড়িয়ে কেন? বেরো ঘর থেকে!"

হাঁটু গেড়ে ব'সে জাকবের মুখের সামনে এক গেলাস জল ধ'রতেই জাকবের রক্তাক্ত, ফুলেওঠা ঠোঁটদুখানা এবং থেঁতলানো মুখখানার দিকে চেয়ে ইলিয়ার বুকটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

জলটুকু খেয়ে নিয়ে ফিশফিশ ক'রে ব'ললো জাকব :

"ও আমার সব ক'টা দাঁতই ভেঙে দিয়েছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্চে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো ইলুশা, এখানে থাকতে পারছি না, নিয়ে চলো ভাই।"

জাকবের ফুলে-ওঠা চোখদুটো দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

পেত্রুহার দিকে ফিরে ইলিয়া কঠোরভাবে ব'ললো :

"ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

ছেলের দিকে চেয়ে পেত্রুহা বিড়বিড় ক'রে কি যেন বললো—তাড়াতাড়ি এবং অস্পষ্টভাবে। তার একটা চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে র'য়েছে, অন্যটা গেছে বুঁজে ইলিযার চড়ে। ফুলে উঠে চোখটার অবস্থা হ'য়েছে জাকবের চোখের মতোই।

ইলিয়া চেঁচিয়ে উঠলো :

"কি, আমার কথাটা কানে গেলো তোমার?"

হঠাৎ শান্তভাবে সুস্থির গলায় ব'ললো পেত্রুহা :

"চেঁচাস্ নি! হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাওয়া চ'লবে না। সবাই জানতে

পারবে। এমনিতেই তো তুই একটা কেলেংকারী বাধিয়ে ব'সেছিস্। মনে রাখা দরকার আমি একজন কাউন্সিলার। তাই হাসপাতালের চিন্তা ছেড়ে দে!"

ফিলিমনফের পায়ের ওপর এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে ইলিয়া ব'ললো:

"শয়তান কোতাকার! ব'লছি ওকে এখুনি হাসপাতালে পাঠাও, নইলে কেলেংকারীর চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বো আমি!"

"কি আশ্চর্য, এতো রাগছিস্ কেন? এতো উতলা হবারই বা কি আছে? আমার মনে হয় যতোটা না লেগেছে তার চেয়েও বেশি ভাণ ক'রছে ও।"

ইলিয়া চ'টেম'টে উঠে দাঁড়াতেই ফিলিমনফ্ তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে ব'ললো:

"ইভান্! একখানা গাড়ি ডেকে আন্ তো! ব'লবি হাসপাতালে যাবো। আনা চারেকের বেশি ভাড়া রফা করিস্ নি যেন। জাকব, নে জামা-কাপড় প'রে নে। আর অতো ছেনালি করিস্ নি বাপু, নে টক্ ক'রে উঠে পড়্! এই মারেই চোখ অন্ধকার। তোর মতো বয়েসে আমি যা মার খেতাম তার তুলনায় এ মার তো কিছুই নয়। উঃ, সেদিনের কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে!"

ইলিয়ার দিকে ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে জাকব অত্যন্ত আস্তে আস্তে ব'ললো:

"ধন্যবাদ, ইলুশা!"

সংগে সংগে জাকবের ফুলে-ওঠা গালদুখানা বেয়ে আবার জল গড়াতে শুরু করে।

ইলিয়া শুনতে পেলো মদের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে তেরেন্স ভীরু গলায় কাকে যেন ব'লছে:

"কতো দেবো—তিন পয়সার না পাঁচ পয়সার? এই নাও, পাঁচ পয়সারই দিলাম। কি ব'ললে—কাটলেট্? কাটলেট্ তো আর নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। বরং চপ্ খাও।"

জাকবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ইলিয়া দেখলো ফিলিমনফের বাড়িতে ওর আর ফিরে যাওয়া উচিত নয়। তাই রাতটুকু কাটাবার জন্যে

ও গেলো ওলিম্‌পিয়াদার কাছে। ইলিয়ার মনে হ'লো একটা তীব্র যাতনা যেন ওর বুকটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। কেমন যেন গুলিয়ে যেতে থাকে ওর চিন্তাগুলো, নিজেকে মনে হয় নেহাতই হতভাগ্য, আর এই সব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হ'য়ে ইলিয়া হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। চিন্তাগুলো যতোই অস্পষ্ট হ'ক না কেন, একটি চিন্তা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। সে চিন্তাটা এই : "এভাবে বাঁচা অসম্ভব।" সংগে সংগে ছোটোখাটো একখানি দোকানের সেই স্বপ্নটা আবার ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। মনে মনে ইলিয়া ব'ললো :

"আমাকে পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে বাঁচতেই হবে। সুন্দব এবং নিরিবিলি জীবন আমার চাইই চাই।"

পরদিন ইলিয়া একখানা ঘর খুঁজে পেলো—বান্নাঘরের ঠিক পাশে ছোট্টো একখানি ঘর। বাড়িওয়ালী তরুণী, লাল বঙের ব্লাউজ তার গায়ে, মুখখানা গোলাপী, নাকটা ছোট্টো এবং টিকলো পাখীর ঠোটের মতোই, কপালখানা ছোটো এবং মাথায় একরাশ ঢেউ-খেলানো কালো চুল। সেই চুলের হু'চার গাছা আবার অনবরত এসে প'ড়ছে তার ভ্রূর ওপর, আর অনবরতই সে সে-গুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে তার ছোট্টো পাতলা একখানি হাতের ত্বরিত ভংগিমায়।

বিশাল-স্কন্ধ যুবকটি যে তার নিবিড় কালো চোখের বিলোল কটাক্ষে থেকে থেকে বিচলিত হ'য়ে উঠছে এটা লক্ষ্য ক'রে মুচকি হাসতে হাসতে মেয়েটি ব'ললো ইলিয়াকে :

"এমন একখানা চমৎকার ঘরের আট টাকা ভাড়া এমন কিছু বেশি নয়। আপনিই বলুন, বেশি কি ?"

এদিকে ঘরের দেয়ালগুলোর দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবতে লাগলো : "আশ্চর্য। এই স্ত্রীলোকটা কে ?"

"দেয়াল দেখছেন ? এই কিছুদিন হ'লো আগাগোড়া চুনকাম করা হ'য়েছে। তাছাড়া, জানলা খুললেই সামনে বাগান। দেখুন না মুখ বাড়িয়ে ! এর চেয়ে আর কতো ভালো ঘর আশা করেন আপনি ?—তারপর, ভোরবেলা কেৎলি-ভর্তি

গরম চা দেবো আপনাকে।—ইচ্ছে ক'রলে সেটা আপনি অনায়াসেই নিজের ঘরে এনে খেতে পারেন।”

আকণ্ঠ কৌতূহল নিযে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

“তুমি কি এ-বাড়ির চাকরানী ?”

তখন মেয়েটি হাসি থামিযে, ভ্রূ কুঁচকে, শিরদাঁড়া সোজা ক'রে গম্ভীরভাবে ব'ললো :

“আমি চাকরানী নই। এ-বাড়ির মালিক আমি। আর, আমার স্বামী—”

“কিন্তু আপনি কি বিবাহিতা ?” অবাক হ'য়ে প্রশ্নটা ক'রে ইলিয়া মেযেটির ছিমছাম সুগঠিত দেহটার দিকে তাকালো।

এইবার রাগ না ক'রে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে ব'ললো মেয়েটি :

“ভারি মজা ক'রতে পারেন তো আপনি! প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন আমি চাকরানী কি না, তারপর আবার এখন জিজ্ঞেস ক'রছেন আমি বিবাহিতা কি না। ভারি মজার লোক তো ?”

ইলিয়াও তখন হাসতে হাসতে ব'ললো :

“জিজ্ঞেস না ক'রে কি করি বলুন, আপনার বয়স এতো অল্প যে—”

“তা'হলে শুনুন আমার বিয়ে হ'যেছে আজ তিন বছর, আর আমার স্বামী হ'লেন একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর।”

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো ইলিয়া। আচ্ছা কাণ্ড যা হ'ক, বিশ্বাসই করা যায় না যেন!

কৌতূহলের সংগে ইলিয়াকে দেখতে দেখতে কাঁধ দুখানা নেড়েচেড়ে ব'ললো তরুণীটি :

“ভারি অদ্ভুত মানুষ আপনি! আচ্ছা সে কথা থাক্। ঘরটা কি নেবেন ?”

“হ্যাঁ, তা তো নেবোই। কিছু আগাম দিতে হবে না কি ?”

“নিশ্চয়ই! অন্তত গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে যান।”

“আমি ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যেই চ'লে আসছি এখানে।”

“ঠিক আছে। আপনার মতো একজন ভাড়াটে পেয়ে খুশিই হ'লাম আমি। দেখে মনে হ'চ্ছে আপনি ভারি ফূর্তিবাজ লোক।”

হাসতে হাসতে ইলিয়া ব'ললো :

"তাই কি? বোধ হয়, না।"

রাস্তায় এসেও ইলিয়া হাসতে লাগলো—খুশির আমেজে। ঘরখানা ওর পছন্দই হ'য়েছে। হাল্‌কা নীল রঙের দেয়ালগুলোও ভারি সুন্দর। উপরন্তু চটপটে মেয়েটি বেশ। বিশেষ ক'রে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর বাড়িতেই যে এখন থেকে তাকে থাকতে হবে এটা ভেবে যেন আরও খুশি হ'লো ইলিয়া। ব্যাপারটা মজার তো বটেই, কেমন যেন অস্বাভাবিকও, হয়তো বা তার পক্ষে খানিকটা বিপজ্জনকও।

জাকব হাসপাতালে র'য়েছে। তাকে দেখতে যাবে ব'লে ইলিয়া একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রলো। যেতে যেতে ও হাসতে লাগলো মনে মনে এবং ভাবতে লাগলো:

"সেই টাকাটা নিয়ে এখন করি কি, লুকিয়েই বা রাখি কোথায়?"

হাসপাতালে পৌঁছে ইলিয়া শুনলো স্নান ক'রে জাকব এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এর পর কি ক'রবে ভেবে না পেয়ে ইলিযা বারান্দার জানলাটির পাশে দাঁড়িয়ে নানান্ কথা ভাবতে লাগলো। চ'লে যাবে, না কি জাকবের জন্য অপেক্ষা ক'রবে? কিন্তু তার ঘুম যে কখন ভাঙবে তাও তো জানার উপায় নেই। আচ্ছা ফ্যাসাদ যা হ'ক। এদিকে ইলিয়ার পাশ দিয়ে হ'লদে হ'লদে ড্রেসিং গাউন প'রে একটির পর একটি রোগী যেতে আসতে থাকে, তাদেব চটিগুলো খশ্‌খশ্ করে বারান্দাব মেঝেতে। যেতে যেতে তারা ইলিয়ার দিকে তাকায়—বিষণ্ণ চোখে, নিজেদেব মধ্যে কথা বলে—ফিশফিশ ক'রে; আর সেই অস্পষ্ট গুঞ্জন মিশে যায় দূবের কোনো গোঙানিতে। এদিকে প্রত্যেকটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে লম্বা বারান্দাটি জুড়ে।

ইলিয়ার মনে হ'লো, কতকগুলো বিষণ্ণ আত্মা যেন হাসপাতালের গুমোট হাওযায় উড়ে বেড়াচ্ছে ধীরে ধীবে, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে করুণভাবে। যে-দিকেই দেখো, হ'লদে দেয়াল—বিবর্ণ মানুষের মতো। এখানে আর একটি মুহূর্তও থাকতে চাইলো না ইলিয়া, মনটা ওর পালাই পালাই ক'রতে লাগলো। কিন্তু ঠিক এই সময়ে একজন রোগী হঠাৎ ওর সামনে এসে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললো:

"গুড্ মর্ণিং।"

মুখখানা তুলতেই অবাক হ'য়ে যায় ইলিয়া, নিজের চোখদুটোকে যেন বিশ্বাস ক'রতে পারে না সে।

"আরে—পল্ যে! কি আশ্চর্য! তুমিও এখানে?"

"আমাকে দেখে তুমি ভেবেছিলে কি? পল্ না বুঝি?"

পলের মুখখানা পাঁশুটে মেরে গেছে, তাছাড়া তার চোখদুটো কেবলই পিটপিট ক'রছে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠায় এবং অস্বস্তিতে। ইলিয়া ব'ললো:

"কাণ্ড শোনো—জাকবের বাবা জাকবকে বেদম ঠেঙিয়েছে।—কিন্তু তুমি এখানে এলে কি ক'রে? অনেক দিন ধ'রেই আছো না কি এখানে?"

তারপর বিষণ্ণ গলায় আবার ব'ললো সে:

"যাই বলো ভাই, তোমার চেহারাটা কিন্তু এক্কেবারে পাল্‌টে গেছে।"

গভীরভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিলো পল্। ঠোঁট-দুখানা তার কেঁপে উঠলো, চোখদুটো গেলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে। অপরাধীর মতো মাথা নুইয়ে ভাঙা গলায় ব'ললো পল্:

"হ্যাঁ—তা পাল্‌টে গেছে বটে।"

কিছুই বুঝতে না পেরে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্‌কে:

"তোমার হ'য়েছে কি?"

"এমনভাবে জিজ্ঞেস ক'রছো যেন তুমি কিছুই জানো না!"

এই ব'লে ইলিয়ার মুখের দিকে একবার চেয়ে পল্ আবার মাথা নোয়ালো।

ফিশফিশ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"রোগে ধ'রেছে না কি?"

"ঠিক তাই।"

"পেলে কোত্থেকে? ভেরার কাছে?"

"তা না তো আর কার কাছ থেকে?" বিষণ্ণভাবে জবাব দিলো পল্।

খানিক নীরব থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"আজ বাদে কাল আমাকেও ধ'রবে। ঠিক ধ'রবে।"

অতি কষ্টে একটু হেসে, ইলিয়ার আরও কাছে স'রে এসে, বিড়বিড় ক'রে ব'ললো পল্:

"অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলাম তোমাকে। কিন্তু ভাবলাম তুমি হয়তো এখন আমাকে ঘেন্না ক'রবে। তাই, কি করি, খানিকটা এগিয়েও আবার চ'লে গেলাম তোমার পাশ দিয়ে—লজ্জায়।"

তিরস্কারের সুরে ইলিয়া লুনেফ্ ব'ললো:

"মস্তো কাজ ক'রেছিলে যা-হ'ক!"

"কিন্তু কি ক'রে জানবো বলো ব্যাপারটাকে তুমি কিভাবে নেবে? রোগটা যে খারাপ তা তো জানি! তাই ভাবলাম তোমার সংগে আর দেখা ক'রে দরকার নেই।' দু'হপ্তা হ'লো এখানে এসেছি। মনে শান্তি নেই, তার ওপর এতো যন্ত্রণা যে বলার নয়। ঘুরেই বেড়াও আর শুয়েই থাকো, ব্যাপারটা কিছুতেই ভোলা যায় না। বিশেষ ক'রে, রাত্তিরে মনে হয় কে যেন আমায় আগুনের তাপে ঝল্সাচ্ছে। তখন সময় আর কাটতেই চায় না কিছুতে। আবার এক এক সময়ে মনে হয় পাঁকের মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছি হু-হু ক'রে—নেহাতই অসহায়ভাবে। বড়ো কষ্ট, ইলিয়া, বড়ো কষ্ট!"

ফিশফিশ ক'রে কথাগুলো ব'লতে ব'লতে পলের মুখখানা কাঁপতে থাকে, আর ড্রেসিং গাউনেব কলারটা নিয়ে সে চটকাতে থাকে দু'হাত দিয়ে।

একটু পরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললো পল্:

"ভাগ্য যদি কারোর প্রতি বিরূপ হ'য়ে ওঠে, আর তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু ক'রে—তা'হলে অবস্থাটা কি রকম হয় জানো ইলিয়া? মনে হয় কে যেন বুকের ওপর অনবরত হাতুড়ি পিটছে।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো চিন্তিতভাবে:

"ভেরা এখন কোথায়?"

"যমই জানে," তিক্ত হাসি হেসে জবাব দিলো পল্ গ্রাৎচফ্।

"ও তোমায় দেখতে আসে না?

রাগে ফুলতে ফুলতে জবাব দেয় পল্:

"এসেছিলো একবার, ভাগিয়ে দিয়েছি। মাগীটাকে আর সহ্য ক'রতে পারি না আমি, দেখলে যেন সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়।"

পলের বিকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে ব'ললো ইলিয়া:

"যা ব'লছো তার কোনো মানেই হয় না। কথা যখন ব'লবে তখন একবার

নিজের দিকেও চেয়ে দেখো। তুমি তো রেগেই সারা, কিন্তু ভেরার দোষটা কোথায় শুনি ?"

উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় উত্তর দিলো পল্ :

"নয়তো আর কাকে দোষ দেবো ? বলো, কাকে ? সারা রাত শুয়ে শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি : আমার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেলো কেন ? ভেরাকে ভালবাসলাম ব'লে কি ?—হ্যাঁ, তাই। ভেরা ছিল আমার সবকিছু—একাধারে মা, বোন, বউ, বন্ধু—স-ম-স্ত কিছু। মানুষ মানুষকে ততোটা ভালবাসতে পারে না ইলিয়া, আমি যতোটা ভালোবাসতাম ভেরাকে। সে ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন কি আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা দিয়েও না !"

পলের চোখদুটো লাল হ'য়ে যায় এবং চোখের জলের দুটি বড়ো বড়ো ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে তার গালের ওপর। ড্রেসিং গাউনের আস্তিনটা দিয়ে অশ্রু মুছে, আরও আস্তে আস্তে ব'লতে থাকে পল্ :

"হাঁটতে হাঁটতে মানুষ পাথরে হোঁচট খায়। আমিও পথে যেতে যেতে একটা পাথরে হোঁচট খেয়েছিলাম। আর, সেই পাথরটা হ'লো—ঐ ভেরা !"

পলের চেয়ে ভেরার জন্যে বেশি দুঃখিত হ'য়ে ইলিয়া ব'ললো :

"তুমি অন্যায় কথা ব'লছো, পল্। তোমার আবার পথ কি ? কোনো পথই নেই তোমার। কেন ও-সব বড়ো বড়ো কথা ব'লছো ? তুমি মদ খেতে, খেয়ে প্রশংসাও ক'রতে, এমন কি বলতেও : 'বেড়ে মদ তো ?' তারপর খেতে খেতে যখন নেশায় বুঁদ হ'য়ে যেতে তখন দোষটা চাপাতে সেই মদেরই ঘাড়ে। ব'লতে : 'ইস্, মদটা শেষ পর্যন্ত আমাকে মাতাল ক'রে ছাড়লো।' এই তো তোমার স্বভাব ! ব'ললাম ব'লে রাগ ক'রো না পল্। কিন্তু এইবার ভেরার কথাটা একটু ভেবে দেখো। ভেরার কাছ থেকে তুমি যে-রোগটা পেয়েছো, সে-রোগটা ভেরাও পেয়েছে আর একজনের কাছ থেকে !"

"কিন্তু ওর মতো একটা মেয়ে কি না শেষে এই রোগ জোটালো !" ব'লে একটু থেমে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্ :

"তুমি কি ভেবেছো ওর জন্যে আমার দুঃখ হয় না ?"

"হয় বুঝি ? তা ভালো !"

"ওর ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়। তাছাড়া, আর কার ওপরই বা রাগ ক'রবো বলো? সেদিন ও আসতেই ওকে তাড়িয়ে দিলাম। যাবার সময় ও কেঁদে ফেললো। অমন ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওকে কাঁদতে দেখে আমার দুঃখ হ'লো খুবই, হয়তো আর একটু হ'লে আমিও কেঁদে ফেলতাম। কিন্তু ব'লবো কি, ইলিয়া, তখন আমার মনে হ'লো আমি যেন পাষাণ হ'য়ে গেছি। ও চলে যেতে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবলাম। কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক ক'রতে পারলাম না। কেবল রাগে বুকটা জ্বলে যেতে লাগলো। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানো?"

"কি?"

"মনে হয়, আমাদের মতো লোকের উপযুক্ত কোনো জীবনই নেই।"

অদ্ভুতভাবে একটু হেসে ধীরে ধীরে ব'ললো ইলিয়া লুনেফ্:

"নেই? কি জানি এ-সব ব্যাপারের কোনো কূল-কিনারাই পাই না আমি। শুধু মনে হয়, একটা শক্তি যেন পিষে দিচ্ছে সকলকে। জাকবের বাবার জন্যে জাকব শান্তি পাচ্ছে না, এক বেটা বুড়োর সংগে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে মাশার, তার ওপর কে-ই বা জানতো যে তোমাকেও এখানে আসতে হবে?"

এই ব'লে হঠাৎ আর একটু জোরে হেসে চাপা গলায় ব'ললো সে:

"দেখছি, তোমাদের মধ্যে আমার বরাতটাই যা একটু ভালো! ব'লতে কি, একবার যদি ভাবি এ-জিনিষটা আমার চাই, তাহ'লে তা পেয়েও যাই।"

কথাটা বিশ্বাস ক'রতে না পেরে কৌতূহল-ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্:

"সত্যি? এও কি সম্ভব।"

"যা ব'ললাম বিশ্বাস করো, পল্! ভাগ্য আমার দিকে। সে যেন আমাকে কেবলই এগিয়ে নিয়ে চ'লেছে।"

আড়চোখে ইলিয়ার দিকে চেয়ে পল্ ব'ললো:

"আচ্ছা যা-তা ব'কছো যা হ'ক! নিজেকে নিজেই ঠাট্টা ক'রছো না কি?"

বিষণ্ণভাবে ভ্রূ কুঁচকে ইলিয়া জবাব দিলো:

"তা হয়তো নয়, তবে একজন ঠাট্টা ক'রছে ঠিকই! তার স্বভাবই হ'লো ঠাট্টা করা; তাই সকলকেই সে ঠাট্টা ক'রছে অনবরত। তোমাকে অনেক

কথাই ব'লতে পারতাম পল্। জীবনটাকে দেখতে দেখতে আজকাল মনে হয়—সুবিচার ব'লতে কিছু নেই।"

কায়মনোবাক্যে সায় দিয়ে আস্তে আস্তে পল্ ব'ললো:

"আমারও ঠিক তা-ই মনে হয়। চলো, ঐ কোণটায় গিয়ে দাঁড়াই।"

পরস্পরের চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে ওরা বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে। পলের চোখদুটো হঠাৎ যেন চকচক ক'রে ওঠে—অসুখ হবার আগে যেভাবে চকচক ক'রতো ঠিক সেইভাবে, সেই সংগে তার গালদুখানায় ফুটে ওঠে খানিকটা লাল্‌চে আভা।

ইলিয়ার কানে কানে ব'ললো পল্:

"তাছাড়া আমার ধারণা, আমাদের মতো লোককে কেবলই সর্বস্বান্ত করা হ'চ্ছে। শুধু তাই নয়। কোনো জিনিষের জন্যে হাত বাড়িয়েছি কি সেটাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে সংগে সংগে। তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"অর্থাৎ, আমাদের বরাতে জোটে না কিছুই! ধরো—আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি, আর তাকে বিয়ে না ক'রলেও, ধরো—সে আমার বউয়েরই মতো। আমি তাকে পুরোপুরি পেতে চাই। পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে তো পুরোপুরি পেতে চাইবেই! কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই একান্ত ক'রে পাই না। আর সেও আমায় পুরোপুরি পায় না। অথচ, আমাকেও তার পুরোপুরি পাওয়া দরকার। কেন এমন হয়? লোকে ব'লবে আমি গরিব, তাই। আচ্ছা বেশ! কিন্তু আমি কি খাটি না? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো পয়সা রোজগারের চেষ্টা কি আমি করি না? সারা জীবনই তো বেদম খাটছি—সেই দশ বছর বয়স থেকে! এর বদলে আমি চাই আমাকেও বাঁচতে দেওয়া হ'ক।"

পল্ থামতে পলের বক্তব্যটাকে ইলিয়া এইভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ করে:

"আর এদিকে পেত্রুহা ফিলিমনফ্, কুটোটি না নেড়েই আরামসে দিন কাটাচ্ছে, যখন যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে, যা খুশি তাই ক'রছে—কিন্তু কেন, কেন?"

পল্ গ্রাৎচক্ ব'লতে লাগলো :

"এখানকার ডাক্তারটা আমায় এমন গালমন্দ করে যেন আমি একটা আসামী। কিন্তু আমি কী ক'রেছি যার জন্যে এতো মুখ-ঝামটা? ডাক্তার হ'ক সে একটা শিক্ষিত লোক। তার উচিত প্রত্যেকের সংগেই ভদ্র ব্যবহার করা। তাছাড়া, আরও একটা কথা আছে : আমি কি মানুষ নই? ভেরাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে আমি বেকুব নই। আমি জানি ওর কোনো দোষ নেই।"

"আসলে লাঠি তো মারে না। মারে, যার হাতে লাঠি সে ই।"

বারান্দার এক অন্ধকার কোণে, হ'লদে রঙের শার্শি-দেওয়া একটা জানলার কাছাকাছি, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওরা এইভাবে উত্তেজিত হ'য়ে কথাবার্তা ব'লতে থাকে। খানিক দূর থেকে ভেসে আসে একটা গোঙানির শব্দ—থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে। বড়ো বিষণ্ণ আর করুণ সেই শব্দটা। মনে হয়, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,—সে যেন জানে তার ব্যথা কেউ বুঝবে না, তার যন্ত্রণা সইতে হবে তাকেই,—একান্ত ক'রে তাকেই, এ-দুনিয়ায় দরদী লোকের সংখ্যা বড়ো কম কি না, তাই। এদিকে পল্‌ও যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে থাকে। জীবনের কাছ থেকে সে যে খুব বড়ো রকমের একটা আঘাত পেয়েছে এটা সে বোঝে এবং বোঝে ব'লেই তার মনটা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে। নানান কথার ফাঁকে পল্ উত্তেজিতভাবে নালিশ জানাতে থাকে—কখনো সংলগ্ন কখনো অসংলগ্নভাবে—কখনো ঝড়ের মতো কখনো ফিশফিশ ক'রে। আর, এদিকে পলের কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়ার বুকে আগুন জ্বলে উঠে। ওর মনে হয়, এতোদিন ধ'রে যে-চিন্তাটা ওকে বিভ্রান্ত ও বিহ্বল ক'রে এসেছে, যে-চিন্তাটা ওর হাড়ে-মাসে, রক্তের কণায় কণায় ছড়িয়ে এসেছে অসহ্য যন্ত্রণার বিষ, সেই চিন্তাটা এবার বুঝি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে এ-আগুনে, মনের সকল অন্ধকার যাবে ঘুচে, আর তার বদলে ও ফিরে পাবে স্বস্তি—হয়তো বা শান্তিও।

ইলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে ব'লতে থাকে পল্ :

"যথেষ্ট খেতে পেলে মানুষ পাপ করে না কেন? শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে মানুষ ভুলই বা করে না কেন?—ধ'রে নিলাম আমি ক্ষুধার্ত এবং আমার শিক্ষা-দীক্ষাও নেই। কিন্তু আমার আত্মা তো আছে! না কি ক্ষুধার্ত মানুষের

আত্মাও থাকতে নেই? বুঝলে ইলিয়া, অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম আমার বরাতে শান্তি নেই, সত্যিকারের জীবন যেন আমার নাগালের বাইরে। তাছাড়া, আমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরাট প্রাচীর গজিয়ে উঠেছে। এমনটা কেন হয় বলো তো?"

গম্ভীরভাবে ইলিয়া বললো:

"তা কেউই ব'লতে পারে না! তাছাড়া জিজ্ঞেসই বা ক'রবো কাকে? কে আমাদের বুঝবে? আমাদের খবরই বা রাখে কে?"

"তা সত্যি। কাকেই বা জিজ্ঞেস ক'রবো?"

এই ব'লে পল্ থামতেই, বারান্দার মেঝের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে ইলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে ওরা।

আর, সেই গোঙানির শব্দটা এখন আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, একখানা মজবুত বুক যেন ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে।

পল্ জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে:

"ওলিম্পিয়াদার খবর কি? তোমাকে নিয়েই আছে তো এখনো?"

ইলিয়া জবাব দিলো:

"হ্যাঁ। এখনো আমি ওর সংগেই আছি।"

তারপর, অদ্ভুতভাবে একটু হেসে চাপা গলায় আবার বললো ইলিয়া:

"জানো, দিনরাত প'ড়ে প'ড়ে জাকব আজকাল ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ ক'রতে শুরু ক'রেছে!"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি-র ভংগিতে জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্:

"তাও কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ। কোত্থেকে যেন এ-ধরণের একখানা বই যোগাড় ক'রেছে ও। এসম্বন্ধে তোমার মত কি?"

আস্তে আস্তে, চিন্তিতভাবে ব'ললো পল্:

"আমি—মানে—আমি এ-সব ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ভাবি নি এখনো। তবে, গির্জেতে যাই না।"

"কিন্তু, আমি ভাবি। অনেক কিছুই ভাবি, পল্। বুঝতে পারি না ঈশ্বর কি ক'রে এ-সব সহ্য করেন।"

তারপর আবার ওদের কথাবার্তা শুরু হয় নতুন ক'রে, খেয়ালই থাকে না হাসপাতালের দারোয়ানটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে।

লোকটা কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে :

"এখানে লুকিয়ে আছো কেন, অ্যাঁ ?"

ইলিয়া ব'ললো :

"আমি তো লুকিয়ে নেই।"

"দেখছো না সমস্ত ভিজিটর্ চ'লে গেছে ?"

"না, দেখি নি। আচ্ছা, পল্, যাই এবার। জাকবের সংগে দেখা ক'রো।"

দারোয়ানটা চেঁচিয়ে ব'ললো :

"হ'য়েছে, হ'য়েছে, এবার স'রে পড়ো!"

পল্ গ্রাংচফ্ ব'ললো :

"আবার এসো ইলিয়া—যতো শিগ্গির পারো।"

দারোয়ানটি আবার ব'ললো ইলিয়াকে :

"ব'ললাম না তোমাকে এখুনি চ'লে যেতে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মস্করা হ'চ্ছে বুঝি ?"

তারপর ইলিয়ার পিছনে যেতে যেতে ব'লতে লাগলো লোকটা :

"যতো সব ভ্যাগাবণ্ডের দল—কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে!"

দারোয়ানটা ওর পাশে এসে প'ড়তেই ইলিয়া দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ব'ললো :

"চেঁচিও না, বুঝলে? দেখে তো মনে হ'চ্ছে ছিলে একটা তালপাতার সেপাই। আবার কথা? চুপ করো, নইলে ব'লবো : 'চোপ্‌রাও কুত্তা!"

দারোয়ানটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়তেই ইলিয়া হনহন ক'রে চ'লে গেলো সেখান থেকে এবং যেতে যেতে এই ভেবে খুশি হ'লো যে একটা মানুষকে সে ক'ড়কে দিতে পেরেছে!

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়া ওর বন্ধুদের ভাগ্য নিয়ে মনে মনে আলোচনা ক'রতে থাকে। পল্ কী না ক'রেছে—ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে

বেড়িয়েছে, জেলে গেছে, সেই ছেলেবেলা থেকে খাটছেও হরদম, তার ওপর কতো শীতেই না কষ্ট পেয়েছে, কতো ক্ষুধাই না হজম ক'রতে হ'য়েছে তাকে, এ-ছাড়া মারধোর তো সইতে হ'য়েছেই উঠতে ব'সতে, তারপর এখন আবার এসে ঢুকেছে এই হাসপাতালে। আর, মাশা? সে হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবে না সুখের জীবন কাকে বলে। এদিকে শান্তি পাবে না জাকবও। ছেলেটা কি ক'রে যে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কে জানে!

ভেবে ভেবে ইলিয়া এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় যে, ওদের চারজনের মধ্যে ওর জীবনটাই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু তাহ'লেও, এতে তেমন খুশি হ'তে পারে না ও, যেতে যেতে কেবল হাসে একটু-আধটু আর এদিক-ওদিক তাকায় সন্দিগ্ধভাবে

২৭

নতুন বাসায় উঠে আসার পর থেকে বেশ আরামেই দিন কাটতে লাগলো ইলিয়ার। বিশেষ ক'রে ওর বাড়িওয়ালা এবং তার গিন্নী সম্পর্কে ওর কৌতূহলটা হ'লো প্রবল। গিন্নীটির নাম তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না। ভারি ফূর্তিবাজ মেয়ে সে, যেন ময়না পাখিটি, কথা লেগেই আছে মুখে। ব'লতে কি, ইলিয়া যে-রবিবার উঠে এলো এখানে, তার পরের বৃহস্পতিবারেই তাতিয়ানা তার জীবনের সমস্ত কাহিনীটাই শুনিয়ে দিলো ইলিয়াকে—সবিস্তারে।

সকালে ইলিয়া যখন নিজের ঘরে ব'সে চা খায়, তখন গায়ে অ্যাপ্রন্ চড়িয়ে ব্লাউজের আস্তিনদুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে তাতিয়ানা রান্নাঘরময় টুকটুক্ ক'রে ঘুরে বেড়ায় এবং একটি একটি ক'রে সংসারের কাজকর্ম সারে; তাছাড়া, সময় পেলেই ইলিয়ার দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথাবার্তাও চালায় তার সংগে।

একদিন সে ব'ললো ইলিযাকে:

"আমরা বড়োলোক নই বটে, তবে শিক্ষিত, যাকে বলে কল্‌চার্ড্ আমরা হ'লাম সেই শ্রেণীর লোক। আমি নিজেও ইস্কুলে প'ড়েছি, আমার স্বামীও মিলিটারী ইস্কুলে প'ড়েছেন, তবে সেখানকার কোর্স্‌টা উনি পুরো করেন নি। বড়োলোক না হ'লেও আমরা বড়োলোক হ'তে চাই এবং হবোও একদিন। এদিকে ঝামেলাও নেই বিশেষ কিছু। নিজেদের ছেলেপিলে না থাকায় সুবিধেই হ'য়েছে। নইলে গুচ্ছেরখানেক খরচ হ'য়ে যেতো তাদের পেছনে। আমি নিজেই রাঁধি-বাড়ি, নিজেই বাজার করি, অবিশ্যি ধোয়া মোছার কাজের জন্যে একটা মেয়েকে রাখতেই হয়েছে তিন টাকা মাইনেতে, তবে তার সংগে কথা আছে সে আমার বাড়িতেই থাকবে। জানেন, এভাবে আমি কতো টাকা বাঁচাই?"

এই ব'লে দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যয়-লাঘবের পরিমাণটা সে আঙুলে গুনে গুনে দেখাতে থাকে:

"একটা রাঁধুনীর মাইনে কম-সে-কম পাঁচ টাকা, তার ওপর তার খোরাকি

আছে—সেও ধরুন গোটা দশেক টাকা—তাহ'লে দাঁড়ালো গিয়ে পনেরো টাকা! এছাড়া জানা কথা, মাসে অন্তত পাঁচটি টাকা সে চুরি ক'রবেই—অর্থাৎ সেটা নিয়ে হ'লো কুড়ি টাকা! তারপর, তার ঘরখানা আপনাকে ভাড়া দিয়েছি—তাহ'লে কতো হ'লো?—মোটমাট আটাশ টাকা। বুঝুন তাহ'লে একটা রাঁধুনী রাখার খরচ কতো! এছাড়া, আমি যা-ই কিনি না কেন কিনি একেবারে বেশি ক'রেই। যেমন ধরুন: মাখনটা কিনি একসংগে দশ সের, ময়দা—এক বস্তা, চিনি—পাঁচ সের, এই রকম আর কি! তাতে আমার সাশ্রয় হয় প্রায় আঠারো থেকে বিশ টাকা! আমি যদি পুলিশে কিংবা টেলিগ্রাফ অফিসে কোনো কাজ নিতাম, তাহ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াতো কি? আসলে একটা রাঁধুনীকে রাখবার জন্যেই আমাকে খাটতে হতো। তাই না? কিন্তু সংসারের যাবতীয় কাজ আমি নিজেই করি ব'লে আমার জন্যে আমার স্বামীকে এক পয়সাও খরচ ক'রতে হয় না, আর এজন্যে আমার গর্বেরও সীমা নেই! বাঁচতে হ'লে এইভাবেই বাঁচা উচিত, বুঝলেন মশাই? আমার কাছে শিখুন কি ক'রে বাঁচতে হয়!"

এই ব'লে তার চঞ্চল চোখদুটিকে সে তুলে ধরে ইলিয়ার মুখের পানে, আর ইলিয়া অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে। মেয়েটিকে ভালো লাগে ওর, তাছাড়া কেমন একটা শ্রদ্ধাও জাগে তার প্রতি।

ইলিয়ার ঘুম ভাঙবার আগেই ভোর থাকতে উঠে তাতিয়ানা বাচ্চা ঝিটাকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের কাজকর্ম শুরু ক'রে দেয়। কাজও অনেক: মাজা-ঘষা আছে, সাজানো-গোছানো আছে, উনুনে আগুন দিয়ে চায়ের কেৎলি বসানো আছে, তাছাড়া আরও কতো কি যে আছে তা কেবল জানে তাতিয়ানাই। এদিকে মনিবনীর সংগে রোগামতো ঝিটাও মুখ বুঁজে সমানে খাটতে থাকে: হুকুম-মতো এটা-ওটা এনে দেয়, জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখে, তাছাড়া নোংরা কাপ-ডিশ ধোয়া কিংবা টেবিল চেয়ার মোছা তো আছেই। ঝিটার বয়স কতো বলা মুশকিল—হয় চোদ্দো নয়তো আঠারো—বলা যায় না উনিশও হ'তে পারে, তবে তাকে দেখলে মনে হয় বাড়তে বাড়তে সে যেন হঠাৎ থ'মকে দাঁড়িয়ে গেছে। মুখখানা তার ফুট-ফুট দাগে ভর্তি, চোখ দুটো হ'লদে, তার ওপর শিরদাঁড়াটা আবার বেশ একটু বাঁকা। কাজ ক'রতে ক'রতে ঝিটা

কখনো তার মনিবনীর দিকে চায় কখনো-বা ঘরের জিনিষপত্রের দিকে, কিন্তু সে-চাহনিতে না আছে তেজ না আছে কৌতূহল।

সন্ধ্যাবেলা ইলিয়া যখন বাড়ি ফেরে, তাতিয়ানা দরজা খুলে দেয় মুচকি হেসে। সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে সে, তাছাড়া কোনো না কোনো আতরের মিষ্টি গন্ধ লেগেই থাকে তার গায়ে। স্বামী বাড়ি থাকলে, তার গীটার-বাজ্‌নার তালে তালে তাতিয়ানা গলা ছেড়ে গান গায়, কিংবা দুটিতে ব'সে 'গোলাম-চোর' খেলার ছুতো ক'রে এ ওকে চুমু খায় একটার পর একটা। নিজের ঘরে ব'সে ইলিয়া সব কিছুই শুনতে পায়—তাসের খশ্‌খশ্‌ আওয়াজ থেকে শুরু ক'রে চুমুর শব্দগুলো পর্যন্ত। তাছাড়া শোনে, গীটারটা কখনো বাজছে খুশির আমেজে, কখনো-বা বিষণ্ণ সুরে। তাতিয়ানাদের ঘর দুখানা। একখানাতে তারা শোয়, অন্যখানায় দুবেলার খাওয়া-দাওয়া সারে, ব'সে গল্পগুজবও করে। আসলে, সন্ধ্যাটা তারা কাটায় এই ঘরেই। ভোর হ'লেই নানা পাখির কলরবে মুখর হ'য়ে ওঠে এই ঘরখানা। একটা টম্‌টিট্‌ কিচ্‌মিচ্‌ ক'রে উঠতেই গ্রীন্‌ফিঞ্চ্‌ আর গোল্ড্‌ফিঞ্চের মধ্যে লেগে যায় গানের মল্লযুদ্ধ; শুনে মনে হয় ওরা প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রছে কে কতো বড়ো কালোয়াত। একটু পরে বুল্‌ফিঞ্চ্‌ও ভারিক্কে গলায় ধ্রুপদের আলাপ শুরু ক'রে দেয়, আর মাঝে মাঝে একটা লিনেটের কোমল কণ্ঠ নিঃসঙ্গ খেয়ার মতো বিষণ্ণভাবে কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই উত্তাল সুর-সিন্ধুতে।

তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌নার স্বামী কিরিক্‌ নিকদিমিচ্‌ আভ্‌তনমফের বয়স প্রায় ছাব্বিশ। মানুষটি ঢ্যাঙা, নাদুসনুদুস। নাকটা তার বড়োই, দাঁতগুলো কালো-কালো, সাদামাটা মুখখানা ব্রণতে ভর্তি, মাথার বাদামী রঙের চুলগুলো খোঁচা-খোঁচা—খাটো ক'রে কাটা, সর্বোপরি তার নিষ্প্রভ চোখদুটো আশ্চর্য রকমের শান্ত। কিরিকের চেহারাটা দেখলে হাসি পায়। তার হাঁটবার ভংগীটাও কিছু অদ্ভুত—হাঁটলে ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ হয়। ইলিয়ার সংগে যেদিন তার প্রথম দেখা হ'লো সেইদিনই সে প্রশ্ন ক'রে ব'সলো:

"পাখি ভালোবাসেন?"

"তা বাসি।"

"পাখির গান কেমন লাগে আপনার?"

"ভালোই লাগে।"

"পাখি ধরেন ?"

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিলো ইলিয়া :

"না।"

কিরিক্ তখন নাক সিট্‌কে, এক মুহূর্ত কী ভেবে, আবার জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"জীবনে কখনো পাখি ধরেন নি ?"

"না।"

"কখনো না ?"

"না। কখনো না।"

তখন একটু মুরুব্বীর হাসি হেসে ব'ললো কিরিক্ আভ্‌তনমফ্ :

"তার মানে আপনি পাখি ভালোবাসেন না। পাখি যারা ভালোবাসে, পাখি ধরেও তারা। আমি হ'লাম চিড়িয়া-খোর, বুঝলেন ? ভালোওবাসি, ধরিও। ব'লতে কি, এই পাখি ধরার জন্যেই মিলিটারী ইস্কুল থেকে আমায় তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিলো। এখনো সাধ যায় ধ'রতে, কিন্তু ক'রবো কি, ওপর-ওলাদের সামনে তো আর নিজেকে ছোটো ক'রতে পারি না, তাই ধরি না। যে-পাখি গান গায় তাকে ধরা ভারি মজার, কিন্তু হ'লে হবে কি, পাখি ধরার ব্যাপারটা সম্ভ্রান্ত মানুষজনের পক্ষে একেবারেই বেমানান। আমি যদি আপনার মতো কেউ হ'তাম তাহ'লে এখনো এন্তার পাখি ধ'রতাম—বিশেষ ক'রে খুদে গোল্ড্‌ফিঞ্চ্‌গুলোকে। ভারি ফূর্তিবাজ এই পাখিগুলো। কথায় বলে, গোল্ড্‌ফিঞ্চ্ হ'লো নন্দনকাননের পাখি।"

ইলিয়ার মুখের পানে কেমন একটা উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আভ্‌তনমফ্ কথা ব'লতে থাকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে অস্বস্তি বোধ করে ইলিয়া। ওর মনে হয়, পাখি ধরার নাম ক'রে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরটি ঘুরিয়ে ওকে অন্য কথা ব'লছে। বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ছাঁৎ ক'রে ওঠে ইলিয়ার, কানদুটো আপনা-আপনি খাড়া হ'য়ে যায়। কিন্তু আভ্‌তনমফের শান্ত নিষ্প্রভ চোখদুটোর দিকে তাকাতেই ওর আতংকের ভাবটা মিলিয়ে যায় এবং হঠাৎ ও এই সিদ্ধান্ত ক'রে বসে যে, চালাক-চতুর হওয়া তো দূরের কথা, আভ্‌তনমফ্ একটা পয়লা নম্বরের হাঁদা। কিরিকের কথাগুলো ও চুপচাপ শোনে, একটু-

আধটু মুচকি হাসে, এবং মাঝে মাঝে জবাব্ দেয় অত্যন্ত ভদ্রভাবে। ইলিয়ার গাম্ভীর্য এবং ভদ্রতা দেখে কিরিক্ কৃতার্থ হ'য়ে যায়।

দু-চার কথার পর হাসতে হাসতে কিরিক্ ব'ললো ইলিয়াকে :

"কোনো সন্ধ্যায় চ'লে আসুন না আমাদের ঘরে, এক সংগে ব'সে চা খাওয়া যাবে'খন। সটান চ'লে আসবেন, অতো কেতা-ফেতার ধার ধারি না আমরা। দু-চার হাত 'গোলাম-চোর'ও খেলা যাবে সেই সংগে। আমরা কারোর সংগেই বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ করি না। লোকজনকে নেমন্তন্ন ক'রতে ভালো লাগে অবিশ্যি, তবে আসতে ব'ললেই কিছু না কিছু খাওয়াতে হবে তো, তাই— বুঝতেই তো পারছেন—নেমন্তন্ন করা মানেই কিছু টাকা খসানো।"

কিরিক্ আভ্‌তনমফের জীবনটা যে সুখের এতে খুশি হয় ইলিয়া। ফলে, আভ্‌তনমফ্-দম্পতিকে ক্রমশই ভালো লাগতে থাকে তার। তাতিয়ানাদের ঘরদোর ঝকঝকে তকতকে, কাজকর্ম নিখুঁত পরিপাটী, কোথাও এতোটুকু হৈ চৈ নেই, কলহ নেই, উপরন্তু আভ্‌তনমফ্‌রা পরস্পর পরস্পরকে ভালোও বাসে তেমনি। তাতিয়ানাকে দেখে মনে হয় সে যেন ফুটফুটে ফূর্তিবাজ টম্‌টিটুটি। অন্যদিকে তার স্বামীটা যেন সৃষ্টিছাড়া বুল্‌ফিঞ্চ্। দুটিতে মানিয়েছে বেশ। তাদের বাসাটিও পাখির নীড়ের মতো।

এক সন্ধ্যায় ঘরে ব'সে আভ্‌তনমফ্‌দের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ইলিয়া ভাবলো :

"হ্যাঁ, বাঁচতে হ'লে এইভাবেই বাঁচা উচিত।"

ওদের এতো সুখ দেখে হিংসা হয় ইলিয়ার—হয় বৈ কি! সেই সংগে ভাবে, কবে সেদিন আসবে যেদিন ওর নিজের একখানি দোকান হবে—ছোটো টুকটুকে একটি বাসা হবে—পাখি পুষবে সেও— একলাটি থাকবে সুখে শান্তিতে —একান্ত নিরিবিলি হবে তার জীবন, ঘুমের মতোই নরম একটি জীবন—কবে সেদিন আসবে? ইলিয়া এই সব ভাবে, আর মাঝে মাঝে হিংসায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। শুনতে পায় দেয়ালের ওপাশে ত্যাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না তার স্বামীকে ব'লছে কী কী সে কিনেছে, খরচ ক'রেছে কতো এবং বাঁচিয়েছেই বা কতো :

"শুনলে তো, আমি ব'লেই তোমার অতোগুলো টাকা বাঁচাতে পেরেছি, নইলে—"

শুনে, তাঁর স্বামী হাসতে হাসতে বলে :

"ওরে দুষ্টু মেয়ে, এতো চালাক তুমি! সাধে কি আর বলি তাতু আমার ময়না! এসো, এদিকে এসো, একটা চুমি খাই।"

এর পরই কিরিক্ স্ত্রীকে যতো রাজ্যের খবরাখবর শোনাতে থাকে : শহরে কী কী ঘ'টেছে, কতোগুলো রিপোর্ট লিখেছে সে, দারোগা কিংবা কোন্ ডেপুটিবাবু তাকে কী ব'লেছে—এই ধরণের নানান্ কথা। কিরিকের যে খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রোমোশন্ হ'তে পারে এ-নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা চলে :

"হ্যাঁ গা, যা ব'ললে সত্যি?"

"শুনছিলাম তো সেই রকম।"

"ভালো ক'রে খবর নাও। বুঝলে?"

"তা তো নেবো। কিন্তু প্রোমোশন্ হ'লে এ-বাসায় তো আর থাকা চ'লবে না! তখন এর চেয়েও একটা ভালো বাড়ি চাই!"

"সে তো ঠিকই। তার জন্যে ভেবো না।·····আচ্ছা, ডেপুটিবাবু তোমায় কি ব'ললেন?—"

শুয়ে শুয়ে ইলিয়া এই সব শোনে আর শুনতে শুনতে ওর বুকটা দুঃখে তোলপাড় ক'রে ওঠে। মনে হয় একটা বিরাট বোঝা যেন চেপে ব'সছে ওর বুকে। তখন দম নিতে কষ্ট হয় ওর। চারিদিকে ও তাকায় যন্ত্রণায় ছটফট ক'রতে ক'রতে। মনে হয়, দুঃখের কারণটা ও যেন এলোপাতাড়ি খুঁজছে। অবশেষে যন্ত্রণা সইতে না পেরে ও চলে যায় ওলিম্‌পিয়াদার কাছে, আর নয়-তো ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ধ'রে।

এদিকে ওলিম্‌পিয়াদা আর সে-ওলিম্‌পিয়াদাটি নেই। আজকাল সে কথায় কথায় জোর-জবরদস্তি করে, তাছাড়া কেমন যেন হিংসুটেও হ'য়ে উঠেছে সে। তাই ইলিয়ার সংগে তার হামেশাই ঝগড়া হয় আজকাল। ওলিম্‌পিয়াদার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, চোখদুটো গেছে ব'সে, হাত দুখানা রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে, দেখে মনে হয় কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে সে। ব্যাপারটা ভালো লাগে না ইলিয়ার। কিন্তু এ-ছাড়া ওলিম্‌পিয়াদার চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে সম্প্রতি। সে আজকাল প্রায়ই খিঁচে,

ভগবান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু ক'রে দেয়। মাঝে মাঝে বলে:

"ভাবছি কোনো মঠে চ'লে যাবো।"

এতে আরও চ'টে যায় ইলিয়া। ওলিম্পিয়াদার এ-সব কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না সে। কারণ ও জানে ওলিম্পিয়াদার মতো মেয়েমানুষ বেটা-ছেলে বিনা বাঁচতেই পারে না।

একদিন কথায় কথায় ইলিয়া বাঁকা হাসি হেসে ব'ললো ওলিম্পিয়াদাকে:

"যাই হ'ক, আমার জন্যে তুমি যেন আবার প্রার্থনা-টার্থনা ক'রো না! আমাব পাপের ব্যাপার আমি বুঝবো।"

বিষণ্ণ এবং ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ইলিয়ার দিকে চেয়ে ওলিম্পিয়াদা ব'ললো:

"সাবধান ইলিয়া, এ-সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করা উচিত নয়।"

"আমারও তাই মত।"

"আমাকে বিশ্বাস করো না বুঝি? সবুর করো—দিনকতক পরেই ক'রবে।"

"না, না, তা কেন? কেউ কেউ যে মরিয়া হ'য়ে মঠে ঢোকে তা আমি বিশ্বাস করি। এদের মূলধন হ'লো ঘেন্না আর প্রতিহিংসাপরায়ণতা।"

ইলিয়াব কথায় ওলিম্পিয়াদা গেলো চ'টে। তারপর শুরু হ'লো বিশ্রী কথা-কাটাকাটি।

চোখ পাকিয়ে চীৎকার ক'রে ব'ললো ওলিমপিয়াদা:

"তোমার বড়ো বাড বেড়েছে, বুঝলে? ধরাকে যেন তুমি সরা জ্ঞান করো! র'সো, আরও দিনকতক যাক্, তারপর তোমার ঐ উঁচু মাথা নিচু না হয় তো কী ব'লেছি। তখন তোমার ঐ মুণ্ডু ধূলোয় লুটোবে। তাছাড়া তোমার অতো দেমাকই বা কিসের? চেহারাটার জন্যে তো? না কি ঐ যৌবনটার জন্যে? কিন্তু এ-সব কিছুই থাকবে না। একদিন সাপের মতো বুকে হাঁটবে, আর ভাববে কেউ যদি একটু আদর করে। ভিক্ষে চাইতে হবে সেদিন এক ফোঁটা করুণার জন্যে। কিন্তু সেদিন তোমায় করুণাও ক'রবে না কেউ!"

ওলিম্পিয়াদার চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, এখুনি বুঝি রক্ত ফেটে প'ড়বে। ঝগড়া করবার সময় ওলিম্পিয়াদা গলুএক-

তকের সেই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে একটি কথাও বলে না, কিন্তু মেজাজ ভালো থাকলে নাছোড়বান্দার মতো ইলিয়াকে তার বলা চাইই চাই :

"ইলুশা, ও-ব্যাপারটা ভুলে যাও, একেবারে ভুলে যাও !"

একদিন ঝগড়ার পর ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো ওলিম্‌পিয়াদাকে :

"আচ্ছা লিপা, রাগের সময় তুমি তো সেই বুড়োটার কথা বলো না ?"

সংগে সংগে জবাব দিলো ওলিম্‌পিয়াদা :

"বলি না, কারণ তার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তোমারও নেই আমারও নেই। পাপ ক'রলেই শাস্তি পেতে হয়। ও পাপ ক'রেছিলো তাই শাস্তিও পেয়েছে। এ-ক্ষেত্রে তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। শাস্তি যিনি দেন তিনি তোমার হাত দিয়েই ওকে শাস্তি দিয়েছেন। তুমি তো নিজেই ব'লেছো ওকে গলা টিপে মারবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তাহ'লেই বুঝতে পারছো আর কেউ তোমাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়ে নিয়েছে।"

কথাটা শুনে ইলিয়া হো-হো ক'রে হেসে উঠতেই ওলিম্‌পিয়াদা জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কি ব্যাপার ? হাসছো কেন ?"

"না, কিছু না। আমি শুধু ভাবছিলাম পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বোকা না হ'লেও পুরোপুরি রাস্কেল বটে। দরকার প'ড়লেই তারা সাফাই গায়, হ্যাঁ-কে না করে, না-কে হ্যাঁ করে, ভালোকে মন্দ করে, মন্দকে ভালো করে—এই আর কি ! হা-হা-হা !"

মাথা নেড়ে ব'ললো ওলিম্‌পিয়াদা :

"কি যে ব'লছো বুঝতে পারছি না।"

কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো ইলিয়া :

"কী বুঝতে পারছো না ? এ তো জলের মতো সোজা। যা ব'লতে চাই তা এই : এমন কোনো জিনিষের নাম ক'রতে পারো যার পরিবর্তন নেই ?—যা অচল, অটল ? করো দেখি এমন একটি জিনিষের নাম ? ক'রতে পারবে না। আসলে এ-রকমের কোনো জিনিষ পৃথিবীতেই নেই। চারধারে যা দেখছো সবই রঙের খেলা, অর্থাৎ দরকার মতো রং বদলাচ্ছে। মানুষের আত্মাটাও ঠিক এই রকম—দরকার প'ড়লেই রং পাল্টায়।—বুঝলে ?"

খানিক নীরব থেকে ওলিম্পিয়াদা ব'ললো :

"কৈ এখনো তো বুঝলাম না!"

"কিন্তু আমি বুঝি এবং জানি যে এই রঙের খেলার মধ্যেই যতো ধাঁধা—যতো কারসাজি। আর, এর জন্যেই আমাদের এতো দুর্গতি।"

এর পর আর একদিন ওলিম্পিয়াদার সংগে ইলিয়ার ঝগড়া হ'লো। রাগ ক'রে মেয়েটার কাছে সে গেলোই না দিন চারেক। পাঁচ দিনের দিন ইলিয়া একখানা চিঠি পেলো তার কাছ থেকে। ওলিম্পিয়াদা লিখেছে :

"বিদায়, ইলুশা, চিরবিদায়। আর কোনো দিন দেখা হবে না আমাদের মধ্যে। খোঁজবার চেষ্টা ক'রো না আমাকে। খুঁজে পাবেও না কখনো। এই অভিশপ্ত শহর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি আমি—যে-শহরে আমার বুক ভেঙে গেছে—চিরদিনের জন্যে ভেঙে গেছে। প্রথম যে-স্টীমারটা ছাড়বে তাতেই আমি চ'ড়ে ব'সবো। যাচ্ছি ফিরবো না ব'লেই, তাই আকাশ-পাতাল ভেবো না, প্রতীক্ষাও ক'রো না। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মাণিক। তোমার ভালোটুকু মনে রাখবো চিরদিন, মন্দটুকু ভুলে যাবো। এ-ছাড়া আর একটা কথা খোলাখুলি ব'লে যেতে চাই তোমাকে। হয়তো ভাবছো যে, স্রেফ খেয়ালের বশে যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকে চ'লেছি আমি। কিন্তু না, তা সত্যি নয়। আমার গন্তব্য আছে। তরুণ আনানিনের সংগে আমার পরিচয় নিবিড় হওয়ায়, ও আমায় বহুদিন ধ'রেই ব'লছে—পেড়াপীড়ি ক'রছে—যাতে আমি ওর সংগে গিয়ে থাকি। যদি না যাই তাহ'লে আমিই যে ওর ধ্বংসের কারণ হবো এমন কথা ও হাজারবার ব'লেছে আমায়। তাই রাজী হ'য়েছি।—আমার পক্ষে সবই সমান। এখান থেকে আমরা যাবো সমুদ্রের ধারে—একটি গ্রামে—সেখানে ওর মাছের কারবার আছে। আনানিনে মানুষটা সরল, এমন কি ও আমায় বিয়ে ক'রতেও রাজী আছে। আচ্ছা বেকুব যা হ'ক! চলি ইলুশা। বিদায়! মনে হ'চ্ছে তোমাকে যেন স্বপ্নে দেখেছিলাম। ঘুম ভাঙতেই সে-স্বপ্ন মিলিয়ে গেলো। আমাকে ক্ষমা ক'রো। ক'রবে তো? আমার মিনতি, ক'রো। যদি জানতে আমার বুকের মধ্যে এখন কী হ'চ্ছে! যন্ত্রণা, ইলুশা, যন্ত্রণা! আমার চুমু নিও। অনে—ক চুমু। মন খারাপ ক'রো না।

হতভাগ্য আমরা সকলেই। তোমার লিপার এখন আর সে-তেজ নেই। তার বুক জ্ব'লে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে, ইলুশা। ইতি।

"ওলিম্পিয়াদা শ্লীকফ্।

"পুঃ—পার্সেল ক'রে একটা আংটি পাঠালাম—স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।—দয়া ক'রে প'রো।—

"ওলিম্ শ্লী".

আঁকাবাঁকা ছাঁদে বড়ো বড়ো হরফে লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠিখানি প'ড়ে অবাক হ'য়ে গেলো ইলিয়া। চিঠিখানার বক্তব্য অতি সরল, অকপট আবেগের পরিচয় তার প্রতি ছত্রে। ওলিম্পিয়াদা যে তাকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসতো তা জানতো কে আগে। ওর ভালোবাসার গুরুত্ব নিয়ে সে তো ভাবেও নি এতোদিন! চিঠিখানি প'ড়ে আনন্দ হ'লো তার, গর্বে ভ'রে উঠলো তার মন। কিন্তু সেই সংগে একটা বিরাট বেদনাও অনুভব ক'রলো সে। চিঠিখানা বহুবার পড়বার পর ইলিয়া যখন বুঝলো যে বন্ধু ব'লতে আর কেউ রইলো না তার, তখন তার আনন্দটুকু মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। সত্যি, এবার দুঃখের দিনে কার কাছেই বা যাবে সে? তার মনে হ'লো, ওলিম্পিয়াদা যেন আজও দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, উচ্ছ্বসিত আদরে চুমুতে ভ'রে দিচ্ছে তার মুখখানা, হেসে হেসে কথা ব'লছে তার সংগে, সে-কথায় কখনো-বা বিদ্যুতের ঝিলিক কখনো-বা ঠাট্টার আমেজ। এই সব কথা মনে প'ড়তেই দুঃখে বেদনায় ইলিয়ার বুকখানা শূন্য প্রান্তরের মতো খাঁ-খাঁ ক'রে উঠলো।

ভ্রূ কুঁচকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে চাইতে সে দেখলো গোধূলির নরম আলোয় এলডার ঝোপগুলো ন'ড়ছে, বার্চ-গাছের সরু-সরু ডালগুলো দুলছে মৃদু মৃদু। দেয়ালের ওধার থেকে ভেসে এলো গীটারের বিষণ্ণ সুর। সেই সংগে শোনা গেলো তাতিয়ানা ভ্যাসিএফ্নার প্রাণখোলা গান:

"যার খুশি সে মরুক খুঁজে
লক্ষ টাকার হীরে·"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ইলিয়া ভাবতে থাকে:

"ওলিম্‌পিয়াদা ব'লেছিলো কারোর কাছেই সে হার মানবে না। ব'লেছিলো আমি তাকে সুখী ক'রেছি। কিন্তু তবুও—সে তো চ'লে গেলো! বুঝতে পারছি আমি তাকে বিশেষ সুখী ক'রতে পারি নি।"

ওলিম্‌পিয়াদার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হ'লো ইলিয়ার। বিষাদে, আত্ম-ধিক্কারে মোচড় দিয়ে উঠলো তার বুকখানা। মনে হ'লো তার মনটা যেন কেবলই কেঁদে কেঁদে উঠছে।

দেয়ালের ওপাশ থেকে আবার ভেসে এলো তাতিয়ানার গান :

"আমায় শুধু আংটিটা দাও
সাগর থেকে তুলে—"

তারপরই শোনা গেলো তার স্বামীর হো-হো হাসি এবং সংগে সংগে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে তাতিয়ানা দৌড়ে পালিয়ে গেলো রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু রান্নাঘরে গিয়েই সে থমকে দাঁড়ালো। ইলিয়া বুঝতে পারলো তার কাছাকাছি কোথাও র'য়েছে তাতিয়ানা; কিন্তু ঘরের দরজাটা খোলা থাকা সত্ত্বেও সে ফিরে তাকালো না মেয়েটির দিকে, তাকাবার ইচ্ছাও হ'লো না তার। ঠায় দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগলো নিজেরই কথা। মনে হ'লো একটা বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা যেন মেঘের মতো আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে তাকে।

বাইরে গাছের মাথাগুলো তখনো দুলছে। ঝিরঝিরে বাতাসে কেঁপে উঠছে এলোমেলো ঝোপঝাড়। ইলিয়ার মনে হ'লো ঘর থেকে উড়ে গিয়ে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সে যেন নিঃশব্দে ভেসে বেড়াচ্ছে গোধূলির ঠাণ্ডা আলোয়।

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"চা খাবেন ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌?"

"না।"

বিপুল শব্দে গির্জার ঘণ্টাটা বেজে ওঠে ঢংঢং ক'রে। হয়তো বা জানলার শার্শিগুলো কেঁপে ওঠে সেই শব্দে। ইলিয়ার মনে প'ড়লো অনেক দিন সে গির্জায় যায় নি। বাইরে বেরোবার একটা ছুতো পেয়ে খুশিই হ'লো সে।

দরজার দিকে ফিরে ইলিয়া ব'ললো :

"আমি গির্জায় যাবো এক্ষুণি। সান্ধ্য উপাসনা শুরু হবার আগেই সেখানে পৌছতে চাই।"

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ কৌতূহল নিয়ে তাতিয়ানা দেখতে থাকে ইলিয়াকে। তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে নেহাতই বিব্রত হ'য়ে প্রায় কৈফিয়ৎ দেবার ছলেই ব'লে ওঠে ইলিয়া :

"বহুদিন গির্জায় যাই নি।"

"বেশ তো, যান না! না হয় এসেই চা খাবেন। ফিরতে আর কতো হবে? ন'টার বেশি তো নয়।"

গির্জার দিকে যেতে যেতে ইলিয়া আনানিনের কথা ভাবতে থাকে। আনানিনে যুবক, তার ওপর সে একজন ধনী ব্যবসাদার। তাকে ও চেনে। 'আনানিনে অ্যাণ্ড্ ব্রাদার্স' নামে যে কারবার আছে সে হ'লো তার জুনিয়র পার্ট্নার। লোকটি ফর্শা, ছিপ্‌ছিপে। মুখখানা তার ফ্যাকাশে, চোখদুটি বেশ নীল। কিছুদিন আগে সে শহরে আসে এবং এসে প্রথম থেকেই মদ-মাগী নিয়ে দিন কাটাতে শুরু করে।

বড়ো দুঃখেই ভাবলো ইলিয়া :

"কথায় বলে : মারবি তো মার বাজপাখীর ছোঁ! আনানিনে তা-ই মারলো সত্যি। পালক গজাতে না গজাতে শিকার ক'রে ব'সলো কি না একটা আস্তো পায়রা!"

রাগে ফুলতে ফুলতে ইলিয়া গির্জায় এসে ঢুকলো। নানান্ দুশ্চিন্তায় ভ'রে আছে তার মন। মনে হ'চ্ছে, বুকের আগুন যেন নিবে গেছে একটা বিরাট ফুৎকারে। বেছে বেছে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়ালো সে। তার পাশেই দাঁড় করানো র'য়েছে একটা প্রকাণ্ড মই। এই মই দিয়ে উঠে গির্জার ঝাড়লণ্ঠনগুলো জ্বালানো হয়।

চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ইলিয়া শুনলো, তখন 'হে ভগবান দয়া করো, দয়া করো আমাদের' গানটি গাওয়া হ'চ্ছে। ওর মনে হ'লো, থেকে থেকে কে যেন বেসুরো গাইছে। একটু মন দিয়ে শুনতেই বুঝতে পারলো বেসুরো গাইছে একটা ছেলে। মূল গায়কের ভারী গলার সংগে সে যেন কিছুতেই তার গলাটা মেলাতে

পারছে না। বেসুরো গান শুনে ইলিয়ার মেজাজটা আরও খারাপ হ'য়ে গেলো। তার ইচ্ছা হ'লো ছুটে গিয়ে সেই ছেলেটার কান দুটো মলে দিয়ে আসে। নিরিবিলি কোণটা বেশ আরামের, কাছেই একটা মশাল জ্ব'লছে। ইলিয়া সবে মইটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দামী গাউন-পরা একটা বুড়ি এসে তার মুখের দিকে চেয়ে খিঁচিয়ে উঠলো :

"শুনছেন? এখানে তো আপনার দাঁড়াবার কথা নয়! আপনি বোধ হয় ভুল ক'রে এখানে এসে প'ড়েছেন।"

বাহারী গাউনটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইলিয়া স'রে দাঁড়ালো এক পাশে। মনে মনে ব'ললো :

"গির্জাতেও ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ!"

পলুএক্তফের খুনের ব্যাপারটার পর সে যে এই প্রথম আবার গির্জায় পা দিলো, এই কথাটা ভাবতেই ইলিয়া শিউরে উঠলো। সংগে সংগে নিজের পাপের কথা স্মরণ ক'রে আর-সব-কিছুই ভুলে গেলো সে। ভয় পেলো না বটে, তবে বিষাদে এবং আত্মগ্লানিতে ভ'রে গেলো তার মন।

ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে অস্ফুট স্বরে ব'ললো ইলিয়া :

"প্রভু, দয়া করো আমাকে।"

গানের পর্দা তখন ক্রমশ চ'ড়ছে। সুরেলা শব্দগুলো পাখির গানের মতো ছড়িয়ে প'ড়ছে প্রকাণ্ড গম্বুজটার আনাচে-কানাচে। কখনো বা মনে হ'লো সুরের ফোয়ারা ছুটেছে, আবার কখনো বা মনে হ'লো ফুলের কুঁড়ির মতো শব্দগুলো ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। কে একজন অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠলো : 'ওগো বিপদ-বারণ, প্রেমময় ধন…।' তারপরই শোনা গেলো কিশোর কিশোরীদের সুললিত কণ্ঠ : 'ওগো সুন্দর নয়ন-মনোহর…।' এমন সময় ইলিয়ার দৃষ্টি প'ড়লো গম্বুজের গায়ে আঁকা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ছবিখানির দিকে। শ্বেত বসন তাঁর অঙ্গে, চোখে বিষণ্ণ-ব্যাকুল দৃষ্টি, দুখানি বাহু পাখির ডানার মতো প্রসারিত। মনে হ'লো, প্রার্থনারত জনমণ্ডলীর দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে, উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর লোকে প্রস্থান ক'রছেন তিনি; আর, গানের শব্দগুলো উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁর বরবপু। হঠাৎ সমস্ত কণ্ঠ মিশে গেলো একটি সুরের জ্যোতিতে। সে সুর যেন সূর্যাস্তের আলো।

গানের রেশটা মিলিয়ে যেতেই ইলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এখন সে সুখী। তার ভয় নেই, বিরক্তি নেই, অনুতাপ করবার ইচ্ছাও নেই এতোটুকু। এমন কি তার পাপের কথাটাও সে ভুলে গেলো এই সময়। গান যেন তার বুকের বোঝাটাকে হাল্কা ক'রে দিয়েছে, তার আত্মাটাকে ক'রেছে শুদ্ধ। অপ্রত্যাশিতভাবে এতোটা খুশি হ'য়ে ইলিয়া কেমন যেন ধাঁধায় প'ড়লো। নিজের মনটাকে নিজেই যেন বিশ্বাস ক'রতে পারলো না সে। কী আশ্চর্য, তার মনে কোনো অনুতাপ নেই? না, না, অনুতাপ থাকা দরকার! কিন্তু, কোথায় অনুতাপ? আশ্চর্য।

এমন সময় ইলিয়া হঠাৎ ভাবলো: "আচ্ছা, কৌতূহলের বশে তাতিয়ানা যদি এই সময় আমার ঘরে ঢুকে বাক্শো-পেঁটরা হাঁটকে সেই টাকাটার খোঁজ পায়, তা'হলে?"

সংগে সংগে ভিড় ঠেলে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলো ইলিয়া, তারপর একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে চ'ললো বাড়ির দিকে। সেই টাকার চিন্তাটা ওকে যেন পাগল ক'রে তুললো:

"টাকাটা যদি তাতিয়ানা পায়ও, তাতেই বা হ'য়েছে কি? ওরা নিশ্চয়ই আমাকে ধরিয়ে দেবে না, বড়ো জোর টাকা ক'টা আত্মসাৎ ক'রবে।"

কিন্তু ধরিয়ে না দিলেও ওরা টাকাটা আত্মসাৎ ক'রবে এই কথা ভাবতেই ইলিয়া আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। ভাবলো, তা-ই যদি ঘটে, তা'হলে এই গাড়িতে ক'রেই সে সোজা থানায় চ'লে যাবে এবং গিয়ে স্বীকার ক'রবে যে সে-ই পলুএক্তফ্‌কে খুন ক'রেছে।

নাঃ, এ-হয়রানি আর পোষাচ্ছে না তার। দুশ্চিন্তা, নোংরামি ও দারিদ্র্যের মধ্যে সে আর এক দণ্ডও থাকতে রাজী নয়। তাছাড়া, যে-টাকার জন্যে সে এতো বড়ো পাপ ক'রেছে সেই টাকা নিয়ে অপরে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবে —এ হ'তেই পারে না।

গাড়ি থেকে নেমেই ইলিয়া উন্মাদের মতো দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। একটু পরে দরজাটা খুলে দিলো তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না।

ভয়ে ভয়ে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললো তাতিয়ানা:

"বাব্বাঃ, কড়া নাড়ার কি বহর! ভাবলাম কড়াদুটো বুঝি খুলেই গেলো। হ'য়েছে কি আপনার?"

কোনো কথা না ব'লে তাতিয়ানাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ইলিয়া হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। তারপর ঘরখানায় একবার চোখ বুলোতেই বুঝতে পারলো তার আশংকা বৃথা। টাকাটা সে লুকিয়ে রেখেছিলো জানলার ওপরে একটা ছোট্টো দেয়াল-আলমারীতে—এক গাদা ন্যাকড়ার মধ্যে। আলমারীর দরজার ওপর আল্‌তো ক'রে আট্‌কে দিয়েছিলো একটা পাত্‌লা পালক। উদ্দেশ্য এই: কেউ যদি দেয়াল-আলমারীটায় হাত দেয় তাহ'লে পালকটা প'ড়ে যাবে। পড়ে নি অবশ্য, তবে ইলিয়া দেখলো আলমারীর দরজায় সাদা মতো একটা ছোট্ট দাগ প'ড়েছে এবং দাগটা বেশ স্পষ্ট।

দরজার গোড়ায় এসে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো তাতিয়ানা:

"আপনার কি অসুখ ক'রেছে?"

"হ্যাঁ, শরীরটা বিশেষ ভালো বোধ হ'চ্ছে না। শুনুন, কিছু মনে ক'রবেন না আপনাকে তখন ঠেলে দিয়েছিলাম ব'লে।"

"না না, এতে আর মনে করা-করির কি আছে। কিন্তু—গাড়োয়ানটা যে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। কতো ভাড়া ঠিক ক'রেছিলেন?"

"যা খুশি দিলেই হ'লো। দয়া ক'রে ওর ভাড়াটা যদি মিটিয়ে দেন তাহ'লে খুবই ভালো হয়।"

তাতিয়ানা দৌড়ে চ'লে যেতেই ইলিয়া চেয়ারে উঠে দেয়াল-আলমারীর মধ্যে থেকে টাকার প্যাকেটটা বের ক'রে কোটের পকেটে গুঁজে রাখলো। টিপেটাপে দেখলো টাকাটা যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই আছে। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে চেয়ারে ব'সে প'ড়লো ঝুপ্‌ ক'রে। মনে মনে ব'ললো: "আচ্ছা আহাম্মক আমি। ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিলাম!"

একটু পরে দরজার গোড়ায় ফিরে এসে তাতিয়ানা তাড়াতাড়ি ব'ললো:

"পাঁচ আনা দিলাম গাড়োয়ানটাকে। কি হ'য়েছিলো আপনার?—মাথা ঘুরে উঠেছিলো না কি?"

"হ্যাঁ—মানে—গির্জেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—তারপর হঠাৎ যেন—"

ঘরে ঢুকে তাতিয়ানা ব'ললো:

"শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, আমাকে আর লজ্জা ক'রতে হবে না। আমি না হয় খানিকক্ষণ ব'সছি আপনার কাছে। বাড়িতে এখন কেউ নেই। উনি গেছেন ক্লাবে ডিউটি দিতে।"

ইলিয়া বিছানায় ব'সলো, আর তাতিয়ানা ব'সলো চেয়ারে। ঐ একখানি চেয়ারই আছে এই ঘরে।

বিব্রতভাবে হাসতে হাসতে ইলিয়া ব'ললো :

"আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।"

সরাসরি ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিলো তাতিয়ানা :

"না, না, এতে আর কষ্ট কি ?"

দুজনেই চুপচাপ ব'সে থাকে। তাতিযানাকে কি যে ব'লবে কিছুই ভেবে পায় না ইলিয়া। আর এদিকে তাতিয়ানা ইলিযার মুখের দিকে চেয়ে মিটমিট ক'রে হাসতে শুরু করে।

চোখদুটো নামিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"কি দেখছেন ?"

"ব'লবো ?"

"বলুন।"

"আপনি ভান ক'রতেও জানেন না। বুঝলেন ?"

চ'ম্‌কে উঠে ইলিয়া মেয়েটির দিকে তাকায়।

"সত্যি ব'লছি, আপনি ভান ক'রতে জানেন না। অসুখ ক'রেছে না হাতী! আপনার কিছুই হয় নি'। যা হ'য়েছে তা আমি জানি।"

"তার মানে ?"

"তার মানে আপনি একখানা খারাপ চিঠি পেয়েছেন। ভাবেন কি আমাকে ? আমি বুঝি কিছুই দেখি না ?"

চাপা গলায় সতর্কভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"হ্যাঁ, একখানা চিঠি পেয়েছি বটে।"

এমন সময় জানলার বাইরে কিসের যেন খশখশ শব্দ হ'লো। প্রথমে শার্শিগুলোর দিকে চেয়ে, তারপর ইলিয়ার দিকে ফিরে ব'ললো তাতিয়ানা :

"ও কিছু নয়, বাতাস। আর, নয়তো পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে গাছে

ব'সে।—হ্যাঁ, যা ব'লছিলাম, আমার গোটাকতক কথা শুনবেন মন দিয়ে? বয়স আমার অল্প হ'লেও ছেলেমানুষ নই আমি! যদি শোনেন তো বলি।"

তাতিয়ানার মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ব'ললো:

"বলুন, বলুন। নিশ্চয়ই শুনবো।"

বেশ ক'রে বাগিয়ে ব'সে তাতিয়ানা ব'লতে লাগলো:

"শুনুন, চিঠিখানা কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিন। মেয়েটি যদি আপনাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেই থাকে তাহ'লে ভালোই ক'রেছে,—বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে। এতো অল্প বয়সে আপনার বিয়ে করা উচিত নয়। বিয়ে তো ক'রবেন, কিন্তু বউকে খাওয়াবেন কি? কীই বা আপনার রোজগার? তাছাড়া গরিব লোকের বিয়ে করা উচিতও নয়। জোয়ান মানুষ আপনি, গায়ে তাকত আছে, খাটবেন-খুটবেন—এই তো। ভালোবাসা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া আপনি সুপুরুষ। ভালোবাসা আপনি পাবেনই। কিন্তু সাবধান, এখন প্রেমে-টেমে প'ড়বেন না। খাটুন, জিনিষপত্তর বেচুন, টাকা জমান, কারবারটাকে বড়ো করুন, একখানা দোকান খোলবার চেষ্টা করুন,—তারপর হাতে যখন বেশ কিছু জ'মবে, তখন না হয় বিয়ে ক'রবেন। আমার ধারণা আপনার উন্নতি হবে, কারণ মনটা আপনার সাদা, মদ খাওয়ারও বাই নেই, তাছাড়া একা মানুষ আপনি।"

চুপচাপ মাথা নিচু ক'রে তাতিয়ানার কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া মনে মনে হাসতে লাগলো। ওর ইচ্ছা হ'লো হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

বেশ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো ভারিক্কে গলায় ব'লতে থাকে তাতিয়ানা:

"ওভাবে মুখ নিচু ক'রে বসে থাকলে চ'লবে না। আপাতত ভালোবাসার কথা আপনাকে ভুলতে হবে।—ভালোবাসা একটা রোগ। আর, এ-রোগ সহজেই সেরে যায়! বিয়ের আগে তিন তিনবার আমি এমন গভীরভাবে প্রেমে প'ড়েছিলাম যে তখন জলে ডুবে ম'রতেও আমার বাধতো না। কিন্তু সে-নেশাও তো কেটে গেলো! তারপর যখন দেখলাম যে এবার আমার নেহাতই বিয়ে করা উচিত, তখন ভালোবাসা বাদ দিয়েই বিয়ে ক'রলাম।"

সংগে সংগে মুখ তুলে ইলিয়া মেয়েটির দিকে তাকালো।

"কি হ'লো?—অবাক হ'চ্ছেন বুঝি? না, না বিয়ের পরে আমার স্বামীকে

আমি ভালোবেসেছি। মাঝে মাঝে মেয়েরা নিজেদের স্বামীদের সংগেও প্রেমে প'ড়তে পারে বৈ কি।"

চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"তার মানে ?"

তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

"ঠাট্টা ক'রছিলাম। তবে হ্যাঁ, একথাটা আমি ব'লবোই যে ভালো না বেসেও বিয়ে করা সম্ভব এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভালোবাসা আসে বিয়ের পরে।"

তাতিয়ানার সুগঠিত, ছোটোখাটো, আঁটসাট দেহটার পানে চেয়ে, তার কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া তাজ্জব ব'নে যায়। এতোটুকু মেয়ের এতো বুদ্ধি ? ভাবে : "এমন বউ নিয়ে কাউকেই কোনোদিন পস্তাতে হবে না।"

একজন শিক্ষিতা নারী—রক্ষিতা নয়, রীতিমতো বিবাহিতা স্ত্রী—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম একজন সত্যকার ভদ্র মহিলা যে তার সংগে ব'সে প্রাণ খুলে গল্পগুজব ক'রছে, তার মতো একটা সাধারণ মানুষকেও 'তুমি' না ব'লে 'আপনি' ব'লছে—এতে খুশি হ'লো ইলিয়া। এমন কি মেয়েটির প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও দেখা দিলো তার মনে। তাই যাবার জন্যে তাতিয়ানা উঠে দাঁড়াতেই ইলিয়া শশব্যস্ত হ'য়ে তার সামনে মাথা নিচু ক'রে গদগদ-স্বরে ব'ললো :

"দয়া ক'রে এতোক্ষণ যে গল্পগুজব ক'রে গেলেন এতে সত্যিই বড়ো আনন্দ পেলাম। বুকের বোঝাটা অনেক হাল্‌কা ক'রে দিয়ে গেলেন আপনি। ধন্যবাদ।"

"দিয়ে গেলাম না কি ? ভেঁবে দেখুন।" এই ব'লে তাতিয়ানা ফিক্ করে একটু হাসতেই তার গাল দুটিতে গোলাপী আভা ফুটে উঠলো। তারপর ইলিয়ার দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে কেমন যেন অদ্ভুত গলায় "আচ্ছা, এখনকার মতো আসি তাহ'লে" এই ব'লে বালিকার মতো হাল্‌কা চরণ ফেলে চ'লে গেলো তাতিয়ানা।

এইভাবে আভ্‌তনমফ্‌দের কেবলই ভালো লাগতে থাকে ইলিয়ার এবং সেই সংগে তাদের সুখশান্তি দেখে ওর ঈর্ষাটাও বাড়তে থাকে দিন দিন। সাধারণভাবে ব'লতে গেলে, পুলিশের লোকগুলোকে মোটেই দেখতে পারে না ইলিয়া, কারণ তাদের হাতে ওর খোয়ার তো কম হয় নি, কিন্তু কিরিকৃকে

ওর ভালোই লাগে। লোকটা সরল, নিজের কাজকর্ম নিয়েই থাকে, তাছাড়া তার বুদ্ধিশুদ্ধিও খুব বেশি নয়। আসলে কিরিক্ হ'লো দেহ এবং তার বউটি হ'লো মন। বেশির ভাগ সময়ই কিরিক্ বাইরে বাইরে থাকে, তবে তার বাড়িতে থাকাও যা আর না থাকাও তাই।

ধীরে ধীরে ইলিয়ার প্রতি তাতিয়ানার ব্যবহারটা সহজ হ'য়ে আসে এবং দিন কতক পরেই সে ইলিয়াকে দিয়ে নানান ফাইফরমাশ খাটিয়ে নিতে শুরু করে—যেমন, কাঠ কাটা, জল তোলা, জঞ্জাল ফেলে দিয়ে আসা, ইত্যাদি। ইলিয়াও সানন্দে তাতিয়ানার কাজগুলো ক'রে দেয় এবং দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই এগুলো তার ডিউটিতে দাঁড়িয়ে যায়।

তখন তাতিয়ানা একদিন তার বাচ্চা ঝিটাকে ব'লে দিলো ঃ

"তুই এখন যা। কেবল শনিবারে শনিবারে আসবি, বুঝলি ?"

২২

আভ্‌তনমফ্‌রা কাউকেই বড়ো একটা আমল না দিলেও, সাব-ইন্‌স্পেক্টর কর্সাকফ্‌ তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে। সে কিরিকের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্‌। লোকটা রোগা, লম্বা তার গোঁফ, চোখে কালো চশমা। এন্তার মোটা মোটা সিগ্‌রেট্‌ ফুঁকতে ফুঁকতে কর্সাকফ্‌ গাড়োয়ানদের বাপ-চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে। শুনে মনে হয় গাড়োয়ান জাতটাই যেন তার চক্ষুশূল। বেশ ক'রে বাগিয়ে বসে কর্সাকফ্‌ বলে :

"গাড়োয়ানগুলোর জ্বালায় শহরটা মাটি হ'যে গেলো। বেটারা যেন জানোয়ার। লোকজনকে যদি বলো যে বাঁ দিক দিয়ে চলো, তারা কথা শোনে। দু-চার মিনিটেই গোটা রাস্তাটাকে বাগে আনা যায়, কিন্তু গাড়োয়ানগুলো আইনও মানে না বুদ্ধিশুদ্ধিও ধার ধারে না। যমই জানে বাবা গাড়োযান কী চীজ্‌!"

সারা সন্ধ্যা ধ'রে সে এইভাবে গাড়োযানদের নিন্দে কর'তে থাকে এবং তার মুখ থেকে এ-ছাড়া আর কোনো কথাই শুনতে পায় না ইলিয়া। মাঝে মাঝে গ্রিসলফ্‌ও আসে আভ্‌তনমফ্‌দেব বাড়ি। বোন একটা প্রাইমারী ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টর সে। গ্রিস্‌লফ্‌ গান গাইতে ভালোবাসে, বিশেষ ক'রে 'ঢেউযের ওপরে ঢেউ—নীল ঢেউ—' গানটা। সে যখন গান গায, তার লম্বা-চওড়া দাঁতালো বউটা তাতির্য়ানা ভ্লাসিএফ্‌নার মিষ্টি কেক্‌গুলো এক ধার থেকে ভস্ম ক'বে চলে। তাই, গ্রিসলফ্‌-বনিতা চ'লে গেলেই শ্রীমতী আভ্‌তনমফ্‌ তার উদ্দেশে গালমন্দ পাড়তে থাকে :

"ঐ ফেলিংসাতা এগরফ্‌নাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। কেবল আমাকে চটিয়ে দেবার জন্যেই ও ইচ্ছে ক'বে এতো খায়। টেবিলে মিষ্টি কিছু দেখেছে কি অমনি ওর নোলা দিয়ে জল পড়ে।"

মাঝে মাঝে আলেক্‌সান্দ্রা ভিক্‌তোরফ্‌না ত্রাফ্‌কিনাও তার স্বামীকে নিয়ে এখানে আসে। আলেক্‌সান্দ্রা যেমন লম্বা তেমনি রোগা। নাকটা তার বড়ো, মাথায় খাটো-ক'রে-কাটা লাল রঙের চুল, চোখদুটো তার বড়োই, গলার

আওয়াজটা কর্কশ, তাছাড়া সে সর্বদা এমনভাবে নাক ঝাড়ে যেন কাপড় ছিঁড়ছে। এদিকে তার স্বামীটি ফিশফিশ ক'রে কথা বলে—গলার অবস্থা খুব ভালো নয় ব'লেই হয়তো,—কিন্তু একবার ব'কতে শুরু করলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে জিভটাকে চালু রাখে এবং মনে হয় তার মুখের মধ্যে যেন খড়ের খশখশ শব্দ হচ্ছে। লোকটির আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো, আবগারী বিভাগে কাজ করে সে এবং কোন্ একটা চ্যারিটি-সোসাইটির সভ্যও বটে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা কেবলই দানধ্যানের গল্প করে।

"বুঝলেন, আমাদের এই সোসাইটিটাকে নিয়ে যেন এক জ্বালা হ'য়েছে।"

সংগে সংগে তার স্ত্রী ব'লে ওঠে :

"জ্বালা ব'লে জ্বালা!"

"বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন দরখাস্ত আসে : সাহায্য করুন।"

"আমার মতে, এই চ্যারিটি-সোসাইটিগুলো মানুষকে কেবল নষ্টই করে।"

"কোনো স্ত্রীলোক লেখে : 'আমার স্বামী মারা গেছেন। তিন তিনটে কাচ্চাবাচ্চাকে নিয়ে ব'ড়ো অসহায় হ'য়ে প'ড়েছি। এক টুকরো রুটিও নেই যে তাদের মুখে দিই।"

"বাঁধা গৎ, বুঝলেন?"

"তখন তাকে গোটা পাঁচেক টাকা দিতেই হয়।"

"কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, বিধবাগুলোকে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।"—আভ্‌তনমফ্‌দের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আলেক্‌সান্দ্রা টিপ্পনী কাটে।

"যাই হ'ক, তখন কিন্তু আমার স্ত্রী আমায় বলেন : 'গিয়ে একবার দেখেই আসি স্ত্রীলোকটাকে, কি বলো?'"

"গিয়ে কি দেখি জানেন? তার স্বামী বছর পাঁচেক আগেই মারা গেছে এবং তার কাচ্চাবাচ্চা তিনটে নয়, দুটো।"

"কেমন বুঝছেন?"

"শুনুন শুনুন, আরও আছে। দেখি, মাগী নিজেও বেশ মজবুত। পাকামিও যথেষ্ট। বুঝলাম সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তাই সরাসরি ব'ললাম : 'হ্যাঁ বাছা, মিছে কথাও মুখে আটকায় না? আর এটাকে মিছে

কথাই বা বলি কি ক'রে, এ তো স্রেফ জালিয়াতি। দেবো নাকি তোমায় থানায় পাঠিয়ে?' যে-ই না বলা স্ত্রীলোকটা অমনি আমার পায়ের ওপর আছড়ে প'ড়লো।"

শুনে হো হো ক'রে হেসে ওঠে কিরিক্ আভ্‌তনমফ্।

আলেক্সান্দ্রা ভিক্‌তোরফ্‌না চালাক-চতুর ব'লে সবাই তার প্রশংসা করে এবং গরিবরা গরিব ব'লে সবাই তাদের নিন্দা করে। বলে: গরিব জাতটাই মিথ্যুক এবং লোভী, তাছাড়া যারা ওদের ভালো চায় তাদের ওরা সম্মান ক'রতে জানে না।

নিজের ঘরে ব'সে ইলিয়া লুনেফ্ মন দিয়ে এদের কথাবার্তা শোনে এবং বুঝতে চেষ্টা করে জীবন সম্বন্ধে এদের বক্তব্যটা কী, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না। ওর মনে হয় এরা সবজান্তা, তাছাড়া যাদের জীবনের সংগে এদের জীবন ঠিক মেলে না তাদেব এরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। বেশির ভাগ সময়ই এরা এর-ওর পারিবারিক কুৎসা নিয়ে আলোচনা করে, কখনো বা বিশপের কাজকর্ম নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে, আবার কখনো বা এদের পরিচিত স্ত্রী-পুরুষগুলোর মন্দ আচরণ নিয়ে হাসাহাসি করে। শুনতে শুনতে ইলিযা ক্লান্ত হ'যে যায। কোনো কোনো দিন সন্ধ্যাবেলা কিবিক্ তাকে চা খেতে ডাকে। চায়ের টেবিলে ব'সে তাতিযানা প্রাণ খুলে হাসে আর বঙবেরঙের ঠাট্টা তামাশা জুড়ে দেয়। এদিকে তার স্বামীটি আকাশ-কুসুম কল্পনায় বিভোর হ'য়ে ভাবে হঠাৎ যদি সে বড়লোক হ'য়ে যায় তাহ'লে কী ভালোই না হয়! তখন সে চাকরিটা ছেড়ে তো দেবেই, উপরন্তু একটা প্রকাণ্ড বাড়িও কিনবে। তারপর ·

চোখদুটো কুঁচকে স্বপ্নে মশগুল হ'য়ে ব'লতে থাকে কিরিক্:

"তারপর একটা পোল্‌ট্রি খুলে নানারকমের হাঁস মুরগী পয়দা ক'রবো। দুনিয়ায় যতো রকমের হাঁস মুরগী আছে সব জড়ো ক'রবো আমার পোল্‌ট্রিতে। আর হ্যাঁ, একটা ময়ূরও থাকবে আমার বাড়ির উঠানে। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে মুখে একটা মিষ্টি সিগারেট দিয়ে যখন দেখবো যে ময়ূরটা পেখম তুলে পুলিশের বডকর্তার মতো গট্‌গট্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন—তখন—"

আনন্দের আতিশয্যে কিরিক্ কথাটা শেষ ক'রতে না পেরে জিভে একটা

টাকনা দিতেই তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না হেসে ওঠে মৃদু মৃদু—স্বামীর প্রতি সহানুভূতিতে, এবং তারপর সেও আকাশ-কুসুম কল্পনায় ডুবে যায় :

"আর আমি ? গরমের সময় আমি যাবো ক্রিমিয়ায় কিংবা ককেশাসে, আর শীতকালে কোনো চ্যারিটি-সোসাইটিতে ব'সে মিটিং ক'রবো। এর জন্যে বানিয়ে নেবো কালো কাপড়ের একটা সাদাসিধে জামা, আর গয়না ব'লতে প'রবো শুধু চুনী-বসানো ব্রুচ্ আর মুক্তোর ইয়ারিং। সেদিন একটা কবিতায় প'ড়ছিলাম, পরলোকে গিয়ে গরিবের রক্ত আর চোখের জল চুণী আর মুক্তো হ'য়ে যায় !"

তারপর আল্‌তো ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাতিয়ানা আবার বলে :

"লক্ষ্মী মেয়েদের গায়ে চুণীর গয়না ভারি স্নুন্দোর খোলে !"

ইলিয়া চুপচাপ মুচকি হাসতে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানা ভারি আরামের, আতরের মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর ক'রছে ঘরের বাতাসটা, চা-টাও ভালো, অবশ্য এখানে আরও একটা কিছু আছে যা সবচেয়ে ভালো। খাঁচার মধ্যে জড়োসড়ো হ'য়ে ঘুমোচ্ছে পাখিগুলো, দেয়ালে চকচক ক'রছে খানকতক রঙীন ছবি, জানলার ধারে বসানো র'য়েছে কতকগুলো কাচের পুতুল, রঙবেরঙের দু-চারটে ওষুধের বাক্‌শোও শোভা পাচ্ছে কুলুঙ্গীতে। ঘরখানির চারিদিকে চেয়ে খুশি হয় ইলিয়া, শান্তিও পায় কম নয়, কিন্তু সেই সংগে এটাও বুঝতে পারে, তার জীবন কতো অপূর্ণ !

বিশেষ ক'রে যেদিন তার ব্যবসার অবস্থা খারাপ থাকে সেদিন এই দুঃখটা তাকে পাগল ক'রে তোলে। তখন ঐ সব ছবি, পুতুল, আসবাবপত্র কিছুই ভালো লাগে না তার। ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে সেগুলোকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। হঠাৎ তার মনের অবস্থাটা কেন যে এমন হ'য়ে যায় বুঝতে পারে না সে ; মনে মনে শিউরে উঠে ভাবে : "এ তো আমার মন নয়। এ যেন আর কারোর মন। না, না, এ-মন আমার নয় !"

মনের এমন অবস্থা হ'লে ইলিয়া একটি কথাও বলে না, চুপচাপ একদিকে চেয়ে ব'সে থাকে। ওর ভয় হয় পাছে আভ্‌তনমফ্‌রা ওর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু একদিন কিরিকের সংগে তাস খেলতে খেলতে ও আর নিজেকে সামলাতে

পারলো না। আভ্‌তনমফের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে নীরস গলায় জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলো :

"আচ্ছা কিরিক্ নিকদিমিচ্, দ্‌ভরিআন্‌স্কি ষ্ট্রীটের ব্যবসায়ীটিকে যে-লোকটা গলা টিপে মেরেছিলো এখনো পর্যন্ত তার কোনো খোঁজখবর পেলেন না ?"

প্রশ্নটা ক'রে ইলিয়া মনে মনে হাসতে লাগলো।

হাতের তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরটি চিন্তিতভাবে ব'ললো :

"কার কথা ব'লছেন ? পলুএকৃতফের ? মানে, প-লু-এক্-ত-ফের ? না বন্ধু, এখনো পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাই নি। মানে, তাকে নয়, যে-লোকটা পলুএকৃতফ্‌কে খুন ক'রেছে—তাকে। লোকটাকে খোঁজবার চেষ্টাও করিনি, খুঁজে পাইও নি, এবং তাকে আমার দরকারও নেই। আমি শুধু জানতে চাই ইস্কাপনের বিবিটা কার হাতে ? ইস্কাপন, ইস্কাপন, ইস্কাপন ! তানিয়া, তুমি আমায় তিনখানা তাস দিয়েছো, না ? চিড়িতনের বিবি, রুইতনের বিবি, আর···আর·· আর একখানা কি ?"

"রুইতনের সাতা। এবার থেকে একটু চটপট ভাববে।"

মুচকি হেসে ইলিয়া ব'ললো : "লোকটা তাহ'লে স্রেফ উধাও হ'য়ে গেলো ?"

হাতের কোন্ তাসখানা ফেলবে এই চিন্তায় কিরিক্ এতো বিভোর যে ইলিয়ার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। তার বদলে ইলিয়ার প্রশ্নটা সে নিজেই আওড়াতে লাগলো :

"লোকটা তাহ'লে স্রেফ উ-ধাও হ'-য়ে গে-ল্-লো ! গেলো, সব গেলো। পলুএকৃতফ্‌ও গেলো। হ্যাঁ, আর একখানা কোন্ তাস দিয়েছো ব'ললে তানিয়া ?"

সংগে সংগে তার স্ত্রী ধমকে উঠলো : "অতো অন্যমনস্ক হ'য়ো না কিরিয়া। কী আবোল-তাবোল ব'কছো ? নাও, চটপট তাস ফেলো !"

"আঃ, সবুর করো, একটু ভাবতে দাও !"

এদিকে নাছোড়বান্দার মতো ইলিয়া আবার ব'ললো :

"খুন ক'রে যেন উবে গেলো ! লোকটা চালাক বটে !"

কিরিক্ তার প্রশ্নে কান দিচ্ছে না দেখে ইলিয়া ইচ্ছে ক'রেই বারেবার সেই খুনের কথাটা পাড়তে থাকে।

জড়ানো গলায় কিরিক্ ব'ললো :

"চালাক? কে চালাক? চালাক যদি কেউ থাকে তো সে আমি। আসুন এইবার,—কৈ দেখান তো আপনার তাসগুলো?"

এই ব'লে টেবিলের ওপর তাসগুলো সশব্দে ফেলে দিয়ে কিরিক্ ইলিয়ার মুখের দিকে তাকালো। ইলিয়া দেখলো সত্যই সে বেকুব ব'নে গেছে। এর পর আভ্‌তনমফ্‌রা তার মুখের ওপর হেসে উঠতেই সে আরও চ'টে গেলো। তাস বাঁটতে বাঁটতে গোঁয়ারের মতো ব'ললো সে :

"দিনে-দুপুরে বড়ো রাস্তার ওপর কাউকে খুন ক'রতে হ'লে সাহস থাকা চাই।"

টুক্ ক'রে তাতিয়ানা ব'ললো :

"সাহস নয়, বরাত।"

সংগে সংগে মেয়েটির দিকে তাকালো ইলিয়া। মুচকি হেসে কিরিক্ জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"খুন করবার বরাত?"

"কেন নয়? মানে,—খুন ক'রে জেলে না যাওয়ার কথা ব'লছি আমি। এটা কি বরাত নয়?

কিরিক্ ব'ললো : "আবার আপনি আমায় রুইতনের টেক্কা দিয়েছেন।"

ইলিয়া ব'ললো গম্ভীরভাবে : "ওটা আমারই পাওয়া উচিত ছিলো!"

হাতের তাসগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে তাতিয়ানা ব'ললো :

"তাতে আর কি হ'য়েছে? কোনো ব্যবসাদারকে মারুন, তাহ'লেই ওটা পেয়ে যাবেন।"

দুটো নহলা এবং টেক্কাখানা ইলিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললো কিরিক্ :

"হ্যাঁ মারুন, তা'হলে লাল কাপড়ের একটা টেক্কা* আপনার ভাগ্যে জুটবেই। কিন্তু এখনকার মতো এই কাগজের টেক্কাটাই ধরুন।"

---

*খুন করার অপরাধে যে সব আসামীকে শাস্তি দেওয়া হয় তাদের পিঠের মাঝ বরাবর রুইতনের টেক্কার মতো ক'রে এক টুকরো লাল কাপড় সেলাই ক'রে দেওয়া হয়।

বলেই কিরিক হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

আভ্‌তনমক্‌দের এমন প্রাণখুলে হাসতে দেখে খুনের কথাটা ইলিয়া আর পাড়তেই পারে না। বিশেষ ক'রে তাতিয়ানার গোলাপী মুখখানার দিকে চেয়ে কথাটা এক রকম ভুলেই যায় সে। ভাবেঃ ঐ যে একটা পাতলা দেয়াল, তার এধারে দুঃখ, ওধারে সুখ। এধারে সে, ওধারে তাতিয়ানা আর তার স্বামী। দেখে দেখে ঈর্ষায় তার বুকটা জ্বলে যেতে থাকে, মাঝে মাঝে হতাশায় মুষড়েও পড়ে সে। মনে হয় এক রাশ ঠাণ্ডা কুয়াশা যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে তাকে। এই সংগে সে জীবনের অসঙ্গতির কথাও ভাবে এবং ঈশ্বরের চিন্তাও দেখা দেয় তার মনেঃ "ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি করুণাময়, ধৈর্য তাঁর অসীম, তিনি দেখেন আর অপেক্ষায় থাকেন … "—মনে মনে এই কথাগুলো আওড়ে ইলিয়া আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেঃ "কিন্তু কিসের অপেক্ষায় থাকেন তিনি ?" নেহাতই ক্লান্ত হ'য়ে, নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে সে আবার বই পড়া ধরে ; তাতিয়ানার কাছে ছেঁড়াখোড়া যে বই আর পত্রিকাগুলো আছে সেগুলো চেয়ে নিয়ে এসে বারেবার প'ড়তে থাকে। ছেলেবেলার মতো এখনো তার সেইসব গল্প উপন্যাসই ভালো লাগে যাতে বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্য নেই, আছে এক অজানা অদ্ভুত জীবনের কাহিনী। বাস্তব জীবনের—সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো গল্প পড়'লেই তার মনটা বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে এবং তার মনে হয় এগুলো সত্য নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য এ-ধরণের গল্প প'ড়ে আমোদ পায় সে এবং ভাবে, এগুলো যারা লিখেছে তাদের মুন্সিয়ানাও আছে বটে ; বাস্তব জীবনের ছবি এঁকে তারা চায় দুঃখের বোঝা লাঘব ক'রতে ! তার ধারণা জীবনকে সে চেনে এবং দিন দিন আরও ভালো ক'রে যেন চিনছেও। তবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরবার সময় প্রতিদিনই সে এমন কিছু না কিছু দেখে যাতে তার মনটা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, ঘটনাগুলো নিয়ে তার মনে তোলাপাড়া চলে, আর হাসপাতালে গিয়ে বাঁকা হাসি হেসে পল্‌কে সে না ব'লেই পারে নাঃ

"চমৎকার বিচার, চমৎকার ! এই সেদিন দেখলাম ফুটপাথ দিয়ে কতকগুলো ছুতোর আর রাজমিস্ত্রি চ'লেছে। কোত্থেকে দৌড়ে এসে একটা পাহারাওয়ালা হঠাৎ তাদের ধ'মকে ওঠলোঃ 'আবে, ফুটপাথ থেকে নাম্,

রাস্তা দিয়ে হাঁট্।' এই ব'লে সে ছুতোর, মজুরগুলোকে ফুটপাথ থেকে স্রেফ ভাগিয়ে দিলো। ভাবখানা এই : 'তোরা হাঁটবি তো হাঁট ঘোড়াগুলো যেখান দিয়ে হাঁটে, নইলে তোদের নোংরা জামাকাপড়ের ছোঁয়া লেগে বাবুদের দেহ অপবিত্র হ'য়ে যাবে! তাদের জন্যে তোরা বাড়ি তৈরি ক'রে ম'রবি মর্, কিন্তু তারপর—সাবধান—বাবুদের গায়ে যেন তোদের ছায়াও না লাগে।'—চমৎকার বিচার!"

এতে পল্ও জ্ব'লে ওঠে। হাসপাতাল তো নয়, যেন জেলখানা! মনে তার একফোঁটাও শান্তি নেই, বুকে যেন হামেশা তুষানল জ্ব'লছে। তাছাড়া, ভেরা কেমন আছে, কোথায় আছে—এই সব ভেবে ভেবে পল্ দিনদিন মোমবাতির মতো ক্ষ'যে যাচ্ছে। এদিকে জাকব ফিলিমনফ্‌কে পল্ আদৌ দেখতে পারে না; এমন কি এতো দুঃখের দিনেও তার সংগে ব'সে দুদণ্ড যে গল্পগুজব ক'রবে তাতেও ওর মন চায় না।

জাকবের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেই পল্ ইলিয়াকে বলে :

"ওর কথা বাদ দাও। ও একটা উন্মাদ!"

অসুস্থ অবস্থায় জাকব আজও হাসপাতালে প'ড়ে র'যেছে, তবে আছে বেশ মনের আনন্দেই। এদিকে সে ভাব জমিয়ে নিয়েছে তার পাশের বিছানার রোগীটির সংগে। লোকটি কোনো গির্জার ওয়ার্ডার। পায়ে ঘা হওয়ায় তার একটা পা কেটে বাদ দিযে দেওয়া হ'যেছে। বেঁটেসেটে নাদুস-নুদুস মানুষ সে, মাথাটা প্রকাণ্ড, তার ওপর গোটা মাথায় টাক, মুখে লম্বা কালো দাড়ি, দাড়িটা আবার নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত, তাছাড়া তার ভ্রূ দুটো দেখলে মনে হয় একজোড়া বাঘা গোঁফ যেন ভুল ক'রে ভ্রূ-র জায়গা জুড়ে ব'সেছে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে সে যখন কথা বলে তার গলার আওয়াজটা ঠেকে ভেঁপুর মতো, তবে আওয়াজটা গলা থেকে না বেরিয়ে বেরোয় বোধ হয় পাকস্থলী থেকে। হাসপাতালে এলেই ইলিয়া দেখে জাকব এই ওয়ার্ডারের বিছানায় ব'সে কোলে একখানা নধর বাইবেল নিয়ে আস্তে আস্তে প'ড়ছে, আর গির্জার ওয়ার্ডারটি চুপচাপ শুয়ে আছে ভ্রূ কুঁচকে।

জাকবের গলার আওয়াজটা আরও দুর্বল ঠেকে—যেন কাঠের মধ্যে দিয়ে ছোট্টো একখানা করাত চ'লছে। ডান হাতখানা উঁচু ক'রে ধ'রে এমনভাবে

সে বাইবেল পাঠ করতে থাকে যেন ঘরভর্তি রোগীদের ডেকে সে ব'লছে : "ওহে শোনো, ঈসাইয়ার মারাত্মক ভবিষ্যৎবাণীগুলো শোনো।" জাকবের মুখের ওপর থেকে মারের দাগগুলো এখনো মিলিয়ে যায় নি। কাঁকড়াবিছের মতো এক রাশ কালশিটের মধ্যে তার ড্যাবডেবে চোখ দুটোকে বড়ো বীভৎস দেখায়। ইলিয়াকে দেখলেই জাকব বইখানা ফেলে দিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে চিরাচরিত প্রশ্ন করে :

"মাশুৎকার সংগে তোমার দেখা হ'য়েছে ?"

"না।"

বিষণ্ণ গলায় জাকব বলে :

"কি আশ্চর্য ! ব্যাপারটা যেন গল্পের মতো। মেয়েটা ছিলো বেশ ছিলো, হঠাৎ কে যেন জাদু ক'রে নিয়ে গেলো তাকে। তারপর তার পাত্তাই নেই !"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা করে :

"তোমার বাবা আর এসেছিলো ?"

"হ্যাঁ, আর-একবার এসেছিলো।"

জাকবের ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে, সেই সংগে তার চোখে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখা দেয়।

"সংগে খানিকটা দড়ি, কিছু চা আর চিনিও এনেছিলো। এসে ব'ললো : 'এখানে অনেকদিন তো রইলি, এবার বাড়ি যাবার অনুমতি নে।' আমি কিন্তু ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ব'ললাম আমাকে তিনি যেন এখন ছুটি না দেন। বেশ ভালো লাগে এখানে—জায়গাটা নিরিবিলি, তাছাড়া হুকুমও নেই হাকিমও নেই।"

তারপর একটু থেমে ইলিয়ার সংগে গির্জার ওয়ার্ডারটির পরিচয় করিয়ে দিয়ে জাকব আবার ব'লতে থাকে :

"এঁর নাম নিকিতা এগোরিচ্। আমরা একসংগে পড়াশুনো করি। ওঁর একখানা বাইবেল আছে। আট বছর ধ'রে বইখানা প'ড়ে প'ড়ে সবই ওঁর মুখস্থ হয়ে গেছে, তাছাড়া ভবিষ্যৎবাণীগুলোর অর্থও ইনি খুব চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারেন। সেরে উঠে আমি নিকিতা এগোরিচের সংগে চ'লে যাবো।

বাবার কাছে আর যাচ্ছি না। গির্জের কাজকর্মে আমি সাহায্য ক'রবো নিকিতা এগোরিচ্‌কে, আর সেখানে গান গাইবো।"

জাকবের কথা শুনে নিকিতা এগোরিচ্‌ তার বিশাল চক্ষুদুটি ইলিয়ার মুখের পানে ধীরে ধীরে তুলে ধরে। চোখদুটো বড়ো হ'লেও চোখের তারাদুটো ব'সে গেছে কোটরের মধ্যে। সে-চোখে দীপ্তি নেই, আছে কেবল একটা স্থির চাহনি। লোকটা তার দিকে চাইতেই ইলিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আনন্দের আতিশয্যে হাঁপাতে হাঁপাতে, মাশা, তার বাবা, তার স্বপ্ন সব কিছু ভুলে গিয়ে জাকব ব'লে ওঠে:

"কী সুন্দর বই এই বাইবেল! ভাবলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কথা তো নয়, যেন অমৃত!"

উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে জাকব।

"আচ্ছা ইলিয়া, তোমার কি মনে পড়ে সেই ধর্মব্যাখ্যাতাটি হোটেলে ব'সে কী ব'লেছিলেন? তাঁর সেই কথাটিও বাইবেলে আছে। মনে পড়ে কথাটা? 'যেখানে ডাকাতের ডেরা সেখানে লক্ষ্মী অচলা।' বাইবেলে আছে, খুঁজে পেয়েছি।"

কথাটা বিশ্বাস ক'রতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া:

"সত্যি আছে?"

"আছে হে আছে। হুবহু এই কথাই আছে।"

ইলিয়া বলে:

"যাই বলো, এটা কিন্তু ভালো নয়। কেমন যেন বদখত ঠেকছে।"

তখন চোখদুটো বুঁজে, লম্বা দাড়িটা নেড়ে, কেমন যেন অদ্ভুত গলায় স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে বলে নিকিতা এগোরিচ্‌:

"কৌতূহল পাপ নয়। সত্যের খোঁজে মানুষ যদি কৌতূহলী হয়, এমন কি যদি হঠকারিতাও ক'রে বসে তবুও তার পাপ হবে না, কারণ মানুষের এই কর্মের পিছনে র'য়েছে স্বর্গীয় প্রেরণা।"

ইলিয়া চ'মকে ওঠে।

গভীরভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিকিতা সেই একই ভাবে ব'লতে থাকে:

"সত্য মানুষের কানে কানে বলে : 'আমার খোঁজ করো।' কিন্তু যা সত্য তা-ই ভগবান। আর সেইজন্যেই বলা হ'য়েছে : 'যে ঈশ্বরের অনুগামী, সে ধন্য।"

নিকিতার দাড়িশুদ্ধ প্রকাণ্ড মুখটার দিকে চেয়ে ভড়কে যায় ইলিয়া, কেমন যেন শ্রদ্ধাও জাগে তার প্রতি। লোকটার মুখাবয়বে এমন একটা কিছু আছে যা জবরদস্ত এবং কঠোর।

ভ্রূজোড়া তুলে কড়িকাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আবার বলে নিকিতা এগোরিচ্ :

"বুক্ অফ্ জব্-এর দশম অধ্যায়টা ওকে একবার প'ড়ে শোনাও তো য়াশা?"

তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতা উল্‌টে, কম্পিত গদগদ স্বরে প'ড়তে শুরু করে জাকব :

"জীবনের দুঃসহ ভারে আত্মা আমার ক্লান্ত। আমার নালিশ আমারই থাক্। শুধু জানি বুক যেন পুড়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরকে ব'লবো—'হে ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ ক'রো না। আমাকে বুঝিয়ে দাও তোমার সংগে কোথায় আমার কলহ! যে-জীবনকে তুমিই সৃষ্টি ক'রেছো সে-জীবনকে তোমার কি ঘৃণা করা উচিত, উৎপীড়ন করা উচিত?'..."

চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে গলাটা বাড়িয়ে ইলিয়া বাইবেলের পাতাটা দেখবার চেষ্টা ক'রতেই জাকব ব'লে ওঠে :

"তোমার কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো তুমি!"

ধীরস্থিরভাবে টিপ্পনী কাটে নিকিতা এগোরিচ্ :

"বেয়াড়া নয়, বেয়াড়া নয়, ও একটা কাপুরুষ। সরাসরি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাইবার মতো শক্তি ওর নেই।"

এই ব'লে কড়িকাঠের দিক থেকে তার বিষণ্ণ দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে ইলিয়ার মুখের ওপর রেখে, অত্যন্ত কঠোর স্বরে—যেন কথার জাঁতায় ইলিয়াকে পিষে দিতে চায়—এইভাবে বলে নিকিতা :

"এখুনি যা পড়া হ'লো তার চেয়ে আরও অনেক বেশি দুঃখের কথা আছে। আছে বৈ কি! দ্বাবিংশ অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোক তো সরাসরি ব'লছে :

"'বুঝলাম, তুমি সৎ। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের আনন্দ কোথায়? বুঝলাম, তুমি নিষ্ঠাবান। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের লাভ কি?' এই কথাগুলো নিয়ে মানুষের বারেবার ভাবা উচিত, কেন না এতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা র'য়েছে।"

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া লুনেফ্:

"কিন্তু এগুলো কি আপনি ঠিকমতো বুঝতে পারেন?"

জ্যাকব ব'লে ওঠে: "কি যে বলো তার ঠিক নেই। নিকিতা এগোরিচ্ সব কিছুই বোঝেন।"

গলার আওয়াজটা আরও নামিয়ে নিকিতা কিন্তু বলে:

"বেলা আমার ফুরিয়ে এলো।—এখন আমার মৃত্যুকে বোঝা উচিত। একটা পা তো কেটে বাদ দেওয়াই হ'য়েছে—অন্যটাও ফুলছে—বুকের অবস্থাও ভালো নয়।—আমি জানি ম'রতে হবে আমাকে শিগ্গিরই।"

নিকিতার চোখের চাহনি ইলিয়াকে বিব্রত ক'রে তোলে।

চাপা গলায় ধীরে ধীরে ব'লতে থাকে নিকিতা:

"কিন্তু আমি ম'রতে চাই না।—জীবনে দুঃখ-অবিচার ছাড়া আর কিছুই পাই নি আমি। তাই ম'রতে চাই না। আনন্দ? আনন্দের ছিটে-ফোঁটাও জোটে নি আমার ভাগ্যে। ছেলেবেলাটা কেটেছে বাবার ভয়ে ভয়ে। আমার অবস্থাটা কী ছিলো তা জ্যাকবের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে। বাবার চাবুকের তলায় দাঁড়িয়ে মুখটি বুঁজে খাটতাম। আমার বাবা ছিলো নিষ্ঠুর, তার ওপর মাতাল। তিন তিনবার সে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো, তাছাড়া ফুটন্ত জলে একবার পুড়িয়েও দিয়েছিলো আমার পা দুখানা। মাকে কখনো দেখি নি। আমাকে জন্ম দিয়েই তিনি মারা যান। ধীরে ধীরে বড়ো হ'লাম। বিয়েও করলাম একদিন। মেয়েটি আমাকে ভালোবাসতো না—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বিয়ে ক'রলো আমায়। বিয়ের পর দুটো দিন গেলো। তিন দিনের দিন আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিলো। এদিকে আমার এক শালা পথে বসালো আমাকে, যা কিছু আমার ছিলো সবই লুটেপুটে নিলো। তারপর আমার বোন ব'ললো আমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে আমিই না কি দায়ী। শুধু সে কেন, সবাই ব'লতে লাগলো ঐ কথা, যদিও তারা জানতো যে আমার স্ত্রীকে আমি ছুঁইও নি। সে যখন একরত্তি ছুঁড়ি

তখনই সে নিজের আত্মাটাকে—থাক্ সে-কথা। এর পর ন'টি বছর একা কাটালাম। নিঃসঙ্গ জীবন যে কী ভয়ানক তা ব'লে বোঝানো যায় না হয়তো! ন'টি বছর ধ'রে আমি স্থখের স্বপ্ন দেখে এসেছি—স্থখের প্রতীক্ষা ক'রেছি। কিন্তু তারপর? আজ ম'রতে ব'সেছি। এই তো আমার কাহিনী—"

এই ব'লে একটু থেমে চোখদুটো বুঁজে জিজ্ঞাসা করে নিকিতা:

"এখন ভাবি: কিসের জন্যে এতো কষ্ট ক'রে বাঁচলাম? ব'লতে পারো কেন বাঁচলাম?"

মর্মন্তুদ কাহিনীটা শুনতে শুনতে ইলিয়ার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, বুকে তার ভয় ঢোকে। জাকবের মুখখানা ইতোমধ্যেই কালিবর্ণ হ'য়ে গেছে। তার চোখদুটো চকচক ক'রছে অশ্রুতে। কারোরই মুখে কোনো কথা নেই। ঘরখানা যেন থমথম ক'রতে থাকে।

"আমার একটি মাত্র প্রশ্ন: এতোদিন বাঁচলাম কিসের জন্যে?—ঈশ্বর আমার ওপর অবিচার ক'রেছেন। তাই এ-জীবনটাকে আরও কিছু দূর টেনে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ ক'রবো না তাঁকে। শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবি: এতোদিন বাঁচলাম কিসের জন্যে?"

নিকিতার গলা ধ'রে আসে। তারপর হঠাৎ সে নীরব হ'য়ে যায়। মনে হয়, একটা ঘোলাটে নদী যেন বইতে বইতে অকস্মাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেলো পাতালের মধ্যে।

চুপচাপ থাকতে না পেরে নিকিতা আবার ব'লে ওঠে:

"প্রাণের সংগে যার যোগ আছে তার জীবনে আশাও আছে। মরা সিংহের চেয়ে জীবন্ত কুকুরও ভালো।"

এ-সব কথা ইলিয়া আর যেন সইতে পারে না। তার বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। জাকবের সংগে করমর্দন সেরে নিকিতার সামনে সে এমনভাবে মাথা নোয়ায় যেন কারোর মৃতদেহের সামনে মাথা নোয়াচ্ছে। নিজের অজান্তেই ইলিয়া মাথাটা এইভাবে নুইয়ে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এবার হাসপাতাল থেকে ফেরবার সময় বুকের মধ্যে ক'রে সে এমন একটা অনুভূতি নিয়ে চ'লেছে যা অভূতপূর্ব এবং মর্মান্তিক।

নিকিতা এগোরিচের সংগে নানান কথাবার্তার পর বিশেষ কোনো চিন্তা তার মাথায় দানা বাঁধে নি সত্যি, তবে নিকিতার বিষণ্ণ মূর্তিটা ছবির মতোই আঁকা হ'য়ে গেছে তার মানসপটে। জীবনে অবিচার অত্যাচার ভোগ ক'রেছে এমন মানুষ সে দেখেছে বহু। নিকিতা এগোরিচ্ তাদেরই একজন। যেতে যেতে লোকটির কথাগুলো নিয়ে মনে মনে সে তোলাপাড়া কর'তে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে কথাগুলোর গোপন অর্থ। কিন্তু কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়, থেকে থেকে কেবল বুকটা উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন সব ওলট-পালট হ'য়ে গেছে।

শুধু তাই নয়। কতক ধারণা উড়ে গেছে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো, আবার কতক ধারণা জন্ম নিয়েছে নতুন যন্ত্রণা নিয়ে।

ইলিয়ার মনে হয় ঈশ্বরের সুবিচারের প্রতি তার যে একটা একাগ্র বিশ্বাস ছিলো, প্রবল ধাক্কা লেগে সেটা যেন ট'লে গেছে, এখন সে-বিশ্বাসের সে-জোর আর নেই, তাতে যেন পোকা ধ'রেছে, লোহায় যেন ম'রচে প'ড়েছে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিকিতার নালিশগুলো নিয়ে মনে মনে আলোচনা ক'রতে ক'রতে ইলিয়া এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছোয়। বুঝতে পারে, কেন তার মনটা এতো অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। তার মনে হয়, বুকের মধ্যে দুটো শক্তি পাঞ্জা ল'ড়ছে— একটা আগুন, অন্যটা জল। এদের মিলনও সম্ভব নয়। এই সব ভাবতে ভাবতে ইলিয়া হঠাৎ রেগে ওঠে; তার রাগটা গিয়ে পড়ে নিজের অতীত জীবনের ওপর, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ওপর, আগাগোড়া জীবনের সমস্ত কাঠামোটারই ওপর। রাগে ফুলতে ফুলতে মনে মনে সে বলে:

"চিন্তার গাছ গজাচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি, কিন্তু ফল ধ'রছে কৈ?"

অবশেষে ইলিয়া ঠিক করে চিন্তাগুলোকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এমন ক'রে নিজের হাতে বুকটাকে ছিঁড়ে লাভ কি? তার চেয়ে বরং আজ থেকেই তার চেষ্টা করা উচিত যাতে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিরিবিলি জীবনের স্বপ্নটা সফল হয়। মনে মনে বলে:

"লোকজনের সংগে মেলামেশা করা বন্ধ ক'রতে হবে দেখছি। এতে কারোরই কোনো লাভ হয় না। তাছাড়া এ-ভাবে বাঁচাও অসম্ভব।"

বহুক্ষণ ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে বিষণ্ণ বদনে ইলিয়া বাড়ি ফিরে আসে।

আভ্‌তনমফ্‌রা আজকাল আরও ভালো ব্যবহার করে তার সংগে। তার পিঠ চাপড়ে রসিকতা ক'রে বলে কিরিক্‌ঃ

"বুঝলেন মশাই, ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি বড়ো বেশি মাথা ঘামান। এমন শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক আপনি, আপনার কি উচিত এইভাবে দারিদ্র্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়া? থাকবেন আরামসে, তবে তো! ধরুন, যে-লোকটা অনায়াসেই পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর হ'তে পারে সে পাহারাওয়ালা হ'তে যাবে কোন্‌ দুঃখে?"

এদিকে তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না তাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেঃ

"ব্যবসার অবস্থা কেমন? হাতে কিছু জ'মছে তো? আসুন, হিসেব দিন, এ-মাসে মোটমাট কতো লাভ হ'য়েছে।"

তাতিয়ানার প্রতি তার শ্রদ্ধাটা রোজই বাড়তে থাকে। কেমন ক'রে সুখে শান্তিতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে জীবন কাটাতে হয় তা জানে এই মেয়েটি। তাই তাতিয়ানা কোনো প্রশ্ন করলে সানন্দে উত্তর দেয় সে—এতোটুকুও লুকোচুরি করে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা খোলা জানলার সামনে ব'সে অন্ধকার বাগানের দিকে চেয়ে ইলিয়া ওলিম্‌পিয়াদার কথা ভাবছে, এমন সময় রান্নাঘরে ঢুকে তাতিয়ানা তাকে চা খেতে ডাকলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গেলো রান্নাঘরে। তাতিয়ানার ডাকে তার চিন্তার সূত্রটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেলো ব'লে মনে মনে একটু বিরক্ত হ'লো সে। মুখ ভারি ক'রে চুপচাপ চায়ের টেবিলের সামনে ব'সে চোখদুটো একটু তুলতেই ইলিয়া দেখলো আভ্‌তনমফ্‌রা কেমন যেন চিন্তিত হ'য়ে র'য়েছে। তাদের মুখেও কথা নেই। এদিকে টগবগ ক'রে চায়ের জল ফুটছে কেৎলিতে, খাঁচার মধ্যে একটা পাখি হঠাৎ জেগে উঠে ডানা ঝাড়ছে পতপত ক'রে, তাছাড়া পেঁয়াজ আর ওডিকলোনের গন্ধে ঘরখানা মশ্‌গুল হ'য়ে র'য়েছে।

টেবিলের ওপর খটাখট তবলা বাজাতে বাজাতে কিরিক্‌ গুনগুনিয়ে উঠলোঃ

"তিম্‌-রিম্‌ তিম্‌-রিম্‌ তারা-রাম্‌-রাম্‌! বাম্‌-বাম্‌ ত্রাতাতা-ত্রাতাতা তা!"

গম্ভীরভাবে তাতিয়ানা ব'ললোঃ

"একটা জরুরী কথা আছে আপনার সংগে, ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌। আমরা একটা ব্যবসা ফাঁদবার চেষ্টা ক'রছি। তা নিয়ে আমার স্বামী আর আমি ভেবেওছি খানিকটা। মন দিয়ে একটু শুনুন।"

হাতের লাল্‌চে চেটো-দুখানা ঘ'ষতে ঘ'ষতে কিরিক্‌ হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বেশ খানিকটা অবাক হ'য়ে ইলিয়া তাকালো পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরটির দিকে।

"চুপ করো, কিরিক্‌! যখন তখন অমন ক'রে হেসো না!"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে একবার চোখ টিপে, মুচকি হেসে ব'ললো কিরিক্‌ঃ

"হ্যাঁ, ভেবে প্রায় ঠিক ক'রেই ফেলেছি আমরা! তাই না তানিয়া? একখানা মাথা বটে!"

"কিছু টাকা আমরা জমিয়েছি, বুঝলেন ইলিয়া য়াকফ্‌লিচ্‌?"

"জমিয়েছি ব'লে জমিয়েছি! জ'মে একেবারে বরফ হ'য়ে গেছে। কি বলো তানিয়া?"

এই ব'লে কিরিক্‌ আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

এবার চ'টে গিয়ে ধ'মকে উঠলো তাতিয়ানাঃ

"কি ক'রছো কিরিক্‌? চুপ করো। ব'ললাম না তোমায় চুপ ক'রতে?"

তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে ইলিযার চোখের ওপর নিজের চকচকে চোখ-দুটো রেখে, চাপা গলায় ব'ললো তাতিয়ানাঃ

"প্রায় হাজার দেড়েক টাকা জমিয়েছি আমরা।"

বাইরে বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে ইলিয়ার মনটা নেচে উঠলো।

"টাকাটা আছে ব্যাংকে, শতকরা চার টাকা সুদ পাচ্ছি।"

টেবিলে দুম ক'রে একটা ঘুসি মেরে কিরিক্‌ ব'লে উঠলোঃ

"ঐ ক'টা টাকায় কি হবে? ও তো নস্যি! আমরা চাই . "

কিন্তু কিরিক্‌ কথাটা শেষ ক'রতে পারলো না। তাতিয়ানার কঠোর চাহনি মাঝ-পথেই তাকে ঘায়েল ক'রে দিলো।

"অবিশ্যি শতকরা চার-টাকাই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা এটাও চাই যে আপনারও উন্নতি হোক। তাই ভাবছি আপনাকে সাহায্য করবো আমরা। এমন স্থিরমতি মানুষ আপনি, একটু সাহায্য পেলে নিশ্চয়ই উন্নতি ক'রবেন।"

এই ব'লে খানিকক্ষণ ইলিযার গুণগান ক'রে তাতিয়ানা আবার ব'লতে লাগলো :

"আপনি একবার ব'লেছিলেন যে, জরি রেশমের দোকান ক'রলে তার থেকে শতকরা বিশ টাকা কি তারও বেশি লাভ হ'তে পারে। লাভের পরিমাণটা অবিশ্যি নির্ভর ক'রবে মূলধনের ওপরই। শুনুন, আপনি যদি সত্যিই দোকান খোলেন তাহ'লে আমরা সেই বাবদ টাকাটা আপনাকে ধার দিতে রাজী আছি। তবে আপনাকে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হবে। টাকাটা শোধ ক'রবেন সাক্ষাতে, অন্য কোনো ভাবে নয়। কারবারটা চালাবেন আপনিই, কিন্তু আমাব মত না নিযে কোনো কাজই করা চ'লবে না। আর, লাভের অর্ধেক আপনার, অর্ধেক আমাদেব। দোকানের জিনিষপত্র কিন্তু ইন্‌শিওর ক'রতে হবে আমাবই নামে। এ-ছাডা আপনাকে আর একটা দলিল সই ক'রতে হবে—সেটা অবিশ্যি এমন কিছু হাতী-ঘোডা ব্যাপাব নয—তবুও কেতার খাতিবে করা দরকার। যা বলবাব ব'ললাম এখন আপনি ভেবে-চিন্তে হ্যাঁ না কিছু একটা ব'লে দিন।"

তাতিয়ানাব কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিযা কপাল চুলকোয আর মাঝে মাঝে দেযালের এককোণে টাঙানো কোনো এক দেবতাব ছবির চকচকে সোনালী ফ্রেমটার দিকে দেখতে থাকে। অবাক না হ'লেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে, খানিকটা ভয়ও করে তার। তবে, তাতিয়ানা যা দিতে চাচ্ছে তাতে তার বহুদিনের স্বপ্নটা সফল হ'তে পাবে—এই ভেবে ইলিযা যেমন ঘাবড়েও যায় তেমনি উল্লসিতও হয়।

বিব্রতভাবে মুচকি হাসতে হাসতে তাতিয়ানার ছোট্টো দেহটার পানে চেয়ে ভাবলো ইলিযা :

"এই আমার সুযোগ।"

এদিকে উদ্বিগ্ন জননীর মতো তাতিযানা ব'লতে থাকে :

"ভেবে দেখুন, ব্যবসাটার আনাচ-কানাচ খুঁটিযে খুঁটিয়ে বিচার করুন। এতো বড়ো একটা কাজ হাতে নেবার মতো শক্তিসামর্থ্য এবং জ্ঞানগম্যি আছে তো আপনার? ভাবুন, কেমন?—আচ্ছা, আর একটা কথা আছে। কষ্ট

স্বীকার করা ছাড়া এ-ব্যবসায় আপনি আর কি ঢালতে পারেন? আমাদের টাকা তো খুব বেশি নয়। তাই—বুঝতেই তো পারছেন—তাই না?"

ইলিয়া ধীরে ধীরে বললো:

"আটশো মতো টাকা আমি ঢালতে পারি। টাকাটা আমার কাকা হয়তো আমায় দেবেন। আপনাকে তো ব'লেইছি আমার এক কাকা আছেন, ইচ্ছে ক'রলে তিনি এ-ক'টা টাকা দিতে পারেন। চাই-কি এর বেশিও পেয়ে যেতে পারি তাঁর কাছ থেকে।"

কিরিক্ আভ্‌তনমফ্‌ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো: "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!"

তাতিয়ানা ইলিয়াকে ব'ললো: "মানে, আপনি তাহ'লে রাজী?"

"হ্যাঁ, রাজী।"

"রাজী ব'লে রাজী, একশো বার রাজী!" এই ব'লে পকেটে হাত গুঁজে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর কিরিক্ চীৎকার ক'রে উত্তেজিতভাবে ব'লতে লাগলো:

"এবার কিন্তু একটু শ্যাম্‌পেন্ চাই। তা না হ'লে আর জ'মছে না! চালাও শ্যাম্‌পেন্! আরে, ব'সে ব'সে ক'রছো কী ইলিয়া? যাও বাবা যাও, দৌড়ে গিয়ে কোনো মদের দোকান থেকে খানিকটা শ্যাম্‌পেন্ নিয়ে এসো। ইলিয়া সায়েবকে আজ আমরা না খাইয়ে ছাড়ছি না। কি বলো তানিয়া? হ্যাঁ, শুনুন···এই ছাখো আবার শুনুন কেন · শোনো ইলিয়া, মোড়ের মাথায় 'ডন্' নামে যে রেস্তরাঁটা আছে সেইখান থেকে নিয়ে এসো। আমার নাম ক'রলে বাজারদরের থেকে সস্তায় ছেড়ে দেবে'খন। ব'লবে—এক বোতল। বুঝলে? যাও, চট্ ক'রে চ'লে যাও!"

উল্লসিত আভ্‌তনমফ্‌দের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে ইলিয়া বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যেতে যেতে ভাবে: "এতোদিন ধ'রে ভাগ্য আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, গুরুতর একটা পাপও করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে, শান্তি এমন কি স্বস্তিও দেয় নি সে; কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে অনুতপ্ত হ'য়ে সে যেন নিজেই ক্ষমাভিক্ষা চাইছে, আমার যতো ক্ষতি সে ক'রেছে তা পূরণ করবার জন্যেই যেন সে আজ আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে।···হ্যাঁ, এবার আমার স্বপ্ন সফল হ'তে পারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিরিবিলি একটা জীবন এখন আমি সত্যিই গড়ে তুলতে পারি। একটা লোকের জীবন আমি নিয়েছি বটে, কিন্তু

এখন আমি কতো লোককেই তো সাহায্য ক'রতে পারি, আর এইভাবে ভগবানের সংগেও আমার একটা মিটমাট হ'যে যেতে পারে। তাই না? তখন ভগবান আমার ওপর আর অতোটা বিরূপ হ'য়ে থাকবেন না নিশ্চয়ই। তাঁর কাছ থেকে কীই বা লুকবো, তিনি তো সর্বজ্ঞ। ওলিম্‌পিয়াদা ঠিকই ব'লেছিলো খুন আমি করিনি, কেউ করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে। তাই কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমি যাতে আমার জীবনটাকে সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলতে পারি, মনের গ্লানিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিযে নিজেকে শুধরে নিতে পারি—এতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাত ছিলো।"

হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়া এই সবই ভাবতে থাকে। থেকে থেকে ওর মনে যেন কোকিল ডেকে ওঠে। বুঝতে পারে ওর বুকে আজ এমন একটা সাহস এসেছে যার কল্পনাও ও করে নি কোনো দিন।

দশ টাকা দিয়ে এক বোতল খাঁটি শ্যামপেন্ কিনে নিয়ে এলো ইলিয়া। দেখে, আভ্‌তনমক্ লাফিয়ে উঠলো:

"বহুত আচ্ছা। খাসা মাল এনেছো হে। জীতা রাহো বেটা।"

তাতিয়ানা কিন্তু ব্যাপারটাকে এ ভাবে নিলো না। মুখ বেজার ক'রে বোতলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিরিক্ষি গলায় ব'ললো:

"এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে এলেন তো? দেখছি আপনার এতোটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। না, না, এটা আপনার একেবারেই উচিত হয় নি, ইলিয়া যাকফ্‌লিচ্।"

তাতিয়ানার সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে আটখানা হ'য়ে এক মুখ হেসে ব'ললো ইলিয়া:

"কিন্তু একেবারে খাঁটি জিনিষ।" তারপর একটু থেমে, গম্ভীর গলায় আবার ব'লতে লাগলো: "জীবনে আজ এই প্রথম আমি খাঁটি মদে চুমুক দিতে যাচ্ছি। এর আগে কীই বা ছিলো আমার জীবনে? ছিলো শুধু দারিদ্র্য, নোংরামি, হট্টগোল, দুঃখ, যন্ত্রণা আর অপমান। এ-জীবনকে কি সত্যকার জীবন বলা যায়? শুধু এই নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? না, না, সত্যি ব'লছি, এর আগে আমি জানতামই না সত্যকার জীবন কী।"

হৃদয়ের যেখানে ব্যথা ঠিক সেইখানটিতেই হাত দিয়ে ফেলায়, ইলিয়ার গলা দিয়ে ক্ষোভ যেন উপচে পড়ে। মেঘলা চোখদুটো আভ্‌তনমফ্‌দের দিকে তুলে, মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস নিতে নিতে জোরালো গলায় ব'লতে থাকে ইলিয়া :

"শুধু আজ নয়, সেই ছেলেবেলা থেকে আমি সত্যকে খুঁজে আসছি। জীবনটা আমার কেটেছে স্রোতের মুখে এক টুক্‌রো খড়ের মতো। যেদিকে চেয়েছি শুধু দেখেছি ঘোলা জলের ঘূর্ণি। কোথাও টিকতে পারি নি, এক মুহূর্ত বিশ্রামও পাই নি। দুঃখ, অবিচার, চুরি-ডাকাতি—এ-ছাড়া আর কিছুই দেখি নি আমি আমার চারপাশে। তারপর একদিন আপনাদের কাছে এসে প'ড়লাম। এসে কি দেখলাম জানেন? জীবনে যা কোনো দিন দেখি নি তা-ই দেখলাম। এমন দুটি মানুষের সংগে আমার পরিচয় হ'লো যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'যে, শান্তিতে, পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে জীবন কাটাচ্ছে।"

এই ব'লে এক মুখ হেসে আভ্‌তনমফ্‌দের সামনে মাথা নুইয়ে আবার ব'লতে লাগলো ইলিয়া :

"আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কি ব'লবো, এক ভগবানই জানেন আপনাদের সাহচর্যে আমার বুকের ভার কতোটা নেমে গেছে। আপনারা আমাকে যা দিচ্ছেন তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হ'যে থাকবে। এখন আমি এগিয়ে যেতে পারি। আজ আমি বুঝতে পারছি কী ভাবে বাঁচতে হয়। এতে আমার নিজের ভালো তো হবেই, অপরেরও ক্ষতি হবার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীতে কতো হতভাগ্য মানুষই না আছে। এক আধটা নয়, কাতারে কাতারে মানুষ বৃথাই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে! এ-সব আমি নিজের চোখে দেখেছি কি না, তাই এর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি।"

গানে-বিভোর কোনো পাখির দিকে বেরাল যেভাবে চেয়ে থাকে, তাতিয়ানাও ঠিক সেইভাবে তাকিয়ে থাকে ইলিয়ার দিকে। তার চোখ দিয়ে যেন একটা সবুজ আলো ঠিকরে প'ড়তে থাকে, সেই সংগে তার ঠোঁটদুখানাও কেঁপে কেঁপে ওঠে। এদিকে কিরিক্‌ কিন্তু মদের বোতল নিয়েই ব্যস্ত। সামনে ঝুঁকে হাঁটু দুটোর মধ্যে বোতলটাকে চেপে ধ'রে সে তখন ছিপিটায়

হেঁচ্‌কা টান মারছে। গর্দানটা লাল হ'য়ে গেছে তার, কানদুটো ন'ড়ছে থেকে থেকে।

"শোনো দোস্ত্—হ্যাঁ, দোস্ত্‌ আমার দু'জন—একজন মেয়ে, আর অন্যজন—"

এমন সময় বোতলের ছিপিটা তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে কড়িকাঠ ছুঁয়েই আবার টেবিলের ওপর এসে পড়ে। ঠুং ক'রে শব্দ হয় একটা কাঁচের ডিশে। দেখা যায় ছিপিটা ঐ ডিশের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে।

তিন গেলাশ মদ ঢেলে একটা চুমকুড়ি দিয়ে ব'ললো কিরিক্‌ঃ

"নাও, তুলে নাও!"

তারপর, তার স্ত্রী এবং ইলিয়া গেলাশদুটো হাতে নিতেই নিজের গেলাশটা মাথার ওপর উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে চীৎকার ক'রে ব'ললো কিরিক্‌ঃ

" 'তাতিয়ানা আভ্‌তনমফ্‌ অ্যাণ্ড্‌ ইলিয়া লুনেফ্‌ কোম্পানী'-র বাড়বাড়ন্ত হোক্‌।—হুর্‌রে!"

ব্যবসাটা ফাঁদবার আগে তার খুঁটিনাটি নিয়ে বেশ কয়েকদিন আলোচনা চ'ললো ইলিয়া আর তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌নার মধ্যে। তাতিয়ানার কথাবার্তা শুনে মনে হ'লো সে যেন সারাজীবন ধ'রে এই জরি-রেশমের কারবারই ক'রে আসছে। ইলিয়া কথা ব'লবে কি, মেয়েটির জ্ঞান দেখে সে একেবারে হতবাক! চুপচাপ ব'সে মিটমিট ক'রে হাসা ছাড়া তার আর কোনো কাজ রইলো না। ইলিয়ার ইচ্ছা এখুনি একটা দোকানঘর খুঁজে নিয়ে ব্যবসাটা শুরু ক'রে দেয়। তাই, তাতিয়ানা আভ্‌তনমফের শর্তগুলো পুরোপুরি মেনে নেবার সময় সে একবার ভেবেও দেখলো না তাতে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে।

অবশেষে, এদিকের বন্দোবস্ত যখন সব পাকা, তখন দেখা গেলো দোকান ঘরের খোঁজও রাখে তাতিয়ানা। ইলিয়া ঠিক যেমনটি চেয়েছিলো এ যেন ঠিক তা ই। অর্থাৎ, দোকানঘরখানি ছোটো, তার সংগে লাগাও দোকানীর থাকবার একখানা ঘর, উপরন্তু পাড়াটাও ভালো। আগে এই দোকানে দুধ বিক্রি হ'তো। জিনিষপত্র ফেরি করবার সময় ইলিয়া বহুবার এসে এখান থেকে দুধ খেয়ে গেছে। তাই দোকানখানা ইলিয়ার খুবই পরিচিত। যাই হোক, ভালোয় ভালোয় সব বন্দোবস্তই হ'য়ে গেলো।

তার পরের দিনই ইলিয়া আনন্দে নাচতে নাচতে হাসপাতালে গেলো বন্ধুদের সংগে মোলাকাত ক'র্‌তে। গিয়েই ওর সংগে দেখা হ'য়ে গেলো পলের। পল্‌কেও বেশ হাসি-খুশি দেখালো।

ইলিয়াকে দেখেই পল্ উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলো :

"কাল চ'লে যাচ্ছি এখান থেকে। ভেরার একখানা চিঠি পেয়েছি। খুব গালমন্দ ক'রে লিখেছে : 'তুমি আমায় আঘাত দিয়েছো।' বোঝো ঠেলা! দুষ্টু আর কাকে বলে!"

পলের চোখদুটো চকচক্ ক'রে উঠলো, গালদুখানায় লাগলো গোলাপী আভা। স্থির হ'য়ে যেন দাঁড়াতেই পারছে না সে। কখনো হাত নাড়ছে, কখনো পা ছুঁড়ছে, কখনো বা মেঝেটা ঠুকছে চটির ডগা দিয়ে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

ইলিয়া ব'ললো তাকে :

"ওহে সাবধান, একটু সামলে।"

"কি যে বলো। শোনো ইলিয়া, সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। এখন শুধু গিয়ে ব'লবো: 'ভেরা, আমাকে বিয়ে ক'রবে কি না বলো। লক্ষীটি, দয়া ক'রে করো। কি, করবে না? তাহ'লে খুন ক'রে ফেলবো তোমায়।'

ব'লেই পল্ শিউরে উঠলো।

মিটমিট ক'রে হাসতে হাসতে ব'ললো ইলিয়া:

"কি জ্বালা। একেবারে খুন?"

"না, না, ইলিয়া, শোনো, আমি অনেক স'য়েছি। ওকে না পেলে আমি বাঁচবো না। তাছাড়া, ও কোন্ অধিকারে আমাকে ছেড়ে বাঁচতে চায়? নোংরা তো কম ঘাটলো না, এবার ওর আশ মেটা উচিত। যাই হ'ক, কালই এর একটা মীমাংসা হ'য়ে যাবে। হয় এস্-পার, না হয় ওস্ পার।"

পলের মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো:

"অবস্থা যা দেখছি, মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত খুন না ক'রে বসে।"

তারপর হঠাৎ এক মুখ হেসে সলজ্জভাবে ব'ললো:

"পাশুংকা, তোমায় একটা সুসংবাদ দি। আমার বরাত খুলে গেছে ভাই।" এই ব'লে ইলিয়া দু-চার কথায় গোটা ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দিলো পলকে।

সব শুনে, মাথাটা কাত ক'রে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পল্ ব'ললো:

"তোমার বরাতটা সত্যিই ভালো।"

"হিংসে হ'চ্ছে?"

"নিশ্চয়ই।—দুত্তোর্।"

"কি ব'লবো ভাই, সত্যি ব'লছি, নিজের সুখে নিজেই যেন লজ্জিত।"

পল্ বিষণ্ণভাবে ব'ললো:

"থাক্, থাক্, মুখ ফুটে যে ব'ললে এ-ই যথেষ্ট।"

"না, না, শোনো, বাহবা লোটবার জন্যে আমি এ-কথা ব'লছি না। ঈশ্বরের দিব্যি, আমি সত্যিই লজ্জিত।"

কোনো জবাব না দিয়ে পল্ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইলিয়া ব'ললো: "দুঃখের দিনে দুজনে একসংগে দুঃখ ভোগ ক'রেছি।

তাই ব'লছি, এসো, সুখের দিনে দুজনে একসংগে সুখও ভোগ করি।"

বিড়বিড়িয়ে পল্ ব'ললো: "কিন্তু লোকজনকে ব'লতে শুনেছি একজন নারী ছাড়া দ্বিতীয়জনকে নিয়ে না কি সুখ ভোগ করা যায় না।"

"খুব যায়! তুমি তো ইদানীং একটা পাইপ-ফিটারের কাছে কাজ ক'রছিলে, না? খোঁজ নাও যন্ত্রপাতি-সমেত এই রকম একটা কারখানা খুলতে কতো লাগে। টাকাটা আমি তোমায় দেবো।"

কথাটা বিশ্বাস ক'রতে না পেরে পল্ তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠতেই ইলিয়া তার একখানা হাত চেপে ধ'রে ধীরে ধীরে ব'ললো:

"ভারি আজব লোক তো তুমি! ব'লছি আমি দেবো।"

"তা কি কেউ দেয় না কি?"

"কি আশ্চর্য, ব'লছি দেবো, বিশ্বাস করো আমায়।"

অতি কষ্টে অনেক ঝুলোঝুলির পর ইলিয়া তাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করালো। তখন পল্ ইলিয়াকে জড়িয়ে ধ'রে গদগদ স্বরে ব'ললো:

"ধন্যবাদ ভাই, তুমি আমাকে গর্ত থেকে টেনে তুলছো। কিন্তু শোনো: আমি কারখানা চাই না—চুলোয় যাক কারখানা। ওটা যে কী চীজ্ তা আমি জানি। তুমি বরং আমায় টাকাটা দাও, আমি ভেরাকে নিয়ে এখান থেকে চ'লে যাই। এতে তোমারও লাভ, কারণ কম টাকা লাগবে। তাছাড়া, এতে আমারও সুবিধে। তারপর—অন্য কোথাও গিয়ে আমি নিজেই না হয় কোনো কারখানায় ঢুকে প'ড়বো।"

ইলিয়া ব'ললো: "এটা বাজে কথা! নিজের মনিব নিজে হওয়াই সবচেয়ে ভালো।"

হাসতে হাসতে পল্ ব'ললো: "তাহ'লেই হ'য়েছে, আমি হবো মনিব? মজুরদের সংগে কি ক'রে মিশতে হয় তা-ই জানি না আমি। না, না, ওসব নিজের কল-কারখানায় আমার কোনো দরকার নেই। মনিব হওয়ার মানে যে কী তা আমি জানি ভাই! ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। ছাগলকে কি আর শূয়োর বানানো যায়?"

পল্ কেন যে নিজের কল-কারখানা চায় না তা ঠিকমতো বুঝতে পারলো না ইলিয়া। তবে, কথাটা তার ভালোই লাগলো; আর সেইজন্য পলের প্রতি

তার দরদও গেলো বেড়ে। বন্ধুর দিকে মোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে ব'ললো ইলিয়া :

"তা সত্যি, তোমাকে দেখে ছাগলেব কথাই মনে প'ড়ছে, রঙে চেহারায় কি হুবহু মিল! জানো এখন তোমাকে ঠিক কার মতো দেখাচ্ছে?—পেফিশ্কা মুচির মতো। যাই হোক, কাল এসে আপাতত কিছু টাকা নিয়ে যেও, এখন তোমার তো চাকরি নেই।—এবার চলি। জাকবের সংগেও একবার দেখা ক'রে যেতে হবে।"

"আচ্ছা ভাই, এসো। অনেক ধন্যবাদ!"

"আজকাল জাকবকে তোমার লাগছে কেমন?"

মুচকি হেসে পল্ গ্রাৎচফ্ ব'ললো :

"কি জানি, ওর সংগে আমার তেমন বনে না।"

চিন্তিতভাবে ইলিয়া ব'ললো :

"বেচারা বড়ো দুঃখে আছে। তাই—"

"দুঃখ কার নেই বলো? আমার মনে হয় ওর মাথার ঠিক নেই। ও একটা গাড়োল।"

"আচ্ছা চলি।"

"এসো।"

ইলিয়া চ'লে যেতে বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্ তাকে আর-একবার ডেকে ব'ললো : "অনেক ধন্যবাদ, ইলিয়া!"

ইলিয়া মুচকি হেসে জাকবের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

গিয়ে দেখলো, জাকব বিস্ফারিত নেত্রে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে তার ছোট্টো কদর্য বিছানাটায় মনমরা হ'য়ে শুয়ে আছে। ইলিয়াকে সে প্রথমটায় দেখতেই পেলো না। তারপর বিষণ্ণভাবে ব'ললো :

"নিকিতা এগোবিচ্‌কে ওরা অন্য ঘরে নিয়ে গেছে।"

মনে মনে খুশি হ'য়ে ইলিয়া ব'ললো :

"ভালোই হ'য়েছে। যেমন চেহারা তেমনি বাক্যি। যেন একটা গুণ্ডা! গেছে যাক্, তাতে তোমার কি?"

কোনো কথা না ব'লে জাকব ইলিয়ার দিকে রুষ্টভাবে তাকালো।

একটু পরে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া: "এখন আছো কেমন? ভালোর দিকে তো?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জাকব জবাব দিলো:

"হ্যাঁ, ভালোই আছি। খুশিমতো একটু অসুস্থ হ'য়ে থাকবো তারও কি জো আছে? বাবা কাল আবার এসেছিলো। এসে ব'ললো: 'একখানা বাড়ী কিনেছি। আর একটা হোটেল খুলবো।' কি জ্বালা বলো তো, এই সব ঝক্কি প'ড়বে আমারই ঘাড়ে!"

ইলিয়া ভাবলো নিজের সুখবরটা দিয়ে জাকবকে একটু চাঙ্গা ক'রে তোলে, কিন্তু কি ভেবে কথাটা আর ব'ললো না।

বাইরে তখন ঝলমল ক'রছে বসন্তের সূর্য। মুঠো মুঠো রোদ ছড়িয়ে প'ড়েছে ঘরের মেঝেতে। হলদে দেয়ালগুলিকে দেখাচ্ছে আরও হ'লদে। ফাটা-চটা দাগগুলো হ'য়ে উঠেছে আরও স্পষ্ট। চুপচাপ বিছানার উপর ব'সে দুজন রোগী একমনে তাস খেলছে। ওদিকে ঘরময় নিঃশব্দে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে মাথায়-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আর একজন রোগী। তার জরাজীর্ণ দীর্ঘ দেহটার পানে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে কেউ কেউ। থমথম ক'রছে সারা ঘরখানা। তবে মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বুকফাটা কাশির শব্দ, আর সেই সংগে শোনা যাচ্ছে বারান্দার মেঝের ওপর চটি-ঘষার ক্ষীণ খশ্‌খশানি।

জাকবের ফ্যাকাশে মুখ আর ঝাপ্‌সা চোখদুটোর পানে তাকিয়ে ইলিয়ার দুঃখ হ'লো। একটু পরে ও শুনতে পেলো জাকব শুক্‌নো গলায় ব'লছে:

"যদি ম'রতে পারতাম! শুয়ে শুয়ে ভাবি: মৃত্যু আসুক, সে বরং অনেক ভালো। তখন কোনো ঝক্কি থাকবে না, আমাকেও কেউ দেখবে না, আর আমিও কাউকে দেখবো না। জীবনে শুধু হট্টগোল আর হানাহানি। কিন্তু মৃত্যুর দেশ—নিস্তব্ধ। সেখানে না বোঝবার কিছু নেই, সবকিছুই স্পষ্ট, সবকিছুই জ্যোতির্ময়!" এর পর জাকবের গলাটা ধ'রে এলো: "সেখানে থাকে দেবদূতরা। তাদের দয়ামায়া আছে। তারা সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারে, যে-প্রশ্নই করি না কেন তার জবাব তারা জানে!" এই ব'লে জাকব

কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেলো। ইলিয়া দেখলো কড়িকাঠের ওপর এক টুকরো বিবর্ণ রোদ কাঁপছে। জাকবের দৃষ্টি তাতেই নিবদ্ধ।

চোখদুটো নামিয়ে ইলিয়া ব'লতে গেলো: "জানো জাকব—"

কিন্তু জাকব তাতে বাধা দিয়ে ব'ললো: "মাশুৎকার সংগে দেখা ক'রেছো?"

"ন্ না।"

"কি আশ্চর্য, গিয়ে ওর সংগে একবার দেখা করা উচিত তোমার।"

"কি ক'রবো গিয়ে?"

"কি আর ক'রবে, দেখে আসবে কেমন আছে! হাজার হ'ক্ ছেলেবেলার বন্ধু তো!"

লজ্জিত হ'য়ে ইলিয়া একটি কথাও ব'লতে পারলো না। এমন সময় বারান্দা থেকে ছুঁচলো-গোঁফ-ওয়ালা একজন বেঁটেসেটে লোক লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকে, হাতে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একজন রোগীকে ব'ললো:

"শুর্কার কাণ্ড দেখো! আজও এলো না।"

লোকটার দিকে একবার চেয়ে ছটফট ক'রতে ক'রতে জাকব ব'ললো:

"নিকিতা এগোরিচ্ ম'রতে চায় না, কিন্তু ওকে ম'রতেই হবে। কাল ওর কথা জিজ্ঞেশ ক'রেছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সার্জনকে। উনি ব'ললেন: ও ম'রবেই! আশ্চর্য! এদিকে আমি ম'রতে চাই কিন্তু ম'রতে পারছি না। সেরে উঠে আবার আমাকে বাবার হোটেলেই যেতে হবে। বুঝতে পারছি ভদ্কাই আমার শেষ অবলম্বন!"

এই বলে বিষণ্নভাবে একটু হেসে ইলিয়ার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে জাকব আবার ব'ললো:

"এ-পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে ক'লজেটা হওয়া চাই লোহার। আর তা যদি না হয় তা'হলে ভেসে যেতে হবে আর-সকলের মতো—বিবেক-বুদ্ধির পরোয়া না ক'রেই।"

জাকবের কথাগুলো ইলিয়ার ভালো লাগলো না।

"আমার অবস্থা হ'য়েছে একগাদা পাথরের মধ্যে কাঁচের পুতুলের মতো। ন'ড়েছি কি—ভেঙে গুঁড়ো!"

ইলিয়া ব'ললো : "নালিশ করাটা তোমার যেন বিলাস!"

"আর তোমার বিলাসটা কী শুনি ?"

জাকবেব ঠোঁটে এক ফালি ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠলো।

মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইলো ইলিযা। তারপর যখন দেখলো যে জাকব আর কথাই ব'লছে না, তখন ব'ললো চিন্তিতভাবে :

"দুঃখী সকলেই। এই—পল্-এর কথাই ধরো না কেন।"

নাক সিটকে জাকব ব'ললো : "ওকে আমি দেখতে পারি না।"

"কেন ?"

"এমনি। ওকে আমাব ভালো লাগে না।"

"আমার কিন্তু ভালো লাগে।"

"তা লাগতে পাবে।"

"আচ্ছা, এবার তবে উঠি।"

ইলিযার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে জাকব হঠাৎ ভিখারীর মতো ব'লে উঠলো :

"মাশুৎকার সংগে একবার দেখা ক'রো, কেমন ? মনে থাকবে তো ? ভগবানের দোহাই—"

"আচ্ছা।"

এই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো :

"উঃ, বাঁচলাম এতোক্ষণ পরে। কাঁহাতক আর দুঃখের পাঁচালী শুনি ?"

তবে মাশার কথাটা ভেবে ও সত্যিই লজ্জিত হ'লো। না, না, পের্ফিশ্কার মেয়েটার প্রতি এতোটা উদাসীন হ'য়ে থাকা ওর কখনোই উচিত হয় নি! ইলিয়া ঠিক ক'রলো মাত্তিৎসার কাছে গিয়ে মাশার খোঁজটা নিয়ে আসবে। সে নিশ্চয়ই ব'লতে পারবে মাশা কেমন আছে, কারণ দুনিয়াশুদ্ধ সকলেই জানে যে মাতিৎসা প্রতি শনিবারে দোকানদার ক্রেনফের ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসে, এবং ধোয়া মোছা আদর চুমু—সব কিছু বাবদ আট গণ্ডা ক'রে পয়সাও পায় ক্রেনফের কাছ থেকে।

২৪

ফিলিমনফের হোটেলের দিকে যেতে যেতে ইলিয়া চিন্তায় ডুবে যায়। ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলো ময়ূরের মতো নাচতে থাকে তার বুকের মধ্যে। ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ফিলিমনফের হোটেলটা পিছনে ফেলে আসে তার খেয়ালই থাকে না, কিন্তু পরে সেটা টের পেয়ে আবার পিছনে ফিরে যেতেও কেমন যেন ইচ্ছা করে না তার।

দেখতে দেখতে শহরের সীমানা পেরিয়ে ইলিয়া এসে প'ড়লো এক বিরাট মাঠে। দূরে দেখা যাচ্ছে ধূসর বন। সামনে অস্তমান সূর্য। মাঠের কচি কচি ঘাসে গোধূলির সোনালী প্রতিফলন। দূরের—অনেক দূরের নিশ্চল, জ্বলন্ত মেঘখণ্ডগুলির দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে থাকে ইলিয়া। প্রতি পদক্ষেপে যেন ফুটে ওঠে এক একটি স্বপ্ন—রজনীগন্ধা ফুলের মতো। ইলিয়া ভাবে সে যেন ইতোমধ্যেই একজন জবরদস্ত বড়োলোক হ'য়ে গেছে এবং সর্বনাশ ক'রে ছেড়েছে পেত্রুহার। পেত্রুহা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদছে, আর সে—মানে—ইলিয়া লুনেফ্ তার দিকে চেয়ে কঠোর স্বরে ব'লছে:

"দয়াভিক্ষা চাও? লজ্জা করে না তোমার? তুমি কি কাউকে দয়া ক'রেছিলে? নিজের ছেলেটার ওপর অত্যোচার করো নি? আমার কাকাকে পাপের পথে ঠেলে দাও নি? আমার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো নি? দূর হও আমার সামনে থেকে। একটা দিনের জন্যেও কেউ সুখের মুখ দেখে নি তোমার ঐ অভিশপ্ত বাড়িতে। ওটা বাড়ি নয়, একটা ফাঁদ, একটা জেলখানা!"

তারপর পেত্রুহাকে ভিখারীর মতো কাঁপতে দেখে সে যেন আবার ধ'মকে উঠলো:

"তোমার ঐ বাড়িটাকে আমি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবো। রেখেই বা লাভ কি? ওটা তো মৃত্যুপুরী। তখন পথে পথে ঘুরবে তুমি, ভিক্ষা চাইবে তাদেরই কাছে যাদের তুমি সর্বনাশ ক'রেছো, আর এমনি ক'রে একদিন ক্ষুধায় যাতনায় কুকুরের মতো বমি ক'রতে ক'রতে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারে হারিয়ে গেলো মাঠখানা। দূরের বনটাকে দেখালো মিশ-কালো পাহাড়ের মতো। নিঃশব্দে উড়ে গেলো একটা বাদুড়। বহুদূর থেকে ভেসে এলো স্টীমারের চাকার শব্দ। মনে হ'লো একটা বিরাট পাখি যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। একে একে তার সমস্ত শত্রুকে মনে মনে ধরাশায়ী ক'রে, ঐ অন্ধকার নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠলো ইলিয়া।

এমন সময় একটা পচা গন্ধ তার নাকে আসতেই গান থামিয়ে সে ভাবলো: "জায়গাটা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে!" কিন্তু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে এবার, জেরেমিয়া-ঠাকুর্দার সংগে এইখানেই ও আসতো বটে জঞ্জাল খোঁচাবার জন্যে। শহরের সমস্ত আবর্জনা জমা হ'তো এইখানটায়। কিন্তু কোথায় গেলো জেরেমিয়া, আর কোথায় গেলো তার জিরোবার ঠাঁইটুকু? জেরেমিয়াও নেই, তাই তার জিরোবার ঠাঁইটুকুও চাপা প'ড়ে গেছে জঞ্জালের নিচে। ইলিয়ার মনে হ'লো, জীবনের অনেক কথাই হারিয়ে গেছে এই নির্জন মাঠের মধ্যে! অন্ধকার, এতো অন্ধকার!

ইলিয়া হঠাৎ ভাবলো:

"পলুএক্‌তফ্‌কে যদি খুন না ক'রতাম, তাহ'লে আমার জীবনটা হয়তো সুখেরই হ'তো!" কিন্তু সংগে সংগে কে যেন ব'লে উঠলো: "তার কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? সে তোমার দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ বটে, কিন্তু তোমার পাপের উপলক্ষ নয়।"

এমন সময় ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে একটা কুকুর ইলিয়ার পায়ের ওপর দিয়ে চ'লে গেলো। মনে হ'লো খানিকটা অতীত যেন গোঙাতে গোঙাতে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে। চ'ম্‌কে উঠে মনে মনে ব'ললো ইলিয়া:

"পলুএক্‌তফের কথা বাদ দিলেও মনে আমার শান্তি থাকতো না। অপমান তো কম ভোগ করি নি, তাছাড়া মানুষকে অপমানিত হ'তেও দেখেছি কম নয়! বুকে যদি একবার আঘাতের দাগ পড়ে সে-দাগ আর ওঠে না!"

হাঁটতে হাঁটতে তার পা দুখানা কেবলই জঞ্জালের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে। অবশেষে একটা গভীর খাতের ধারে পা ঝুলিয়ে ব'সে ইলিয়া তাকালো

নদীর দিকে। ইস্পাতের মতো নিথর হ'য়ে বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে নদীটা। নৌকোর আলোগুলো কাঁপছে থেকে থেকে—ছোটো ছোটো সিঁদুরে পাখির মতো। পায়ের তলায় হাঁ ক'রে র'য়েছে খাতটা। অন্ধকার থইথই ক'রছে তার মধ্যে। হঠাৎ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো ইলিয়া। ভাবলো: "এই একটু আগে আমার সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু খামকা এতো দুঃখ এসে জড়ো হ'লো কোত্থেকে? যেদিকে মানুষ যেতে চায় না জীবন তাকে ঠিক সেই দিকেই ঠেলে নিয়ে যায় কেন? হয়তো জাকবের কথাই ঠিক: 'সর্বাগ্রে নিজেকে জানা দরকার।' তবে, তারও আগে হয়তো চেনা দরকার অন্যান্য মানুষকে। কিভাবে তারা বাঁচে, কোন্ নিয়মে তাদের জীবন কাটে—এগুলো জানা দরকার,—তাই না? "কিন্তু জাকব আজ আমার সংগে এমন ব্যবহার ক'রলো কেন? আমি কি ওর বন্ধু নই?" কথাটা মনে ক'রে ইলিয়া আরও বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো: ভয়ে ভয়ে তারা ফুটছে, বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা লাল গোলকের মতো চাঁদ। একটার পর একটা বাদুড় উড়ে যেতে লাগলো তার মাথার ওপর দিয়ে। মনে হলো, একটার পর একটা স্মৃতি যেন অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। আরও বিষণ্ণ হ'য়ে গেলো ইলিয়া। ভাবলো: "মানুষ মানুষকে সর্বস্বান্ত ক'রছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে, গলা টিপে মারছে, তবু কেউ কাউকে সাহায্য ক'রছে না এতোটুকুও, তারপর দূরে স'রে এসে হয় তারা ঝগড় দেখছে আর নয়-তো নিরালা কোণ খুঁজছে। এদিকে আমিও তো হামাগুড়ি দিয়ে এমনই একটা নিরিবিলি ঘুপচির দিকে চ'লেছি। কিন্তু, সত্য কী? সত্য কোথায়?"

আকাশের দিকে আর একবার তাকালো ইলিয়া, খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো নক্ষত্র আর চাঁদের দিকে। এদিকে দু-এক ফালি জ্যোৎস্না থেকে থেকে শিউরে উঠছে কালো কালো ঝোপঝাড়ে আর অন্ধকার খাতের মধ্যে। কতকগুলো কুৎসিত ছায়া প'ড়েছে ঝোপগুলোর ধারে ধারে। ঠাণ্ডায় হাত-পা চিন্‌চিনিয়ে উঠতেই ইলিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে প'ড়লো। তারপর মাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে চ'ললো বাড়ির দিকে। মনটা তার খাঁ খাঁ ক'রছে। চিন্তা ক'রবে কি, একটা গভীর ঔদাসীন্য যেন চেপে ব'সেছে তার মনে।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হ'য়ে গেলো। সদরদরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া

ভাবতে লাগলো কড়া নাড়বে কি না। কড়া নাড়ার শব্দে যদি তাতিয়ানার ঘুম ভেঙে যায়? কিন্তু ক'রবেই বা কি? বাড়িতে ঢুকতে তো হবেই। তাই, আস্তে আস্তে বার দুয়েক কড়া নাড়লো ইলিয়া, আর প্রায় সংগে সংগে দরজাটা গেলো খুলে। ইলিয়া দেখলো স্বয়ং তাতিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

কেমন যেন অচেনা গলায় তাতিয়ানা ব'ললো ইলিয়াকে: "দরজাটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। ঠাণ্ডা আসছে। দেখছো না আমার গায়ে বিশেষ কিছুই নেই! আমার স্বামী বাইরে কি না, তাই - "

তাতিয়ানার মুখে অকস্মাৎ 'তুমি' সম্বোধন শুনে কেমন যেন একটু অবাক হ'য়ে ইলিয়া বিড়বিড় ক'রে ব'ললো: "ও হ্যাঁ......তাই তো, বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে।"

"রাত কতো হ'লো তার খেয়াল আছে? কোথায় ছিলে এতোক্ষণ?"

দরজায় খিল এঁটে জবাব দিতে গিয়েই ইলিয়া দেখলো তাতিয়ানার বুকখানা উঁচিয়ে আছে ঠিক ওর সামনেই। তাতিয়ানা পিছু হ'টলো না, বরং মনে হ'লো আরও যেন এগিয়ে আসছে ইলিয়ার দিকে। ইলিয়াও পিছু হ'টলো না। যাবেই বা কোথায়? পিছনে তো দরজা। এমন সময় তাতিয়ানা হঠাৎ হেসে উঠলো—খিলখিল ক'রে নয়, কেমন যেন মৃদু ঢেউ খেলিয়ে। ইলিয়া তাতিয়ানার কাঁধে ওর হাত দুখানি রাখলো, কিন্তু রাখতেই হাত দুখানা কেঁপে উঠলো উত্তেজনায়, কামনায়। ওর ইচ্ছা হ'লো তাতিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তাতিয়ানা হঠাৎ একটু স'রে গেলো, তারপর তার উত্তপ্ত বাহুযুগ দিয়ে ইলিয়ার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ব'লতে লাগলো পরিষ্কার গলায়:

"রোজ এতো রাত পর্যন্ত কোথায় ঘুরে বেড়াও বলো তো? কেন ঘুরে বেড়াও এমন ক'রে, অ্যাঁ? যা চাও তা তো তুমি এখানেই পেতে পারো মাণিক —যতো তোমার খুশি। সোনা আমার, রাজা আমার!"

ব'লতে ব'লতে উদ্দাম হয়ে ওঠে তাতিয়ানা। দুরন্ত হ'য়ে ওঠে তার কোমল দেহখানি। মাতালের মতো তার চুমুগুলো গিলতে গিলতে ট'লতে থাকে ইলিয়া। এদিকে বেরালের মতো ইলিয়ার বুকখানা আঁকড়ে ধ'রে তাতিয়ানা চুমু খেতে থাকে একটার পর একটা, আর ব'লতে থাকে: "সোনা আমার, রাজা আমার, মানিক আমার···!"

তাতিয়ানাকে কোলে তুলে নিয়ে ইলিয়া নিজের ঘরে চলে গেলো।

কিন্তু সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই ওর ভয় হ'লো: "কিরিকের সামনে এখন মুখ দেখাবো কি ক'রে?" শুধু ভয় নয়, লজ্জাও হ'লো সেই সংগে: "লোকটার ওপর আমার যদি রাগ থাকতো কিংবা তাকে যদি আমার ভালোও না লাগতো, তাহ'লে না হয় বলবার কিছু ছিলো না। কিন্তু সে তো কিছু করেনি, আমি তাকে শুধু শুধু আঘাত দিলাম, মস্তো বড়ো একটা আঘাত—এমনি, বিনা কারণেই—ছিছিছি—।" তাতিয়ানার ওপর মনে মনে চ'টে গেলো ইলিয়া। ভাবলো: কিরিক যেদিন জানতে পাববে ওর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী সেদিন না জানি কি বিপদই ঘটবে। "কিন্তু ঐ মেয়েটাই বা অমন ক'রে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো কেন আমার ওপর? যেন কদ্দিন আদরের মুখ দেখে নি..."। কথাটা ভেবে খানিক বিব্রত হ'লো ইলিযা, কিন্তু খুশিও হ'লো সেই সংগে। "তাতিয়ানা তো আব ওলিম্পিয়াদাব মতো একটা ব্যবসাদারের রাখা-মাগী নয়, সে হ'লো একজনের বিয়ে-করা বউ, রীতিমতো একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। তবে? হ্যাঁ, তাব মতো একটা সভ্যভব্য মেয়েও কি না আমাকে দেখে না ম'জে পারলো না। তাহ'লে?" আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে হামবড়ার মতো মনে মনে ব'ললো ইলিযা: "তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অসাধারণ। তবে, ব্যাপাবটা লজ্জারও বটে। · কিন্তু আমারও তো বক্তমাংসের শবীব, আমি তো আর পাষাণ নই। তাই ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি, দিতে পারতামও না হয়তো।"

ইলিয়া জোয়ান ছেলে, দশাসই, মজবুত। সত্যি, তার মতো মানুষ পাষাণ হবেই বা কি ক'রে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইলিয়া তাতিয়ানার আদর-সোহাগের কথা ভাবতে লাগলো। এর আগেও অনেক মেয়েব আদর-সোহাগ পেয়েছে সে, কিন্তু তাতিয়ানার আদর করবার ধবণটা একেবারেই আলাদা, তার আদরের স্বাদটাও ভিন্ন। সে যাই হ'ক, ইলিয়া প্র্যাক্‌টিকল্ মানুষ, অত শত চিন্তায় তার লাভ কি? এই ঘনিষ্ঠতা থেকে তাব যে বেশ কিছু লাভ হ'তে পাবে এইটুকু ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো ইলিয়া—নিজের অজান্তেই। কিন্তু সেই সংগে আরও অনেক চিন্তা ছেঁকে ধ'রলো তাকে:

"আবার সেই ঘুরেফিরে পাঁকের মধ্যে! কিন্তু আমি কি তাই চেয়েছিলাম?

এতোদিন সম্মান করতাম মেয়েটাকে, ওর সম্বন্ধে কোনো খারাপ চিন্তা ঢোকেই নি আমার মাথায়, কিন্তু ছাখো কিসে কি হ'লো!" কথাটা ভেবে দুঃখিত হ'লো ইলিয়া। কিন্তু একটু পরেই তার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দ্বিধা ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেলো একটিমাত্র খুশির তরঙ্গে:

"আর কিছুদিন পরেই তো আমার সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্নটি সফল হবে! নিরিবিলি বাসা—মুঠো মুঠো শান্তি—আঃ, প্রাণ জুড়িয়ে যাবে তখন!"

কিন্তু হ'লে হবে কি, আবার সেই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা: তবে তাতিয়ানাকে নিয়ে এই ব্যাপারটা না ঘ'টলেই ভালো হ'তো!"

আভ্‌তনমফ্‌ কাজে না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইলিয়া ইচ্ছে ক'রেই বিছানায় প'ড়ে রইলো। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলো, জিভে টাক্‌না দিয়ে কিরিক্‌ তার স্ত্রীকে ব'লছে: "তাহ'লে আজ দু-চারখানা মাংসের চপ্‌ ক'রছো, কি বলো? একটু কড়া করে ভেজো। এসে যেন দেখি ডিশ্‌ আলো ক'রে আছে, বুঝলে? আর শোনো তাতু, একটু বেশি ক'রে ঝাল দিও। আসবার সময় তোমার জন্যে বরং এক ঠোঙা মিষ্টি কিনে আনবো।"

আদুরে গলায় তাতিয়ানা ব'ললো: "হয়েছে, হ'য়েছে, এবার স'রে পড়ো দেখি? আহা, আমি যেন জানি না তুমি কি খেতে ভালোবাসো!"

"তবে লক্ষ্মী মেয়ের মতো এবার আমাকে একটা ছোট্টো করে চুমু খাও!"

চুমু খাওয়ার শব্দ শুনে ইলিয়া চ'মকে উঠলো। শুধু বিরক্তিকর নয়, নিতান্ত হাস্যকরও বটে ব্যাপারটা!

স্ত্রীকে চুমু খেয়ে আভ্‌তনমফ্‌ ব'ললো: "চুক্‌ চুক্‌ চুক্‌!"

তাতিয়ানা হেসে উঠলো। তারপর স্বামী বেরিয়ে যেতেই সদর দরজায় খিল দিয়ে লাফাতে লাফাতে ইলিয়ার ঘরে ঢুকে, সরাসরি তার বিছানায় ব'সে আব্দার ধ'রলো:

"তাড়াতাড়ি আমাকে একটা চুমু খাও। অনেক কাজ প'ড়ে র'য়েছে, তাড়াতাড়ি খাও!"

বিষণ্ণভাবে ইলিয়া ব'ললো: "কিন্তু একটু আগেই তুমি তোমার স্বামীকে চুমু খাচ্ছিলে না?"

খুশি হ'য়ে তড়াক্ ক'রে বিছানা থেকে নেমে হাসতে হাসতে জানলার পর্দাগুলো টানতে টানতে তাতিয়ানা ব'ললো :

"ইস্, হিংসে হ'চ্ছিলো বুঝি? তা ভালো। হিংসে যাদের বেশি তাদের ভালোবাসাও ক্ষীরের মতো ঘন।"

"না, না, সেজন্যে আমি ও-কথা বলিনি।"

ইলিয়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে আদুরে গলায় শাসালো তাতিয়ানা :

"আবার কথা? চুপ!"

চুম্বন-পর্ব শেষ হবার পর তাতিয়ানার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ইলিয়া না ব'লেই পারলো না : "আচ্ছা দস্যি মেয়ে তো তুমি? ভয়-ডর নেই তোমার? সোজাসুজি স্বামীর নাকের ওপরই এই সব কীর্তি ক'রছো?"

তাতিয়ানার চোখের সবুজ তারাদুটো লাফিয়ে উঠলো :

"এতে আর অবাক হবার কি আছে? এমনটা ঘ'টেই থাকে হরদম। তুমি কি মনে করো পৃথিবীতে এমন মেয়েমানুষ অনেক আছে যাদের গোপন প্রেমের ব্যাপার নেই? শোনো, যে-মেয়েগুলো কুচ্ছিত আর রুগ্ন, তাদেরই কেবল নেই। কিন্তু যে সুন্দরী তার প্রেমের খোরাক চাইই চাই—হরদম চাই।"

সারাটা সকাল ধ'রে তাতিয়ানা ইলিয়াকে শোনাতে লাগলো কেমন ক'রে স্ত্রীরা স্বামীদের বোকা বানায়—তারই কাহিনী। ব'লতে ব'লতে হাসিতে খুশিতে সে যেন ফেটে একেবারে ফুটি! লাল রঙের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে, আস্তিন দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে স্বামীর জন্যে মাংসের চপ বানাতে বানাতে তাতিয়ানা অবিশ্রাম ব'কতে লাগলো :

"তুমি বুঝি ভাবো কোনো মেয়েমানুষের পক্ষে একজন স্বামীই যথেষ্ট? না গো না। মাঝে মাঝে স্বামীকেও ভারি বিস্বাদ লাগে, এমন কি তাকে ভালো-বাসলেও! তা ছাড়া স্বামী মাত্রেই যেন গঙ্গাজল। ঘরে সে ভিজে বেরালটি, কিন্তু বাইরে গিয়েই একেবারে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম। স্ত্রীর চোখের আড়ালে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়, তা নিয়ে তার এতোটুকুও মাথাব্যথা থাকে না তখন। কেবল মনের মতো একটা জিনিষ পেলেই হ'লো, বাস্! কিন্তু মেয়েমানুষের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো দেখি? সারা জীবন ধ'রে কেবল হা স্বামী আর যো স্বামী। এ-সব কি ভালো লাগে?—মেয়েমানুষের স্বামী এক-

জন থাকে থাক, কিন্তু তাই ব'লে সে আর কোনো পুরুষের সংগে একটু হেসে খেলে বেড়াবে না? তাতেও তো মজা আছে, অন্ততপক্ষে জানা তো যাবে পৃথিবীতে কতো রকমের পুরুষ আছে, আর একজনের সংগে আর-একজনের তফাংটাই বা কোথায়! রোজই এক মদে চুমুক দিতে ভালো লাগে না বাপু, কেমন যেন পানসে ঠেকে। মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে নতুন মদ চাই বৈ-কি! কি, অবাক হ'লে?"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ইলিয়া তাতিয়ানার কথা শুনতে থাকে। নতুন কথা, চমক আছে। তবু কেমন যেন তেঁতো। এমন সময় ওর ওলিম্পিয়াদার কথা মনে পড়ে। ওলিম্পিয়াদা কথা ব'লতো ধীরে ধীরে, তার চলনে-বলনে ছিলো কেমন একটা মদির মন্থরতা। তাছাড়া তার প্রতিটি কথায় থাকতো নিবিড় আবেগ যা অন্তর স্পর্শ ক'রতো। অবশ্য ওলিম্পিয়াদার কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো না। সে ছিলো এক নগণ্য কেরাণীর মেয়ে—অতি সাধারণ মেয়ে। বেহায়া সে কম ছিলো না সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে একটা সারল্যও ছিলো। তাতিয়ানার দু-একটা কথার জবাব দিতে গিয়ে ইলিয়া জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু জোর ক'রে কি হাসা যায়? যাই হোক, তাতিয়ানার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে অবশেষে চিন্তিতভাবে ব'ললো ইলিয়া:

"তোমার জীবনটাকে মোটামুটি পরিষ্কার ব'লেই জানতাম। তোমার জীবনেও যে এ-সব ব্যাপার ঘ'টতে পারে তা আমি সত্যিই ভাবি নি।"

"জীবনের কথা ব'লছো? তাহ'লে শোনো, জীবনের ধর্ম সর্বত্রই এক। জীবনের কাঠামোটা তৈরি করে পুরুষ, আর সব পুরুষই চায় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম,—এক কথায় মানসিক ও দৈহিক তৃপ্তি। এর জন্যে তার টাকা চাই। তাই পুরুষের সর্বাগ্রে যা দরকার তা হ'লো টাকা। টাকা আসতে পারে তিন ভাবে: এক—উত্তরাধিকার-সূত্রে, দুই—বরাত জোরে, তিন—গতর খাটিয়ে। যারা কপালে বিশ্বাস করে, তারা দৈবের ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকে। খানিকটা লটারির টিকিটের মতো আর কি। মেয়েমানুষের লটারির টিকিট হ'লো তার রূপ। রূপ থাকলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু যাদের রূপ নেই, ধনী আত্মীয়স্বজনও নেই তাদের গতর খাটানো ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। তবে সারা জীবন ধ'রে কাজ করাটাও লজ্জার—বিশ্রী লজ্জার। আমার

দু-দুটো লটারির টিকিট আছে—মানে, বুঝতেই পারছো—তবুও আমি কাজ করি। শেষে ঠিক করলাম টিকিট দুখানা তোমার দোকানের কাজেই বাঁধা রাখা যাক্। রাখলামও তাই। কিন্তু দুখানা টিকিটই তো যথেষ্ট নয়। সারা জীবন ধ'রে মাংসের চপ বানাবো, আর একটা পুলিশ-ইন্স্পেকটরের ব্রণভর্তি মুখে চুমু খাবো—এতে আমার মন ভরে না। ভারি ক্লান্তি আসে। তাই তোমাকে চুমু খেতে চেয়েছিলাম।"

এই ব'লে ইলিযাব দিকে চেয়ে তাতিয়ানা দুষ্টুমিভরা গলায জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তোমার খুব খাবাপ লাগছে, না? আমাব দিকে অমন কটমট ক'বে দেখছো কেন? বাগ হ'যেছে?"

ঘরের দবজার ধারে দাঁড়িয়ে ইলিয়া ভ্রূ কুঁচকে মেযেটাব দিকে চেযে থাকে। তাতিয়ানা উঠে গিযে ইলিযার কাঁধেব ওপর হাত রাখতেই ইলিয়া ব'ললো : "না কৈ, বাগ তো করি নি।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠে তাতিয়ানা ব ললো :

"সত্যি না-কি? আহা, কি বরাত আমাব। ইলিযাসাহেবের কি দযাব শরীর!"

ধীবে ধীরে ইলিয়া ব'ললো : "তোমার কথা নিযেই ভাবছিলাম এতোক্ষণ। হয়তো তোমার কথাই সত্যি, কিন্তু তাহ'লেও এটা খাবাপ,—মানে, ভালো নয়।"

"মবি মরি, কতো ঢঙই জানো! কোন্‌টা ভালো নয় শুনি? বলো, বুঝিয়ে বলো।"

ব'লবে কি ছাই, ইলিযা কি জানে তাতিয়ানার কথার ভালো মন্দটা কোথায়? মেয়েটার কথাগুলো এমন যে বুঝেও বোঝা যায় না। ওলিম্পিয়াদা হয়তো এর চেয়েও খাবাপ কথা ব'লতো, কিন্তু সে-কথা যতোই খারাপ হোক, তা নিয়ে বিব্রত হবার কোনো কারণই থাকতো না। তাতিয়ানার কথা যেন বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, মগজে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। মেয়েটাকে সে আদৌ বুঝতে পারে না। সারাটা দিন ধ'রে ইলিয়া তাতিয়ানার কথা

নিয়ে ভাবে, তার এই অযাচিত ঘনিষ্ঠতার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

সেদিন বাড়ি ফিরতেই কিরিক্ সানন্দে ইলিয়াকে ব'ললো:

"আরে ইলিয়া, দেখো দেখো, তানিয়া আজ আমাদের জন্যে কি সব বানিয়েছে! মাংসের চপ তো নয় যেন এক একটি সঙ্গীত! ভয় নেই দোস্ত, তোমার জন্যেও খানকতক রেখেছি। কাঁধ থেকে তোমার ও-সব ঝোলাঝুলি নামাও। আরাম ক'রে ব'সে একবার কামড় দিয়ে দেখো—মাইরি ব'লছি—খাসা চপ—একেবারে তোফা—!"

কিরিকের দিকে অপরাধীর মতো চেয়ে, মুচকি হেসে ব'ললো ইলিয়া:

"ধন্যবাদ কিরিক্ নিকদিমিচ।"

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে আবার ব'ললো:

"আপনি বেজায় ভালোমানুষ,—সত্যিই ভালোমানুষ।"

হাত নেড়ে আত্মরক্ষার ভংগীতে ব'লে ওঠে কিরিক্:

"ধন্যবাদ কাকে দিচ্ছো হে ছোকরা? আমি যদি পুলিশের বড়োসাহেব হ'তাম তাহ'লে না হয় কথা ছিলো। এক ডিশ্ মাংসের চপের জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন? যাই হোক্, আমি কোনো দিনই পুলিশের বড়োসাহেব হ'তে পারবো না, আর তাছাড়া পুলিশের চাকরি ছেড়েই দেবো ভাবছি। কোনো ব্যবসাদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'তে পারলে মন্দ হয় না। ব্যবসাদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী বড়ো যে-সে চীজ নয় হে, যে-সে চীজ নয়। একবার হ'তে পারলে টাকার ভাবনা আর ভাবতে হবে না। রাতারাতিই বড়োলোক!"

এদিকে তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না আপন মনে গুন্ গুন্ ক'রতে ক'রতে উনুনের আশপাশে ঘুরঘুর ক'রতে থাকে। মেয়েটার দিকে চেয়ে ইলিয়া কেমন যেন বিব্রত হ'য়ে পড়ে। তবে ধীরে ধীরে এই বিব্রত ভাবটা নানান কাজের ভিড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে থাকে। এখন কি আর ব'সে ব'সে ধ্যান করবার সময় আছে তার? দোকান গুছোতে হবে, মালপত্র কিনতে হবে, তাছাড়া আরও অনেক কাজ বাকি।

দিন আসে দিন যায়। দেখতে দেখতে তাতিয়ানাকে তার স'য়েও যায়।

প্রথম-প্রথম ভদ্‌কা বিস্বাদ লাগে, কিন্তু খেতে খেতে ভদ্‌কাই হয় অমৃত। তাতিয়ানার আদর-সোহাগ দিনদিন বাড়তেই থাকে। এতে কেমন যেন লজ্জা পায় ইলিয়া, সেই সংগে ভয়ও ক'রতে থাকে মেয়েটাকে। এতোদিন সে তাতিয়ানাকে সম্মান ক'রে এসেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সম্মানটুকু মিইয়ে যেতে থাকে। প্রতিদিন সকালে স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলে কিংবা প্রতি সন্ধ্যায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাতিয়ানা ইলিয়াব ঘরে গিয়েই হোক কিংবা ইলিয়াকে নিজের ঘবে ডেকে এনেই হোক জীবনের খারাপ দিকটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। বলা বাহুল্য বক্তা তাতিয়ানা, শ্রোতা ইলিয়া। আলোচনা ব'লতে শুধু দেহ, ভালোবাসা আর টাকা। শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনে হয়, সে এমন এক দেশের গল্প শুনছে যেখানকার নারীপুরুষ এক নম্বরের শয়তান, যারা ন্যাংটো হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, আর যাদের একমাত্র আনন্দ হ'লো দেহের সম্ভোগ।

খানিক শোনবার পর ইলিয়া বলে: "এর সবই কি সত্যি?"

তাতিয়ানার গল্পগুলোকে সে বিশ্বাস ক'রতে চায় না, কিন্তু অবিশ্বাস করবার মতো কোনো কাবণও খুঁজে পায় না।

হাসতে হাসতে ইলিয়া'র মুখে চুমু খেয়ে তাতিয়ানা বলে:

"আমরা তো চুনোপুঁটি, শুরু করা যাক রুই কাৎলাদের নিয়েই, কি বলো? প্রথমে গভর্ণরের কথাই ধরো। সে থাকে কোর্ট অফ এক্সচেকারের ম্যানেজারের বউটাকে নিযে। এদিকে ম্যানেজার একটা কেরাণীব বউকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে রেখেছে সোবাচিপেরেউলকের একটা বাড়িতে। খুব বেশিদিনের কথা ব'লছি না, হালের ঘটনা এ-সব। হপ্তায় দুদিন ক'রে এই ম্যানেজার কেরাণীর বউটাকে দেখতে যায়। এ কথা কে না জানে? মেয়েটাকে আমি চিনি, অল্প বয়েস, বিয়ে হ'যেছে এই মাস দশেক আগে। এদিকে তার স্বামীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে সুপারভাইজার ক'রে কোন্ একটা জেলায়, সে ট্যাক্স আদায় ক'রে বেড়াচ্ছে। একেও আমি চিনি। একটা আকাট মুখ্যু, শিক্ষাদীক্ষায় অষ্টরম্ভা, নিরেট গাড়োল আর কি, যেমন খোসামুদে তেমনি বোকা। সে হ'লো কি না ট্যাক্সের সুপারভাইজার!"

এ-ছাড়া তাতিয়ানা ব্যবসাদারদের জীবন সম্বন্ধেও নানান গল্প বলে।

ব্যবসাদাররা না-কি অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নষ্ট করে, তাদের বউঝিরা না কি পরপুরুষের সংগে ঢলাঢলি করে, সম্ভ্রান্ত বংশের যুবতীরা না-কি গর্ভবতী হ'য়ে লুকিয়ে চুরিয়ে গর্ভ নষ্ট করে—এই সব গল্প।

শুনতে শুনতে ইলিয়ার মনে হয় জীবনটা যেন ড্রেন যার মধ্যে মানুষগুলো পোকার মতো কিলবিল ক'রছে।

ক্লান্ত হ'য়ে ইলিয়া বলেঃ "আঃ, পৃথিবীতে কি সুন্দর বলে কিছু নেই, পবিত্র ব'লে কিছু নেই? যদি থাকে তো তার গল্প শোনাও।"

অবাক হ'য়ে তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা করেঃ

"সত্য, সুন্দর, পবিত্র—তার মানে? কি ব'লতে চাও তুমি?"

চ'টে গিয়ে ইলিয়া চেঁচিয়ে ওঠেঃ "সত্য মানে সত্য। সত্য কি তা তুমি জানো না?"

"এতোক্ষণ ধ'রে আমি তো তোমায় সত্য কথাই ব'লছি, বাস্তব জীবনের খাঁটি সত্য কথা। আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো তুমি! তুমি কি ভেবেছো এসব গল্প আমি বানিয়ে বানিয়ে ব'লছি?"

"তা ব'লছি না। আমি যা ব'লতে চাই তা হ'লো এইঃ কোথাও কি এমন সত্য নেই যা সুন্দর, যা পবিত্র?"

বুঝতে না পেরে তাতিয়ানা হেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে তার কথাবার্তা অন্য পথেও যায়। ইলিয়ার মুখের পানে তার জলজ্বলে চোখদুটো তুলে সে প্রশ্ন ক'রে বসেঃ

"আচ্ছা, মেয়েমানুষ যে কী তা তুমি সর্বপ্রথম জানলে কি ক'রে বলো তো?"

ইলিয়ার গা ঘিনঘিন ক'রে ওঠে। তাতিয়ানার ওপর সে সত্যিই বিরক্ত হয়। সেই প্রথম অভিজ্ঞতাটুকু আজও তার কাছে লজ্জার বিষয় হ'য়ে আছে। চ'টে গিয়ে তাতিয়ানার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ইলিয়া তিরস্কারের সুরে জবাব দেয়ঃ

"কি সব নোংরা প্রশ্ন করো তুমি! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। পুরুষমানুষও পুরুষমানুষকে এমন প্রশ্ন করে না।"

তাতিয়ানা কিন্তু নাছোড়বান্দা। এ-প্রশ্নের জবাব ওর চাই-ই চাই। অবশেষে যখন ও দেখে যে ইলিয়ার মুখখানা রাগে দুঃখে ঘৃণায় অন্ধকার হয়ে

গেছে তখন ও বেপরোয়াভাবে ইলিয়ার পৌরুষকে জাগিয়ে তোলে এবং আদরে সোহাগে তাকে এমনভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় যেন ইলিয়া ওকে আর ঘৃণা করবার অবকাশই না পায়।

দোকানে ছুতোর লেগেছে। দেরাজ আলমারী তৈরী হ'চ্ছে। ইলিযাকে রোজই তদারক ক'রতে যেতে হয়। তদারকি সেরে সেদিন সে সবে বাড়ি ফিরেছে এমন সময় দেখে রান্নাঘরে ব'সে মাতিৎসা তাতিয়ানার সংগে গল্প ক'রছে। তাতিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে উনুনের ধারে, আর মাতিৎসা টেবিলের ওপর তার ভারি হাতদুখানা রেখে চেয়ারে ব'সে আছে। অবাক কাণ্ড! মাতিৎসা এলো কোত্থেকে?

মাতিৎসাকে দেখিয়ে তাতিয়ানা ব'ললোঃ

"এই যে, এই ভদ্রমহিলা তোমার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা ক'রছেন।"

চেয়ার থেকে অতি কষ্টে উঠে মাতিৎসা ব'ললোঃ

"কেমন আছো?"

"আশ্চর্য, তুমি বেঁচে আছো এখনো?" ইলিয়া অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে।

হেঁড়ে গলায় জবাব দিলো মাতিৎসা।

"যম আর নিচ্ছে কৈ।"

বহুদিন হ'লো ইলিয়া মাতিৎসাকে দেখে নি। আজ ওকে দেখে ওর আনন্দও হ'লো করুণাও হ'লো। মাতিৎসার গায়ে মোটা কাপড়ের একটা ছেঁড়াখোঁড়া ফ্রক মাথায় জড়ানো একখানা পুরণো রংচটা শাল, তার ওপর তার পা দুটো নগ্ন। দেয়াল ধ'রে ধ'রে পা দুখানাকে কোনো মতে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে এনে ইলিয়ার ঘরে ঢুকে মাতিৎসা একখানা চেয়ারে ঝুপ ক'রে ব'সে প'ড়লো। তারপর ব'ললো ভাঙা গলায়ঃ

"অক্কা পেতে খুব বেশি দেরি নেই। পা দুখানার দফা রফা। আজও হাঁটছি কোনো মতে। যেদিন তাও পারবো না সেদিন রোজগারের আশাও ছাড়তে হবে। তারপর অনাহারে মৃত্যু।"

মাতিৎসার মুখখানা বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। তার ওপর সারা মুখে কালো কালো দাগ। বড়ো বড়ো চোখদুটো প্রায় হারিয়ে গেছে চামড়ার ভাঁজে।

"আমার মুখের দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন? ভাবছো বুঝি কেউ মেরে আমার মুখখানা ফুলিয়ে দিয়েছে? না, না, তা নয়। অসুখে অসুখে আমার এই হাল হ'য়েছে।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো: "তোমার চ'লছে কি ক'রে?"

উদাসীনভাবে জবাব দিলো মাতিৎসা:

"গির্জের দরজায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকি, দু-চার পয়সা জুটেও যায়। সে-কথা থাক্। আমি তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি। পের্ফিশ্কা ব'ললো তুমি না কি কোন্ সরকারী চাকুরের সংগে আছো, তাই এলাম।"

ইলিয়া ব'ললো: "চা খাবে?"

মাতিৎসার ফুলো মুখখানার দিকে চেয়ে তার কেমন করুণা হ'তে থাকে।

"রাখো তোমার চা। আমাকে বরং আনা দুয়েক পয়সা দাও। কিন্তু তোমার কাছে কেন এলাম জানো?"

ব'লে মাতিৎসা হাঁপাতে থাকে।

"কেন?"

মাতিৎসার দিক থেকে ইলিয়া মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওর মনে পড়ে একদিন ও মাতিৎসাকে কী অপমানই না ক'রেছিলো।

"মাশাকে মনে পড়ে? ও, ভুলেই গেছো দেখছি। তা তো যাবেই, এখন তুমি বড়োলোক!"

ইলিয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিলো: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ-কি।"

"মনে প'ড়লেই বা কি, আর না প'ড়লেই বা কি। তাতে ওর তো আর কোনো উগ্গার হ'চ্ছে না।"

"মাশা আছে কেমন?—তার খবর কি?"

ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে মাতিৎসা টুক্ ক'রে ব'ললো:

"এখনো গলায় দড়ি দেয় নি—এই পর্যন্ত।"

চ'টে গিয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"হেঁয়ালী রাখো। যা বলবার সোজাসুজি বলো। আমার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছো কিসের জন্যে শুনি? তুমিই তো মেয়েটাকে পাঁচটা টাকার লোভে বেচে দিয়েছিলে।"

শান্তভাবে জবাব দিলো মাতিৎসা :

"তোমার ওপর মেজাজ দেখাবো কেন? তোমাকে দুষছেই বা কে? দুষছি আমি নিজেকেই।"

এই ব'লে মাতিৎসা মাশার কথা ব'লতে লাগলো :

"মেয়েটার খোয়ারের অন্ত নেই। অনেক পাপ করলে তবে এমন ভাতার ভাগ্যে জোটে, বুড়ো যেমন বুচুটে তেমনি হিংসুটে। মাশার ওপর দিনরাত অত্যাচার করে। মেয়েটাকে কোথাও যেতে দেয় না, এমন কি দোকানেও না। ছেলেপিলেগুলোকে নিয়ে মাশা দিনরাত্তির বাড়িতে মুখ গুঁজে ব'সে থাকে, এমন কি উঠোনে পা বাড়াতে হ'লেও তার ভাতারের অনুমতি দরকা'র। কিছুদিন হ'লো বুড়ো তার ছেলেপিলেগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে অন্য কোথাও। কোথায়, কি ক'রে যে সবালো কে জানে। এখন সে মাশার সংগে একলাই থাকে। মাশাকে খামচায়, কথা নেই বার্তা নেই মাশার হাতদুটো বেঁধে রাখে। মেয়েটাকে নিয়ে বুড়ো যেন ছিনিমিনি খেলছে। তার কারণ ওর প্রথম পক্ষের বউটা ছিলো স্বৈরিণী। ছেলেপিলেগুলোর কোনোটাই বুড়োর নয়। মাশা দু-দুবার পালিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু যাবে কোথায়? প'ড়লো পুলিশের খপ্পরে। পুলিশ তাকে এনে হাজির ক'রলো তার ভাতারের কাছেই—দুবারই। ফলে বুড়োর হাতে মেয়েটা মারধোর তো খেলোই, তার ওপর এমন ভাতার যে তার খাওয়াই দিলো বন্ধ ক'রে। এই হ'লো মাশার জীবন, আর কি ব'লবো—"

বিষণ্ণভাবে ইলিয়া ব'ললো :

"হুঁ, পের্ফিশ্কা আর তুমি দুজনে মিলে খুব কারবার ক'রেছিলে যা-হোক্!"

"ভেবেছিলাম এতে মাশার ভালো হবে। কিন্তু দেখছি এর চেয়েও খারাপ কিছু করা উচিত ছিলো। কোনো পয়সাওলা লোকের কাছে যদি ওকে বেচে দিতাম তাহ'লে বোধ হয় ও সুখে থাকতো। আমার কিন্তু সেই ইচ্ছেই ছিলো। পয়সাওলা লোকের কাছে বেচে দিলে মেয়েটা বাড়ি পেতো, জামা-জুতো পেতো, পেতো না কী, সবই পেতো। তারপর লোকটাকে কাজে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো জীবন কাটাতে পারতো—যেমন সকলে

কাটায়। অনেকের জীবনই তো এই ;—প্রথমে তারা শুরু করে কোনো বুড়োকে দিয়ে। তারপর, আস্তে আস্তে—”

“বুঝলাম। কিন্তু আমার কাছে এসেছো কেন ?”

মাতিৎসা ব’ললো : “শুনলাম তুমি পুলিশের লোকের সংগে থাকো, তাই এলাম। শোনো, মাশাকে পুলিশ কেবলই ধ’রে ধ’রে আনে। তোমার পুলিশ-বন্ধুকে ব’লো মেয়েটাকে যেন তারা রেহাই দেয়। ও পালিয়ে যাক। ওকে পালাতে দাও। চেষ্টা ক’রলে ও কোথাও না কোথাও পালিয়ে যেতে পারবেই। মানুষের কি পালাবারও জো নেই ?”

“তুমি কি সত্যি এইজন্যেই এসেছো ?”

“হ্যাঁ, এইজন্যেই এসেছি।”

“চুপ করো। তোমরা আবার মানুষ!” এই ব’লে ইলিয়া ভাবতে লাগলো মাশার জন্যে যদি কিছু করা যায়।

চেয়ার থেকে উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে মাতিৎসা দরজার দিকে এগোয়। হাঁটবার সময় পা দুখানাকে নিয়ে সে যে কী ক’রবে তা ভেবেই পায় না। মাতিৎসাকে দেখে মানুষ ব’লেই মনে হয় না। মনে হয় একটা পচা গাছ যেন ধীরে ধীরে মাটির ওপর এলিয়ে প’ড়ছে।

বিড়বিড় ক’রে ব’ললো মাতিৎসা :

“চলি। এই হয়তো শেষ দেখা। খুব শিগ্‌গীরই আমি ম’রবো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তোমায়। সেলাম বড়লোক, সেলাম।”

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মাতিৎসা বেরিয়ে যেতেই, ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে হাত দুখানা ইলিয়ার গলার চারধারে মালার মতো জড়িয়ে, হাসতে হাসতে ব’ললো তাতিয়ানা :

“ওই মেয়েমানুষটাই বুঝি তোমার প্রথম প্রেম ?”

মাশার কথা ভাবতে ভাবতে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক’রলো :

“কে ? কার কথা ব’লছো ?”

“কেন, ওই যে গো ওই হস্তিনীটি—যে একটু আগেই চ’লে গেলো।”

গলা থেকে তাতিয়ানার হাত দুখানা জোর ক’রে সরিয়ে দিয়ে রুক্ষ স্বরে

ব'ললো ইলিয়া : "পা নিয়ে ন'ড়তে পারছে না, তবু যাকে ভালোবাসে তার জন্যে ও এতো কষ্ট ক'রেও এ্যাদ্দূর হেঁটে এসেছে।"

বিস্মিতভাবে ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে কৌতূহল-ভরা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো তাতিয়ানা : "কাকে ভালোবাসে?"

ইলিয়া ব'ললো : "থামো, তাতিয়ানা থামো। সব কথা নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না।"

সংক্ষেপে মাশার জীবনকাহিনী শুনিযে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো তার প্রণয়িনীকে : "কি করা যায় বলো তো?"

ছোট্টো কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে তাতিযানা জবাব দিলো :

"কিছুই করবার নেই। আইন অনুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, আব স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিযে নিয়ে যাবাব হক কারোরই নেই।"

এর পর মিসেস আভ তনমফ অর্থাৎ তাতিযানা এমনভাবে কথা ব'লতে লাগলো যেন সমস্ত আইনকানুন তার নখদর্পণে, যেন সে বিশ্বাস করে এই সব আইনকানুনেব মার নেই। স্বামীর সবকিছুতেই যে মাশার সায দেওয়া উচিত এ-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বকবক কবার পর তাতিয়ানা ব'ললো :

"এখনকার মতো এ-সব তার মেনে নেওয়াই ভালো। মেনে নিতেই হবে, সহ্য ক'রতেই হবে। স্বামী তো বুড়ো, আজ বাদে কাল মারা যাবে, তখন সমস্ত সম্পত্তি মাশার হাতেই তো প'ডবে। এখন খারাপ লাগছে, কিন্তু তখন ও হ'য়ে যাবে একেবারে ঝাডা হাত-পা। তারপর তুমি সেই ধনী বিধবা যুবতীকে বিয়ে ক'রে ফেলবে—কি ব'লো?

হাসতে হাসতে আরও কিছুক্ষণ ধ'রে ইলিযাকে উপদেশ দেবার পর তাতিয়ানা ব'ললো :

"কিন্তু সবচেযে ভালো হয় তুমি যদি তোমার পুরণো বন্ধুদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দাও। এখন তারা তোমার যুগ্যি নয়। কি হবে তাদের বোঝা পিঠে ব'য়ে? যেমন নোংরা তেমনি অপদার্থ তারা। তোমার সেই বন্ধুটির কথাই ধরো না কেন—সেই যে সেই রোগা মতো লোকটা যার চোখ-দুটো শয়তানের মতো—যে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেলো—"

"গ্রাৎচক্?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই। ছোটোলোকগুলোর নাম কি অদ্ভুত: গ্রাৎচফ্, লুনেফ্, পেতুহফ্ স্ক্ভর্ৎসফ্। কিন্তু আমাদের মতো যারা তাদের নাম: আভ্তনমফ, কর্সাকফ্। আমার বাবা ছিলেন ফ্লোরিয়ানফ্ যখন ছোটো ছিলাম আমার সংগে একজন ছাত্র প্রেম ক'রতে আসতো, তার নাম ছিলো গ্লোরিযান্তফ্। একদিন সে আমার মোজার গার্টারটা খুলে নিয়ে গিয়ে শাসিয়েছিলো আমি যদি নিজে গিয়ে সেটা নিয়ে না আসি তাহ'লে সে আমার নামে কুৎসা রটাবে।"

তাতিয়ানার কথা শুনতে শুনতে ইলিয়া অতীতের তীরে ফিরে যায়। মনে হয় পেত্রুহা ফিলিমনধের বাড়িব সংগে কে যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বেখেছে; হয়তো সেই বাড়িখানা তাকে কোনোদিনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেবে না, হয়তো শান্তির দিনেও তা অশান্তির মতো তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

২৫

অবশেষে ইলিয়ার স্বপ্ন সফল হ'লো।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে সে তারিফ ক'রতে থাকে তার দোকানখানিকে। যেমন ফিটফাট তার দোকান, তেমনি সুপুরুষ সে নিজেও। চারিধারে বাক্সো—কোনোটি ছোটো, কোনোটি বড়ো—থাক্-থাক্ সাজানো আলমারীতে। জানলার শো-কেসে চক্‌চক্ ক'রছে পিতলের বক্‌লস্, হরেক রকমের ব্যাগ, সাবান, বোতাম, রঙবেরঙের লেস্ ফিতে রেশমী সুতো। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ ক'রছে চারিধার। রোদ্দুরে যেন হাসছে সবকিছু। খদ্দের এলে ইলিয়া তাকে বিনীতভাবে অভিবাদন জানায়, খুব যত্ন ক'রে জিনিষপত্র দেখায়। মাঝে মাঝে দর্জিরা আসে, দু-এক আনার সুতোটা ফিতেটা কিনে নিয়ে যায়। এদের সকলকেই ভালো লাগে ইলিয়ার। কিন্তু আনন্দে তার বুকের ভিতরটা নাচলেও বাইরে সে ধীরস্থির, গম্ভীর। জীবনটা যেন হঠাৎ সহজ হ'য়ে গেছে তার কাছে, কিছুটা আরামের আমেজও যেন লেগেছে তার দেহে মনে, সর্বোপরি অতীতের দিনগুলো যেন ভোজবাজির মতো বিলীন হ'য়ে গেছে বিস্মৃতির কুয়াশার অন্তরালে। এখন তার একমাত্র চিন্তা ব্যবসা, মালপত্র এবং খদ্দের। ফাইফরমাস খাটবার জন্যে একটা চাকরও রেখেছে সে, তাকে দিয়েছে ছাইরঙা একটা কোট, তাছাড়া ছেলেটি যাতে সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে সেদিকেও তার দৃষ্টি আছে সজাগ।

ইলিয়া বলে : "গাভ্রিক্, এসব সৌখীন জিনিস, আমাদের সাফসুতরো হ'য়ে থাকতে হবে, ময়লা যেন না লাগে, লাগলেই বিপদ।"

গাভ্রিকের বয়স প্রায় বারো। দিব্যি মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলে, নাকটা বোঁচা, মুখে বসন্তের হাল্‌কা দাগ, চোখের তারাদুটি ধূসর। লেখাপড়াও জানে গাভ্রিক্, সহরের ইস্কুলে প'ড়েছে। তার ধারণা সে এখনই যথেষ্ট বড়ো হ'য়ে গেছে। দোকানের মালপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে তার ভালোই লাগে। মালিকের মতো সেও খদ্দেরদের সংগে মিষ্টি ব্যবহার করবার

চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময় ঠিকমতো পেরে ওঠে না। কেউ যদি বাংলা পাঁচের মতো মুখ করে তাহ'লে তারও বাংলা পাঁচের মতো মুখ করা চাই। কেউ যদি তোতলায় তারও তোতলানো চাই। কেউ যদি খোনা হয় তারও খোনা হওয়া চাই। বিশেষ ক'রে বাচ্চা মেয়েদের দেখলে তাদের সংগে তার খুনসুড়ি করা চাইই চাই। কখনো-বা তাদের ধাক্কা মারে, কখনো-বা আস্তে ক'রে খিমচে দেয়, আবার কখনো-বা তাদের বিনুনি ধরে টান মারে। দোষের মধ্যে শুধু এই। নইলে গাভ্রিক লক্ষ্মী ছেলে। ছেলেটার দিকে চেয়ে ইলিয়ার মনে প'ড়ে যায় অতীতের সেই দিনগুলো যখন সে মাছের কারবারী স্ত্রোগানফের দোকানে কাজ ক'রতো। গাভ্রিক্‌কে ভালোবাসে ইলিয়া, তার সংগে দু-একটা ঠাট্টাও করে মাঝে মাঝে, তবে খদ্দের থাকলে নয়। ছেলেটাকে বলে: "গাভ্রিক্, হাতে কাজ না থাকলে বই প'ড়বি। বই পড়া ভালো, এতে মনমেজাজ ভালো থাকে, তাছাড়া সময়ও কাটে আরামে হুস্‌হুস্ ক'রে।"

ইলিযা বেশ কিছুটা অমাযিক ব'নে গেছে। দরদ যেন উপচে পড়ে তার কথায় বার্তায়। লোকজনের দিকে তাকিয়ে সে যখন মুচকি হাসে তখন মনে হয় সে যেন ব'লছে:

"আমাব বরাত ভালো। তোমরাও ধৈয ধ'রে থাকো। একদিন না একদিন তোমাদের বরাতও নিশ্চয় খুলে যাবে।"

রোজ সকাল সাতটায় দোকান খোলে ইলিয়া, বন্ধ করে রাত দশটায়। খদ্দেরের সংখ্যা খুব বেশি নয। দিনের বেলা দরজার ধারে চেয়ার পেতে ব'সে ইলিয়া আরামে রোদ পোয়ায়, ভাবেও না কিছু চায়ও না কিছু। গাভ্রিক্‌ও দরজার ধারটিতে ব'সে লোকজনের আনাগোনা দেখে, সুযোগ সুবিধা মতো মুখের কসরত করে, একে ওকে ভেংচায়, যতো রাজ্যের কুকুরকে ডাকে শিস দিয়ে, পায়রা কিংবা চড়ুইগুলোকে ঢিল মারে, মাঝে মাঝে বইও পড়ে অবশ্য। নিশ্বাস নেবার সময় তার নাকের চেহারা হয় অদ্ভুত। মাঝে মাঝে ইলিয়া বলে: "গলা ছেড়ে একটু পড়্, গাভ্রিক্, শুনি।" কিন্তু বইপত্র আর ভালো লাগে না ইলিয়ার। তার চেয়ে বরং সে ব'সে ব'সে শোনে নিজের হৃদয়ের গুঞ্জন। শুনতে ভালো লাগে, ভারি ভালো লাগে। এ যেন এক আশ্চর্য অনুভূতি—যেমন নতুন তেমনি মিষ্টি। মাঝে মাঝে তার ভয় করে, অজানা আশংকায় বুকটা কেঁপে

ওঠে, রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের ওপর যেন মেঘ ঘনিয়ে আসে। এই সময় তার গাম্ভীর্যের পাহাড় যায় ট'লে, চঞ্চল হ'যে ওঠে মন।

তখন ইলিয়া গাভ্রিকের স'গে কথাবার্তা শুরু করে।

"গাভ্রিক্ তোর বাবা কি করেন রে ?"

"বাবা ? বাবা হ'লো পিওন—চিঠি বিলি করে।"

"তোদের স'সারে খেতে অনেকগুলি, না ?"

"হ্যাঁ। খুব বড়ো সংসার আমাদের। কেউ কেউ সাবালক হ'য়েছে, কেউ কেউ এখনো নাবালক।'

"নাবালক ক'টি ?"

"পাঁচজন। সাবালক হ'য়েছে তিনজন। তিনজনই চাকরি করে। আমি চাকরি করি আপনার এখানে, ভাসিলি চাকরি করে সাইবেরিয়ার একটা টেলিগ্রাফ-অফিসে, আর সোনকা পড়ায়। খুব কাজের মেয়ে এই সোনকা, মাস গেলে প্রায় বিশ টাকা ঘরে আনে। এ-ছাড়া আছে মিশকা। তবে সে বিশেষ কাজের নয়, যদিও বয়সে আমার চেয়ে বড়ো। মিশ্‌কা এখনো ইস্কুলে প'ড়ছে।"

"তার মানে সাবালক চারজন, তিনজন নয়।"

অবাক হ'যে বলে গাভ্রিক্ :

"তা কেমন ক'রে হবে ? মিশ্‌কা তো এখনো প'ড়ছে। সাবালক তারাই যারা চাকরি করে।"

"খুব কষ্টে দিন যায় তোদের, না ?"

সোঁ সোঁ ক'রে নিশ্বাস নিতে নিতে ধীরে ধীরে বলে গাভ্রিক্ :

"তা তো যায়ই।"

তারপরই সে ব'লতে শুরু করে ভবিষ্যতে সে কী হ'তে চায়।

"বড়ো হ'য়ে আমি সৈনিক হবো। যুদ্ধ বাধলে চ'লে যাবো যুদ্ধ ক'রতে। আমার ভয়ডর নেই, আমি ভীষণ সাহসী।—সবচেয়ে আগে গিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর তারপর তাদের নিশান কেড়ে নেবো। আমার কাকা ঠিক এমনি ক'রে নিশান কেড়ে নিয়েছিলো। এর জন্যে জেনারেল গুর্কা কাকাকে একখানা মেডেল আর দশ দশটা টাকা দিয়েছিলেন।"

গাভ্রিকের থাঁদা নাকটার দিকে চেয়ে ইলিয়া মুচকি হাসে। মনে মনে বলে: "খাসা স্বপ্ন তো ছেলেটার?" রাত্রে দোকান বন্ধ ক'রে ইলিয়া কাউণ্টারের পিছনে ছোট্টো ঘরখানায় চ'লে আসে। গাভ্রিক্ জলভর্তি কেৎলিটা চাপিয়ে দেয় উনুনে। জল ফুটতে থাকে। একটু পরে চা তৈরি হ'য়ে যায়। টেবিলের ওপর রাখা হয় রুটি আর মাংস। এক গেলাশ চা আর খানিকটা রুটি খেয়ে গাভ্রিক দোকানে শুতে যায়, আর ইলিয়া টেবিলের ধারে চুপটি ক'রে বসে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে—কখনো এক ঘণ্টা কখনো-বা দুঘণ্টাও।

ইলিয়ার নতুন বাসাটি ছোটো। আসবাবপত্রের মধ্যে খান দুয়েক চেয়ার, একখানা টেবিল, একটা খাট আর কাপডিশ্ রাখবার একটি কাঠের র‍্যাক। ঘরখানা সরু, কড়িকাঠটা নিচু, রাস্তার ধারে একটা চৌকো জানলাও আছে। জানলার মধ্যে দিয়ে ইলিয়া দেখতে পায় পথ-চল্‌তি লোকজনের পা, সামনের বাড়ির ছাদ আর এক টুকরো আকাশ। একটা সিল্কের পর্দাও সে দিয়েছে জানলায়, কিন্তু লোহার গরাদগুলোকে সে একেবারেই বরদাস্ত ক'রতে পারে না। দেয়ালে একখানা ছবিও টাঙিয়েছে ইলিয়া। ছবিখানার নাম: "মানুষের জীবন।" দেখে খুশি হয় ইলিয়া। অনেক দিন থেকেই ছবিটা কেনবার সাধ ছিলো তার। কিন্তু দোকান খোলবার আগ পর্যন্ত কেনা হ'য়ে ওঠে নি, যদিও দাম বেশি নয়, মাত্র তিন আনা।

ছবিখানার মধ্যে ধাপে ধাপে মানুষের জীবন দেখানো হ'য়েছে। বাঁকা ভুরুর মতো যে খিলানটি আঁকা তার নিচে মর্ত্য, ওপরে স্বর্গ। স্বর্গে ব'সে ঈশ্বর এ্যাডাম আর ঈভের সংগে কথা বলছেন। রাশি রাশি ফুল তার চারিদিকে, জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে। মোটমাট সতেরোটি ধাপ দেখানো হ'য়েছে মানুষের জীবনের। মায়ের কোলে শিশু—এইটাই প্রথম ধাপ। নিচে লাল হরফে লেখা র'য়েছে: "এই শুরু"। তার পরে দেখা যাচ্ছে ছেলেটি ঢোল বাজিয়ে নাচছে। নিচে লেখা র'য়েছে: "বয়স পাঁচ বছর—খেলছে।" সাত বছর বয়সে তার "লেখাপড়ায় হাতেখড়ি"। দশ বছর বয়সে "স্কুলে যাচ্ছে"। বয়স যখন একুশ তখন সে বন্দুক হাতে নিয়ে মুচকি হাসছে। নিচে লেখা র'য়েছে: "সৈনিক।" পঁচিশ বৎসর বয়সে তার গায়ে কোট, বগলে টুপি, হাতে ফুলের তোড়া। এটা তার "বর-বেশ।" তারপর তার দাড়ি

গজিয়েছে, গায়ে একটা লম্বা ফ্রক-কোট, বুকের ওপর ঝুলছে গোলাপী টাই। হলদে গাউন-পরা নাদুসনুদুস একটি স্ত্রীলোকের পাশে দাঁড়িয়ে এখন সে তার করমর্দন ক'রছে। এর পরের ধাপে তার বয়স পঁয়ত্রিশ। নেহাই-এর সামনে দাঁড়িয়ে গায়ে একটা হাফ-শার্ট প'রে গরম লোহার ওপর হাতুড়ি পিটছে সে। তার পরের ধাপে দেখা যাচ্ছে একটা লাল ইজিচেয়ারে ব'সে সে খবরের কাগজ প'ড়ছে এবং তার স্ত্রী আর চারটি সন্তান তার পড়া শুনছে। এর পর তার বয়স পঞ্চাশ। মুখে একটা তৃপ্তির আমেজ, প্রচুর স্বাস্থ্য থইথই ক'রছে তার সর্বাঙ্গে। শুধু তারই নয়, স্ত্রীর এবং সন্তানগুলিরও চোখে মুখে সেই স্বাস্থ্য, সেই তৃপ্তি। সকলেরই পরণে ফিটফাট পোষাক, সকলেই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এর পরেই ধাপগুলো নিচে নামতে শুরু ক'রেছে। এখন তার দাড়ি পেকে গেছে, গায়ে একটা লম্বা হ'লদে কোট, কাঁধে ঝুলি, তাতে একটা মাছ, আর হাতে মগ। নিচে লেখা র'য়েছে: "সংসারের ঘানি"। এর পরের ধাপে সে নাতিকে আদর ক'রছে। তার পরের ধাপে সে অথর্ব, এখন তার বয়স আশি। শেষ ধাপে তার বয়স পঁচানব্বই। কম্বিনে পা দিয়ে ইজিচেয়ারে ব'সে আছে, আর যম দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে খাঁড়া হাতে নিয়ে।

টেবিলের ধারে ব'সে ইলিয়া ছবিখানা দেখে আর খুশি হয়। কতো সহজে আর কি সুন্দরভাবেই না ধাপে ধাপে দেখানো হ'য়েছে মানুষের জীবন। রঙগুলো কী সুন্দর। বাস্তব জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি যেন ধরা প'ড়েছে ছবিখানায়। বোঝা কতো সহজ। এই জীবনই তো আসছে, এই তো ভবিষ্যৎ। আশ্চর্য! ইলিয়া ভাবে তার জীবনও ঠিক এই ভাবে কাটবে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। একটির পর একটি ক'রে ধাপ। সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে যখন সে উঠবে, যখন তার অনেক টাকা জ'মে যাবে, তখন সে লেখাপড়া-জানা একজন সাদাসিধে মেয়েকে বিয়ে ক'রবে।

কেৎলিটা গুনগুন ক'রতে থাকে, মাঝে মাঝে শিস্ দেয়। জানলার মধ্যে দিয়ে ঝাপসা আকাশ উঁকি মারে, কিন্তু নক্ষত্রের দেখা পাওয়া ভার। মাঝে মাঝে দু-একটিকে দেখা যায়—চোখ পিটপিট ক'রছে—ভারি চঞ্চল।

ইলিয়া ভাবে: "হয়তো চল্লিশ বছর বয়সেই বিয়ে করা ভালো। মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা এক ঝামেলা! নিত্যি নতুন ফ্যাসাদ। এটা চাই, ওটা চাই,

এটা হয় তো ওটা হয় না, ওটা হয় তো এটা হয় না। ঝুট্ ঝামেলা। তবে হ্যাঁ, বিয়ে ক'রলে তিরিশ বছরের কাছাকাছি কোনো মেয়েকে বিয়ে ক'রবো। কিন্তু যদি দেরিতে বিয়ে করি তাহ'লে আবার ছেলেপিলে মানুষ হবার আগেই হয়তো মারা যাবো। সেও তো এক সমস্যা। তবে?"—

কেৎলিটা সমানে গুনগুন ক'রতে থাকে—যেন এক ঝাঁক মশা ডাকছে। কেমন যেন একটা নেশা-ধরিয়ে-দেওয়া শব্দ! সবকিছু গুলিয়ে যায়। যাই হোক, কেৎলির মুখটা খোলাই রাখে ইলিয়া। কি হবে ঢাকা দিয়ে? নতুন বাসায় আসা অবধি নিত্য নূতন অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছে সে। আগে আগে সে থাকতো লোকের ভিড়ের মধ্যে—আড়াল ব'লতে ছিলো শুধু পাতলা কাঠের পার্টিশান। কিন্তু এখন তার চারধারে পাথুরে দেয়াল, মানুষজনের সান্নিধ্য থেকে সে এখন অনেক—অনেক দূরে।

ছবিখানার দিকে চেয়ে ইলিয়া মনে মনে বলে: "মানুষকে ম'রতেই বা হবে কেন?"

ঠিক এই সময় জাকব ফিলিমনফের কথাগুলো মনে প'ড়ে যায় ইলিয়ার। জাকব ব'লতো: "ম'রে আরাম আছে।"

হঠাৎ এ-সব চিন্তা আর ভালো লাগে না ইলিয়ার। চিন্তাগুলোকে সে যেন জোর ক'রে মগজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়।

আবার প্রশ্ন জাগে: "ভেরাকে নিয়ে পল্ কেমন আছে কে জানে!"

ঘড়ঘড় ক'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ি চলে যায় রাস্তা দিয়ে। জানলার শার্শিগুলো কেঁপে ওঠে। দেয়ালের বাতিটা ওঠে চ'মকে। দোকানঘর থেকে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসে; ঘুমের ঘোরে গাভ্রিক বিড়বিড় ক'রছে। ঘরের কোণে নিরেট অন্ধকারের তালগুলো যেন দুলতে থাকে। টেবিলে কনুই রেখে হাতের চেটো দিয়ে রগ চেপে ধ'রে ইলিয়া আবার ছবিখানার দিকে তাকায়। ঈশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছে একটা সিংহ, একটা কচ্ছপ হেঁটে চ'লেছে মাটিতে বুক দিয়ে, একটা শেয়ালও র'য়েছে তার পাশে, একটা ব্যাঙ্ লাফাচ্ছে, আর জ্ঞান-বৃক্ষে ফুল ফুটেছে—রক্তের মতো লাল। কফিনে-পা-দেওয়া বুড়ো লোকটার দিকে চেয়ে ইলিয়ার পলুএক্তফের কথা মনে প'ড়ে যায়। ঠিক পলুএক্তফের মতো দেখতে। মাথায় টাক, অস্থিচর্মসার দেহ, গলাটাও তেমনি সরু। ধপ্

ক'রে পায়ের শব্দ হয় রাস্তায়। দোকানের পাশ দিয়ে কে যেন চ'লে যায় একটু পরেই। কেৎলির গুন্‌গুন্‌নি থেমে যায়, আর অন্ধকার নিরেট পাথরের মতো ইলিয়ার বুকের ওপর চেপে বসে।

পলুএক্‌তফের কথা মনে প'ড়লে এতোটুকুও বিচলিত হয় না ইলিয়া। আসলে কোনো চিন্তাই তাকে কাবু ক'রতে পারে না। মাঝে মাঝে সে একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে এই যা। খুব চিন্তিত হ'লে ছবিখানার রঙগুলো একটু ফিকে দেখায়, আর নিস্তব্ধ ঘরখানা যেন আরও একটু নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়। পলুএক্‌তফের খুনের ব্যাপারটা মনে প'ড়লেই ইলিয়া মনে মনে বলে: "জীবন যখন আছে, জীবনে ন্যায় অন্যায়ও আছে। কেউ যদি পাপ করে বা অন্যায় ক'রে তাকে শাস্তিও পেতে হবে একদিন—হয় আজ আর নয় তো কাল।" কিন্তু এ-কথা ভেবেই সে ঘরের অন্ধকার কোণটার দিকে তাকায়, তাকিয়ে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করে। তারপর পোষাক ছেড়ে, আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাতিটা একেবারেই নিবিয়ে দেয় না। সলতেটাকে একবার তোলে একবার নামায়। শিখাটা একবার হারিয়ে যায়, তারপরই আবার লাফ দিয়ে চিমনির মধ্যে নাচতে থাকে। শুয়ে শুয়ে ইলিয়া অন্ধকারের মধ্যে কী যেন খোঁজবার চেষ্টা করে, মনে হয় দৃষ্টি দিয়ে সে যেন অন্ধকারের নিরেট প্রাচীরটা ভেদ করবার চেষ্টা ক'রছে।

অবশেষে ছটফট ক'রতে ক'রতে শিখাটা নিবে যায়। অন্ধকার থইথই ক'রতে থাকে ঘরখানায়, কিন্তু তখনো মনে হয় প্রদীপের শিখাটা যেন নাচছে, যেন শেষবারের মতো অন্ধকারের সংগে তার বোঝা-পড়া ক'রে নিচ্ছে। জ্যোৎস্না থাকলে জানলার গরাদগুলোর কালো কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে টেবিলে, মেঝের ওপর। এক টুকরো আকাশ চেয়ে থাকে ইলিয়ার মুখের পানে। বেশ ক'রে কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয় ইলিয়া, কেবল মুখখানা খোলা থাকে। তারপর এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে এক রাশ বোবা অন্ধকারের মধ্যে। ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙে, বেশ ফিটফাট মনে হয় নিজেকে। গতরাত্রের চিন্তাগুলোর কথা ভেবে বেশ খানিকটা লজ্জিত হয় সে। কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে গাভ্রিকের সংগে চা খায়। প্রতি সকালেই দোকানখানাকে যেন নতুন লাগে তার।

ফুরসৎ পেলে পল্ মাঝে মাঝে দেখা ক'রে যায় ইলিয়ার সংগে। হাতে কালি মুখে কালি জামায় তালি প্যান্টে কালি—সে এক অভিনব চেহারা হয় পলের। পল্ আবার এক পাইপ-ফিটারের দোকানে কাজ ক'রছে। তার হাতে থাকে একটা টিনের কেৎলি, কয়েকটা লোহার পাইপ আর মাঝারি সাইজের একটা হাতুড়ি। মাঝে মাঝে তার সংগে একটা ঝুলন্ত উনুনও থাকে। পল্ সর্বদাই ব্যস্ত। বাড়ি আর বাড়ি। বাড়ি ছাড়া সে যেন আর কিছুই জানে না। ইলিয়া বলে :

"এতো তাড়া কিসের ? ব'সো, দুদণ্ড কথাবার্তা বলি। এই তো এলে, এর মধ্যেই বাড়ি ?"

"না ভাই, ব'সতে পারবো না। কেবলই মনে হয় বাড়িতে যে-পাখিটিকে রেখে এসেছি সে বুঝি খাঁচা ভেঙে পালিয়ে গেলো। সারাদিন চুপটি ক'রে একা একাই ব'সে থাকে সে। কী ভাবে কে জানে! জীবনটা নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগে তার কাছে। সব বুঝি, ভাই, সব বুঝি। যদি একটা বাচ্চা হ'তো !"

এই ব'লে পল্ গ্রাৎচফ্ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

একদিন সে ইলিয়াকে ব'ললো : "বাগানে জল তো ঢেলেছি, এখন বাগান ভেসে না যায় !"

আর একদিনের কথা। ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো : "কি হে, কবিতা-টবিতা লিখছো আজকাল ?"

মুচকি হেসে জবাব দিলো পল্ :

"লিখছি বৈ কি, আকাশে আঙুল দিয়ে। চুলোয় যাক কবিতা! বাঁধাকপির ঝোল খেয়ে আর ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে কবিতা হয় না। হে কবিতা হয় না। মাথাটা যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। সারা দিন ধ'রে আমি শুধু আমার পাখির কথাই ভাবি। হয়তো পাইপ ফিট ক'রছি কিংবা হাতুড়ি চালাচ্ছি ঠিক এই সময় তার স্বপ্ন দেখি। এই তো ছন্দ—কি বলো? হা-হা-হা! অবিশ্যি—থাক্ সে-কথা। কিন্তু বুঝলে ভায়া, আমি যা, আমার পাখিটি ঠিক তা নয়। মেয়েটার কষ্ট হ'চ্ছে—হ্যাঁ, তা একটু হ'চ্ছে বৈ কি !"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো : "শুধু তার, তোমার হ'চ্ছে না ?"

"ওর হ'চ্ছে ব'লে আমারও হ'চ্ছে। আর একটু যদি সুখে রাখতে পারতাম ওকে! দেখে বুঝতে পাবি ও একটু হেসে-খেলে জীবন কাটাতে চায় মোটামুটি হাসিখুশিতেই ও এতোদিন জীবন কাটিয়েছে তো, তাই। সর্বদাই টাকা পয়সাব স্বপ্ন দেখছে ও। মাঝে মাঝে বলে: 'কোথাও থেকে যদি কিছু টাকা পেতাম তা'হলে সব কিছু বদলে যেতো। আমি বেজায় বোকা। আমার উচিত ছিলো কোনো ব্যবসাদারকে হাতিয়ে কিছু টাকা বাগিয়ে নেওয়া।' এই সব আবোল-তাবোল বকে ও, আমার ওপর করুণা ক'রেই অবিশ্যি। বুঝি, সব বুঝি। জানি ওর ভাবি কষ্ট হ'চ্ছে।"

তারপর হঠাৎ শশব্যস্ত হ'য়ে পল্ দৌড়ে চ'লে যায়।

পের্কিশ্‌কা-মুচি প্রায়ই আসে ইলিয়াব সংগে দেখা ক'রতে [illegible]। জামা, ছেড়া প্যাণ্ট। কখনো পিঠেব খানিকটা দেখা যায়, কখনো-বা হাঁটুটা বেরিয়ে থাকে। চুল উশ্‌কো-খুশ্‌কো, যেমন বোগা তেমনি [illegible] তার চেহারা। মাঝে মাঝে তার ছোট্টো হার্মোনিযমটাও সে সংগে আনে। — দরজায় পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে ইলিযাকে ফিলিমনফের বাড়ির এবং জাকবেব নানান খবব দিয়ে যায়। বলে:

"পেত্রুহা বিয়ে ক বেছে। বউটার গতব কুমড়োব মত, আর যে-ছেলেটা তার মায়ের সংগে এসেছে সে যেন গাজরটি। বাগান হে বাগান, একেবারে ফলাও কারবাব। বউটা মোটা, বেঁটে, গায়ের বং লাল, মুখখানা হাঁড়িব মতো, মুখে তিন থাক্ মাংস। দেখলে মনে হয় মুখ তিনটে, হাঁ কিন্তু একটা। চোখ দুটো ঠিক শূয়োরেব মতো, ওপব দিকে চাইতেও পারে না। এ হেন মায়ের ছেলেটা কিন্তু ঢ্যাঙা, তার গায়ের রং হ'লদে, চোখে আবার এক জোড়া চশমা। একেবারে এ্যারিস্টোক্যাব্যাট্ আব কি। ছোড়াটার নাম সাভ্‌ভা, কথা কয় নাকিসুরে, মায়ের সামনে যেন ভিজে বেবালটি, কিন্তু মায়ের চোখেব আড়ালে এমন দুষ্কর্ম নেই যা সে করে না। বাড়ি একেবারে গুলজাব। জাকবকে দেখলে মনে হয়, ইঁদুরের মতো সে যেন কেবলই লুকোবার গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারা লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায় আব কাশে। সেই সেবাব মার দিয়ে ছেলেটার লিভারের হয়তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে পেত্রুহা। দেখে শুনে মনে হয় ওরা সবাই মিলে ওকে গিলতে যাচ্ছে। ছেলেটা একটু কোমল প্রকৃতির

ওরা ওকে পিষে মারবে না সত্যি, তবে স্রেফ গিলে হজম ক'রে ফেলবে একদিন। তোমার কাকা কিয়েভ্ থেকে চিঠি লিখেছে। আমার মনে হয় এতোটা কষ্ট সে না ক'রলেই পারতো। কুঁজোর হয়তো আর স্বর্গে যাওয়া হবে না। যেতে দিলে তো যাবে? এদিকে মাতিৎসার পা দুখানা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে, তাকে এখন চাকা-লাগানো চেয়ারে বসিয়ে ঠেলাঠেলি ক'রতে হয়। কোথা থেকে একটা অন্ধ লোককে ভাড়া ক'রেছে সে। সে-ই চেয়ার ঠেলে। হেসে আর বাঁচি না! কিন্তু খোঁড়া হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সে রোজগার ক'রতে বেরোয়। মাতিৎসা মানুষ ভালো! মানে, আমার বউ যদি অমন লক্ষ্মী না হ'তো তাহ'লে আমি এই মাতিৎসাকেই বিয়ে ক'রতাম। পৃথিবীতে দুটিমাত্র দরদী মেয়েমানুষ দেখলাম: এক আমার বউ, আর এই মাতিৎসা। মদ অবিশ্যি খায় ও। ভালো মানুষ হ'লে কি মদ খেতে নেই? ভালো মানুষ মাত্রেই মাতাল।"

ইলিয়া তাকে মনে করিয়ে দেয়:

"আর মাশুৎকা—তার খবর কি?"

মেয়ের নাম শুনেই পেফিশকার হাসিখুশি এক মুহূর্তে উবে যায়, ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে, বিষণ্ণ হ'য়ে যায় তার মুখখানা। মিনমিন ক'রে বলে সে:

"তার কোন খবরই আমি জানি না। ক্রেনফ্ সরাসরি শাসিয়ে রেখেছে: 'মেয়ের ছায়া মাড়িয়েছো কি আমি তার মুখের চেহারাই বদলে দেবো।' মদ খাবো, কিছু পয়সা দাও ইলিয়া যাকফ্লিচ্!"

বিষণ্ণ মুখে বলে ইলিয়া: "তুমি ম'রতে বসেছো পেফিলি।"

"ঠিক তাই। ম'রতেই ব'সেছি। তবে আমি ম'রলে অনেকেরই দুঃখ পাওয়া উচিত। কেন জানো? আমি নিজে যেমন হাসিখুশি, মানুষকে আনন্দও দিয়েছি তেমনি। সকলেই তো কাঁদে, ছটফট করে, পাপ করে আর পাপের জন্যে গোঙায়। পাপ আর ঈশ্বর, ঈশ্বর আর পাপ! কিন্তু আমি? আমি শুধু গান গাই, হাসি আর হাসাই। ছোটো পাপই করো আর বড়ো পাপই করো, ম'রতে তো হবেই একদিন। শয়তানের হাত থেকে কি রেহাই পাবে? কিন্তু জগৎজোড়া কান্নার মধ্যে এমন একজন থাকা চাই যে হাসবে, যে হাসাবে। তাই না?"

হাসতে হাসতে, ঠাট্টা তামাসার ফোরণ দিয়ে পের্ফিশকা যখন এসব কথা বলে, তখন দুঃখিত হয় ইলিয়া। মুচকি হেসে বিদায় জানায় তাকে। কিন্তু দুঃখে ওর বুকের মধ্যেটা তোলপাড ক'রে ওঠে। অথচ এ-দুঃখের দরকারই বা কি, দামই বা কি! অতীতের দিনগুলো এখনো যেন জাপ্‌টে ধ'রে রয়েছে ইলিয়াকে, থেকে থেকে চঞ্চল ক'রে তুলছে তাকে। শান্তি নেই স্বস্তি নেই— এ যেন এক বিষম জ্বালা! পের্ফিশকা কিংবা পল্ যখন তাদের দুঃখের কাহিনী শোনায় তখন সে মনোযোগের ভাণ করে। মনে মনে বলে: "গেলে বাঁচি। আর কতো দুঃখের গান শুনবো? আর পারছি না, সত্যি পারছি না।" বিশেষ ক'রে পলের কথাবার্তা শুনে দুঃখ পায় ইলিয়া, কি ক'রবে কি ব'লবে কিছুই ভেবে না পেয়ে বিব্রতভাবে টাকা-পয়সা গুঁজে দেয় পলের হাতে, তার-পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে:

"আর কিভাবে তোমায় সাহায্য ক'রবো বলো? এ-ছাড়া আমি আর কিই বা ক'রতে পারি? আমার মতে ভেরার সংগে তোমার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়াই উচিত।"

শান্তভাবে বলে পল্:

"তা পারি না, কিছুতেই পারি না। যাকে দরকার নেই তাকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ভেরাকে যে আমার বড়ো দরকার। আমি তাকে কাছে রাখতে চাই। আমার মতো অনেকেই তাকে চায়। ভেরাকে তারা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলে ইলিয়া, ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি না। হ'তেও পারে। হয়তো কেবল যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি ওকে ভালোবাসি। তাও হ'তে পারে। কিন্তু আমার সুখই বলো আর শান্তিই বলো সবই হ'লো ওই ভেরা। সত্যিই কি ওকে ছেড়ে দেবো? তা যদি দিই তা'হলে আমার কি থাকবে? না, আমি ছাড়া কেউ পাবে না ওকে। ওকে যদি খুন ক'রতে হয় তাও স্বীকার, তবু আমি ওকে ছেড়ে দেবো না কিছুতেই।"

ব'লতে ব'লতে পলের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, সেই সংগে তার মুঠোদুটো শক্ত হ'য়ে যায়।

চিন্তিতভাবে ইলিয়া বলে:

"কাউকে ঘুরঘুর ক'রতে দেখো না কি ওর আশপাশে ?"

"না, তা তো দেখি না।"

"তবে কারা ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার কাছ থেকে ?"

"মনে হয় এমন একটা শক্তি আছে যা নিয়ে যাচ্ছে, ইলিয়া। আমার বাবার সর্বনাশ হ'য়েছিলো একটা মেয়েমানুষের জন্যে। হয়তো আমার কপালেও তা-ই লেখা আছে।"

ইলিয়া লুনেফ বলে : "তোমাকে সাহায্য করা অসম্ভব পল্।"

পের্ফিশকার জন্যে ইলিয়ার দুঃখ হয বটে, কিন্তু পলের জন্যে তার বুক যেন ফেটে যেতে চায়। পল্ যখন রেগে ওঠে তখন তার বুকের মধ্যেও একটা রাগের আগুন দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে। মনে হয়, কোনো অদৃশ্য শত্রু পলের জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। একবার মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় না এই শত্রুটাকে? ইলিয়া জানে এতোটা বিচলিত হওয়া হয়তো তাব উচিত নয়, দুঃখ করারও হয়তো কোনো দরকার নেই তার। এ-ক্ষেত্রে দুঃখ ক'রেই বা লাভ কি? আর, রাগ ক'রেই বা লাভ কি ? তা সত্ত্বেও কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তার মনটা।

ভ্রূ কুঁচকে বিষণ্ণভাবে বলে পল্ গ্রাৎচফ্ :

"আমি জানি তুমি আমাকে সাহায্য ক'রতে পারবে না। ক'রবেই বা কি ক'বে, আর কেই বা ক'রবে ? পৃথিবীতে মানুষের অভাব নেই, কিন্তু তাহলেও মনে রেখো আমরা একা। গতর খাটাও, আর মুখ বুঁজে থাকো—এই তো নিয়তি। তারপর একদিন মৃত্যু এসে টেনে নিয়ে যাবে ভাগাড়ে।"

ইলিয়ার মুখেব দিকে চেয়ে আবার বলে পল্ :

"বেশ তো আরাম ক'রে দোকান খুলে ব'সেছো ; কিন্তু তুমি হয়তো জানো না কোন্ শক্তি কী ভাবে তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যে তৈরি হ'চ্ছে। তার চোখে হয়তো ঘুমই নেই।"

অবজ্ঞাভরে জবাব দেয় ইলিয়া :

"ঠিক তা নয় হয়তো। আমি নিজেই দাঁড়াবো নিজের পায়ে। আমাকে হার মানানো অতো সোজা নয়।"

"হ'য়েছে, হ'য়েছে, বড়াই রাখো। তুমি কি ভাবো সারাটা জীবন মালপত্র বেচেই কাটিয়ে দেবে ?"

"তাছাড়া আর কি ক'রবো ?"

"কোন্ দিন হয়তো দেখবে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে কিংবা তুমি হয়তো নিজেই পাত্তাড়ি গুটিয়ে ব'সে আছো।"

হাসতে হাসতে বলে ইলিয়া :

"পাত্তাড়ি গুটোলে তো, না কি এমনি এমনি ?"

কিন্তু গ্রাংচফ্ তবুও তর্ক ক'রতে ছাড়ে না। বন্ধুর চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে :

"আমি ব'লছি পাত্তাড়ি গুটোবে। এক নাগাড়ে চুপচাপ ব'সে থাকা তোমার ধাতে সইবে না। হয় মদ ধ'রবে আর নয় তো গোল্লায় যাবে—দুটোর একটা ঘ'টবেই ঘ'টবে তোমার জীবনে।"

অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া :

"কিন্তু কেন ?"

"কেন আবার কি ? যা ঘ'টবে তা-ই ব'ললাম। আরামের জীবন তোমার সইবে না। মানুষটা তুমি ভালো—এক কথায় দরাজ-দিল। এ-রকম মানুষ আরও আছে। সারাটা জীবন তারা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকে, তারপর হঠাৎ একদিন—"

"হঠাৎ একদিন কি ?"

"পড়ে আর মরে।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠে হাতের শক্তিশালী পেশীগুলোয় একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলে ইলিয়া :

"যতো সব বাজে কথা।"

কিন্তু রাত্রে চা খাওয়ার সময় পল্ গ্রাংচফের কথাগুলো মনে ক'রে সে যথেষ্ট চিন্তিত হয়। দোকান খোলবার আগে আনন্দের আতিশয্যে তাতিয়ানা আভ্‌তনমফের সব শর্তই সে নির্বিচারে মেনে নিয়েছে, এমন কি পলুএকতফের প্রায় ছ'শোটি টাকাও সে ঢেলেছে এই কারবারে। কিন্তু অংশীদার হওয়া তো দূরের কথা, এখনো পর্য্যন্ত সে যেন দোকানের একটা কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নয়। কথা নেই বার্তা নেই হিসেব দেখাও তাতিয়ানাকে। এটা কি, ওটা কি, এটা কেন এমন হ'লো, ওটা কেন অমন হ'লো—আশ্চর্য !

দোকানের কর্মচারী হবার জন্যে কি সে অতোগুলো টাকা কারবারে ঢেলেছিলো ? এই সত্যটি আবিষ্কার ক'রে ইলিয়া বেজায় চ'টে ওঠে। মনে মনে তাতিয়ানার উদ্দেশে বলে : "বুঝেছি। চুমু খেয়ে তুমি আমার পকেট মারতে চাও। সে গুড়ে বালি।" সংগে সংগে সে ঠিক ক'রে ফেলে বাকি টাকাটাও কারবারে ঢেলে দোকানখানা সে কিনে নেবে এবং তাতিয়ানার সংগেও সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে। খব সহজেই এই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলে ইলিয়া। আজকাল তাতিয়ানাকে যেন একটা ভারি বোঝার মতো মনে হয়। তার আদর সোহাগও আর ভালো লাগে না।

একদিন সে সরাসরি বলেওছে তাতিয়ানাকে :

"কি বেহায়া মেয়েমানুষ তুমি, তানিয়া।"

জবাবে তাতিয়ানা হেসেছে একটু। ইলিয়াকে কাছে পেলেই তার গল্প জুড়ে দেওয়া চাই। গল্পের মধ্যে অবশ্য মধ্যবিত্ত চাকুরে কিংবা ব্যবসাদারদের জীবন-কাহিনী।

শুনতে শুনতে একদিন ব'লেছে ইলিয়া :

"যা ব'লছো তার সবটাই যদি সত্যি হয়, তাহ'লে তোমাদের সুন্দর জীবন তোমাদেরই থাক্। এ-জীবনের দাম কানা কড়িও নয়।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব'লেছে তাতিয়ানা আভ্‌তনমফ্ :

"কেন ? এমন ফুর্তির জীবন, এতে খারাপটা কোথায় শুনি ?"

"হ্যাঁ, খুব ফুর্তির জীবন ! দিনের বেলা পেটের চিন্তা আর রাত্তির বেলা লাম্পট্য। না, না, কোথাও নিশ্চয়ই গলদ আছে।"

"আচ্ছা নিরামিষ তো তুমি ! তবে শোনো বলি—"

এই ব'লে তাতিয়ানা আবার শুরু ক'রেছে তার গল্প। যে জীবনের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ সেই জীবনের বীভৎস রূপটাও প্রকট হ'য়ে প'ড়েছে ইলিয়ার সামনে।

ইলিয়া ব'লেছে : "কিন্তু এটা কি ভালো ?"

"আচ্ছা ভালো-বাগীশের পাল্লায় প'ড়েছি যা হোক ! আমি কি ব'লছি, ভালো ? যা ব'লছি তা এই : যদি এমনটা না হ'তো তাহ'লে জীবন বিস্বাদ হ'য়ে যেতো।"

মাঝে মাঝে তাতিয়ানা উপদেশও দিয়েছে ইলিয়াকে।

"শোনো, এবার তোমার ওই সব মোটা কাপড়ের শার্টগুলোকে বাতিল ক'রে দাও। ভদ্রভাবে চলাফেরা ক'রতে গেলে সিল্কের জামা গেঞ্জি পরা উচিত। কোন্ শব্দ আমি কীভাবে উচ্চারণ করি তা মন দিয়ে শুনবে এবং শুনে মনে রাখবার চেষ্টা ক'রবে। দেহাতী চালচলন এবার ছাড়ো। যেদিন চাষা ছিলে সেদিন ছিলে। এখন তো আর চাষা নও। এবার চেষ্টা করো ঘ'ষে মেজে যাতে একটু সভ্য হ'তে পারো।"

তাতিয়ানা প্রায়ই তাকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছে তার মতো একটা 'চাষার' সঙ্গে ওর মতো একজন শিক্ষিতা মহিলার তফাৎটা কোথায়। এতে আঘাত পেয়েছে ইলিয়া। ওলিম্পিয়াদার সংগে থাকবার সময় ও এইটুকু বুঝতো যে সংগী হিসেবে ওলিমপিয়াদা কাম্য। তাছাড়া মাঝে মাঝে এমনও মনে হ'তো মেয়েটাকে হয়তো ও ভালোও বাসে। কিন্তু তাতিয়ানাকে সংগী হিসেবে কল্পনাই করা যায় না। ওলিম্পিয়াদার চেয়ে সে হয়তো আরও আজব জীব, হয়তো সে যাদুকরী, কিন্তু তাকে যেন আর শ্রদ্ধা করা যায় না। ব'লতে কি, তাতিয়ানার প্রতি তার যেটুকু শ্রদ্ধা ছিলো তা এতোদিনে ধুয়ে-মুছে সাফ হ'য়ে গেছে। আভ্‌তনমফ্‌দের সংগে থাকবার সময় ইলিয়া শুনতে পেতো শোবার আগে তাতিয়ানা প্রার্থনা ক'রছে :

"হে ভগবান, দুমুঠো যেন খেতে পাই। যদি অপরাধ ক'রে থাকি তবুও তোমার মার্জনা যেন পাই। ভগবান—কি জ্বালা, উঠে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এসো কিরিয়া, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।"

এইভাবে উপাসনা ক'রতো তাতিয়ানা।

ঘুম-জড়ানো গলায় বলে উঠতো কিরিক্ :

"খালি মেঝের ওপর অমন ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছো কেন?"

তারপরই ইলিয়া আবার শুনতে পেতো তাতিয়ানার গলা :

"হে ভগবান, তাতিয়ানা আর কিরিক্‌কে সুখে রেখো, তাদের স্বাস্থ্য দিও, সৌন্দর্য দিও—হে ভগবান—"

তাতিয়ানা উপাসনা করবার সময় যেন হুড়হুড় ক'রে মুখস্থ ব'লে যেতো—

নেহাতই অভ্যাসবশে। তাতে না থাকতো প্রাণের আবেগ না থাকতো কোনো মাধুর্য।

তাতিয়ানাকে একদিন সে জিজ্ঞাসাও ক'রেছে :

"তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো ?"

অবাক হ'য়ে জবাব দিয়েছে তাতিয়ানা :

"আচ্ছা প্রশ্ন যা-হোক্! করি বৈ কি। এ-প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ?"

"উদ্দেশ্য আর কি, এমনি জিজ্ঞেশ ক'রলাম। যা হুডবড়িয়ে প্রার্থনা করো তুমি, তাতে মনে হয় ভগবানের সংগে প্রাণ-বিনিময়ের পালাটা চটপট্ চুকে গেলেই যেন বাঁচো।"

"প্রথমত, 'হুডবড়িয়ে' শব্দটা ব্যবহার ক'রবে না। 'তাড়াতাড়ি' ব'ললেই তো পারো। দ্বিতীয়ত, সারা দিন খেটেখুটে ক্লান্ত হ'য়ে যদি তাড়াতাড়ি উপাসনা ক'রেও থাক তাতে কিছুই যায় আসে না, ভগবান এ-অপরাধটুকু ক্ষমা ক'রেই থাকেন।"

তারপরই চোখদুটো ওপর দিকে তুলে স্বপ্নিল ঔদাসীন্য-ভরা গলায় ব'লেছে তাতিয়ানা :

"ভগবানের দয়ার শরীর। তিনি সব কিছুই ক্ষমা করেন।"

ওলিম্পিয়াদা কিন্তু হাঁটু গেড়ে ব'সে যখন উপাসনা ক'রতো তখন তাকে দেখাতো পাথরে-গড়া মূর্তির মতো। মুখখানা তার থমথম ক'রতো বিষণ্ণতায়, একটা আশ্চর্য গাম্ভীর্য দেখা যেতো তার চোখদুটিতে। উপাসনা করবার সময় সে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতো না।

এই ধরণের নানান কথা ভেবে ইলিয়া তাতিয়ানার ওপর বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে আজ যখন সে বুঝেছে যে তাতিয়ানা তাকে দোকানের ব্যাপারে বেশ কায়দা ক'রে ঠকিয়েছে তখন তাতিয়ানার থেকে দূরে দূরে থাকাই তার পক্ষে ভালো। ইলিয়া সত্যিই ঘৃণা ও সন্দেহ করতে শুরু করে তাতিয়ানাকে। ভাবে : "দুজনের মধ্যে যদি আলাপ পরিচয় না থাকতো তাহ'লে ঠকালেও অতোটা বেমানান হ'তো না। এতোটা আঘাতও পেতাম না হয়তো। জানি একে অপরকে ঠকায়। কিন্তু ওর সংগে আমার যে সম্বন্ধ তা প্রায় স্বামীর

সংগে স্ত্রীর সম্বন্ধের মতোই। আমাকেও চুমু খায় আদর করে। কে জানতো ওর পেটে পেটে এতো! খচ্চর মাগী কোতাকার! বেশ্যার অধম ও।”

দেখতে দেখতে ইলিয়ার মনটা কঠিন হ’য়ে ওঠে এবং নানা অজুহাত দেখিয়ে তাতিয়ানার সান্নিধ্য থেকে ও দূরে দূরে থাকে; হাজার ডাকলেও দেখা ক’রতে যায় না তার সংগে।

এই সময় আর একটি মেয়ে আসে ইলিয়ার জীবনে। সে আর কেউ নয়, গাভ্রিকের দিদি। মাঝে মাঝে দোকানে এসে সে তার ভাইয়ের খোঁজখবর নিয়ে যায়। মেয়েটি ঢ্যাঙা, ছিপছিপে, দেহের গড়নটা ভালো তবে সুন্দরী নয়, তাছাড়া গাভ্রিকের মতে তার বয়স উনিশ হ’লেও ইলিয়ার চোখে তাকে আরও বেশি বড়ো দেখায়। মেয়েটার মুখখানা লম্বা, মুখের রং হ’লদে, কপালে কয়েকটা সূক্ষ্ম রেখা, নাকটি ছোটো, রাগলে নাকের গর্তদুটো ফুলে ফুলে ওঠে, চোখদুটি বড়ো, চোখের তারাদুটো কালো, সর্বোপরি তার পাতলা ঠোঁট দুখানা সর্বদাই আঁটসাট বন্ধ থাকে। বিশেষ কইয়ে-বইয়ে মেয়ে নয় সে, কথা বলে কম, কথা বলবার সময় ঠোঁটদুখানি যতদূর সম্ভব কম ফাঁক করে। হাঁটবার সময় সে একটু তাড়াতাড়ি হাটে—মুখখানা বেশ কিছুটা ওপরে তুলে। দেখে মনে হয় সে বুঝি তার মুখের সৌন্দর্য জাহির করবার জন্যেই এভাবে মুখ উঁচিয়ে হাঁটছে, কিন্তু তা হয়তো সত্যি নয়; হয়তো তার লম্বা মোটা বিনুনিটার জন্যেই তার মাথাটা পিছন দিকে একটু কাৎ হ’য়ে থাকে। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় সে সৎ, তার মনের জোর আছে। বেশ গুরুগম্ভীর তার মুখখানা। তার সামনে ব’সলেই ইলিয়া কেমন যেন লাজুক ব’নে যায়। মেয়েটির গর্বিত চাহনি তার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। দোকানে সে এলেই ইলিয়া তার সামনে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বলে:

“বসুন।”

“ধন্যবাদ” এই ব’লে ইলিয়াকে একটি সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানিয়ে মেয়েটি চেয়ারে ব’সে পড়ে। ইলিয়া লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে থাকে মেয়েটিকে: তার মুখ, তার খয়েরী রঙের ফ্রক, তালি-দেওয়া জুতো, খড়ের টুপি—সবকিছু। চেয়ারে ব’সে ভাইয়ের সংগে কথা বলবার সময় মেয়েটি ডান হাতের লম্বা আঙুলগুলোর ডগা দিয়ে হাঁটুর ওপর অবিশ্রাম টোকা মারতে থাকে, আর বাঁ হাত দিয়ে

কোলের-ওপরে-রাখা বইগুলোর পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এমন একটি গর্বিতা যুবতী কেন যে এমন সাদাসিধে পোষাক পরে তা ভেবে পায় না ইলিয়া। দু-এক মিনিট দোকানে ব'সেই মেয়েটি ভাইকে বলে :

"আচ্ছা, চলি এবার। দেখিস্, খুব বেশি দুষ্টুমি করিস্ না যেন।"

তারপর দোকানের মালিককে নিঃশব্দে একটি অভিবাদন জানিয়ে গট্ গট্ ক'রে সে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। তার যাওয়ার ভংগী দেখে মনে হয় যেন একজন নির্ভীক যোদ্ধা লড়াই ক'রতে চ'লেছে।

ইলিয়া একদিন ব'ললো গাভ্রিক্‌কে :

"ভারি গম্ভীর মানুষ তো তোর দিদি।"

নাক কুঁচকে, চোখদুটো পাকিয়ে ছোট্টো একটি হাঁ ক'রে গাভ্রিক মুখের এমন একটি মজাদার ভংগী ক'রলো যার সংগে ওর দিদির মুখের বেশ খানিকটা মিল আছে। তারপর মুচকি হেসে ও ব'ললো ইলিয়াকে :

"ওকে দেখে তা-ই মনে হয় বটে, তবে ওটা ওর ভাণ।"

"কিন্তু এভাবে ভাণ করবার মানে ?"

"মানে আর কি, ওটা ওর খেয়াল! আমিও তো আমার খুশি মতো যে কোনো রকমের মুখ বানাতে পারি।"

গাভ্রিকের দিদি ইলিয়াকে ভাবিয়ে তোলে। ঠিক এইভাবে তাকে একদিন ভাবিয়ে তুলেছিলো তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না। মনে মনে বলে ইলিয়া : "এই রকম একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে মন্দ হয় না। দেখে শুনে মনে হয় মেয়েটার মনটা সাদা।"

একদিন গাভ্রিকের দিদি একখানা মোটা বই নিয়ে দোকানে এলো। বইখানা ভাইয়ের হাতে দিয়ে ব'ললো :

"এই বইখানা প'ড়বি, ভারি মজার।"

বিনীতভাবে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কি বই, আমি একবার দেখতে পারি ?"

ভাইয়ের হাত থেকে বইখানা নিয়ে ইলিয়ার হাতে দিয়ে ব'ললো মেয়েটি :

"ডন কুইক্‌সোট্—এক নির্ভীক নাইটের জীবনকাহিনী।"

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বিনীতভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"তাই বুঝি ? নাইটদের নিয়ে লেখা আমি অনেক গল্প প'ড়েছি।"

ভ্রূ কুঁচকে নীরস গলায় ব'ললো মেয়েটি :

"যা প'ড়েছেন তা হযতো রূপকথাব গল্প। কিন্তু এ-বইখানা ঠিক সেই ধরণের নয়। এটা ভালো বই এবং খুব উঁচুদরের বই। এতে এমন একটি পুরুষেব দেখা পাবেন যিনি দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষকে বক্ষা কববাব জন্যে নিজের জীবন পযন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বুঝলেন ? প'ড়তে প'ড়তে মনে হবে বইখানা বুঝি হাসাবার জন্যে লেখা, কিন্তু তা নয। সে-যুগেব লেখার ধরণই ছিলো এই। আসলে এর বিষযবস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুব মনোযোগ দিযে পড়া উচিত বইখানা।"

ইলিয়া ব'ললো : "আমবা ঠিক এইভাবেই প'ড়বো।"

মেয়েটি এই প্রথম তাব সংগে কথা ব'ললো ব'লে আচমকা খুশিতে ইলিয়া মিষ্টি ক'বে হাসলো। কিন্তু মেয়েটি তাব মুখেব দিকে চেযে বরফেব মতো ঠাণ্ডা গলায় ব'ললো টিপে টিপে :

"আমাব কিন্তু মনে হয বইখানা আপনাব ভালো লাগবে না।"

এই ব'লে গাভ্রিকের দিদি চ'লে যেতেই ইলিয়াব মনে হ'লো এইমাত্র 'আপনার' শব্দটি সে যেভাবে উচ্চাবণ ক'বে গেলো তাব মধ্যে হযতো একটা বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিলো। এতে রেগে গেলো ইলিয়া এবং যখন দেখলো যে গাভ্রিক একমনে বইয়ের ছবিগুলো দেখছে তখন সে রুক্ষ গলায না ব'লেই পারলো না :

"ওহে, এটা বই পড়বাব সময নয়।"

বইখানা বন্ধ না ক'বে জবাব দিলো গাভ্রিক :

"কিন্তু এখন তো কোনো খদ্দেব নেই।"

গাভ্রিকের দিকে চেযে গুম হ'য়ে গেলো ইলিয়া। সেই সংগে বইখানা সম্পর্কে ওর দিদির মন্তব্যগুলোও মনে পড়লো তার। কিন্তু মন্তব্য বাদ দিয়ে শুধু মেয়েটার কথা ভাবতেই তাব মেজাজ গেলো বিগড়ে। বিরক্তভাব মনে মনে ব'ললো সে :

"আচ্ছা দেমাকী মেয়ে বাবা! হুঁঃ—"

২৬

দিন আসে দিন যায়। কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া গোঁফে তা দেয় আর জিনিষপত্র বেচে। দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। মাঝে মাঝে ইলিয়া ভাবে দোকান বন্ধ ক'রে খানিক বেড়িয়ে আসবে, কিন্তু তাতে ব্যবসার ক্ষতি হ'তে পারে এই ভেবে বেরুতে পারে না। সন্ধ্যাবেলায় বেরুনোও মুশকিল। গাভ্রিক একা দোকানে থাকতে ভয় পায়; তাছাড়া গাভ্রিকের হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বেরুবেই বা কি ক'রে? হয়তো সে আগুনই লাগিয়ে ব'সবে, নয়তো কোনো বাজে লোককে দোকানে ঢুকিয়ে একটা হুলুস্থূল কাণ্ড ক'রে তুলবে। ব্যবসার অবস্থা মোটামুটি ভালোই, হয়তো-বা দিনকতক পরে একজন কর্মচারীও রাখতে হবে। এদিকে তাতিয়ানা আভ্‌তনমফের সংগে ইলিয়ার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন কমে আসছে। এর জন্যে অবশ্য ইলিয়াই দায়ী। তবে তাতিযানাব দিক থেকেও কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। মেয়েটা এখনো খিল খিল ক'রে হাসে, দিনের শেষে দোকানের হিসাবপত্র দেখে। ইলিয়ার ঘরে ব'সে সে যখন খাতা মেলায় তখন তার মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া বেজায় বিরক্ত হয়। তবে মেয়েটাকে মাঝে মাঝে ভালোও লাগে। হাসি ঠাট্টার ফুলঝুরি তো, তাই। কোনো কোনো সময় তাতিয়ানা ওকে তার অংশীদার ব'লেও সম্বোধন করে। এতে একটু খুশি হয় ইলিয়া, মেয়েটার প্রতি আবার যেন একটু আকষণ অনুভব করে। অবশ্য এই আকর্ষণকে ইলিয়া বলে 'নোংরা'।

মাঝে মাঝে কিরিক্ এসে কাউণ্টারের কাছাকাছি একখানা চেয়ারে ব'সে গা এলিয়ে দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ বকবক ক'রে যায়, সুযোগ সুবিধা মতো মেয়ে-খদ্দেরদের সংগে দু-চারটে রসিকতাও করে। এখন তার গায়ে আর পুলিশের জামা নেই। আজকাল সিল্‌কের সুট শোভা পায় তার অঙ্গে। চাকরি করে কোন্ এক ব্যবসাদারের কাছে। আর, এই নতুন চাকরির গুণগানে সে সর্বদাই পঞ্চমুখ:

"আজকাল প্রায় হাজার টাকা ক'রে কামাচ্ছি হে, এ-ছাড়া উপরিও আছে। খরচপাতিও বেশি নয়। আছি ভালোই, কি বলো? ভয় নেই

ভায়া, উপরি-রোজগারের বেলা মাথা আমার ঠাণ্ডাই থাকে, যা করি আইন বাঁচিয়েই করি। হা-হা-হা, হো-হো-হো! বাড়ি বদলেছি. জানো তো? নতুন বাসাটি খাসা। একজন র'াধুনীও রেখেছি হালে—বেড়ে র'াধে—খাসা মেয়েমানুষ! শরৎকাল আসছে, লোকজনকে নেমন্তন্ন ক'রবো, দু-চার হাত তাসও খেলা যাবে—তোফা। দিন কাটছে মন্দ নয়। আপাতত তাস খেলা চালিয়ে যাচ্ছি আমি আব আমাব স্ত্রী। কখনো আমি জিতি, কখনো ও জেতে। ঘরের টাকা ঘরেই থাকে। বুঝলে, সোনার চাঁদ? হা-হা-হা, হো-হো-হো! এই টাকা দিয়েই নেমন্তন্নেব খরচ চালাবো। কেমন কি না? একেই বলে হিসেব ক'রে চলা,—একেই বলে খাসা জীবন। কি হে, মুখে যে তোমার কথাটি নেই?"

তাবপর সিগারেটে দু-এক টান মেবে চেয়ারে আবও খানিকটা গা এলিয়ে দিয়ে ব'লতে থাকে কিরিক:

"কিছু দিন আগে একটু গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম, শুনেছো তো? মেয়ে দেখলাম মাইরি, তোফা মেয়ে সব! প্রকৃতিব কন্যে তো, এক একটি যেন নিটোল আপেল। তাছাড়া সস্তাও বটে। এক বোতল মদ আব একখানা মিষ্টি রুটি পেলেই ঢ'লে পড়ে।"

কিরিকের কথা শোনবার সময় ইলিযা চুপচাপ থাকে। মোটাসোটা সাদাসিধে এই লোকটাব জন্যে তাব কেমন যেন দুঃখ হয়, কিন্তু কেন যে হয় তা সে বুঝতেই পারে না। বিশেষ ক'বে আভ্‌তনমফ্‌কে দেখলেই তার হাসি পায়। কিরিক্ বলে বটে গ্রামে গিয়ে এই ক'বেছে ওই ক'রেছে, কিন্তু ইলিয়া তার এ-সব গল্প বিশ্বাস কবে না। তার মনে হয় কিরিক্ গুল্ মাবছে কিংবা অন্যান্য লোক যা ব'লে থাকে তাব পুনবাবৃত্তি ক'রছে। মনমেজাজের অবস্থা খুব ভালো না থাকলে ইলিয়া মনে মনে বলে:

"ওসব গল্প ঢের শুনেছি, আসলে ধান্দা তো তোমার পেটেব।"

কিবিক্ ব'লে চলে: "সত্যি ভায়া, কুঁড়েঘরের ছায়ায় প্রকৃতির বুকে মাথা রেখে প্রেম ক'রে আরাম আছে—ঠিক যেমনটি কেতাবে পড়া যায়।"

ইলিয়া বলে: "কিন্তু তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না যদি এসব শোনেন তাহ'লে কি ব'লবেন শুনি?"

চোখ টিপে জবাব দেয় কিরিক্ :

"শুনবে না হে শুনবে না। এসব শোনবার জন্যে সে ব'সে নেই। সে জানে এসব শোনা তার উচিতও নয়। হা-হা-হা! পুরুষ হ'লো গিয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ। হঁ্যা ভায়া, তোমার কোনো মনের মানুষ আছে না কি?"

একটু হেসে বলে ইলিয়া: "যদি বলি আছে?"

"গুডগুডে একটি দর্জির মেয়ে তো? ঠিক কি না? এক মাথা চুল, গায়ের রং তামাটে—"

"না, দর্জির মেয়ে নয়।"

"তাহ'লে নিশ্চয়ই কোনো রাঁধুনী। রাঁধুনীও ভালো অবিশ্যি—বেশ নরম, নাদুসনুদুস, থসথসে ময়দার তালের মতো—"

শুনে ইলিয়া এমনভাবে হেসে ওঠে যে কিরিকের ধারণা হয় ইলিয়ার মনের মানুষ সত্যিই বুঝি কোনো রাঁধুনী। তখন অভিজ্ঞ লোকের মতো সে তাকে উপদেশ দেয়:

"একটাতেই যেন ম'জে যেও না হে, যতো পারবে বদল ক'রবে।"

হাসতে হাসতে ইলিয়া জিজ্ঞাসা করে:

"কিন্তু আমার মনের মানুষকে যে দর্জির মেয়ে কিংবা রাঁধুনী হ'তেই হবে এ-কথাটা আপনি ভেবে নিলেন কি ক'রে?"

"এদের সংগে তোমাকে মানায় ব'লে তাই। ধরো না কেন, কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সংগে তোমার কি প্রেম করবার অধিকার আছে?"

"কেন নেই শুনি?"

"সে তুমিও জানো। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে ব'লছি না ভাই, কিন্তু তুমি তো জানো তুমি একটা সাধারণ লোক, যাকে বলে চাষা।"

হাসতে হাসতে ইলিয়ার প্রায় দম বন্ধ হবার যোগাড় হয়। বলে:

"কিন্তু—কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি সে একজন ভদ্রমহিলা।"

হো হো ক'রে হেসে উঠে বলে কিরিক্:

"হাসালে দেখছি। নাঃ, তুমি ভায়া সত্যিই রসিকতা ক'রতে জানো!"

কিন্তু আভ্‌তনমফ্ চ'লে যেতেই তার কথাগুলো মনে ক'রে ইলিয়া অত্যন্ত ব্যথা পায়। একটা কথা স্পষ্টভাবেই বোঝে যে কিরিক্ যতোই সাদাসিধে আর

ভালোমানুষ হোক না কেন, ওকে সে চাষাভুষো ছোটোলোক ব'লেই জানে, যদিও সে আব তাব বউ ওকে দিয়ে নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধি কবিয়ে নিচ্ছে ষোলো আনাই। পেফিশ্‌কাব মুখে ও শুনেছে ওব দোকান খোলা সম্পর্কে পেত্রুহা না কি ব'লেছে: "আবে ছো, রাস্কেলের আবাব ব্যবসা করাব সখ।" জাকবও না কি ব'লেছে পেফিশ্‌কাকে: "ইলিযা আগে ভালো ছিলো, কিন্তু এখন ওর গুমোর বেড়েছে।" এদিকে গাভ্রিকেব দিদি তো বুঝিয়েই দিয়ে গেছে যে ইলিয়া তার যোগ্য নয়। মেযে তো পিওনেব, গায়ের ফ্রকটাও নোংরা, কিন্তু এমন একটা ভাব তাব দেখানো চাই যেন ইলিযাব সংগে এক পৃথিবীতে বাস ক'রতেও সে নাবাজ। ব'লতে কি, দোকান খোলবাব পর থেকে ইলিযা আরও আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছে এবং নিজেব সম্পর্কে গালমন্দ শুনলে ও সত্যিই দুঃখ পায এখন। গাভ্রিকেব দিদি ভাবি অদ্ভুত মেযে, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায় ইলিয়া। বিশেষ ক'বে জানতে চায এই নোংবা ফ্রক-পবা গবীব মেযেটা কি ক'বে এতোটা দেমাকী হ'যে উঠলো। অন্ততপক্ষে মেযেটাব বোঝা উচিত যে তাব ভাই যাব কাছে চাকবি কবে সে হ'লো দোকানেব মালিক, আব মালিক হিসাবে কিছুটা সম্মানও ইলিযাব প্রাপ্য। আব কিছু না হোক শুধু এই জন্যেই ইলিয়াকে তার একটু সমীহ করা উচিত, তাই নয় কি? আজ পর্যন্ত নিজেব থেকে সে কোনোদিন আলাপই কবে নি ইলিয়ার সংগে। এতে দুঃখ পেয়েছে বৈ কি ইলিযা, একশোবাব পেয়েছে।

একদিন ও ব'ললো গাভ্রিকেব দিদিকে:

"'ডন্ কুইকসোট্' পড়ছি।"

ইলিয়াব দিকে না চেযেই জিজ্ঞাসা ক'বলো মেযেটি:

"ভালো লাগছে?"

"খুবই ভালো লাগছে। ভাবি মজার।—আচ্ছা আজব লোক তো কুইক্‌সোট।"

এবাব মেযেটি ইলিযাব দিকে তাকালো। ইলিযাব মনে হ'লো সেই উদ্ধত চাহনির মধ্যে র'য়েছে ঘৃণা, অনুকম্পা আর বিদ্রূপ।

ধীরে ধীরে, গোটা গোটা ক'বে ব'ললো মেয়েটি:

"আমি জানতাম আপনি এই ধরণেবই কিছু একটা ব'লবেন।"

কথাগুলোর মধ্যে যে জ্বালা ছিলো তা হাড়ে হাড়ে অনুভব ক'রলো ইলিয়া। কাঁধদুখানা নেড়েচেড়ে ব'ললো :

"জানেনই তো আমি মুখ্যু মানুষ।"

গাভ্রিকের দিদি মুখ বুঁজে এমনভাবে ব'সে রইলো যেন ইলিয়ার জবাবটা সে শোনেই নি।

এই ধরণের অবজ্ঞা বা অবহেলা দেখলে রাগে ইলিয়ার শরীর রি-রি ক'রে ওঠে। সেইসংগে যত রাজ্যের যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা এসে তার মগজটাকে রণক্ষেত্র বানিয়ে তোলে। তখন সে মানুষ জাতটার 'ওপরই রেগে টং হ'য়ে যায়, তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে ভাবে নিজের পাপের কথা, অবিচারের কথা, বিশেষ ক'রে তার ভবিষ্যতের কথা। দোকানখানাকে তার ভালোই লাগছে, আপাতত যে-জীবন সে যাপন ক'রছে তাও নেহাত মন্দ নয়, আগের জীবনের তুলনায় এ জীবন পরিষ্কার, শান্ত ও স্বাধীনও বটে। কিন্তু সারা জীবনটাই কি সে এই ভাবে কাটাবে, এই দোকানের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে? সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঠায় দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা, তারপর দোকান বন্ধ ক'রে চা খাওয়া, চুপটি ক'রে একলা ব'সে চা খেতে খেতে আকাশপাতাল ভাবা, তারপর আলো নিবিয়ে ঘুমোনো, ঘুমোবার আগে আবার এক চোট চিন্তা, তারপর আবার সকালে উঠে দোকান খোলা—এইভাবেই কি কাটবে তার সারাটা জীবন? ইলিয়া জানে প্রত্যেক ব্যবসাদারই প্রায় এইভাবে জীবন কাটায়। তবে তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো বউ-ঝি আছে, কাচ্চাবাচ্চা আছে, মাঝে মাঝে তারা তাস খেলে, ভদ্‌কা খায়। কিন্তু তাদের মধ্যে ইলিয়ার মতো মানুষ আছে ক'জন? নানা কারণে ইলিয়া অন্যান্য ব্যবসাদার থেকে নিজেকে একটু আলাদা ক'রে দেখে। ব্যবসাদারগুলোকে তার খুব একটা পছন্দ হয় না। তারা হয় কিরিকের মতো নিজের ঢাক নিজে পেটায়, আর নয়-তো লোক ঠকিয়ে গোঁফে তা দেয়। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে একদিন জাকবের মন্তব্যটা মনে প'ড়ে যায় ইলিয়ার। জাকব ব'লেছিলো :

"ইলিয়া, ভগবান করুন, তোমার কপাল যেন না খোলে। তুমি লোভী।"

এই কথাগুলো মনে প'ড়লেই ইলিয়া মরমে ম'রে যায়। না, না, সে লোভী নয়। সে শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে শান্তিতে বাঁচতে চায়। সে চায় সবাই তাকে সম্মান করুক। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু লোকজন যে পদে পদে তাকে ছোটোলোক ব'লে নাক সিটকোবে এটা সে কোনোক্রমেই বরদাস্ত ক'রবে না।

কিন্তু ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতে তার কি দশা হবে কে জানে! খুন করার জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হবে তো? মাঝে মাঝে সে ভাবে, খুন করার জন্যে তাকে যদি সত্যিই শাস্তি দেওয়া হয় তা'হলে তার প্রতি অন্যায় করা হবে। কারণ সে তো ইচ্ছে ক'রে খুন করে নি, খুনের কাজটা "হ'য়ে গেছে, এই পর্যন্ত।" ইলিয়া এইভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কতো খুনী, কতো লম্পট, কতো ডাকাত তো র'য়েছে এই শহরে। সকলেই জানে তারা খুনী, তারা লম্পট, তারা ডাকাত, কিন্তু তাদের তো শাস্তি পেতে হ'চ্ছে না। বেশ স্ফূর্তি ক'রেই তো জীবন কাটাচ্ছে তারা। তবে হ্যাঁ, সুবিচার ব'লে যদি কিছু থাকে তাহ'লে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই উচিত। বাইবেলেও এ-ধরণের একটা কথা আছে বটে।

এই সব চিন্তা একবার ইলিযার মাথায় ঢুকলেই তার চোখদুটো দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে। যারা তার জীবনটাকে নষ্ট ক'রেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার বলিষ্ঠ বাহুদুখানি যেন নিসপিস ক'রতে থাকে। মাঝে মাঝে সে এমন মরিয়া হ'যে ওঠে যে ভাবে ফিলিমনফের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। তারপর বাড়িখানা যখন পুড়বে, লোকজন যখন দৌড়ে আসবে চারধার থেকে, তখন সে চীৎকার ক'রে ব'লবে:

"আমি আগুন লাগিয়েছি! আমি—আমিই খুন ক'রেছি পলুএক্‌তফকে।"

লোকজন তাকে ধ'রে ফেলবে। তার বিচার হবে। তারপর তার বাবাকে যেমন সাইবেরিয়ায় পাঠানো হ'য়েছিলো তেমনি তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে সাইবেরিয়ায়। প্রতিশোধের তৃষ্ণা তাকে এমন ক'রে পেয়ে বসে যে সে ভাবে এখুনি গিয়ে কিরিক্‌কে ব'লে দেবে তার বউয়ের সংগে ওর প্রেমের ব্যাপারটা, কিংবা মাশার ওপর অত্যাচার করার জন্যে মেরে ক্রেনফ্‌কে একেবারে পঙ্গু ক'রে দিয়ে আসবে এই মুহূর্তেই।

মাঝে মাঝে ঘরভর্তি অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে সে বোঝবার চেষ্টা করে নিস্তব্ধতার ভাষা। তার মনে হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু নিঃশব্দে আবর্তিত হ'চ্ছে। হয়তো সেই ঘূর্ণিবায়ুর ঝাপ্টায় ঘরের দেয়ালগুলো এখুনি ভেঙে প'ড়ে যাবে, তারপর ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো সেও উড়ে চ'লে যাবে কোন্খানে কে জানে! অজানা আশংকায় ইলিয়ার বুকটা ঢিপঢিপ ক'রতে থাকে।

একদিন ইলিয়া সবে দোকান বন্ধ ক'রতে যাচ্ছে এমন সময় পল্ এসে হাজির। এসেই সে ধীরে ধীরে ব'ললো :

"ভেরা পালিয়ে গেছে।"

চেয়ারে ব'সে কাউন্টারের ওপর কনুই দিয়ে পল্ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শিস্ও দেয় দু-একটা। তার মুখখানা যেন পাথর ব'নে গেছে, তবে বাদামী রঙের ছোট্টো গোঁফটা থেকে থেকে ন'ড়ছে বেরালের গোঁফের মতো।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"একা গেছে, না কারোর সংগে গেছে?"

"তা জানি না। তিন দিন হ'লো ওর দেখা নেই।"

পলের মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া চুপচাপ ব'সে থাকে। মুখ দেখে কিংবা গলার আওয়াজ শুনে বোঝা মুশ্কিল ভেরার পালানোটাকে পল্ কিভাবে নিয়েছে। তবে ইলিয়া এইটুকু বুঝতে পারে যে পল্ মনে মনে একটা ফন্দি আঁটছে।

পলের ঠোঁটে চাবি আঁটা দেখে ইলিয়া ধীরে ধীরে ব'ললো :

"এখন কি ক'রবে তা'হলে?"

বন্ধুর দিকে না ফিরে শিস্ দেওয়া বন্ধ ক'রে সংক্ষিপ্তভাবে ব'ললো গ্রাৎচফ্ :

"খুন ক'রবো ওকে!"

বিরক্ত হ'য়ে ব'ললো ইলিয়া :

"তোমার সেই এক কথা!"

মৃদু স্বরে ব'ললো পল্ :

"ওর জন্যে আমার জীবনটাকে আমি গোল্লায় দিয়েছি। এই যে ছুরি দেখছো—"এই ব'লে চট্ ক'রে পকেট থেকে একখানা ছোট্টো রুটি-কাটা ছুরি বার ক'রে মুখের সামনে ধ'রে আবার ব'ললো পল্ঃ

"এই ছুরিখানা আমি ওর গলায় বসিয়ে দেবো।"

পলের হাত থেকে ছুরিখানা ছিনিয়ে নিয়ে কাউণ্টারের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগতস্বরে ব'ললো ইলিয়াঃ

"মশা মারতে তুমি কামান দাগ্ছো।"

এবার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পল্ ইলিয়ার দিকে কটমট ক'রে চায়। মুখখানা তার বেঁকে যায়, চোখদুটো দিয়ে যেন আগুন বেরোতে থাকে, সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে ঠকঠক ক'রে। তারপর আবার চেয়ারে ব'সে অবজ্ঞার স্বরে বলে পল্ঃ

"তুমি একটি গাড়োল।"

"আর চালাক শুধু তুমিই, না?"

"ছুরিখানা কেড়ে নিলে বটে, কিন্তু হাত তো আছে।"

"বটে! তারপর?"

"হাতও যদি খ'সে যায় তখন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবো ওর গলাটা।"

"বাপ্স্, কী ভীষণ!"

ধীরস্থির ভাবে ব'ললো পল্ঃ

"আমার সংগে কথা ব'লো না ইলিয়া। তোমার ইচ্ছে হ'লে তুমি আমাকে অবিশ্বাস ক'রতে পারো, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে উপহাস ক'রো না। এমনিতেই ভাগ্য আমাকে নিয়ে যথেষ্ট উপহাস ক'রেছে। আর কেন?"

আস্তে আস্তে ব'ললো ইলিয়াঃ

"কিন্তু বোকা ছেলে, একবার ভেবে দেখেছো কি ব্যাপারটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।"

"অনেক ভেবেছি। দু বছরেরও বেশি সময় ধ'রে কেবল ভেবেই আসছি। যা ভাববার ভাবা হ'য়ে গেছে আমার। যাই হোক্, আমি চলি। তোমার সংগে কথা ব'লেই বা লাভ কি? সুখে আছো, এসব কথা তোমার ভালো না লাগবারই কথা। আমার মতো লোকের না মেশাই উচিত তোমার সংগে।"

তিরস্কারের স্বরে ব'ললো ইলিয়া :

"কিন্তু তোমার এই সব পাগলামি ছাড়বে কি না বলো !"

"একদিকে পেটের চিন্তা, অন্যদিকে মনে এই অশান্তি।"

কাঁধ দুখানা নেড়েচেড়ে অবজ্ঞার স্বরে ব'ললো ইলিয়া :

"কি যে বলো বুঝতে পারি না, সত্যিই অবাক হই। পুরুষমানুষ মেয়েমানুষকে যেন একটা জানোয়ারের সামিল ক'রে দেখে।—মেয়েমানুষ যেন একটা ঘোড়া! যতোক্ষণ সে পুরুষকে টেনে নিয়ে যায় ততক্ষণই সে ভালো, কিন্তু টানা যদি একবার বন্ধ করে তাহ'লেই পুরুষের হাতে তার শতেক খোয়ার। বাঁদরগুলো কিছুতেই বোঝে না যে মেয়েমানুষও মানুষ, মন ব'লে তারও একটা পদার্থ আছে।"

ইলিয়ার দিকে আড়চোখে চেয়ে পল্ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

"আর আমি কি মানুষ নই না-কি ?"

"কে ব'লছে তুমি মানুষ নও? কিন্তু তোমার ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞান থাকা তো উচিত!"

সংগে সংগে চটে গিয়ে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে পল্ গ্রাৎচফ্ :

"রাখো তোমার ন্যায়-অন্যায়-জ্ঞানের কচকচি। তোমার পক্ষে সাধু হওয়া সোজা, কারণ তুমি সুখে আছো। বুঝলে? আচ্ছা, চলি।"

এই ব'লে পল্ ঝড়ের মতো দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।

ইলিয়া তার নাগাল পায় না। রাস্তা থেকে পল্ উত্তেজিতভাবে টুপিটা নাড়তে থাকে।

তাড়াতাড়ি কাউন্টার থেকে উঠে এসে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ইলিয়া চীৎকার ক'রে ডাকে :

"পল্! দাঁড়াও! পল্!"

পল্ একটিবারও পিছনে না তাকিয়ে হনহন ক'রে একটা গলির মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। হতাশ হ'য়ে ইলিয়া ধীরে ধীরে আবার কাউন্টারের পিছনে ফিরে আসে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে পল্ এইমাত্র যে কথাগুলো ব'লে গেলো তা যেন ওর মুখখানাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

একটু পরেই গাভ্রিকের গলা শোনা গেলো :

"লোকটা কী খাবাপ।"

শুনে মুচকি হাসলো ইলিযা।

কাউণ্টাবের ধাবে এসে গাভ্রিক জিজ্ঞাসা ক'বলো ঃ

"ও কাকে খুন ক'রবে ব'লছিলো ?"

ছেলেটার দিকে চেয়ে ব'ললো ইলিযা ঃ

"ওব বউকে।"

কথাটা ব'লবে কি ব'লবে না এই ভেবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্তিত-ভাবে চুপিচুপি ব'ললো গাভ্রিক ঃ

"সেবাব বড়োদিনের সময় আমাদের পাড়াব এক দর্জিব বউ তার স্বামীকে বিষ খাইযে মেবেছিলো। লোকটা বোজ মাতাল হ'তো কি না, তাই।"

পলেব কথা ভাবতে ভাবতে ব'ললো ইলিযা ঃ

"হ্যাঁ, এ বকম ঘটনা ঘটে।"

"আর ওই লোকটা—ও কি সত্যিই ওব বউকে খুন ক'ববে ?"

"এ-সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন গাভ্রিক ? যা, নিজেব কাজে যা।"

দরজার দিকে যেতে যেতে ছেলেটা বিড়বিড় ক'রে ব'ললো ঃ

"তবুও বেটাদের বিয়ে কবা চাই।"

একটু পবে বেশ খানিকটা আলো এসে পড়ে রাস্তাব ওপর। গাভ্রিক চেয়ে দেখে সামনেব বাড়িব রাস্তামুখো ঘবখানা আলোয ভেসে যাচ্ছে।

"দোকান বন্ধ করার সময় হ'লো", আস্তে আস্তে ব'ললো গাভ্রিক।

ওব কথা যেন কানেই গেলো না ইলিযাব। ইলিযা চেযে বইলো আলোকিত ঘরখানার দিকে। জানলা দিয়ে আলো উপচে প'ড়ছে। ফুল-ভর্তি লতানে গাছে জানলাব অর্ধেকটা প্রায় ঢাকা। লতার ফাঁক দিয়ে নজর ক'রলে দেয়ালে ঝোলানো একখানা সোনালী ফ্রেমেব একাংশ কেবল চোখে পড়ে। জানলা খোলা থাকলে শোনা যায গীটাব বাজছে। গান ও হাসির শব্দও ভেসে আসে। বাড়িটায় প্রায প্রতি রাত্রেই গানবাজনা হয, হাসিব গব্‌বা ওঠে। ইলিয়া জানে গ্রমফ্ নামে একজন মোটাসোটা, লালমুখো, প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গোঁফ-ওয়ালা জজ থাকে ওই বাড়িতে। তার স্ত্রীও বেশ নাদুসনুদুস, গোলাপী তার গায়ের রং, চোখেব তারাদুটো নীল। রাস্তা দিয়ে রূপকথার রাণীর মতো সে

হাঁটে, কথা বলবার সময় মৃদুমৃদু হাসে। গ্রমফের একটি বোনও আছে। অল্প বয়স তার, গায়ের রং একটু ময়লা, মাথায় কালচে চুল। হুদো হুদো অফিসার আসে তার কাছে প্রেম নিবেদন ক'রতে, আর একসংগে জড়ো হ'য়ে তারা প্রায় প্রতি রাত্রেই হাসে, গান গায়। গ্রমফের বাড়ির রাঁধুনীটা মাঝে মাঝে ইলিয়ার দোকান থেকে সুতো কিনে নিয়ে যায়। তার মুখে ইলিয়া শোনে গ্রমফ্‌রা না কি চাকরদের ভালো ক'রে খেতে দেয় না, তাদের মাইনেও না কি আটকে রাখে।

ঝলমলে ঘরখানার দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবে:

"যতো জ্বালা আমারই! এই তো, সামনের বাড়ির লোকগুলো কেমন সুখে আছে।"

এমন সময় গাভ্রিক আবার ব'ললো: "এবার কিন্তু সত্যিই দোকান বন্ধ করার সময় হ'য়েছে।"

"বেশ, তাহ'লে দরজাটা দিয়ে দে।"

দরজা বন্ধ হবার সংগে সংগে দোকানখানা অন্ধকার হ'য়ে যায়। তারপর গাভ্রিক খটাস ক'রে ছিটকিনিটা তুলে দিতেই ইলিয়া মনে মনে বলে:

ভাবে: "এই [illegible]গারদ্!"

চা খেতে খেতে [illegible]দের কথাগুলো আবার মনে পড়ে ইলিয়ার। মনে প'ড়তেই পলের ওপর সে রেগে আগুন হ'য়ে যায়:

"দুনিয়াশুদ্ধ, সবাই কেবল দেখছে আমি [illegible] সুখে আছি। আরে, সুখে যে কতো আছি তা শুধু আমিই জানি!"

যাই হোক্‌, ইলিয়ার বিশ্বাস ভেরার গলায় ছুরি বসাবার মতো বুকের পাটা গ্রাংচফের নেই।

"থাক আর না-ই থাক্‌, ভেরার হ'য়ে অতো কথা বলবার কোনোই দরকার ছিলো না আমার। মরুক্‌ গে, চুলোয় যাক্‌ সব! বাবুরগুলো নিজেরাও বাঁচতে জানে না, অপরকেও বাঁচতে দেয় না।" মনে মনে এই কথাগুলো ব'লে ইলিয়া চায়ের কাপটা ঠক্‌ ক'রে টেবিলের ওপর রাখলো।

এদিকে গাভ্রিক্‌ তখন ডিশে চা ঢেলে চোঁ-চোঁ ক'রে চুমুক দিচ্ছে। একটু পরেই সে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে ব'সলো:

মাশার দিকে গাভ্রিক্‌কে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ইলিয়া ব'ললো :

"যা, ঘুমোগে যা গাভ্রিক্। এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

এক পা এক পা ক'রে দোকানঘরে গিয়ে ছেলেটা আবার ফিরে এসে দরজার পাশে দাঁড়ায়।

মাশা নড়ে না চড়ে না, ঠায় ব'সে থাকে। মাঝে মাঝে তার কোটরগত চোখদুটো ঘরের এধারে ওধারে ঘুরে বেড়ায়। মাশার সামনে এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে ইলিয়া তার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, কিন্তু কি-যে ব'লবে কিছুই ভেবে পায় না।

মাশা ব'ললো : "হ্যা—যা অত্যেচার ও করে আমার ওপর⋯"

ঠোটদুখানা কেঁপে ওঠে তার। চোখদুটো বুঁজে যায়। আর একটু পরেই তার গালদুখানি চোখের জলে ভাসতে থাকে।

মুখখানা একপাশে ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললো ইলিয়া :

"কেঁদো না। চা খেয়ে বরং আমাকে সব কথা খুলে বলো। এতে মনটা হাল্‌কা হ'য়ে যাবে।"

শিউরে উঠে ব'ললো মাশা :

"আমার ভয় ক'রছে। ও হয়তো এসে প'ড়বে।"

ইলিয়া ব'ললো : "এসে প'ড়লে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো।"

"ওর গায়ে জোর আছে, ইলিয়া ! মানুষ তো নয় যেন অসুর।"

"তুমি কি পালিয়ে এসেছো ওর কাছ থেকে ?'

"হ্যাঁ,—এই নিয়ে চারবার। যখন আর সইতে পারি না তখন পালিয়ে যাই। গতবারে ভেবেছিলাম কুয়োয় ঝাঁপ দেবো, কিন্তু ও আমাকে ধ'রে ফেললো। তারপর যেমন মার তেমনি অত্যেচার।"

সেই ঘটনাটা মনে প'ড়তেই মাশার চোখদুটো ভয়ে বিস্ফারিত হ'য়ে যায়, নিচের চোয়ালখানা কেঁপে ওঠে। মাথা নুইয়ে অস্ফুটস্বরে বলে মাশা :

"এমন মার মা'র যে মনে হয় পা দুখানা বুঝি ভেঙেই গেলো।"

উত্তেজিতভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"একটা বি ত ক'রতে পারো না ? তুমি কি বোবা ? থানায় গিয়ে বলো

না কেন যে ও তোমার ওপর যাচ্ছেতাই অত্যেচার করে ? এর জন্তে কতো লোকেরই তো জেল হ'য়েছে।"

হতাশভাবে মাশা ব'ললো :

"কার কাছে ব'লবো ? ও নিজেই তো ম্যাজিস্ট্রেট্ !"

"কি ব'ললে ? ক্রেনফ্ ম্যাজিস্ট্রেট ? তোমার মাথা কি খারাপ হ'য়ে গেছে ?"

"না, ইলিয়া, না। আমি জানি ও ম্যাজিস্ট্রেট্ ! কিছুদিন আগে দু হপ্তার জন্তে ও ম্যাজিস্ট্রেট্ হ'য়েছিলো। ফিরে যখন এলো, ওর মুখখানা দেখে আঁত্কে উঠলাম। গোটা মুখে রাগ আর খিদে—বুঝতেই পারছো কি ব'লছি। একটু পরেই ও আমার বুকের মাংসটা সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধ'রলো, তারপর পাকাতে লাগলো—উঃ ! দেখো, কি ক'রে দিয়েছে, দেখো !"

এই ব'লে মাশা ফ্রকের বোতামগুলো খুলে দেখালো তার ছোটো ছোটো শিথিল মাইদুটো কি রকম কালো কালো দাগে ভর্তি হ'য়ে গেছে। দেখে মনে হ'লো মাইগুলোকে কেউ যেন চিবিয়েছে।

বিষণ্ণভাবে ব'ললো ইলিয়া : "জামায় বোতাম দাও।"

মাশার বিবর্ণ, বিকৃত দেহটার পানে যেন তাকাতে পারে না ইলিয়া। ভাবে : "এই কি সেই মাশা—সেই ছোটো সুন্দর মেয়েটা—যার সংগে একদিন খেলা করতাম ?"

কাঁধের ওপর থেকে ফ্রকটা সরিয়ে ধীরে ধীরে মাশা ব'ললো :

"দেখো, আমার কাঁধদুটোরও কী দশা ক'রে দিয়েছে ! দেহের কোনো অংশই ও বাদ দেয় নি, খামচেখুমচে একেবারে একশা ক'রে দিয়েছে।"

ইলিয়া লুনেফ জিজ্ঞাসা ক'রলো : "কিন্তু কেন ?"

"ও একটা জানোয়ার। বলে কি জানো ? বলে : 'তুই আমায় ভালোবাসিস না', আর তারপরই অত্যেচার শুরু করে।"

"কিন্তু বিয়ের সময় তুমি তো আর খুকিটি ছিলে না ?"

"কেন ?—তার মানে ? তোমার সংগে কিংবা য়াশার সংগে কতো রাতই তো একসঙ্গে কাটিয়েছি ; কিন্তু কৈ তোমরা তো কেউ আমার গায়ে হাত দাও নি। এখনো পর্যন্ত আমি এ-সব বরদাস্ত ক'রতে পারি না—আমার ব্যথা লাগে, ঘেন্না হয়, গা বমি বমি করে।"

আস্তে আস্তে ইলিয়া ব'ললো : "চুপ করো মাশা।"

মাশা চুপচাপ ব'সে থাকে। যেমন খোলা ছিলো তেমনি খোলাই থাকে তার বুকখানা।

কেৎলির পিছন থেকে মশার অস্থিচর্মসার, ক্ষতবিক্ষত দেহের পানে চেয়ে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"জামায় বোতাম দাও।"

ফ্রকে বোতাম দিতে দিতে মাশা ফাঁফা গলায় ব'ললো :

"তোমার কাছে আমার তো কোনো লজ্জা নেই, ইলিয়া।"

চারিধার নিস্তব্ধ। এমন সময় শোনা গেলো দোকানঘরের মধ্যে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিমর্ষভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"চুপ কর্ গাভ্রিক্, ঘুমোবার চেষ্টা কর্।"

মাশা জিজ্ঞাসা করে : "সেই ছেলেটা বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"কাঁদছে ?"

"হ্যাঁ।"

"ভয় পেয়েছে বুঝি ?"

"ন্-না, দুঃখ পেয়েছে হয়-তো।"

"কার জন্যে ?"

"তোমার জন্যে।"

"ও।" নির্বিকারভাবে এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে মাশা চুপচাপ ব'সে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দেয়। হাত দুখানা তার কেঁপে ওঠে, ডিশখানা কেবলই দাঁতে ঠুকে যেতে থাকে। মাশার দিকে আড়চোখে চেয়ে ইলিয়া ঠিক বুঝতে পারে না তার জন্যে ওর সত্যিই দুঃখ হ'চ্ছে কি না। তবে তার স্বামীর ওপর ওর রাগ হয় প্রচণ্ড। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"এখন কি ক'রবে ভাবছো ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো মাশা :

"জানি না। কীই বা ক'রবো? খানিকক্ষণ জিরোবো, তারপর পুলিশ এসে আবার পাকড়াও ক'রবে।"

ইলিয়া ব'ললো: "এভাবে তোমার মুখ বুঁজে থাকা উচিত নয়। ও কেনই বা তোমার ওপর অত্যেচার ক'রবে? কোন্ অধিকারে মানুষ মানুষের ওপর অত্যেচার করে?"

মাশা ব'ললো: "ওর প্রথম পক্ষের বউয়ের ওপরও ও এইভাবে অত্যেচার ক'রতো। বিনুনি দিয়ে খাটের পায়ার সংগে তাকে বেঁধে বেদম ঠেঙাতো।... একদিন আমি ঘুমোচ্ছি এমন সময় মনে হ'লো আমার পেটের চামড়াটা যেন পুড়ে গেলো। চীৎকার ক'রে জেগে উঠলাম। দেখি একটা জ্বলন্ত দেশলায়ের কাঠি ও আমার পেটের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।"

চেযার থেকে লাফিয়ে উঠে প্রায় উন্মাদের মতো ব'ললো ইলিয়া:

'কাল সকালেই তোমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত। গিয়ে দেহের দাগগুলো দেখিয়ে বলা উচিত এর একটা বিহিত করা হোক্, যে লোকটা আসামী আসামীর মতোই তার বিচার করা হোক্।"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে ব'ললো মাশা:

"অতো চেঁচিও না,—দোহাই তোমার, অতো চেঁচিও না। কেউ শুনতে পেলে আমার ভীষণ ক্ষতি হবে।"

ইলিযার কথায় মাশা সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে। আশ্চর্য, যে মেয়েটা কিছুদিন আগেও এতো হাসিখুশি এবং কাঠবেরালীর মতো এতো চটপটে ছিলো, মারের গুঁতোয় সে যেন এখন কেঁচোটি ব'নে গেছে, এমন কি প্রতিবাদ করবার সাহসটুকু পর্যন্ত তার নেই।

চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ইলিয়া ব'ললো:

"বেশ, এর বিহিত আমিই ক'রবো। দেখছি, তোমার স্বামী কি ক'রে রেহাই পায়! আজ রাতটা তুমি এখানেই থেকে যাও। বুঝলে মাশুৎকা?"

এদিক ওদিক চেয়ে নিচু গলায় ব'ললো মাশা:

"বুঝলাম।"

"তুমি আমার বিছানাতেই শোও, আমি দোকানঘরে গিয়ে শোবো। তারপর কাল সকালে আমি—"

"ইচ্ছে ক'রছে এখুনি শুয়ে পড়ি—যা ধকল গেছে। শোবো এখন?"

ইলিয়া চেয়ারখানা সরিয়ে নিতেই মাশা ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়ে বিছানায়। কম্বলখানা ঠিকমতো গায়ে জড়াতে না পেরে মুচকি হেসে বলে:

"ভারি অদ্ভুত লাগছে নিজেকে, মনে হ'চ্ছে যেন নেশা ক'রেছি।"

মাশার গায়ের ওপর কম্বলখানা বিছিয়ে দিয়ে, মাথার বালিশটা ঠিক জায়গায় রেখে ইলিয়া দোকানঘরের দিকে পা বাড়াতেই, মাশা উৎকণ্ঠিতভাবে ব'ললো:

"এখুনি যেও না, একটু ব'সো আমার কাছে। একা থাকতে আমার ভয় করে, মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।"

খাটের ধারে একখানা চেয়ারে ব'সে ইলিয়া মাশার কোঁকড়া-চুলে-ঢাকা বিবর্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে। যে কারণেই হোক চোখের সামনে মেয়েটাকে এমন আধমরা হ'য়ে প'ড়ে থাকতে দেখে হঠাৎ কেমন যেন লজ্জিত হয় সে। এই সময় তার মনে প'ড়তে থাকে মাশার জীবনের জন্য জাকবের কাকুতি-মিনতি আর মাতিৎসার উদ্বেগের কথা। সংগে সংগে তার মাথাটা নুয়ে পড়ে।

মাশা ব'ললো: "মাতিৎসার মুখে শুনেছি জাকবের বাবাও জাকবকে খুব ঠেঙায়। কী বরাত।"

দাঁতে দাঁত চেপে ব'ললো ইলিয়া:

"এমন বাবাকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত—তোমার বাবাকে আর পেত্রুহা ফিলিমনফ্‌কে।"

"আমার বাবার ওপর মিথ্যে রাগ ক'রছো ইলিয়া। ওর কোনো দোষ নেই। দোষের মধ্যে বাবা বড়ো অসহায়।"

"ছেলেপুলেকে যারা মানুষ ক'রতে পারে না, তারা জন্ম দেয় কেন?"

সামনের বাড়ি থেকে গানের শব্দ ভেসে আসে। কারা যেন ডুয়েট্ গাইছে। সবটুকু পৌরুষ দিয়ে কে যেন জোরালো গলায় গাইলো:

"আশা নাই যার জীবনে তাহার
বলো কি আছে?

সবই অজানা সবই অচেনা
তাহার কাছে।

অস্ফুট স্বরে মাশা ব'ললো :

"এই দেখো এখনই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ভারি সুন্দর এই জায়গাটা—নিস্তব্ধ নিঃঝুম—বেশ গাইছে, না ?"

বিষণ্ণভাবে একটু হেসে ইলিয়া বললো :

"নিশ্চয়ই। একদিকে শবযাত্রা অন্যদিকে শোভাযাত্রা !"

আবার এক টুক্‌রো গান ভেসে আসে :

"অবাক জীবন—আশা-নিরাশার দোলা !"

তারপরই কে যেন গেয়ে ওঠে :

"তবু একবার বলো একবার—"

সুরটা যেন হাউইয়ের মতো রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ ক'রে আকাশের দিকে ছুটে যায়।

বিরক্ত হ'য়ে ইলিযা জানলাটা বন্ধ করে দিলো। তার মনে হ'লো ও-গান এখানে মানায় না। জানলা বন্ধ করবার সময় খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'তেই মাশা চ'মকে ওঠে। চোখ খুলে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করে :

"কে ওখানে ?"

"জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।"

"তবু ভালো, যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ! এখুনি চ'লে যাচ্ছো না কি ?"

"না, না, ঘুমোও, ভয় নেই।"

বালিশের ওপর মাথাটা নেড়েচেড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে মাশা। কিন্তু এতোটুকু শব্দ হ'লেই আবার জেগে ওঠে :

" কে, কে ওখানে ?"

কিংবা ইলিয়ার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে :

"কেউ কি কড়া নাড়ছে ?"

জানলাটা খুলে দেয় ইলিয়া। তারপর রাস্তামুখো হ'য়ে ব'সে ভাবে কি ক'রলে মাশাকে বাঁচানো যায়। শেষে ঠিক করে পুলিশ এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত ওকে সে তার কাছ-ছাড়া ক'রবে না।

"দেখি, কিবিক্‌কে দিয়ে যদি কিছু হয়।—হওয়াতেই হবে!"

গ্রমফের বাড়ি থেকে আবার গানের শব্দ ভেসে আসে ঃ

"মিনতি শোনো, ওগো মিনতি শোনো।"

সংগে সংগে হাততালি পড়ে।

এদিকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাশা গোঙাচ্ছে। আবার কে যেন গাইলো

"ভোরেব বেলা ঘোড়ায় চ'ড়ে মাঠেব কিনাব দিয়ে—"

প্রায় হতাশ হ'য়ে ইলিয়া মাথা নাড়ে। গান, হৈ-চৈ, হাসি—এসব তার ভালো লাগে না। ঝলমলে জানলাটার দিকে চেয়ে ইলিয়া ভাবে বাস্তায় বেরিয়ে একখানা ইঁট ছুড়ে মারলে কেমন হয় ঐ জানলার দিকে? কিংবা ওদের গুলি ক'বলে কেমন হয়? ইলিয়া সত্যিই রেগে গেছে। এখানে আধমরা হ'য়ে প'ড়ে ব'য়েছে একটা মেয়ে, আর ওখানে চ'লেছে কি না হৈ-হল্লা গান? কিন্তু হ'লে হবে কি, গানেব শব্দগুলো ও নিজেই মনে মনে আওড়ায়, আর একটু পরেই বুঝতে পারে লোকগুলো যে-গান গাইছে তাব বিষয়বস্তু হ'লো ঃ একটা বেশ্যাকে গোর দেওয়া হ'চ্ছে। স্রেফ তাজ্জব ব'নে যায় ইলিয়া। মনে মনে বলে ঃ

"গাইবার মতো আর কোনো গান পেলো না ওরা? এ-গানে এতো হাসিই বা কিসের? বাঁদর, লোকগুলো নিশ্চয়ই এক একটা আস্তো বাঁদর! একে তো সমাধির গান, তার ওপর কি না একটা বেশ্যার সমাধি!"

'বাহবা, বাহবা'-র হুল্লোড় ফেটে প'ড়লো গ্রমফের বাড়ির জানলা দিয়ে। প্রথমে মাশার দিকে, তারপর রাস্তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো ইলিয়া।

একটা বেশ্যার সমাধির গান গেয়ে মানুষ যে কি ক'রে এতোটা উল্লসিত হ'তে পারে তা ভেবেই পেলো না সে। অবাক কাণ্ড!

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো মাশাঃ

"ভাসিলি, ভাসিলিচ্, ছেড়ে দাও আমাকে, দোহাই ভগবানের ছেড়ে দাও!"

বিছানায় শুয়ে ছটফট ক'রতে ক'রতে, কম্বলখানা মেঝেতে ফেলে দিয়ে, হাতদুখানা ছুঁড়ে মাশা আবার নিশ্চল হ'যে যায়; তারপর ঠোঁট দুখানা ফাঁক ক'রে হাঁপাতে থাকে। তাড়াতাড়ি খাটের ধারে গিয়ে ইলিয়া মাশার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। ভয় হয়, মাশা বুঝি মারা যাচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই ও বুঝতে পাবে ভয়ের কোনো কারণ নেই, মাশা দিব্যি নিশ্বাস নিচ্ছে। তখন মেয়েটার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে ও আবার গ্রমফের বাড়ির জানলাটার দিকে তাকায়। গান এখনো হ'চ্ছে। প্রথমে একজন গাইলো, তারপর ডুয়েট্, তারপর সবাই মিলে। গান আর হাসির শব্দে রাস্তাটা যেন কাঁপতে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় রঙ-বেরঙের ফ্রক-পরা দুএকজন মেয়ে জানলার সামনে এসেই আবার পাক খেয়ে অন্য ধারে চ'লে যাচ্ছে। গানগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া ভাবেঃ এরা কি ক'রে এতো রসিয়ে রসিয়ে দুঃখে গদগদ হ'য়ে ভল্গা, সমাধি আর বন্ধ্যা মাঠের গান গাইছে? তবে কি এরা দুঃখেও মজা পায়?

মাশার দিকে চেয়ে ইলিয়া বুঝতে পারে না মেয়েটার কী দশা হবে। এদিকে আবার ভাবেঃ তাতিয়ানা যদি হঠাৎ এখন ঘরে ঢুকে মাশাকে এই অবস্থায় দেখে, তা'হলে? মাশাকে নিয়ে ও তখন ক'রবে কি? ইলিয়ার মনে হয় যতো রাজ্যের ধোঁয়ায় ওর দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে। ও-বাড়ির গান, মাশার গোঙানি, নিজের দুশ্চিন্তা—সবকিছু মিলে ওকে যেন পাগল ক'রে তোলে।

ঘুম আসতে ইলিয়া মাথার নিচে কোটটা রেখে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেঃ মাশা মারা গেছে। তাকে শুইয়ে দেওয়া হ'য়েছে বিরাট একটা চালাঘরের মাঝখানে আর তার চারধারে দাঁড়িয়ে এক দংগল রঙীন ফ্রক-পরা স্ত্রীলোক গান গাইছে। দুঃখের গান শুনে তারা হাসছে,

আর ওবই মধ্যে কোনো স্থখেব কথা উঠলে চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদছে। চারিদিকে অন্ধকার, কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁত ক'রছে ঘরখানা। এককোণে দাঁড়িয়ে সাভেল-কামাব লাল-টকটকে লোহার ওপর হাতুড়ি পিটছে। হাতুড়ি পেটার শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘরের দেযালগুলো। এমন সময় ঘরের চালার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কে যেন ডাকলো ঃ

"ইলিয়া। ইলিয়া।"

আচ্ছা স্বপ্ন যা হোক। ইলিযাও শুয়ে আছে সেই চালাঘরেব মধ্যে। তার হাত-পা বাঁধা, ব্যথায সর্বাঙ্গ জবজব, মুখে রা নেই।

কে যেন আবাব ডাকলো ঃ

"ইলিয়া, উঠে পড়ো, ইলিয়া।"

চোখ মেলতেই ইলিয়া দেখলো চেয়ারে ব'সে পল্ গ্রাৎচফ্ পা দিয়ে ওর হাঁটুদুটো ঠেলছে। খানিকটা চনচনে রোদ এসে প'ড়েছে ঘরের মধ্যে। টেবিলের ওপর কেৎলিটা চকচক ক'রছে। আলোর দিকে চাইতেই ইলিয়ার চোখদুটো ধাঁধিয়ে যায়।

"শোনো ইলিয়া!"

পলের গলার আওয়াজটা শুনে মনে হয় এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে সে যেন মাতাল হ'য়ে ছিলো। পলের মুখ বিবর্ণ, মাথার চুল উশ্‌কোখুশ্‌কো। বন্ধুর দিকে চেয়ে মেঝে থেকে চট্ ক'রে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া:

"কী হ'য়েছে?"

পল্ ব'ললো: "ও ধরা প'ড়েছে!"

সামনে ঝুঁকে পলের কাঁধদুটো চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া লুনেফ্:

"কি? কোথায় সে?"

ডুবন্ত জাহাজের নাবিকের মতো ব'ললো পল্:

"জেলে। শুনলাম কাল সকালে ওকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে।"

"অপরাধ?"

এমন সময় মাশা জেগে উঠলো। সামনেই পল্‌কে দেখে ভয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেলো সে। দোকানঘরের দরজাটা ফাঁক ক'রে গাভ্রিক্ একবার উঁকি মেরে গেলো। তার ঠোঁটের ভংগী দেখে মনে হ'লো কোনো কারণে সে বেজায় বিরক্ত হয়েছে।

"শুনলাম ও না কি কোন্ এক ব্যবসাদারের পকেট মেরেছে—প্রায় হাজার খানেক টাকা।"

পলের কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে ইলিয়া তাড়াতাড়ি একটু দূরে স'রে যায়।

ফাঁকা গলায় পল্ ব'ললো :

"সার্চ্ করবার সময় ওর কাছে ব্যাগ, টাকা—সব কিছুই পাওয়া গেছে। শুনলাম—সার্জেণ্টের মুখে ও না কি একটা ঘুষিও মেরেছে।"

বিষণ্ণভাবে ইলিয়া ব'ললো :

"তাই না কি ? ভালো ভালো। কিন্তু জেলে যখন ঢোকানো হয় তখন বেশ ক'রে লাথিয়েই ঢোকানো হয়।"

ব্যাপারটার উপলক্ষ্য যে সে নয় এটা বুঝতে পেরে মাশা একটু হেসে চাপা গলায় ব'ললো :

"আমি যদি জেলে যেতে পারতাম !"

পল্ একবার মাশার দিকে একবার ইলিয়ার দিকে তাকাতে থাকে।

ইলিয়া ব'ললো : "একে চিনতে পারছো না ? এ যে মাশা, পেফিশ্কার মেয়ে মাশা। মনে প'ড়ছে না ?"

"ও !" এই ব'লে পল্ মাশার দিক থেকে মুখখানা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়। এদিকে মাশা পল্কে চিনতে পেরে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

বিষণ্ণভাবে গ্রাৎচফ্ ব'ললো :

"ইলিয়া, ও যদি আমার জন্যেই এ-কাজ ক'রে থাকে, তাহ'লে ? ব'লতো বটে এরকম একটা-কিছু ও ক'রে ব'সবেই কোনো না কোনো দিন।"

"জানি না বাপু কার জন্যে ও একাজ ক'রেছে—নিজের জন্যে না তোমার জন্যে—তবে এখন এসব কথা ভেবে আর লাভ কি ? যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে। ওর ফূর্তি করা ঘুচলো এবার, এই যা।"

ভালো ক'রে ঘুম হয় নি, হাতমুখ পযন্ত ধোয়া হয় নি, মাথার চুল উশ্কোখুশ্কো—ইলিয়া এখনো পযন্ত ধাতস্থ হ'তে পারে না। বিছানার ওপর মাশার পায়ের কাছে ব'সে ও একবার মাশার দিকে চায় একবার পলের দিকে চায়। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ব'সে থাকবার পর ইলিয়া ধীরে ধীরে ব'ললো :

"আমি জানতাম জল এ্যাদ্দূর গড়াবে।"

সংগে সংগে পল্ ব'ললো : "কিন্তু ও যদি একটিবারও আমার কথায় কান দিতো !"

অবজ্ঞাভরে ব'ললো ইলিয়া লুনেফ্ ঃ

"ঠিক তাই! ব্যাপারটা ঐ একটি কথা থেকেই বোঝা যায়—ও তোমার কথায় কান দিতো না। কিন্তু ওকে তুমি কি ব'লতে শুনি ?"

"আমি ওকে ভালোবাসতাম।"

"রাখো তোমার ভালোবাসা! কেবল ভালোবাসা দিয়ে কি পেট ভরে? যা উপায় ক'রতে তা দিয়ে তো তাকে দুবেলা দুমুঠো ভালো ক'রে খেতেও দিতে পারতে না, অন্য কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পল্ ব'ললো ঃ "তা সত্যি।"

ইলিয়া এবার চ'টতে থাকে—যতোটা পলের ওপর ঠিক ততোটাই মাশার ওপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝালটা কার ওপর ঝাড়বে ঠিক ক'রতে না পেরে পলের ওপরই শ ফেটে পড়ে ঃ

"সকলেই চায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে একটু আরামে বাঁচতে। ভেরাও তাই চেয়েছিলো। কিন্তু তার জবাবে তুমি কি বলেছিলে ? বলেছিলে ঃ 'আমি তোমায় ভালবাসি' অর্থাৎ আমার সংগে শোও আর মুখ বুঁজে দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করো। তুমিই বলো না এটা কি ঠিক ?"

চাপা গলায় নেহাত গোবেচারার মতো জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্ ঃ

"এ-ছাড়া আমার আর কি করা উচিত ছিলো বলো ?"

প্রশ্নটা শুনে ইলিয়া যেন একটু থিতিয়ে যায়, তারপর নিজের অজান্তেই চিন্তিত হ'য়ে ওঠে।

পল্ ব'ললো ঃ "এর চেয়ে নিজের হাতে ওকে খুন করাও সহজ ছিলো।"

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো গাভ্রিক্ ঃ

"দোকান খুলবো কি ইলিয়া য়াকফ্লিচ্ ?"

বিরক্ত গলায় ব'ললো ইলিয়া ঃ

"চুলোয় যাক্ দোকান! এই ঝামেলার মধ্যে কি ছাইপাঁশ ব্যবসা হবে শুনি ?"

পল্ জিজ্ঞাসা ক'রলো ঃ "আমার জন্যে কি তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে ?"

হাঁটুর ওপর কনুই রেখে মেঝের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে পল। রগের

একটা শিরা দপদপ ক'রতে থাকে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার রগে এসে জমেছে।

পলের দিকে চেয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"তোমার জন্যে ? না, না, তুমি আমার অসুবিধে ক'রবে কেন ? তোমরা কেউই আমার অসুবিধে ক'রছো না—তুমিও না মাশাও না। অসুবিধে যে ক'রছে তাকে আমরা কেউই চিনি না। কেবল এইটুকু বুঝি যে সেই শক্তি তোমার, আমার, মাশার—সকলের সাধ-আহ্লাদেই বাদ সাধছে। জানি না আমাদের বোকামিই এর কারণ কি না। তবে মনে হচ্ছে ভালোভাবে বাঁচবার কোনো উপায়ই নেই।"

এই ব'লে ইলিয়া প্রথমে মাশা, তারপর পল্, তারপর দোকান, শেষে রাস্তার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিছানার ওপর নিশ্চল পুতুলের মতো শুয়ে থাকে মাশা। তাকে বড়ো হতাশ দেখায়। দোকানঘরে ব'সে গাভ্রিক্ চায়ের ডিসে চুমুক দিতে থাকে।

লোহার গরাদ-দেওয়া জানলার দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায়—প্রায় হতাশার সুরে—ব'লতে থাকে ইলিয়া :

"অসম্ভব, বাঁচা অসম্ভব। না আছে ঠাঁই না আছে আকাশ। সবকিছুই যেন ঝাপ্‌সা, বুদ্ধির অতীত। মানুষ যদি খুঁজেপেতে একটু সাফ্‌সুত্‌রো ঠাঁইও বার করে, তবুও তার ভাগ্যে শান্তি জোটে না। সবই যেন হেঁয়ালি, কেবল যন্ত্রণা আর ছটফটানি। তলিয়ে যে কিছু বুঝবো তারও কোনো উপায় নেই। যেখানে হাত দাও সেখানেই কাঁটা। খুশি হ'য়ে কেউ হয়তো গান গাইছে, সেই গান শুনে আমার বুকে কিন্তু কাঁটা বিঁধছে, এর কারণ আমার বুকে শান্তি নেই আনন্দ নেই !"

ইলিয়ার দিকে না চেয়েই জিজ্ঞাসা ক'রলো পল্ :

"কী ব'লছো ?"

চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো ইলিয়া লুনেফ্ :

"কী আর ব'লবো, সকলের কথাই ব'লছি। মনে হয় ভালো ব'লে কিছু নেই। হয়তো আমি কিছুই বুঝি না।—নাই বা বুঝলাম ? কিন্তু জানি নিজে কী চাই। আমি চাই সৎভাবে, পরিষ্কার হ'য়ে, সুন্দরভাবে, একটু

আরামে জীবন কাটাতে! দুঃখ বলো, পাপ বলো, নোংরামি বলো—এসব আমি দেখতে চাই না। চাই না, চাই না, চাই না! আমি নিজেও যে একদিন—"

এই পর্যন্ত ব'লেই ইলিয়া থেমে যায়। সংগে সংগে ওর মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে উঠে।

পল্ জিজ্ঞাসা ক'রলো: "তারপর?"

গলা নামিয়ে যেন আপন মনে ব'ললো ইলিযা:

"না, তা নয়। ক'রলেও আমি ইচ্ছে ক'রে সে কাজ করি নি।"

পল্ ব'লে ওঠে: "তুমি কেবল নিজের কথাই ব'লছো।"

রেগে গিয়ে ইলিয়া জবাব দিলো: "আর তুমি কার কথা ব'লছো শুনি? ভেরার? ওকে কার দরকার– তোমার না আমার? যে যার নিজের ঘা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু শোনো, আমি কেবল নিজের কথাই ব'লছি না, ব'লছি সকলের কথা, কারণ সকলেই আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে।"

চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে উঠে পল্ গ্রাংচফ্ ব'ললো:

"আমি না-হয় চলি।"

"কী জ্বালা! শোনো শোনো, আমার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করো, মিছিমিছি রাগ ক'রো না। আঘাত তো আমিও পেয়েছি। আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের দুঃখ বুঝি, তাহ'লে সত্যিকার দোষীকেও খুঁজে বার ক'রতে সুবিধা হয়।"

"আমিও ভাই কিছুই বুঝি না; তবে এইটুকু বুঝি যে বড়ো আঘাত পেয়েছি। ভেরার জন্যে আমার দুঃখ হ'চ্ছে, এই আর কি। কী ক'রবো তা ভেবে পাচ্ছি না।"

ধীরস্থিরভাবে ব'ললো ইলিয়া:

"তোমার কিছুই করবার নেই। মনে করো তুমি ওকে হারিয়েছো। শাস্তি ওকে পেতেই হবে কারণ বামাল ধরা প'ড়েছে।"

পল্ গ্রাংচফ্ আবার চেয়ারে ব'সে প'ড়লো। তারপর ব'ললো:

"কিন্তু আমি যদি বলি ও আমার জন্যেই এ-কাজ ক'রেছে, তাহ'লে?"

"একবার ব'লে দেখো, তাহ'লে তোমাকেও শ্রীঘরে সেঁদোতে হবে। বলি

ভায়া, তুমি রাজা না উজীর? যাও, হাতমুখ ধুয়ে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নাও। মাশা, তুমিও উঠে হাতমুখ ধোও। আমরা দোকানঘরে চ'ললাম। একটু চা তৈরি করো আমাদের জন্যে। মনে করো এটা তোমারই বাড়ি।"

চ'মকে উঠে বালিশ থেকে মুখ তুলে মাশা জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে :

"তারপর কি আমাকে বাসায় ফিরে যেতে হবে?"

"না-ই বা গেলে। মানুষ যেখানে শান্তি পায় তার বাসাও সেইখানে। এসো পাশ্‌কা।"

দোকানঘরে ঢুকে পল্‌ বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"মাশা তোমার এখানে কেন? দেখে তো মনে হ'চ্ছে ও আধমরা।"

দু-চার কথায় ইলিয়া পল্‌কে মাশার জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়ে দিলো। কিন্তু শোনবার পর পল্‌কে চম্‌কে উঠতে দেখে ইলিয়া অবাক হ'লো। এমন কি ক্রেনফের উদ্দেশে "বেটা শয়তানের ধাড়ী" ব'লে একটা দিব্যি গেলে পল্‌ হাসলোও একটু।

বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে দোকানখানা দেখতে দেখতে ইলিয়া ব'ললো :

"চুরি, জোচ্চুরি, ডাকাতি, মাতলামি, দুনিয়ায় যতোরকমের নোংরামি আছে তা নিয়েই যেন আমাদের জীবন! এসব কে চায়? কেউই না। কিন্তু এক নদীতে নাইতে গেলে একই জল গায়ে লাগবে। যার কপালে যা লেখা আছে তা খণ্ডাবে কে? এমন কি লুকোবারও ঠাঁই নেই—না বনে, না মঠে। কিছুদিন আগে তুমি আমাকে ব'লেছিলে কেবল ব্যবসা নিয়েই আমি প'ড়ে থাকতে পারবো না। তাই না? সত্যিই তাই। ব্যবসায় আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না। দিনরাত একই জায়গায় দাঁড়াও আর মাল বেচো। এতে আমার কীই বা লাভ? কিছুই না। উল্‌টে ঝামেলার একশেষ, তারপর হাত-পা বাঁধা। কোথাও যে যাবো তারও উপায় নেই। আগে আগে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, মনের মতো একটা নিরালা কোণ পেলে সেখানে ব'সে সুখদুঃখের কথা ভাবতাম! কিন্তু এখন দিনের পর দিন শুধু দোকান নিয়ে ওঠো আর দোকান নিয়ে ব'সো। ভ্যালা জালা!"

পল ব'ললো : "ভেরাকে যদি তোমার দোকানে চাকরি দিতে?"

বন্ধুর দিকে আড়চোখে চেয়ে ইলিয়া মুখ বুঁজে রইলো। এমন সময় মাশা ডাকলো ওদের :

"এসো, ভেতরে এসো !"

চা খাওয়ার সময় ওরা কেউই বিশেষ কথাবার্তা বলে না। রাস্তায় চনচনে রোদ্দুর। গোটাকতক ছেলে-মেয়ে খালি পায়ে দৌড়োদৌড়ি ক'রতে থাকে ফুটপাথের ওপর। মাঝে মাঝে দু-একজন সব্জিওয়ালী হেঁকে যায় :

"তাজা পেঁয়াজ চাই, তাজা পেঁয়াজ! টাট্‌কা শশা আছে গো, টাট্‌কা শশা!"

মনে প'ড়ে যায় এটা বসন্তকাল,—টাট্‌কা শশার মতোই হওয়া উচিত যার দিনগুলো। কিন্তু ইলিয়ার ঘরখানা স্যাঁতা গন্ধে ভর্তি।

ইলিয়া ব'ললো : "মনে হ'চ্ছে আমরা যেন কারোর পিণ্ডি দিতে ব'সেছি।"

পল্ ব'ললো : "ভেরার।"

বেজায় মুষড়ে প'ড়েছে পল্। মুখখানা ঝুলে গেছে হতাশায়। তার দিকে চেয়ে নীরস গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"এভাবে ভেঙে প'ড়লে কি চলে পল্? সবকিছুই সামলে নিতে হয়। মিছিমিছি মন খারাপ ক'রো না।"

পল্ গ্রাৎচফ্ ব'ললো :

"বিবেকের দংশন, ইলিয়া, বিবেকের দংশন। সারাটা সময় ব'সে ব'সে ভাবছি হয়তো আমিই ওকে জেলের দিকে ঠেলে দিলাম!"

নিষ্ঠুরের মতো ব'ললো ইলিয়া :

"খুবসম্ভব এটাই সত্যি।"

অসন্তুষ্ট হ'য়ে পল্ ইলিয়ার দিকে মুখ তুলে চাইতেই ইলিয়া ব'ললো :

"কি দেখছো?"

"তুমি বেজায় চ'টে গেছো।"

চীৎকার ক'রে বললো ইলিয়া :

"কেন চ'ট্‌বো না শুনি? কিসেরই বা এতো দয়ামায়া? আমায় কি কেউ দয়া ক'রেছে? আদর ক'রে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে? হয়তো

একটি মানুষ আমাকে ভালোবেসেছিলো—তবে তার কিই বা দাম, সে ছিলো একটা বেশ্যা! সবাই আমাকে ঠেঙাবে, আর আমি বুঝি মুখটি বুঁজে থাকবো? না হে না, সে বান্দাই নই আমি। ধন্যবাদ!"

রাগে ফুলতে থাকে ইলিয়া। জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে ওর চোখ-দুটো। ইচ্ছা করে চেয়ার টেবিল থেকে শুরু ক'রে ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত ঘুষি মেরে ভেঙে দেয়।

ভয় পেয়ে মাশা বাচ্চা মেয়ের মতো ককিয়ে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে:

"আমি বাড়ি ফিরে যাবো, আমায় যেতে দাও।"

ব'লে কোঁকড়া চুলশুদ্ধ মাথাটা ও এমনভাবে ঝাঁকায় যেন কোথাও গিয়ে ও মুখ লুকোতে চাইছে।

ইলিয়া চুপচাপ ব'সে থাকে, কিন্তু একটু পরে পলকেও ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ধ'মকে ওঠে মাশাকে:

"কাঁদছো কেন? তোমাকে কি ব'কেছি? কোথায় যাই, চুলোর যাবারও কি জায়গা আছে কোনো? কিন্তু যেতেই হবে আমাকে, যেতেই হবে। মাশা, পল্ রইলো তোমার কাছে। আর, গাভ্রিলো! তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না যদি আসেন,—ভ্যালা জ্বালা, এ-সময় আবার ডাকে কে?"

শোনা গেলো বাইরের দরজার কড়া ন'ড়ছে। গাভ্রিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মনিবের দিকে তাকাতেই ইলিয়া ব'ললো:

"খুলে দে।"

দেখা যায় চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গাভ্রিকের দিদি। চোখে-মুখে তার সেই একই ঔদ্ধত্য। ইলিয়ার অভিবাদনের জবাবে প্রত্যভিবাদন না জানিয়েই নাক তুলে ভ্রূ কুঁচকে ব'ললো মেয়েটি:

"গাভ্রিক, এদিকে একবার আয় তো।"

ইলিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্ব'লে যায়। উপেক্ষা! কিন্তু কেন এই অহেতুক উপেক্ষা? কিসের জন্যেই বা মেয়েটার এতোদূর স্পর্ধা? গোটা গোটা ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে ব'ললো ইলিয়া:

"শুনুন, কেউ নমস্কার ক'রলে তাকে প্রতি-নমস্কার জানাতে হয়।"

কোনো কথা না ব'লে ভ্রূজোড়া আর একটু কুঁচকে গাভ্রিকের দিদি

ইলিয়ার আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। গাভ্রিকও তার মনিবের দিকে তাকালো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে ইলিয়া ওর আগের কথার জের টেনে চ'ললো :

"এমন কিছু বদমাশ কিংবা মাতালের আড্ডাতেও আপনি এসে পড়েননি। আমরা যদি আপনার ইজ্জৎ রেখে চলি তাহ'লে একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা হ'য়ে আপনারও উচিত আমাদের ইজ্জৎ রেখে চলা। তাই না ?"

এ-কূল ও কূল দু-কূলই যাতে বাঁচে এই মতলবে গাভ্রিক হঠাৎ ব'লে উঠলো :

"সব সময় অমন নাক তুলে থেকো না দিদি।"

এই ব'লে দিদির কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ও চেপে ধ'রলো। কারোরই মুখে কোনো কথা নেই। বিশ্রী অবস্থা। ইলিয়া চেয়ে আছে গাভ্রিকের দিদির দিকে, আর গাভ্রিকের দিদি চেয়ে আছে ইলিয়ার দিকে। চুপিচুপি মাশা স'রে যায় এক কোণে। পল পিট্‌পিট্ ক'রতে থাকে চোখদুটো।

বেগতিক দেখে গাভ্রিক ব'ললো ওর দিদিকে :

"চুপ ক'রে থেকো না সোন্‌কা, কিছু বলো। তুমি কি ভাবছো ওঁরা তোমাকে অপমান ক'রতে চান ?" তারপর, হঠাৎ মুচকি হেসে ব'ললো :

"খাসা লোক এঁরা—সত্যি।"

জামার আস্তিন ধ'রে গাভ্রিককে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া লুনেফ কে :

"কি চান আমার কাছ থেকে ?"

"কিছু না, কেবল—"

এমন সময় ইলিয়ার মগজে হঠাৎ এক চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেলো। মেয়েটির দিকে এক পা এগিয়ে যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে ব'ললো সে :

"যদি অভয় দেন তো বলি। তবে গোড়াতেই জানিয়ে রাখি আমরা তিনজন—মানে—এই পল্ আমি আর মাশা—আমরা হ'লাম মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আর আপনি হ'লেন শিক্ষিতা—"

কিন্তু গাভ্রিকের দিদির মুখের দিকে তাকাতেই তার কথার উৎস শুকিয়ে

আসে। মেয়েটার কালো কালো চোখদুটি যেন জ্ব'লছে। বিরক্ত হ'য়ে মাথা নুইয়ে বিব্রতভাবে বলে ইলিয়া :

"এক কথায় ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না, তবে যদি আপনার সময় থাকে তো ঘরে এসে একটু বসুন।"

এই ব'লে ইলিয়া পিছনে স'রে এসে গাভ্রিকের দিদিকে ঘরে ঢোকবার জায়গা ক'রে দেয়।

"তুই এখানে দাঁড়া গাভ্রিক্" এই ব'লে ভাইকে দরজার গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি ঘরে ঢোকে। তারপর ইলিয়া একখানা টুল তার দিকে এগিয়ে দিতেই সে ব'সে পড়ে। পল্ চ'লে যায় দোকানঘরে, মাশা উনুনের পাশটিতে গিয়ে জবুথবু হ'য়ে দাঁড়ায়।

আচ্ছা মুশ্কিল। মেয়েটির থেকে হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে ইলিয়া ভেবেই পায় না কি ব'লে কথাবার্তা শুরু ক'রবে।

গাভ্রিকের দিদি ব'ললো : "বলুন?"

গভীরভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইলিয়া ব'লতে শুরু ক'রলো :

"ব্যাপারটা এই—বুঝলেন—একটি বাচ্চা মেয়ে—মানে—ঠিক বাচ্চা নয়, বিয়ে হ'য়েছে তার এক বুড়োর সংগে—ঐ যে ওর কথাই ব'লছি আর কি। লোকটা অত্যেচার করে ওর ওপর—হরদম—মেরে ধ'রে খামচে-খিমচে একেবারে তছনছ ক'রে দেয়। তাই ও পালিয়ে এসেছে আমার কাছে। হয়তো খারাপ ভাবছেন, না? না, না, সে সব কিছু নয়।"

ইলিয়া ফাঁপরে পড়ে। কোন্ কথাটা আগে ব'লবে? মাশার কথা, না মাশার দাম্পত্যবিপর্যয় সম্পর্কে ওর নিজের মন্তব্যটা? এক সংগে সব কথা ব'লতে গিয়ে ওর সবকিছুই গুলিয়ে যায়। বিশেষ ক'রে ও শোনাতে চায় ওর নিজের কথাটাই। কিন্তু—

এমন সময় গাভ্রিকের দিদি মুখ তুলে ইলিয়ার দিকে তাকালো। একটু যেন কোমল হ'য়ে এসেছে তার মুখখানা, তবে চোখে সেই চাবুক-মারা চাহনি।

ইলিয়ার কথায় বাধা দিয়ে ব'ললো গাভ্রিকের দিদি :

"বুঝেছি। কি ক'রবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না, এই তো? প্রথমে কোনো ডাক্তারকে দিয়ে মেয়েটিকে পরীক্ষা করানো দরকার। আমি একজন ডাক্তারকে

জানি ; বলেন তো তাঁর কাছেই ওকে নিয়ে যাই। গাভ্রিক্, সময় কতো রে এখন ? এগারোটা ? ঠিক আছে, এই সময় গেলে তাঁর সংগে দেখা হবে। একখানা গাড়ি ডেকে আন্, গাভ্রিক্। আর আপনি—কৈ মেয়েটির সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিন ?"

কিন্তু ইলিয়া নড়েও না চড়েও না, রীতিমতো তাজ্জব ব'নে ব'সে থাকে। আজ পর্যন্ত গাভ্রিকের দিদিকে সে বাঘিনী ব'লেই জেনে এসেছে। তার গলা যে এতো মোলায়েম, এতো দরদী হ'তে পারে তা নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাসই ক'রতো না।

ইলিয়াকে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে গাভ্রিকের দিদি নিজেই মাশার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে আলাপ ক'রতে লাগলো :

"কেঁদো না মানিক, ভয় পেও না। যে-ডাক্তারের কথা ব'লছি তিনি ভালো লোক। তোমাকে পরীক্ষা ক'রে তিনি একখানা কাগজ দেবেন। বাস্, এতে আর ভয় কি ? তারপর আমি নিজে তোমায় এখানে পৌছে দিয়ে যাবো। কেঁদো না, কেমন ?"

মাশার কাঁধে হাত রেখে গাভ্রিকের দিদি তাকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা ক'রতেই মাশা ককিয়ে উঠলো :

"উঃ, লাগছে !"

"কি হ'য়েছে ওখানে ?"

চুপটি ক'রে ব'সে ইলিয়া শোনে আর মৃদু মৃদু হাসে।

"লোকটা—লোকটা কি শয়তান !" এই ব'লে গাভ্রিকের দিদি মাশার কাছ থেকে স'রে আসে। মুখখানা তার ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখে জ্ব'লছে ক্রোধের আগুন।

"ইস, কি বিশ্রীভাবে কেটে ছ'ড়ে দিয়েছে—ইস্ !"

শোনা মাত্র ইলিয়া চ'টে গিয়ে ব'লে উঠলো :

"এই আমাদের জীবন ! দেখলেন তো ? আর একটি উদাহরণ আপনাকে দিতে পারি—অন্যরকমের—তবে সমান মর্মান্তিক। আসুন, আমার বন্ধু পল্ সাভেলিয়েভিচ্ গ্রাৎচফের সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দি।"

ধীরে ধীরে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটির দিকে না চেয়েই পল্ তার ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিলো।

পলের করুণ মুখখানার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ললো গাভ্রিকের দিদি :

"আমার নাম মেদভেদেফ্ সোফিয়া নিকলায়েফ্না।" তারপর ইলিয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা ক'বলো : "আপনার নাম তো ইলিয়া য়াকফলিচ্, তাই না ?"

গাভ্রিকের দিদির হাতখানা সজোরে চেপে ধ'রে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শশব্যস্ত হ'য়ে ব'ললো ইলিয়া :

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু শুনুন, একটা ঝক্কি যখন ঘাড়ে নিলেন তখন আর একটা ঝক্কিও—মানে—"

ইলিয়ার মুঠো থেকে নিজের হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে গাভ্রিকের দিদি ইলিয়ার সুন্দর মুখখানার দিকে গম্ভীর-ভাবে তাকিয়ে রইলো। ভেরা এবং পল্ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই ইলিয়া হুড়হুড় ক'রে ব'লে গেলো দরদভরা গলায়। অবশেষে ব'ললো :

"জানেন, পল্ কবিতা লিখতো, আব কী সুন্দবই না সে কবিতা ! কিন্তু এই অশান্তির জন্যে ও কিছুই ক'রতে পারলো না। ভেরাও কিছু কব'তে পারলো না। এবার একটা প্রশ্ন ক'রবো আপনাকে। আচ্ছা, ভেরার সব কথা শুনে আপনার কি মনে হ'চ্ছে যে ওর মধ্যে আর কিছুই নেই ? তা যদি মনে করেন তাহ'লে ভুল হবে। দোষই বলুন আর গুণই বলুন, সবটুকু প্রকাশ পায় না।"

"কি রকম ?" গাভ্রিকের দিদি জিজ্ঞাসা করে।

"অর্থাৎ, যার মধ্যে গুণ আছে তার মধ্যে দোষও আছে ; এবং যার মধ্যে দোষ আছে তার মধ্যে গুণও আছে। মনের রং একটা নয়, বহু।"

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে গাভ্রিকের দিদি সায় দিলো :

"এ-কথা অবিশ্যি খুবই সত্যি। মানুষের মন এই রকমই বটে। কিন্তু দয়া ক'রে এবার আমার হাতটা ছাড়ুন,—লাগছে।"

"তাই তো, ছি ছি, বড়ো অন্যায় হ'য়ে গেছে—"

কিন্তু গাভ্রিকের দিদি ইলিয়ার কথায় কান না দিয়ে পল্‌কে নিয়ে প'ড়লো :

"লজ্জার কথা, গ্রাৎচফ্, লজ্জার কথা! হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলে কি চলে? কিছু করুন। করা দরকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে লাভ কি? ভেরার জন্যে এখুনি কোনো উকিল ঠিক করুন, বুঝলেন? বলেন তো আমিই না হয় একজন উকিল খুঁজে দি। তাহ'লে ভেরা বেঁচে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি ও নিশ্চয়ই ছাড়ান পাবে।"

ব'লতে ব'লতে গাভ্রিকেব দিদিব মুখখানা লাল হ'য়ে যায়, চোখদুটো চকচক ক'রে ওঠে অদ্ভুত আনন্দে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে মাশা একরত্তি খুকির মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে ওব দিকে। এদিকে ইলিয়া পল্ এবং মাশার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন গাভ্রিকের দিদির উপস্থিতিতে তার ঘরখানা ধন্য হ'যে গেছে।

গদগদ হ'য়ে পল্ ব'ললো:

"সত্যিই যদি আমাকে সাহায্য ক'রতে পারেন করুন। এ-উপকার আমি কোনোদিন ভুলবো না। লাভ কতোটা হবে জানি না, তবে আপনার আশ্বাসে যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।"

"সাতটা নাগাদ আমার বাসায় আসুন। কেমন? গাভ্রিকের কাছে আমার ঠিকানা পাবেন।"

"আসবো। কি ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"কেন, ধন্যবাদ কেন?"

"কি যে বলেন!"

"শুনুন, এসব আমার ভালো লাগে না। মানুষ মানুষকে যদি সাহায্য না করে তাহ'লে আর ক'রবেই বা কে?"

ব্যংগের সুরে ব'লে উঠলো ইলিয়া: "তাই না কি? দেখুন র'য়ে ব'সে।"

সংগে সংগে গাভ্রিকের দিদি ইলিয়ার দিকে তাকালো। কিন্তু দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র বাধবার আগেই বিচক্ষণ গাভ্রিক্ দিদির হাতে টান দিয়ে ব'ললো:

"আর বকবক ক'রো না দিদি। যাবে তো যাও এই বেলা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাশা জামা প'রে নাও।"

বিব্রত হ'য়ে মাশা ব'ললো:

"আর কিছু তো পরবার নেই আমার।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। চলো, এবার যাই। গ্রাৎচফ্, আসছেন তো তাহ'লে? আসি, ইলিয়া য়াকফ্লিচ্।"

ছুই বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে গাভ্রিকের দিদি মাশার হাত ধ'রে দরজার দিকে এগোলো। কিন্তু দরজার কাছাকাছি গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে ব'ললো ইলিয়াকে :

"দরকারী কথাটাই বলা হয় নি এতোক্ষণ। দোকানে ঢোকবার সময় আপনাকে প্রতি-নমস্কার করি নি ব'লে আমি লজ্জিত। মাপ ক'রবেন।"

মেয়েটির লজ্জানত মুখখানির দিকে চেয়ে ইলিয়া খুশি হয়। গোটাকতক কোকিল যেন ডেকে ওঠে ওর বুকের মধ্যে।

"সত্যিই আমি লজ্জিত। ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঠাট্টা ক'রছেন— আচ্ছা বোকামি যা হোক—কিন্তু—"

ব'লে একবার ঢোঁক গিলে গাভ্রিকের দিদি আবার ব'ললো :

"প্রতি নমস্কার না জানানোর জন্যে আপনি যখন আমায় তিরস্কার ক'রলেন তখন ভেবেছিলাম ওটা আপনার হামবড়ামি। ভুল বুঝেছিলাম আপনাকে। এখন দেখছি আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিলো ব'লেই আপনি আমায় তিরস্কার ক'রেছিলেন। এতে আমার খুশি হবারই কথা।"

এরপর গাভ্রিকের দিদির ঠোঁটে হঠাৎ এককালি মিষ্টি হাসি খেলে গেলো। ব'ললো :

"আত্মসম্মানজ্ঞান আছে এমন লোকের সংগে কথা ব'লেও আনন্দ। ভারি খুশি হ'য়েছি, সত্যি খুশি হ'য়েছি! আচ্ছা, আসি।"

এই ব'লে গাভ্রিকের দিদি উধাও হ'য়ে যেতেই পল্ আর ইলিয়া এ ওর মুখের দিকে চেয়ে হাঁদার মতো ব'সে থাকে।

খানিক পরে ঘরের চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পল্‌কে একটা গোঁজা মেরে ব'ললো ইলিয়া :

"কড়া মেয়ে, কি বলো?"

পল্ হাসলো একটু।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ইলিয়া আবার ব'ললো :

"খাসা চেহারা! তাছাড়া যেন—"

"ঝড়!"

কোঁকড়া চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে গর্বিতভাবে ইলিয়া ব'ললো :

"যা ব'লেছো। তাছাড়া মাপ চাওয়ার ভংগিটাও কি সুন্দর! শিক্ষা-দীক্ষা আছে বেশ বোঝা যায়। প্রথমে মাথা নোয়াবার মতো মেয়ে ও নয়। বুঝলে?"

হাসতে হাসতে ব'ললো গ্রাৎচফ্ :

"মানুষও ভালো। ঘণ্টাখানেক ছিলো, কিন্তু মনে হ'চ্ছে যেন এলো আর গেলো।"

"উল্কা!"

"ঠিক। তাছাড়া, কার কি করা দরকার তাও ব'লে দিয়ে গেলো চটপট্।"

হো হো ক'রে হেসে উঠলো ইলিয়া—আনন্দে, উত্তেজনায়। বাইরে রুক্ষতার আবরণ থাকলেও গাভ্রিকের দিদির মনটি যে বেশ সরল ও দরদী, এটা জানতে পেরে খুশি হ'লো সে। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ব'ললো মনে মনে : "তাছাড়া ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি আমারও আত্মসম্মানজ্ঞান আছে।" কিন্তু একটু পরেই ব'ললো আমতা আমতা ক'রে :

"বড়ো ভুল হ'য়ে গেছে হে।"

"ভুল? কি ভুল ক'রলে?" পল্ জিজ্ঞাসা করে।

"ওর হাতে আমার চুমু খাওয়া উচিত ছিলো। ওদের সমাজে—মানে—শিক্ষিত সমাজে কারোর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে হ'লে হাতে চুমু খেতে হয়। ওর মাপ চাওয়ার ব্যাপারে এতোটা ম'জে গিয়েছিলাম যে এ-কথাটা আমার মনেই ছিলো না।"

এদিকে গাভ্রিক্ উশখুশ ক'রতে থাকে। ওর কাঁধে হাত রেখে ব'ললো ইলিয়া :

"গাভ্রিলো, তোর দিদি কিন্তু খাসা মেয়ে!"

"হ্যাঁ, দিদি মানুষ ভালো। আজ কি দোকান খোলা হবে, না কি ছুটি? ছুটি পেলে একটু মাঠে ঘুরে আসতে পারি!"

"থাক্, দোকান আজ বন্ধই থাক্! আজ ছুটি! চলো পল্, আমরাও একটু ঘুরে আসি!"

ভ্রূ কুঁচকে পল্ গ্রাৎচফ্ ব'ললো:

"আমি একবার থানায় যাবো ভাবছি। দেখি যদি ভেরার সংগে একবার দেখা করা যায়—"

"বেশ, তাই যাও। কিন্তু, আমি আজ বেড়াতে চ'ললাম।"

আজ তবে ছুটি! আনন্দে, উদ্দীপনায় চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে ইলিয়া। হাঁটতে হাঁটতে গাভ্রিকের দিদির কথা ভাবে :

"মেয়েটি ভালো। এ-পর্যন্ত যতোগুলি মেয়ে দেখেছি তাদের মধ্যে সেরা। আর কতো দরদী! আমার জন্যে এতোখানি দরদ আর কেউ দেখিয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। কি মিষ্টি ক'রেই না মাপ চাইলো : 'প্রতি-নমস্কার না জানানোর জন্যে আমি লজ্জিত। মাপ ক'রবেন।' "

'মাপ ক'রবেন, মাপ ক'রবেন'—গাভ্রিকের দিদির এই কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে ইলিয়া ভেবে চলে :

"তারপর, সেই মুখ—কঠিন প্রতিজ্ঞার ছাপ চিবুকে, গালের হাড়ে। ইস্পাত! আর, নাক? যখনই দেখো নাকের গর্তদুটি ফুলেই আছে—"

মনে মনে না হেসেই পারে না ইলিয়া। কিন্তু একটু পরেই ওকে ভীষণ চিন্তিত দেখায় :

"বুঝলাম। কিন্তু প্রথমটায়—ভালো ক'রে আলাপ-সালাপ না ক'রেই—ও আমাকে তাচ্ছিল্য ক'রলো কেন অমন ক'রে? ক্ষেপেই বা গেলো কেন আমার ওপর? আশ্চর্য!"

ইলিয়া হাঁটে আর ভাবে। আজ তবে ছুটি!

রাস্তায় হট্টগোলের সীমা নেই। স্কুলের ছেলেরা চ'লেছে হাসতে হাসতে, মালবোঝাই ঠেলাগাড়ি যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে, ঢরঢরে ঘোড়ার গাড়িগুলো চ'লেছে ধুঁকতে ধুঁকতে, খট্‌খট্ ক'রে কেঠো পা ঠুকে একটা ভিখিরি চ'লে গেলো লেংচাতে লেংচাতে, পুলিশ-পাহারায় দুজন কয়েদী চ'লেছে বাঁকে-ঝোলানো ভারি বালতি নিয়ে, ফুটপাথ ঘেঁষে একটি ফেরিওয়ালাও চ'লে গেলো হাঁকতে হাঁকতে : "নাসপাতি চাই, মিষ্টি নাসপাতি!" একটা হ্যাংলা কুকুরও চ'লেছে তার পিছনে পিছনে এক হাত জিভ বের ক'রে।

লোকজনের আনাগোনায়, হাসিতে কাশিতে, চীৎকারে, চক্রনির্ঘোষে রাস্তা একেবারে জমজমাট। ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। অজস্র রোদ যেন হাসছে। ভারি আরাম পায় ইলিয়া। বহুদিন হ'লো এমন আরাম ওর ভাগ্যে

জোটে নি। একজন সুন্দরী তরুণী প্রায় লাফাতে লাফাতে চ'লে গেলো ইলিয়ার পাশ দিয়ে। যাবার সময় গোলাপী মুখখানি তুলে এমন মিষ্টি ক'রে তাকিয়ে গেলো ইলিয়ার দিকে, যেন ব'লতে চায়ঃ "খাসা চেহারা তো তোমার!" ইলিয়াও মেয়েটির দিকে চেয়ে মুচকি হাসে। ওদিকে এক কোচোয়ান গাড়ির মাথা থেকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে, টুপি নাড়তে নাড়তে একজন নাদুসনুদুস ভদ্রমহিলাকে ব'লছেঃ "নেহি, নেহি, মেমসাব, আউর্ কুছ দিজিয়ে—কুছ নেহি তো এক আনা আউর্—দেখিয়ে তো কাঁহাসে আয়ে—"।

ইলিয়া এক নজরেই বোঝে কোচোয়ান-বেটা ভদ্রমহিলাকে ঠকাচ্ছে। একটু হেসে পাশ ফিরতেই দেখে একটা বাচ্চা ছেলে এক কেৎলি চা নিয়ে দৌড়োচ্ছে। চা প'ড়ছে রাস্তায় চ'লকে চ'লকে। হুঁশই নেই তার। কোনো দোকানের চাকর-বাকর হবে হয়তো।

হাঁটতে হাঁটতে বেজায় গরম লাগে ইলিয়ার। রাস্তাটাও ঘিঞ্জি। তাছাড়া ভীষণ হট্টগোল। এ-সময় কার না মন চায় শহরের গোরস্থানে গিয়ে লেবুগাছের ছায়ায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিতে? ইলিয়াও পা চালায় সেই দিকে। পুরণো গোরস্থানটির চারিধারে সাদা পাথরের পাঁচিল। অসংখ্য গাছ মাথা তুলেছে আকাশের দিকে—ঢেউ খেলিয়ে। চূড়ার থোকা থোকা পাতাগুলোকে দেখায় সবুজ ফেনার মতো। ঢেউয়ের ওপরে ফেনা। আর সর্বোপরি রোদ্দুরে ঝলমল ক'রতে থাকে গির্জার সোনালী ক্রুশগুলি।

গোরস্থানে ঢুকে দু সারি লেবুগাছের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে ইলিয়া। লেবুফুলের মিষ্টি গন্ধে রিম্‌রিম্ ক'রছে বাতাস। চারিধারে কবর, স্মৃতিফলক। কোনোটি পাথরের, কোনোটি গ্র্যানিটের। কোনোটি ঢাকা প'ড়েছে শ্যাওলায়, কোনোটি প্রায় হারিয়ে গেছে গাছের ডালপালার মধ্যে। রোদের লুকোচুরি খেলা চ'লেছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। ছায়াকুচি ছড়িয়ে আছে ঝোপঝাড়ের চারপাশে। ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের ক্রুশ চমকে উঠছে রোদ্দুরে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হ'তে হয় গাছের অজস্রতা দেখে। বার্চ্, হনিসাক্‌ল্, এ্যাকাসিয়া, থর্ণ্, এল্‌ডার, তাছাড়া কতো রকমের যে ফুল! যেমন রঙ তেমনি গন্ধ। বোল্‌তা ব'সেছে ফুলের ওপর, প্রজাপতিগুলো ভাসছে বাতাসে। দেখেশুনে মনে হয়, গোরস্থান হ'লেও জীবনের অভিযান

যেন থামেনি এখনো। এতো বর্ণ গন্ধই তার প্রমাণ। ব'লতে ইচ্ছা করে জীবনের জয় সর্বত্র, জীবন জয়ও করে সবকিছুকে। ইলিয়া যতোটা পারে ফুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে টেনে নেয়। চারিধাব নিস্তব্ধ, কেমন একটা বিশ্রামের আমেজ র'য়েছে জায়গাটা জুড়ে। বহুদিন হ'লো নির্জনতার এই আনন্দটুকু পায় নি ইলিয়া। ঘুরে ঘুরে ও কবরগুলো দেখতে থাকে।

গ্র্যানিট-নির্মিত প্রকাণ্ড একটি সমাধির গায়ে লেখা র'য়েছে :

"চিরনিদ্রায় নিদ্রিত
ঈশ্বরের দাসানুদাস
বনিফান্তি।"

মজার নাম। মনে মনে হাসে ইলিয়া। বনিফান্তির কবরের ঠিক পাশেই এক টুকরো ঘেরা-জায়গায় র'য়েছে আটাশ বছরের যুবক পেতের্ বাবুশ্কিনের সমাধি। সাধারণ সাদা পাথরের ওপর লেখা র'য়েছে :

"পৃথিবীর ফুল হ'লো আকাশের তারা।"

মর্মস্পর্শী বটে। "মাত্র আটাশ, ভরা যৌবন," মনে মনে বলে ইলিয়া। কিন্তু ঠিক এই সময় আব একটি সমাবির ওপর ওর চোখ প'ড়তেই ও আঁতকে ওঠে। খয়েরী রঙের একটা বিরাট কবরের গায়ে চকচকে সোনার অক্ষরে লেখা র'য়েছে :

"প্রবীণ ব্যবসায়ী
ভাসিলি গাভ্রিলোভিচ্ পলুএক্তফের সমাধি :
'বিশ্রাম'।"

আপনা থেকেই ইলিয়ার চোখদুটি বুঁজে আসে। মনে হয় কে যেন হঠাৎ ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে ও তাকায় আশ-পাশের ঝোপঝাড়গুলির দিকে। কেমন যেন সন্দেহ হয় ওর। কিন্তু কেউ কোথাও নেই, চারিধার নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যায় কোথায় যেন শোক-স্তোত্র পাঠ করা হ'চ্ছে।

"এবার তবে প্রার্থনা শুরু হোক্।"

বোঝা যায় এটা কোনো পাদ্রির গলা।

তার কিছু পরেই শোনা গেলো কে যেন রুক্ষ অসন্তুষ্ট গলায় ব'লছে: "ব'লছি তো দয়া করুন!"

একটু পরেই টিং ক'রে একটা শব্দ হয়।

মেপ্‌ল্ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, পকেটে হাতদুখানা গুঁজে ইলিয়া যার কবরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তাকে ও একদিন খুন ক'রেছিলো। টুপিটা মাথার পিছন দিকে হড়কে যাওয়ায় রোদ এসে প'ড়েছে ইলিয়ার সারা কপালে, ভ্রূজোড়া গেছে কুঁচকে, ওপরের ঠোঁটখানা কাঁপছে থেকে থেকে, সেই সংগে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে ওর দাঁতগুলো।

পলুএক্‌তফের কবরের ডালার ওপর পাথরে খোদাই করা র'য়েছে একখানা খোলা বই, একটা মাথার খুলি এবং একজোড়া হাড়—ক্রুশের আকারে। তার কবরের পাশেই দেখা যাচ্ছে আর একটি ছোটো কবর। লেখা র'য়েছে:

"ঈশ্বরের সেবিকা
এউপ্রাক্‌সিয়া পলুএক্‌তফ্:
বয়স—২২ বৎসর।"

"হারামজাদার প্রথমপক্ষের বউ খুব সম্ভব" মনে মনে বলে ইলিয়া। কিন্তু এ নিয়ে ও একেবারেই মাথা ঘামায় না। ও তখন ভাবছে পলুএক্‌তফের কথা। কি ক'রে ওর সংগে তার প্রথম দেখা হ'য়েছিলো কিভাবে ও তাকে গলা টিপে মেরেছিলো, কেমন ক'রে ওর হাতদুখানা তার লালাতে ভিজে গিয়েছিলো—এই সব কথাই ভাবতে থাকে ইলিয়া। এতো বড়ো একটা গুরুতর ব্যাপার হজম করা শক্ত বটে, তবে তার জন্যে ওর ভয়ও সেই অনুতাপও নেই। ঘৃণা—শুধু ঘৃণা আর যন্ত্রণায় জ্ব'লে যেতে থাকে ওর অন্তর। কবরটার দিকে চেয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে পলুএক্‌তফের উদ্দেশে মনে মনে বলে ও:

"নরকেও তোর ঠাঁই হবে না হারামজাদা। তোর জন্যেই আমি আমার জীবনটাকে নষ্ট ক'রেছি। আমার পাপের মূলে তুই। সারাটা জীবন আমাকে এ পাপের বোঝা বইতে হবে। কি ক'রে যে জীবন কাটাবো কে জানে! বুঝলি হারামজাদা, তুই—তুইই আমার যতো পাপের গোড়া।"

ইলিয়ার ইচ্ছা করে সারা পৃথিবীর সামনে চীৎকার ক'রে এই কথাগুলো বলে যাতে সকলে শুনতে পায়। বলতে কি, আর একটু হ'লে ও চীৎকার

ক'রেই ফেলেছিলো! "আমার কি হবে, আমার কি হবে" ভবিষ্যতের এই চিন্তা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে ওর মনের আনাচে-কানাচে! কবরটার দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে দাঁড়িয়ে থাকে ইলিয়া। কিছুক্ষণ পরে মাড়িগুলো টনটনিয়ে ওঠে। হঠাৎ ওর মনে হয় পলুএকৃতফের কদাকার মুখখানা ওর চোখের সামনে যেন ভাসছে! শুধু তাই নয়, পলুএকৃতফের পাশাপাশি যেন দাঁড়িয়ে র'য়েছে টেকো স্ত্রোগানফ্, শূয়োরমুখো পেত্রুহা, পয়লা নম্বরের গাড়োল কিরিক্, আর ইঁদুরচোখো খেঁদা ক্রেনফ্।

কানদুটো ভোঁ ভোঁ ক'রতে থাকে ইলিয়ার। মনে হয় পলুএকৃতফ্ থেকে শুরু ক'রে ক্রেনফ্ পর্যন্ত সবাই যেন ওর দিকে তেড়ে আসছে। "নাঃ, এখানে আর নয়" এই ভেবে এক পা বাড়াতেই মাথা থেকে ওর টুপিটা যায় প'ড়ে। কিন্তু টুপিটা কুড়োবার সময় চোরাই মালের কারবারী ঐ পোদ্দারটার কবরের ওপর থেকে নিজের চোখদুটোকে ও কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারে না। মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে ইলিয়ার। মনে হয় জ্বর আসছে। অবশেষে রেলিঙের ধারে গিয়ে পলুএকৃতফের কবরের ওপর এক ধ্যাবড়া থুতু ফেলে, মাটিতে একবার প্রচণ্ড পদাঘাত ক'রে ও স'রে আসে সেখান থেকে।

কিন্তু এবার যাবে কোথায়? বাড়ি ফিরতে মন চায় না। দুঃখে ক্লান্তিতে ওর দেহ অবশ হ'য়ে আসে। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না ব'লেই ও হাঁটে, কিন্তু সে যেন উদাসীন উদ্দেশ্যহীনভাবে। হাঁটবার সময় কারোর দিকেই ও তাকায় না, কিছুই ওর ভালো লাগে না, মন যেন খাঁ খাঁ ক'রছে। এইভাবে একটার পর একটা রাস্তা পার হ'য়ে এসে হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই ও বুঝতে পারে সেখান থেকে পেত্রুহা ফিলিমনফের হোটেল খুব বেশি দূরে নয়। সংগে সংগে ওর মনে প'ড়ে যায় জাকবকে। কিন্তু হোটেলের দরজার সামনে এসেই ও ভাবতে শুরু করে:

"কি হবে গিয়ে? নাঃ, থাক্। তবে, যাওয়াও তো দরকার একবার। আচ্ছা ঢোকাই যাক্ এলাম যখন।"

তবে সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে ইলিয়া পিছনের দরজার দিকে এগোয়। যেতে যেতে শোনে পের্ফিশ্কা কাকে যেন ব'লছে:

"জ্যালা জালা! মাইরি ব'লছি, অমন ক'রে গুঁতো মেরো না। পাঁজরার হাড় ক'খানা আমার আস্তো রাখবে না দেখছি! আরে, করো কি, করো কি—"

চৌকাঠের কাছে থেমে ইলিয়া দেখলো ওভারকোট্ গায়ে দিয়ে দিব্যি টেরি বাগিয়ে, এক গাদা ধুলো আর তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে- জাকব কাউণ্টার আগলাচ্ছে। ব্যস্ততার অন্ত নেই তার। এই চা ঢালছে, এই ভদ্কা ঢালছে, এখানে চামচ গুনে চিনি দিচ্ছে, ওখান থেকে খালি কেৎলিটা টেনে নিচ্ছে, তাছাড়া ধুম-ধড়াস্ করে কাউণ্টারের দেরাজ খুলছে বন্ধ ক'রছে তো বটেই। এদিকে খানসামাগুলো হন্তদন্ত হ'যে অর্ডার নিয়ে এসে হাঁকছে হরদম :

"এই যে, এবার এটা ছাড়ুন। আধবোতল ভদ্‌কা, দুটো বীয়ার, তিন আনার মাংস, দুখানা রুটি ·"

সংগে সংগে জাকবও চালান ক'রছে মালগুলো।

জাকবের ব্যস্ততা দেখে কেমন যেন বিরক্ত হয় ইলিয়া। ভাবে :

"খাসা মানিয়ে নিয়েছে তো!"

এমন সময় বুনো জানোয়ারের মতো চীৎকার ক'রে কে যেন ব'লে উঠলো :

"শালা যাবে কোথায়? আধুলিটা ফিরিয়ে দেয় তো ভালোই, নইলে বেইজ্জৎ ক'রে ছাড়বো।"

আস্তে আস্তে ইলিয়া কাউণ্টারের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখেই জাকব চেঁচিয়ে উঠলো : "আরে, ইলিয়া যে!" কিন্তু সেই সংগে, যেন ভয়ে ভয়ে, পিছনের খোলা দরজাটার দিকেও সে একবার তাকিয়ে নিলো।

জাকবের কপালখানা ঘামে ভিজে গেছে, বিবর্ণ গালদু'খানা লাল হ'য়ে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। খুক-খুক ক'রে একটু কেশে ইলিয়ার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঝাঁকালো জাকব।

অতি কষ্টে একটু হেসে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কেমন আছো?"

"দেখতেই পাচ্ছো। খাবার বেচছি!"

"ঝুলিয়ে দিয়েছে তাহলে শেষপর্যন্ত?"

"দিলে আর কি করি বলো?"

সংগে সংগে জাকবের কাঁধদুখানা ঝুলে পড়ে, আর সেইজন্য তাকে বেশ খানিকটা বেঁটে দেখায়।

একটু পরে ইলিয়ার মুখের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জাকব ব'ললো :

"অনেক দিন দেখা হয় নি তোমার সংগে, তাই না? যাক্ ভালোই হ'লো, বাবাও বাড়ি নেই, আরাম ক'রে বসে একটু গল্প করা যাবে। শোনো, তুমি বরং ঐ ঘরে গিয়ে ব'সো। আমি নতুন-মাকে ডেকে দি, উনি ততোক্ষণ কাউণ্টারে এসে দাঁড়াবেন।"

বাবার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে জাকব যতদূর সম্ভব মিষ্টি গলায় ডাকলো :

"মা, এদিকে একবার আসুন তো!"

ঘরে ঢুকেই ইলিয়া বুঝতে পারলো ও আর ওর কাকা থাকতো এই ঘরে। বিশেষ কিছুই বদলায়নি, কেবল দেয়ালগুলো আরো ময়লা হ'য়ে গেছে, আর দুখানা খাটের বদলে একখানা খাট দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া মাথার কাছে এক সারি বইয়ের আমদানি হ'য়েছে, এবং ইলিয়া যেখানে শুতো সেখানে এসে জুটেছে একটা নোংরা উঁচু বাক্সো।

ঘরে ঢুকেই দরজায় ছিটকিনি দিয়ে জাকব হাসতে হাসতে ব'ললো :

"যাক্, এখন অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমার ছুটি। চা খাবে? ঠিক আছে। ইভান্ চা দিয়ে যা।" হাঁকতে গিয়ে জাকব কেশেই অস্থির। মনে হ'লো কাশির চোটে ওর হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

ইলিয়া ব'ললো : "বাপ্‌স্, কি কাশি হ'য়েছে তোমার! এ যে রীতিমতো সিংহগর্জন হে।"

"ফুরিয়ে আসছি, ইলিয়া, ফুরিয়ে আসছি। তোমার সংগে আবার দেখা হ'লো, ভালোই হ'লো। যাই হক্, তোমাকে তো বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। তারপর, আছো কেমন?"

একটু ইতস্তত ক'রে ইলিয়া জবাব দিলো :

"আমার আর থাকা-থাকি কি? বেঁচে আছি এই পর্যন্ত। তোমার খবর কি তা-ই বলো—সেইটাই তো আসল খবর।"

ইলিয়া ইচ্ছে ক'রেই জাকবকে নিজের খবর দিতে চায় না। ব'লতে কি, কথা কইতেই ভালো লাগছে না তার। জাকবের রোগা-পটকা দেহটার

দিকে চেয়ে ইলিয়ার দুঃখ হয়। কিন্তু সে-দুঃখের মধ্যে কোনো দরদ নেই— খানিকটা লোক-দেখানো দুঃখ আর কি।

মৃদুস্বরে জাকব ব'ললো :

"আমি ভাই ভাগ্যকে মোটামুটি মেনেই নিয়েছি।"

"কিন্তু তোমার বাবা যে তোমাকে রক্ত হাগিয়ে মারছে।"

"বাবাকেও রক্ত হাগাচ্ছে আব একজন।"

"ঠিক হ'য়েছে।"

"এখন চাবিকাঠিটি পযন্ত আমাব বিমাতার হাতে। তিনি যা বলেন তা-ই হয।"

এমন সময় শুনতে পাওযা গেলো হার্মোনিযাম বাজিয়ে পের্ফিশ্কা গাইছে :

"ও সই, টাকাব কথা তোলো কেন সই ?
মিনিমাগ্না চুমু খাবে,
যখন তখন আসবে যাবে,
প্রেম তো এরেই কই।
ও সই, টাকার কথা তোলো কেন সই ?"

একটু হেসে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'বলো জাকবকে : "ওটা কিসেব বাক্সো ?"

"ঐ—ঐ বাক্সোটার কথা ব'লছো ? ওটা হ'লো একটা হার্মোনিয়াম। চল্লিশ টাকা দিয়ে বাবা ওটা আমাব জন্যে কিনেছে। কিনে এনে কি ব'ললো জানো ? ব'ললো : 'নে, বাজাতে শেখ্। ভালো ক'বে বাজাতে পারলে পরে চারশো টাকা দিয়ে একটা ভালো হার্মোনিয়াম কিনে দেবো। হোটেলে ব'সে বাজাবি সকলেব সামনে। এ-ছাডা, তোর মতো অপদার্থকে দিয়ে আর কোন্ কাজটা হবে শুনি ?' খাসা মতলব। প্রত্যেক হোটেলেই একটা ক'রে অর্গ্যান আছে, আমাদের এখানে কিছু নেই তো, তা-ই। যাই হ'ক, প্যাঁ-পোঁ ক'রতে আমাব মন্দ লাগে না।"

একটু হেসে ইলিয়া ব'ললো : "আচ্ছা শয়তান তো তোমার বাবা ?"

"না, না, তা কেন? আমি তো সত্যিই অপদার্থ।"

জাকবের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইলিয়া দাঁত খিঁচিয়ে ব'ললো:

"তার চেয়ে তোমার বাবাকে ব'লো: 'বাবা, আমার যখন নাভিশ্বাস উঠবে তখন আমাকে দেখে যাবার দক্ষিণা হিসেবে লোকজনের কাছ থেকে মাথাপিছু এক আনা ক'রে ধ'রে নিও।' আশা করি তখন তোমার বাবা তোমার মধ্যে কিছুটা পদার্থের হদিস পাবে!"

হাসতে গিয়ে জাকব বুকে হাত দিয়ে কেশে উঠলো। ওদিকে পের্ফিশ্‌কা তখন কার সম্বন্ধে যেন বেশ রসিয়ে গান ধ'রেছে:

"বৈরাগী সে বৈরাগী
মস্তবড়ো বৈরাগী!
দেবদ্বিজে ভক্তি যতো
খ্যাটের দিকে দৃষ্টি ততো,
পিপের মাপই পেটের মাপ,
পেটটি তবে সদাই সাফ্‌।
নাম জেনে তার ক'রবে কি?
বৈরাগী সে বৈরাগী!"

"আহা, তার পুণ্যের শরীর বটে, বলিহারি যাই!" এই ব'লে পের্ফিশ্‌কা এতো জোরে হার্মোনিয়ামটা বাজাতে শুরু করে যে এর পর ওর গানের কথা আর শোনাই যায় না।

জাকবের কাশি থামতে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"হ্যাঁ হে, তোমার বিমাতার পোলাপানটির সঙ্গে তোমার ব'নছে কেমন?"

কাশতে কাশতে নীল হ'য়ে গেছে জাকবের মুখখানা। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলো জাকব:

"ও আমাদের সংগে থাকে না,—থাকতে বাধে কি না তা-ই। এটা হ'লো হোটেল। এখানে কি ওর মতো ভদ্রলোক থাকতে পারে? এই আর কি। নইলে ছেলেটা খারাপ নয়। ঘেন্না অবিশ্যি হোটেলটাতেই, নইলে ট্যাঁকে টান

প'ড়লেই ছুটে আসে মায়ের কাছে। রোজই ওর টাকার দরকার,—এতো এতো টাকা।"

তারপর গলা নামিয়ে বিষণ্ণভাবে আবার ব'ললো জাকব :

"সেই বইটার কথা মনে আছে তোমার? সেই যে সেই বইটা। মনে প'ড়ছে তো? একদিন ও দেখে ব'ললো : 'এ-বই বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বেশ দামী বই।' এই ব'লে ও বইখানা নিয়ে চ'লে গেলো। এতো ক'রে ব'ললাম রেখে যেতে, কিন্তু ও আমার কোন কথাই কানে তুললো না।"

ইলিয়া হো হো ক'রে হেসে ওঠে। তারপর দুই বন্ধু চায়ের কাপ তুলে নেয়।

ঘরের দেয়ালগুলোতে ফাট্ ধ'রেছে। পার্টিশান-দেযালটা তো একরকম ফেটেই চৌচির। ফাঁক-ফোকর দিয়ে হোটেলের চীৎকার ভেসে আসে, সেই সংগে খাবারদাবারের গন্ধও। শোনা যায় বেশ বাজখাঁই গলায় কে যেন ব'লছে :

"মিত্‌র্ নিকলাযেভিচ্। আমার সোজা কথার অমন বাঁকা মানে ক'রো না। চুপ করো, কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার। চুপ করো।"

জাকব ব'লতে থাকে : "আজকাল একখানা গল্পের বই প'ড়ছি, ভাই। নাম : 'জুলিয়া, অর্থাৎ মাদসিনির অন্ধকূপ।' ভারি মজার বই। সে কথা যাক্, তোমার পড়াশুনো হ'চ্ছে কেমন?"

রুক্ষ গলায় ইলিয়া ব'ললো :

"রাখো তোমার অন্ধকূপ। জীবনেই ঘেন্না ধ'রে গেছে, তার ওপর আবার বই।"

কিছুটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে জাকব ব'ললো :

"কি ব্যাপার হে, তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই দেখছি।"

ইলিয়া কোনো জবাব দিলো না। ভাবতে লাগলো মাশার কথা জাকবকে ব'লবে কি না। এদিকে ইলিয়াকে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে জাকব আবার বলে :

"মনে মনে ঘেন্না পুষে রেখে লাভ কি, ইলিয়া? যখনই দেখি ফণা তুলেই আছো! মানুষকে দুষেই বা কি ক'রবে বলো? সবই বিধাতার হাতে।

কপালে যা লেখা আছে তাই হবে। লাফালাফি করা মানে অশান্তিকেই ডেকে আনা।”

ইলিয়া এবারও কোনো জবাব না দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

“তাছাড়া শাস্ত্রের এই যে বচন ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ এটাও খুব খাঁটি। বাবার কথাই ধরো। এক কথায় বলা যায় বাবা অত্যাচারী। কিন্তু থেক্‌লা তিমফিয়েফ্‌না আসবার পর থেকেই বেরালের ভয়ে ইঁদুরের মতো বাবা কেবলই গত খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুব বেশি দিন ওদের বিয়ে হয় নি সত্যি, কিন্তু এরই মধ্যে নাজেহাল হ’য়ে দুঃখের চোটে বাবা মদ ধ’রেছে। ব’লতে কি, যারা বাবার মতো পাজী, তাদের শায়েস্তা ক’রতে হ’লে থেক্‌লা তিমফিয়েফ্‌নার মতো দজ্জাল মেয়েছেলেরই দরকার!”

শুনতে শুনতে প্রায় থ’কে গিয়ে, ট্রে-র ওপর ঠক্ ক’রে চায়ের কাপটা বসিয়ে, যতোটা জাকবকে ঠিক ততোটাই নিজেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক’রে ব’সলো ইলিয়া ঃ

“নিজের কথা বলো। তুমি নিজে এখন কি চাও?”

চক্ষুদুটি ছানাবড়া ক’রে ব’ললো জাকব ঃ

“তার মানে? চাইলেই তো হ’লো না, কোত্থেকে কি চাইবো?”

“কোত্থেকে আবার কি? ধরো যদি বলি ভবিষ্যতের কাছ থেকে?”

মাথা হেঁট ক’রে জাকবকে ভাবতে দেখে ইলিয়ার ইচ্ছা হ’লো এখুনি হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। চ’টেম’টে ইলিয়া আবার জিজ্ঞাসা ক’রলো ঃ

“চুপ ক’রে কেন? জবাব দাও!”

বন্ধুর দিকে না চেয়ে মিউ-মিউ ক’রে ব’ললো জাকব ঃ

“কি আর চাইবো? চাইবার কি কিছু আছে আমার? ম’রতে বসেছি এই পর্যন্ত। তাছাড়া জানি খুব শিগ্‌গিরই আমি ম’রবো!”

এই ব’লে মাথাটাকে একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে, জীর্ণ মুখে শীর্ণ হাসি ফুটিয়ে ব’লতে থাকে জাকব ঃ

“আমি স্বপ্ন দেখি—নীল স্বপ্ন। বুঝলে? সবকিছুর রং যেন ফিকে নীল হ’য়ে গেছে। আকাশ থেকে আরম্ভ ক’রে গাছ মাটি ঘাস ফুল—সব নীল! চারিধার নিস্তব্ধ, সবকিছু নিশ্চল! কেউ নেই, কিছু নেই, আছে শুধু ফিকে

নীল। মনটা হালকা হ'য়ে যায়। ভাবি এমন এক পথে চ'লেছি যে-পথের শেষ নেই, যে-পথে ক্লান্তি নেই, নিজে আছি কি নেই তাও যেন ভাবতে ইচ্ছে করে না। যে ম'রতে বসে তার চোখের সামনে এই নীল স্বপ্নই ভাসে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়লো ইলিয়া। ব'ললো :

"এবার তবে চলি।"

"না, না, চ'ললে কোথায়, আর একটু ব'সো।"

"না, চলি।"

জাকবও উঠে প'ড়লো।

"আচ্ছা, এসো তাহ'লে।"

জাকবের গরম হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, তার মুখের পানে চেয়ে ইলিয়া ভেবেই পায় না যাবার সময় কি ব'লে যাবে।

মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করে জাকব :

"কি দেখছো অমন ক'রে ?"

চোখদুটো নামিয়ে অতি কষ্টে বলে ইলিয়া :

"আমাকে মাপ ক'রো ভাই।"

"কেন, কিসের জন্যে ?"

"এমনি। মাপ ক'রো কিন্তু।"

আবার একটু হেসে জাকব ব'ললো :

"আমাকে কি পাদ্রি ঠাওরালে ?"

"এই দেখো, মাশুংকার কথাটাই তো বলা হয় নি এতোক্ষণ !"

"কোন্ কথা ?"

"শুনলাম বড়ো দুঃখেই ওর দিন কাটছে।"

"আমিও তাই শুনেছি।"

"মোটামুটি আমাদের সকলের বরাতই এক। সমান খারাপ। তাই না ? আচ্ছা চলি ! আমায় মাপ ক'রো, য়াশা।"

"ঈশ্বর তোমায় মাপ ক'রবেন ! আবার আসছো তো ?"

কোনো জবাব না দিয়েই ইলিয়া বেরিয়ে গেলো। তারপর রাস্তায় নেমে ভাবলো : "আঃ, বাঁচলাম !" সত্য ব'লতে কি, জাকবের জন্য ওর বিশেষ দুঃখ

হয় না, ও জানে জাকব খুব শীঘ্রই ম'রবে। হয়তো এতদিনে তার মরাই উচিত ছিলো। তার মতো একটা নিরীহ সৎ মানুষ কি ক'রে যে এখনো পর্যন্ত এ-পৃথিবীতে বেঁচে আছে সেইটাই আশ্চর্য! এ-পর্যন্ত মানতে রাজী আছে ইলিয়া। কিন্তু এর পরের কথাটা ভাবতেই ওর বুকে আগুন জ'লে ওঠে। জাকব ম'রবে কেন? যে মানুষটা কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, যে মানুষটা আজও জোয়ান মরদ, তাকে এমন ক'রে মৃত্যুর দিকে ঠেলেই বা দিচ্ছে কোন্ শয়তান? জীবনের প্রতি ঘেন্না ধ'রে যায় ইলিয়ার। ইচ্ছা করে জীবনটাকে ছোবল মারে!

সে-রাত্রে ঘুম হ'লো না ওর। জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও ওর মনে হ'লো ঘরখানা যেন ধীরে ধীরে ওকে গ্রাস করবার চেষ্টা ক'রছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে এসে একটা এল্‌ম্ গাছের তলায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে ইলিয়া দেখলো আকাশ থই থই ক'রছে নক্ষত্রে। দুধের সরের মতো কাঁপছে নীহারিকা। ইলিয়া ভাবলো: আকাশে কেউ না থাকলেও ওখানে সৌন্দর্যের অন্ত নেই, কিন্তু পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকা সত্ত্বেও এখানে সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও নেই কেন? গাছার পাতাগুলো ন'ড়ে উঠলো। মনে হ'লো ডালপালাগুলো ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে যেন আকাশ ছোঁবার চেষ্টা ক'রছে। এই সময় জাকবের নীল স্বপ্নের কথা মনে প'ড়লো ইলিয়ার। তার চেহারাটাও ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। নীল স্বপ্নের মতোই নীল দেখালো জাকবকে—স্বচ্ছ নীল, আর চোখদুটি তার যেন আকাশেরই তারা। ইলিয়া ভাবলো: শান্তি চেয়ে ঐ ছেলেটা পেয়েছে শুধু অত্যাচার; কিন্তু যে অত্যাচারী সে আছে বেশ আরামেই, আর হয়তো এখনো অনেক দিন থাকবেও এমনি আরামে।

ঠিক এই সময় ইলিয়াব জীবনে আব এক নতুন ঝামেলা এসে জোটে। আজকাল প্রায় প্রতিদিনই একবার ক'রে দোকানে এসে গাভ্রিকের দিদি ইলিয়াকে নিত্য নূতন নবম-গবম বোলচাল শুনিয়ে যায়, আব তাব ধাক্কা সামলাতে গিযে ইলিয়া প্রায় হাঁপিয়ে ওঠে।

একদিন গাভ্রিকেব দিদি সবাসরি জিজ্ঞাসা ক'বে বসে ইলিয়াকে :

"ব্যবসা তো ক'বছেন, কিন্তু এতে মন লাগছে আপনার ?"

কাঁধদুখানা নেড়েচেড়ে ইলিযা জবাব দেয :

"না, তেমন লাগছে না সত্যি, তবে বাঁচতে গেলে যে কোনো উপায়ে কিছু রোজগার তো করা চাই।"

ইলিযাব মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে মেয়েটি। ভারি বুদ্ধিমতী দেখায তাকে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইলিয়া আবাব বলে :

"বাঁচতে তো হবেই।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে :

"কখনো কি খেটে খাওয়াব চেষ্টা ক'রেছেন ?"

প্রশ্নটি বুঝতে পারে না ইলিয়া।

"কি ব'ললেন ?"

"ব'লছি, কখনো কি মেহনত ক'বেছেন ?"

আরও অবাক হয় ইলিয়া। বলে :

"নিশ্চযই। সারা জীবন ধ'রেই তো মেহনত ক'রে আসছি। আজকাল দোকানে দাঁড়িয়ে যে মাল বেচি তাও তো মেহনত।"

শুনে গাভ্রিকের দিদি একটু মুচকি হাসে। কিন্তু এ-ধবণের হুল-ফোটানো হাসি একেবারেই বরদাস্ত কবতে পারে না ইলিয়া। একটু পরে শুনতে পায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা ক'রছে :

"আপনি কি মনে করেন ব্যবসা করা মানে মেহনত করা ? এ দুটো কি এক ?"

"তা নয় তো কি? মেহনত ক'রলে যেমন ক্লান্তি আসে, ব্যবসার জন্তে খাটলেও তেমনি ক্লান্তি আসে।"

মেয়েটির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া বুঝতে পারে আর যা-ই করুক ও তাকে ঠাট্টা ক'রছে না নিশ্চয়ই।

মুরুব্বীর মতো হেসে বলে গ্যাভ্রিকের দিদি:

"না, তা নয়। মেহনত করা মানে মানুষের কাজে লাগে এমন কিছু তৈরি করা। এই সব লেস ফিতে চেয়ার টেবিল যারা বানিয়েছে তারা মেহনত ক'রেছে। বুঝলেন?"

বুঝতে না পেরে ইলিয়া মুখ বুঁজে ব'সে থাকে। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। অথচ "বুঝতে পারি নি" এ-কথাটা স্বীকার ক'রতেও তার ইজ্জতে বাধে।

টানা টানা চোখদুটোকে ইলিয়ার মুখের উপর সার্চ্-লাইটের মতো ধ'রে গাভ্রিকের দিদি তর্কটাকে এইভাবে টেনে নিয়ে যায়:

"কিন্তু ব্যবসার মধ্যে কোন্ মেহনতটা আছে শুনি? সাধারণ মানুষ এর থেকে কিই বা পায় বলুন তো? কিছুই না!"

ইলিয়া ধীরে ধীরে জবাব দেবার চেষ্টা করে:

"তা অবিশ্যি সত্যি। ব্যবসা যে বোঝে তার কাছে এটা তেমন শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্যবসা থেকে কিছুই পাওয়া যায় না এটা আমি মানতে রাজী নই। লাভ আছে ব'লেই ব্যবসা, নইলে এর আর দাম কি?"

কোনো জবাব না দিয়ে ইলিয়ার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, ভায়ের সংগে দু-চারটে কথা ব'লে, যেমন-তেমন ক'রে ইলিযাকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গাভ্রিকের দিদি গটগট ক'রে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। যাবার সময় তার মুখের চেহারা দেখে বোঝবারই উপায় থাকে না যে মাশার সংগে আলাপ করবার সময় এই মেয়েটির মুখেই কোমলতার লাবণ্য ফুটে উঠেছিলো। ইলিয়া ভাবে, তবে কি ও এমন কোনো কথা ব'লেছে যাতে মেয়েটি দুঃখ পেয়েছে? কৈ না, তেমন কোনো কথা তো ও বলে নি। তখন ইলিয়া গাভ্রিকের দিদির কথাগুলো নিয়ে মনে মনে আলোচনা ক'রতে থাকে। যতোই আলোচনা করে ততোই অবাক হ'য়ে যায়। আশ্চর্য, ব্যবসা আর মেহনতের মধ্যে তফাৎটা

সে দেখলো কোথায়? মেয়েটি যে ওকে কেবলই আকর্ষণ ক'রছে তা ও বোঝে, কিন্তু বুঝতে পারে না যার বুকে এতো দরদ, বিপদে-আপদে যে মানুষকে সাহায্য করতেও ছুটে আসে, তার মুখখানা কেন সর্বদা অমন বেজার হ'য়ে থাকে! গাভ্রিকের দিদির বাড়িতে পলের যাতায়াত আছে। তার প্রশংসায় পল্ একেবারে পঞ্চমুখ! শুধু তাই নয়, তার বাড়ির সবকিছুই পলের ভালো লাগে। পল্ বলে:

"ওদের বাসায় পা দিয়েছো কি অমনি: 'আসুন, আসুন।' খেতে ব'সে থাকলে—'বসুন, আপনিও কিছু মুখে দিন'। চা খাচ্ছে এমন সময় যদি গিয়ে পড়ো তাহ'লে তোমাকেও চা না খাইয়ে ছাড়বে না! সবচেয়ে মজার কথা এই যে কোনো আড়ম্বর নেই। যখনই যাই, দেখি এক বাড়ি লোক! আর সে কি ফূর্তি! একেবারে আনন্দ-নিকেতন হে, আনন্দ-নিকেতন! গান, হৈ-হল্লা, হুড়োহুড়ি, বইপত্র নিয়ে আলোচনা, তর্ক—এইসবই চলেছে কেবল। বইয়ের কাঁড়ি দেখে মনে হবে কোন বইয়ের দোকানেই এসে প'ড়েছো বুঝি। ওখানকার সকলেই শিক্ষিত: একজন উকিল, আর একজন আজ বাদে কাল ডাক্তার হবে. তাছাড়া ইস্কুলের ছাত্রও আছে অনেকগুলি—মানে—লেখাপড়া জানে এবং লেখাপড়া করে এমন লোকের ছড়াছড়ি ওখানে। ওখানে গেলে ভুলেই যাবে তুমি কে। ওদেরই সংগে হাসবে, সিগ্রেট্ খাবে, গল্পগুজব ক'রবে—মিলেমিশে একেবারে একাকার হ'য়ে যাবে হে, একাকার হ'য়ে যাবে! সত্যিই ভালো মানুষ ওরা—ফূর্তিবাজ বটে, তবে ছ্যাবলা নয়।"

ইলিয়া বিষণ্ণভাবে বলে: "ভয় নেই পল্, ও আমাকে নেমন্তন্ন ক'রবে না। ভারি দেমাকী মেয়ে ও!"

পল্ চীৎকার ক'রে বলে: "গাভ্রিকের দিদির কথা ব'লছো? কী যে বলো! ও অত্যন্ত সাদাসিধে মেয়ে। নেমন্তন্নর আশায় ব'সে থেকো না হে, সোজাসুজি চ'লে যাও একদিন। নেমন্তন্ন আবার কি, ইচ্ছে হ'লে স্রেফ গট্গট্ ক'রে চ'লে যাবে! মাইরি ব'লছি ঠিক যেন হোটেল, কেউ কিছুই ব'লবে না, এ-সব ঝামেলাই নেই ওখানে। আমার কথাই ধরো না কেন, আমি ওদের কে? কিন্তু দ্বিতীয় বার যাবার পর থেকে আমি যেন ওদের ঘরের লোক হ'য়ে গেছি। ভারি মজার বাড়ি—হৈ-হৈ, গান, ঝাঁকে ঝাঁক পাখি যেন উড়ে বেড়াচ্ছে

বাড়িময়—হরদম—। দেখে মনে হবে স্রেফ হেসে-খেলেই বুঝি জীবন কাটাচ্ছে ওরা।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা করে: "বুঝলাম। কিন্তু মাশুংকা আছে কেমন?"

"বেশ ভালো। সেরে উঠছে ধীরে ধীরে। ব'সে ব'সে মিটমিট ক'রে হাসে আজকাল। এক ডাক্তার দেখছে ওকে। সকাল বিকেল দুধ খাচ্ছে। ক্রেনফের কপালে এবার অনেক দুর্গতি আছে। উকিল ব'লেছে ঐ বুড়োর শয়তানি ছুটিয়ে তবে ছাড়বে। মাশাকে করোনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিলো। আমার ব্যাপারটা নিয়েও ওরা মাথা ঘামাচ্ছে, চেষ্টা ক'রছে ভেরার বিচারটা যাতে তাড়াতাড়িই হ'য়ে যায়। না, সত্যি ব'লছি, ওরা মানুষ বড়ো ভালো!"

ইলিয়া লুনেফ্ প্রশ্ন করে: "আর খোদ তিনি, মানে, গাভ্রিকের দিদিটি কেমন?"

গাভ্রিকের দিদির কথা উঠলে পল্ একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যায়। ঠিক এইভাবে ও এককালে কয়েদীদের কথা ব'লতো যারা ওকে ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলো। উচ্ছ্বসিত আবেগে হাত-পা ছুঁড়ে পল্ বলে:

"চমৎকার মেয়ে, ভাই, চমৎকার মেয়ে! একেবারে টনক্ নড়িয়ে দেবার মতো মেয়ে! এখনো পর্যন্ত ইস্কুলের ছাত্রী হ'লে হবে কি, ওর দাপটে সবাই সন্ত্রস্ত। সবাইকেই ও হুকুম করে! আর, কারোর কথা যদি ওর অপছন্দ হয়, তাহ'লেই কেলেংকারি। রাগে স্রেফ গর্‌গরিয়ে ওঠে—ঠিক বেরালের মতো।"

মুচকি হেসে ইলিয়া বলে: "তা আমি জানি।"

পলের ওপর ইলিয়ার হিংসা হয়। গিয়ে ঐ দেমাকী মেয়েটাকে একবার দেখে আসতে খুবই সাধ যায় ওর, কিন্তু আত্মসম্মানে কেমন যেন বাধে। তাই যাওয়া আর হ'য়ে ওঠে না। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে ইলিয়া ভাবে:

"মতলবের দুনিয়া। স্বার্থ না থাকলে কেউ তো কারোর উপকার করে না। কিন্তু ভেরা আর মাশুংকার ব্যাপার নিয়ে গাভ্রিকের দিদি এতোটা মাথা ঘামাচ্ছে কেন? এতে তার লাভই বা কি? সে গরীব, বিলোবার ছড়াবার মতো অবস্থা তার নয়। তবুও তো সে মাশুংকাকে দিনের পর দিন খাওয়াচ্ছে। আশ্চর্য! এর থেকে বুঝতে হবে সে করুণাময়ী। কিন্তু তা-ই

যদি সত্য, তাহ'লে আমার প্রতি সে অমন রূঢ় আচরণ করে কেন ? পলের চেয়ে আমি ছোটো কিসে ?"

এই চিন্তাগুলো ইলিযাকে এমন ক'রে পেয়ে বসে যে অন্য কোনো বিষয়ে ওর মনই বসে না। মনে হয় তিমিরাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে এমন একটি ফোকর খুলে গেছে যার মধ্যে দিয়ে ও এক নূতনতর জগতের সন্ধান পাচ্ছে। সে-জগৎ উজ্জ্বল, সে-জগৎ অনেক দূরে, তার তাপটুকু গাযে লাগছে ওর, কিন্তু তাকে ও যেন ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই।

তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না এসে রুক্ষ গলায় বলে :

"আজকাল তুমি যেন বেজায় অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠেছো। সরু ফিতে আরও বেশি ক'রে কিনে রাখা উচিত ছিলো তোমার। এদিকে লেসও তো দেখছি শেষ হ'য়ে এসেছে। কালো সুতোর যেটিও বেশি নেই। কি মতলব তোমার ? আজ আমার কাছে একটা নামকরা কোম্পানীর এজেন্ট এসেছিলো বোতাম নিয়ে। তাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এসেছিলো তো ?"

সংক্ষিপ্ত জবাব দেয ইলিয়া : "না।"

এই স্ত্রীলোকটাকে ও আর সহ্য ক'রতে পারছে না। ওর ধারণা তাতিয়ানা আজকাল কসাকফের সংগে ঢলাঢলি সুরু করেছে। লোকটার পদোন্নতি হ'য়েছে, এখন সে পুলিশ-ইন্স্পেক্টর। আজকাল তাতিয়ানা ইলিয়াকে খুব কমই ডেকে পাঠায়, যদিও ইলিয়ার প্রতি তার সেই আদুরে নাটুকেপনাটুকু আজও বজায় আছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে ইলিয়া তাতিয়ানার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু দেখে মনে হয় না এর জন্যে তাতিয়ানা তার ওপর রাগ করেছে। এতে ইলিযা আরও চ'টে যায় এবং মনে মনে তাতিযানার উদ্দেশে বলে :

"খানকী।"

স্ত্রীলোকটাকে ও আরও দেখতে পারে না যখন সে দোকানে এসে মাল-পত্রের হিসাব চায়। দোকানময় লাটুর মতো ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে কাউন্টারের ওপর লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর ওপরের তাকগুলো থেকে বাক্সো পেঁটরা টেনে বার করে এবং শেষটায় ধুলো ঝাড়তে গিয়ে হাঁচে। তাছাড়া ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে গাভ্রিক্‌কেও সে তিতিবিরক্ত ক'রে মারে।

"চাকর চাকরের মতো থাকবে, মুখ বুঁজে মনিবের কথা শুনবে। কোন্ দোকানের চাকর দরজার ধারে ব'সে সারাটা দিন নাকের পোঁটা ঘাঁটে শুনি? এর জন্যে কি তাকে মাইনে দেওয়া হয়? তাছাড়া মনিব যা বলেন তা তার মাথা হেঁট ক'রে শোনা উচিত, মনিবের দিকে চেয়ে তার চোখ রাঙানো উচিত নয়।"

কিন্তু গাভ্রিক্‌ও বড শক্ত ছেলে। তাতিয়ানার কথা সে এক কান দিয়ে শোনে আর অন্য কান দিয়ে বের ক'রে দেয। কেবল তাতিয়ানা যখন হাঁটুর ওপবে ঘাগবা তুলে ওপরেব তাক থেকে মালপত্র নামায় তখন গাভ্রিক্ ইলিয়ার দিকে চেয়ে ফিক ক'রে দুষ্টুমির হাসি হাসে। তাতিয়ানা মনিব বটে, কিন্তু তাকে ও এতোটুকুও সম্মান করে না। সে চ'লে গেলেই গাভ্রিক্ ইলিয়াকে বলে :

"গেছে, খচ্চর মাগীটা বিদেয হ'য়েছে।"

অতি কষ্টে হাসি চেপে ইলিয়া তাকে উপদেশ দেবাব চেষ্টা করে :

"ছি গাভ্রিক্, উনি তোমার মনিব, ওঁর সংগে তোমাব এভাবে কথা বলা উচিত নয়।"

গাভ্রিক্ প্রতিবাদ জানায় : "হ্যাঁ, অমন মনিব অনেক দেখেছি। আসে, বকবক করে, আব চ'লে যায়। মনিব তো আপনি।"

ইলিয়া আস্তে আস্তে বলে : "এবং উনিও।" স্পষ্টবক্তা সাহসী ছেলেটাকে ও ভালবাসে।

গাভ্রিক্ তবুও বলে : "মনিব হোক্ আব যাই হোক, ও মাগী বড়ো বজ্জাত।"

শ্রীমতী আভ্‌তনমফ্‌ সুযোগ পেলেই ইলিয়াকে বলে :

"ছেলেটাকে তুমি ভদ্রতা শেখাও না। এ তোমার অন্যায। তাছাড়া কিছু দিন ধ'রে দেখছি ব্যবসার দিকেও তোমার নজর নেই।"

ইলিয়া মুখ বুঁজে থাকে। স্ত্রীলোকটাকে ও আজকাল সত্যিই ঘৃণা ক'রতে শুরু ক'রেছে। তার উদ্দেশে মনে মনে বলে :

"লাফাতে গিয়ে তোমার গোড়ালিজোড়া কেন যে ভাঙে না তাই ভাবছি। ভাঙলে বাঁচি।"

এই সময় কাকার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে ইলিয়া জানতে পারে তেরেন্স্ কেবল কিয়েভেই যায় নি, সেণ্ট্ সেগিয়াসেও গেছে, এমন কি সলফ্কিতেও যেতো, কিন্তু তার বদলে ভালামে এসে পৌঁছেচে এবং শীঘ্রই বাড়ি ফিরবে।

বিরক্ত হ'য়ে ইলিয়া ভাবে: "তবে আর কি, মাথা কিনবে আমার! এখানে এসে নিশ্চয়ই আমার বাসায় গ্যাট হ'য়ে ব'সবে। নাঃ, জ্বালালে দেখছি!"

ইলিয়া ভাবতে থাকে কি ক'রে তার কাকাকে অন্য কোথাও থাকতে রাজী করানো যায়। কিন্তু এ-ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি ভাববার অবসরই পায না সে। খদ্দের আসে যায়। তার ওপর গাভ্রিকের দিদিও এসে পড়ে। ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা অভিবাদন জানিয়ে ঘরের দরজাব দিকে চেযে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে:

"একটু জল পাওয়া যাবে?"

"বসুন, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

"না, না, আমি নিজেই গড়িয়ে নিচ্ছি।"

গাভ্রিকের দিদি ঘরেব মধ্যে চ'লে যায়। এদিকে ইলিয়া এক এক ক'রে খদ্দেরগুলোকে বিদায় করে। তারপর ঘবে ঢুকে দেখে গাভ্রিকের দিদি "মানুষের জীবন" ছবিখানার সামনে দাঁডিযে আছে। ইলিয়ার দিকে চেয়ে ছবিখানা দেখিযে মেয়েটি বলে:

"বাজে ছবি।"

ইলিযা তার এই মন্তব্যে ভডকে যায়, মনে হয় ও যেন কোনো অপরাধ ক'রে ফেলেছে। কিছু না ব'লে ও মুচকি হাসে।

অবজ্ঞাভরে গাভ্রিকের দিদি আবার বলে: "স্রেফ বাজে ছবি!" এই ব'লে ইলিয়াকে একটা জবাব দেবার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে গট্‌গট্ ক'রে সে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে।

কয়েক দিন পরে ভায়ের শার্ট প্যাণ্ট নিয়ে গাভ্রিকের দিদি আবার আসে এবং এসেই গাভ্রিক্‌কে ধমকাতে শুরু করে:

"এই সেদিন তোকে পরিষ্কার শার্ট দিয়ে গেলাম, এরই মধ্যে তুই সেটাকে নোংরা ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লি। তাছাড়া প্যাণ্টই বা এতো তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে কি ক'রে? কোনো দিকে কোনো হুঁশই নেই যেন তোর—"

গাভ্রিক্ বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে: "হ'য়েছে, হ'য়েছে, থামো। এসেই বকাবকি শুরু ক'রলে। একদিকে মনিবনী ধমকাচ্ছে, অন্যদিকে তুমি ধমকাচ্ছো!"

গাভ্রিকের দিদি ইলিয়াকে জিজ্ঞাসা করে:

"ও কি খুব বেশি জ্বালায় আপনাকে?"

"না, না, তেমন কিছু নয়, তবে সাধ্যমতো যা করবার তাই ক'রে।"

গাভ্রিক ব'লে ওঠে: "আমি যথেষ্ট শান্তশিষ্ট।"

"হ্যাঁ, তবে মুখের দৌড় একটু বেশি," ইলিয়া টিপ্পনী কাটে।

ভ্রূ কুঁচকে গাভ্রিকের দিদি বলে: "শুনলি তো?"

ক্রুদ্ধভাবে গাভ্রিক্ জবাব দেয়: "হ্যাঁ, শুনলাম।"

ইলিয়া বলে: "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ নিয়ে অতো রাগারাগি ক'রে লাভ নেই। একটু রোক থাকা ভালো। যারা কেবল মুখ বুঁজে মার খেতেই জানে তারা শুধু ম'রতেই পারে।"

ইলিয়ার কথা শুনে মেয়েটি যেন একটু খুশি হয়। ইলিয়া সেটা লক্ষ্য করে। তারপর একটু বিব্রতভাবেই বলে গাভ্রিকের দিদিকে:

"আপনার সংগে একটা কথা ছিলো।"

"বলুন।"

এই ব'লে ইলিয়ার কাছে স'রে এসে তার মুখের দিকে সে সরাসরি চায়। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মাথা হেঁট ক'রে ইলিয়া বলে:

"আমার মনে হয় ব্যবসাদারদের আপনি দেখতে পারেন না। তাই না?"

"হ্যাঁ, বিশেষ দেখতে পারি না।"

"কেন?"

"তার কারণ, ব্যবসাদাররা অপরের শ্রমে নিজেদের ভরণপোষণ করে।"

মেয়েটা বলে কি! ইলিয়ার ভ্রূ কুঁচকে যায়। কথাগুলো শুনে সে অবাক তো হয়ই, উপরন্তু রেগেও যায় সাংঘাতিক। যা মুখে আসবে তা-ই ব'লবে এই মেয়েটা? একটু ভেবে জোর গলায় ইলিয়া বলে: "এটা সত্য নয়।"

গাভ্রিকের দিদির মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে, ঠোঁটদুখানা কাঁপতে থাকে। রুক্ষ মেজাজে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করে সে :

"ঐ ফিতেটা কিনতে আপনার কতো লেগেছে ?"

"ফিতে ? এই ফিতেটা ? সতেরো পয়সা লেগেছে।"

"বেশ। বেচবেন কি দামে ?"

"পাঁচ আনায়।"

"তাহ'লেই বুঝতে পারছেন, যে তিনটি পয়সা বেশি নিচ্ছেন তা আপনার পাওনা নয়, পাওনা তারই যে ঐ ফিতেটা বানিয়েছে। এবার বুঝলেন ?"

ইলিয়া জবাব দেয় : "না।"

রাগে গাভ্রিকের দিদির চোখদুটো চকচক ক'রে ওঠে। সেটা লক্ষ্য ক'রে ইলিয়া কাঁচুমাচু হ'য়ে যায়, কিন্তু সেই সংগে নিজের দুর্বলতার জন্যে নিজেকে ক্ষমাও ক'রতে পারে না। ফলে তার ক্রোধের মাত্রা যায় বেড়ে।

কাউন্টারের কাছ থেকে স'রে এসে দরজার দিকে যেতে যেতে গাভ্রিকের দিদি বলে :

"এমন একটা সোজা কথা আপনার পক্ষে বোঝা যে শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু শ্রমিকের জায়গায় নিজেকে একবার বসিয়ে দেখুন। মনে করুন এইসব জিনিষপত্র আপনিই তৈরী করেন। তা'হলে আমার কথা হয়তো কিছুটা বুঝবেন।"

এই ব'লে আঙুল দিয়ে দোকানের জিনিষগুলো দেখিয়ে গাভ্রিকের দিদি ব'লতে থাকে এক শ্রমিক ছাড়া শ্রমের দৌলতে সবাই কিভাবে দুপয়সা ক'রে খাচ্ছে। প্রথমটায় তার হাবভাবে কোনো চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা দেখা না গেলেও একটু পরেই তার ভ্রূজোড়া যায় কুঁচকে, নাকের গর্তদুটো ওঠে ফুলে, রাগে কেঁপে ওঠে তার রগের শিরাগুলো এবং সাপের ফণার মতো মাথাটাকে তুলে ধ'রে ইলিয়াকে সে নিষ্ঠুরভাবে ছোবল মারে :

"শ্রমিক আর ক্রেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ব্যবসাদার। সে নিজে খাটে না, কিন্তু জিনিষপত্রের দাম দেয় বাড়িয়ে। ব্যবসা হ'লো আইনসম্মত ডাকাতি।"

নিজেকে অপমানিত বোধ করে ইলিয়া, কিন্তু জবাবে একটি কথাও ব'লতে

পারে না। উদ্ধত মেয়েটা তার মুখের উপর সরাসরি ব'ললো কি না সে চোর, সে ব'সে ব'সে খায়! গাভ্রিকের দিদির কথাগুলো শুনতে শুনতে ইলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। ওর একটি কথাও সে বিশ্বাস করে না, ক'রতে পারে না। ইলিয়া ভাবে, এমন একটা জবাব দেওয়া যায় না যাতে এই মেয়েটার ঔদ্ধত্য একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে প'ড়বে? কিন্তু দুর্ভাগ্য, এমন জবাব সে কিছুতেই খুঁজে পায় না। গাভ্রিকের দিদির সাহস ও বুদ্ধি দেখে একেবারে তাজ্জব ব'নে যায় সে। "মেয়েটা এইভাবে আমায় অপমান ক'রে যাবে?" মনে মনে বলে ইলিয়া, এবং সেইসংগে তার মনে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নও জাগে: "কিন্তু ও আমায় অপমান ক'রছেই বা কেন? কেন?"

চুপচাপ অপমান হজম ক'রতে না পেরে শেষটায় ইলিয়া চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে:

"আপনার কথা সত্য নয়। না, আপনার সংগে আমি একমত হ'তে পারছি না!" রাগে ইলিয়ার বুকের মধ্যে যেন সমুদ্র তোলপাড় ক'রতে থাকে, তার মুখখানা লাল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে মুখ বিবর্ণ হ'য়ে যায়।

একখানা টুলের ওপর ব'সে কোলের ওপর বিহুনিটাকে নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে গাভ্রিকের দিদি শান্তকণ্ঠে বলে:

"বেশ, তবে যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করুন।"

ইলিয়া লুনেফ্ একপাশে মুখ ফিরিয়ে থাকে, মেয়েটির চোখের দিকে তাকাতেও সে যেন ভয় পায়।

"হ্যাঁ, তাই ক'রবো, আমার সারা জীবন দিয়ে তাই ক'রবো! তার জন্যে হয়তো আমাকে আরও পাপ ক'রতে হবে। কিন্তু তাহ'লেও—"

গাভ্রিকের দিদি বলে:

"এতে তো আপনার আরোই লোকসান। কিন্তু এর থেকে কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয় না।"

ইলিয়ার মনে হ'লো গাভ্রিকের দিদি ওর মুখের ওপর যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলো। কাউণ্টারের ওপর হাতের চেটোদুখানা চেপে ইলিয়া ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য, মেয়েটার মুখে রাগ নেই, উত্তেজনা নেই।

মুখ তো নয় যেন এক চাঁই বরফ! এতে ইলিয়া আরও রেগে যায়, কিন্তু মেয়েটা রাগ না ক'রলে সে-ই বা রাগে কি ক'রে? গাভ্রিকের দিদির দৃঢ়তা এবং নির্বিকার নির্ভীকতা ইলিয়াকে প্রায় পাগল ক'রে তোলে। হাজার চেষ্টা ক'রেও সে মুখের মতো কোনো জবাব খুঁজে পায় না।

গাভ্রিকের দিদি জিজ্ঞাসা করে: "কি, চুপ ক'রে কেন?" তারপর একটু হেসে বিজয়িনীর মতো বলে:

"শুনুন, আমার যুক্তি আপনি খণ্ডন ক'রতে পারবেন না, তার কারণ সত্যকে খণ্ডন করা যায় না।"

ফাঁকা গলায় ইলিয়া কামান দাগবার চেষ্টা করে:

"পারবো না?"

"না, পারবেন না! আচ্ছা, কি ব'লবেন শুনি?"

এই ব'লে গাভ্রিকের দিদি আবার মুচকি হাসে, তারপর 'গুড্-বাই' জানিয়ে মাথাটা আরও একটু খাড়া ক'রে গট্‌গট্‌ ক'রে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে।

ইলিয়া চীৎকার ক'রে বলে: "সমস্ত বাজে, আপনার কোনো কথাই সত্য নয়।"

গাভ্রিকের দিদি কিন্তু আর একটিবারও পিছনে তাকায় না।

হতাশ হ'য়ে ইলিয়া টুলের ওপর ব'সে পড়ে, আর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে গাভ্রিক্ মালিকের মুখের দিকে তাকায়। দিদির আচরণে সে যে খুবই খুশি হ'য়েছে এটা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। দিদির গর্বে সে যেন গর্বিত, দিদির জিত্‌ই যেন তার জিত্।

গাভ্রিকের মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে ওঠে:

"হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি?"

"কিছু না," জবাব দেয় গাভ্রিক্।

"তবু ভালো!" ইলিয়া তাকে শাসাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কি ভেবে একটু থেমে আবার বলে:

"যা, খানিক বেড়িয়ে আয়। দূর হ!"

ইলিয়া এখন একটু একা থাকতে চায়। অপমানে ওর বুক যেন জ্ব'লে যাচ্ছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু ও বুঝে উঠতে

পারে না। গাব্রিকের দিদি কী ব'লে গেলো তা নিয়ে ওর চিন্তা নয়। ওর চিন্তা মেয়েটা ওকে অপমান ক'রে গেছে। অপমান, অপমান—কিন্তু কেন?

কাউণ্টারের ওপর কনুই চেপে ইলিয়া ভাবে:

"আমি ওর কি ক'রেছি যে ও আমাকে এভাবে অপমান ক'রে গেলো? ওর স্বভাব তো এরকম নয়। আমি জানি ওর মনটা নরম। এলো, গালাগাল দিলো, আর গট্‌গট্‌ ক'রে বেরিয়ে গেলো। এ কি রকম ভদ্রতা? লেখাপড়া শিখে মাথা কিনেছে একেবারে! আচ্ছা, এবার আসুক ও, তারপর জবাব কাকে বলে তা আমিও দেখিয়ে দেবো।"

মনে মনে গাব্রিকের দিদিকে শাসিয়ে ইলিয়া শেষপর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করে: "আমার মধ্যে সত্যিই কি এমন কোনো ত্রুটি আছে যার জন্যে আমাকে অপমান করা চলে?" এই সময় ওর মনে পড়ে গাব্রিকের দিদির সম্বন্ধে পলের কথাগুলো: "মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সাদাসিধে।"

"যাই হোক, পল্‌কে যে ও ছোঁয়ও না তা আমি বাজি রেখে ব'লতে পারি", এই ব'লে মাথাটা খাড়া ক'রে ইলিয়া আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কে বলে তার চেহারা খারাপ? ঠোঁটের ওপর কালো গোঁফটা নড়ছে, কালো কালো টানাটানা চোখদুটি সুন্দর—আপাতত একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তাহ'লেও সুন্দর, গালের ওপর গোলাপী ছোপ দুটো যেন জ্ব'লছে, দুশ্চিন্তায় অপমানে মুখখানাকে আপাতত একটু বিষণ্ন দেখালেও এ-মুখে শ্রী আছে—একটা চাষাড়ে সৌন্দর্য আছে, এবং পল্ গ্রাংচফের বিবর্ণ গেলাসের মতো মুখের চেয়ে এ মুখ নিশ্চয়ই হাজারগুণে সুন্দর।

ইলিয়া ভাবে: "তবে কি গাব্রিকের দিদি আমার চেয়ে পল্‌কেই বেশি পছন্দ করে?" কিন্তু সংগে সংগেই সে নিজের প্রশ্নের জবাব দেয়: "যাচ্চ'লে, আমার মুখ নিয়ে ও ক'রবে কি? আমি কি ওর প্রেমের উমেদার? ও হয়তো কোনো ডাক্তারকে বিয়ে ক'রবে, নয়তো কোনো উকিলকে, আর নয়তো কোনো সরকারী চাকুরেকে। আমার সংগে ওর কিসের সম্বন্ধ?"

তিক্ত হাসি হেসে ইলিয়া আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করে:

"কিন্তু পল্‌কে ও নেমন্তন্ন ক'রেছিলো কেন? আর, আমাকেই বা ও অপমান করে কিসের জন্যে? যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা?

ব্যবসাদার আব চোর কি না এক? ব্যবসাদাব খাটে না? আমি অপরের শ্রমে নিজের ভরণপোষণ করি? তাই যদি হয, তাহ'লে সকাল থেকে বাত্তিব পর্যন্ত এই দোকানে ঠায দাঁড়িয়ে থাকে কে শুনি?"

একটু একটু ক'রে ইলিয়া এইবাব জবাব খুঁজে পায়।—হ্যাঁ, এইভাবেই তো সে আত্মসমর্থন ক'রতে পাবে। কিন্তু এখন এসব কথা ব'লবে কাকে? গাভ্রিকের দিদি তো সামনে নেই। ফলে ইলিয়া আবও বিমর্ষ হ'য়ে যায়, নিজের ওপব আরও বিবক্ত হ'যে ওঠে, এবং সেই সংগে অপমানের জ্বালাটা যায় আরও বেড়ে। ঘবে গিযে এক গেলাস জল খেযে চারিধাবে ও তাকায। ঘরখানাকে মনে হয কাবাগাব। একটা জমাট বিষণ্ণতা যেন নেমে আসছে কড়িকাঠ থেকে। এই সময় ওব চোখদুটো হঠাৎ গিয়ে পড়ে বঙীন ছবিখানার ওপব। ও আবার পড়ে: 'মানুষেব জীবন'। কিন্তু একটু পবেই ভাবে:

"মিথ্যে কথা। এইভাবে কি মানুষ জীবন কাটায?"

ছবিখানাব দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইলিযা নিজের জীবনেব সংগে সেটাকে মিলিযে দেখতে থাকে। মনে মনে বলে: "তাই কি, সত্যিই কি তাই?" তাবপর হঠাৎ হতাশ হ'য়ে পড়ে: "আব, তা যদি সত্যি হযও, তাহ'লেও ব'লবো এ ছবিতে আনন্দ নেই, প্রাণেব সাড়া নেই, আছে শুধু বোবা রঙ আব একঘেযে ক্লান্তি।"

দেয়াল থেকে টান মেবে ছবিখানা ছিঁড়ে নিযে ইলিযা দোকানঘরে চ'লে আসে, তারপর কাউণ্টাবেব ওপব বেখে সেটাকে খুঁটিযে খুঁটিযে দেখতে থাকে। ধাপে ধাপে মানুষের জীবন দেখানো হ'যেছে সত্যি, বঙে বেখায একটিব পব একটি পরিবর্তনও আঁকা হ'য়েছে সত্যি, কিন্তু তাহ'লেও—না, না, এ-জীবন সত্য নয়, কিছুতেই সত্য নয।

ছবিখানা দেখতে দেখতে ইলিয়া গাভ্রিকের দিদিব কথা ভাবে:

"ও যেন আগে থেকেই জানতো যে আমি বুড়ো পলুএক্তফ্‌কে গলা টিপে মেরেছি। চুলোয় যাক্ সে-কথা। কিন্তু এ-পর্যন্ত ও আমাকে যতো কথা ব'লেছে তার থেকে এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ও আমাকে পছন্দ করে না।"

চিন্তাগুলো ইলিয়ার মাথার মধ্যে ইঞ্জিনের চাকার মতো ঘুরতে থাকে। ছবিখানা দেখতে দেখতে ওর চোখদুটো ঝাপসা হ'য়ে আসে, ছবিখানাকে দুমড়ে মুচড়ে ও ফেলে দেয় কাউণ্টারের ওপর, কিন্তু গড়াতে গড়াতে সেটা এসে পড়ে ওর পায়ের কাছেই। তখন বিরক্ত হ'য়ে ছবিখানাকে আরও দুমড়ে ও ছুঁড়ে ফেলে দেয় একেবারে রাস্তায়।

পথে হট্টগোল হ'চ্ছে। ও-ধারের ফুটপাথ দিয়ে কে যেন চ'লে গেলো লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। বক্‌বকম্ ক'রছে পায়রাগুলো। হঠাৎ ধপ্ ক'রে কি যেন একটা শব্দ হ'লো। একটু পরে মনে হ'লো কাছাকাছি কোনো বাড়ির টালির ছাদের ওপর দিয়ে কে যেন হাঁটছে। হয়তো কোনো ধাঙড় চিম্‌নি সাফ ক'রতে যাচ্ছে। হ'তেও পারে। একখানা ঘোড়ার গাড়ি চ'লে গেলো ঘটর্-ঘটর্ শব্দ ক'রে। কোচোয়ানটা ঝিমোচ্ছে কাৎ হ'য়ে। ইলিয়া ক্যাশবাক্সো থেকে পাঁচ আনা পয়সা বার ক'রলো। তার থেকে তুলে নিলো সতেরো পয়সা। বাকি প'ড়ে রইলো তিন পয়সা। তারপর আবার সে পাঁচ আনা পয়সা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিলো বাক্সে। পথে হট্টগোল বেড়েই চ'লেছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে পায়রাগুলো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইলিয়া ক্যাশবাক্সোটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো কাউণ্টারের ধারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো নিজের বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ।

পরের দিন গাব্রিকের দিদি আবার এলো। গায়ে তার সেই একই জামা, মুখের চেহারা সেই একই রকম। তাকে আসতে দেখে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো: "এই যে, আবার এসেছো দেখছি।" গাব্রিকের দিদি তাকে অভিবাদন জানাতে সেও তাকে একটা অভিবাদন জানালো—কিন্তু অনিচ্ছায়। দোকানে ঢুকেই মেয়েটি হঠাৎ মিষ্টি ক'রে হেসে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"মুখখানা অতো শুকনো কেন? অসুখ ক'রেছে না কি?"

মুখ না তুলেই ইলিয়া জবাব দিলো: "না, ভালোই আছি।"

গাব্রিকের দিদি আবার এসেছে ব'লে ও যে খুশি হ'য়েছে এটা ও জানতে দিতে চায় না কিছুতেই। ভাণ করবার চেষ্টা করে ও তখনো রেগে আছে। ভাবখানা এই: মেয়েটি যদি আবার মুচকি হেসে একটি মিষ্টি কথা বলে। অপেক্ষায় থাকে ইলিয়া, কিছুতেই তাকায় না মেয়েটির দিকে।

গাব্রিকের দিদি তখন দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করে :

"মনে হ'চ্ছে আপনি আমার ওপর যেন রেগে আছেন ?"

গাব্রিকের দিদির গলার আওয়াজটা রুক্ষ শোনায়। আবার ঔদ্ধত্য ? আবার দেমাক ? মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ হাসি হেসে ইলিয়া বলে :

"অপমান আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।"

ইলিয়া ভেবেছিলো এর পর গাব্রিকের দিদির মুখে একটু কোমলতা ফুটে উঠবে। কিন্তু কোথায় ? মুখ তো নয়, যেন বরফের চাঁই ! ইলিয়া ভাবে :

"ও ! ছেনালি হ'চ্ছে বুঝি ? জুতো মেরে গরু দান ক'রতে চাও ? কিন্তু সেটি হ'চ্ছে না।"

গাব্রিকের দিদি বলে : "আমি আপনাকে অপমান ক'রতে চাই নি।"

'আপনি' শব্দটার ওপর সে এমনভাবে জোর দেয় যে তা শুনেই ইলিয়ার রগদুটো রাগে দপদপ ক'রে ওঠে। চীৎকার ক'রে ইলিয়া বলে :

"কিন্তু আপনি আমাকে অপমান ক'রতে পারবেন না। সে-শক্তিই নেই আপনার। আপনার মতো মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। এই কথাটুকু মনে রাখবেন !"

ইলিয়ার কথা শুনে গাব্রিকের দিদি অবাক হ'য়ে যায়। কিন্তু ইলিয়ার খেয়ালই থাকে না সেদিকে। ও শুধু প্রতিশোধ চায়, পাল্টা অপমান ক'রতে চায় মেয়েটিকে। তাই যতোটা পারে টিপে টিপে অসভ্যের মতো ব'লতে থাকে :

"আমি জানি ভদ্রতার মুখোস প'রে থাকেন আপনি। দু-চার পাতা লেখাপড়া শিখে ভেবেছেন পৃথিবীশুদ্ধু লোকের মাথাই বুঝি কিনে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ বিদ্যেটুকু না থাকলে আপনার কি দশা হ'তো জানেন ? হ'তেন দর্জি, আর নয়তো চাকরাণী। গরিবের মেয়ে এছাড়া আর কিই বা হ'তে পারে ? বলুন আপনি, আমি যা ব'লছি তা সত্য কি না ?"

গাব্রিকের দিদি নিজেকে সামলাতে সামলাতে চাপা গলায় বলে :

"ব'লছেন কি আপনি ?"

তার মুখখানা লাল্ হ'য়ে যায়, নাকের গর্তদুটো ফুলে ওঠে। দেখে ইলিয়া খুশিই হয়। তাই আরও টিপে টিপে বলে :

"আপনার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা-ই ব'লছি। কোন্ সাহসে আপনি আমার সংগে ভণ্ডামি ক'রতে আসেন?"

চীৎকার ক'রে গাভ্রিকের দিদি প্রতিবাদ জানায়ঃ "আমি ভণ্ড নই!"

দৌড়ে এসে দিদির হাত ধ'রে ইলিয়ার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে গাভ্রিক্ ব'লে ওঠেঃ

"চলো সোন্‌কা, আমরা চ'লে যাই!"

ওদের দিকে চেয়ে অবজ্ঞাভরে বলে ইলিয়াঃ

"হ্যাঁ, তাই যাও। আমিও তোমাদের চাই না, আর তোমরাও আমাকে চাও না।"

গাভ্রিক্ আর তার দিদি চ'লে যেতেই ইলিযা হেসে ওঠে। উঃ, এতো দিন পরে অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে। আজ সে তৃপ্ত! গাভ্রিকের দিদির বিদায়কালীন মুখখানা মনে ক'রে ইলিয়া খুশি হয়। সে-মুখে ছিলো ক্রোধ, বিহ্বলতা আর খানিকটা ভয়ের ছাযাও। "যেমন দিদি তার তেমনি ভাই। ছোঁড়ার আস্পদ্দা দেখে আব বাঁচি না। বিষের ঝাড় তো!" তারপর মুচকিহেসে গাভ্রিকের দিদির উদ্দেশে মনে মনে বলে ইলিয়াঃ

"আর দেমাক দেখাবে? মুখে ঝামা ঘ'ষে দিয়েছি তো! এখন যদি তাতিয়ানা আসে তাহ'লে তাবও ধুদ্ধুড়ি নেড়ে দেবো!"

ইলিয়া হঠাৎ যেন মারমুখো হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীর লোককে অপমান ক'রতে ইচ্ছা করে তার। "চাই না, চাই না, কাউকে চাই না!"

কিন্তু তাতিয়ানা এলো না। সারাটি দিন ইলিয়া একা ব'সে থাকে। দিনটা যেন আর কাটতেই চায় না। বিছানায শুয়ে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয় তার। গাভ্রিকের দিদির কথাগুলোর চেয়ে এই নিঃসঙ্গতা তাকে যেন আরও বেশি ক'রে কষ্ট দিতে থাকে। মনে হয় কে যেন তাব দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। এই সময় ওলিম্পিয়াদার কথা ভাবে ইলিয়াঃ "একমাত্র এই মেয়েটাই হয়তো আমাকে ভালোবাসতো, কিন্তু সে আজ কোথায়!"

বোবা অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুঁজে শুয়ে ইলিয়া আকাশপাতাল ভাবে। কি নিঃসঙ্গ নীরব রাত্রি। কোথাও একটু শব্দ হ'লেই ইলিয়া চ'মকে ওঠে, চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন খোঁজে। তারপর ছটফট

ক'রতে ক'রতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙবার পর তার মনে হয় মাথায় একটা অসহ্য ব্যথা হ'য়েছে। চায়ের কেৎলিটা উনুনে চাপিয়ে দেয় ইলিয়া, কিন্তু কি মনে ক'রে সেটা তক্ষুনি নামিয়ে রাখে; তারপর ঢক্‌ঢক্ ক'রে এক ঘটি জল খেয়ে দোকান খোলে।

দুপুরের দিকে পল্ এলো। এসে গুড্-মর্ণিং পর্যন্ত না জানিয়ে রুক্ষ গলায় সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে:

"ওভাবে মেজাজ গরম করার মানে কি?"

পল্ যে কি ব'লতে চায় তা বুঝতে পেরে ইলিযা ইচ্ছা ক'রেই নীরব হ'য়ে থাকে। তারপর ভাবে: "এও দেখছি আমার বিরুদ্ধে!"

ইলিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করে পল্:

"সোফিয়া নিকলায়েফ্‌নাকে তুমি অপমান ক'রেছো কেন?"

পলের ভ্রূকুটি দেখে ইলিয়ার বুঝতে বাকি থাকে না যে পল্ ওকে ঘৃণার চক্ষে দেখছে। কিন্তু তার ঘৃণার পরোয়া করে কে? ধীরে ধীরে ক্লান্ত স্বরে বলে ইলিয়া:

"আর যাই হোক, এসে অন্তত একটা গুড্‌মর্ণিংও জানানো উচিত ছিলো তোমার। তাছাড়া টুপিটাও খোলা উচিত ছিলো। দেখছো তো কুলুঙ্গীতে একটা বিগ্রহ র'য়েছে।"

কিন্তু ইলিয়ার কথায় কান্ না দিয়ে মাথায় টুপিটা আরও আঁটসাট ক'রে বসিয়ে উত্তেজিত স্বরে ব'লতে থাকে পল্:

"খুব বাহাদুর তুমি! নবাব হ'য়ে উঠেছো একেবারে। বড়োলোক হ'য়েছো, দুবেলা গণ্ডেপিণ্ডে খাচ্ছো, তাই তোমার রঙই গেছে বদলে। কিন্তু একদিন ব'লেছিলে: 'আমাদের কেউ নেই পল্।' মনে আছে সে-কথা? তারপর কেউ যখন সত্যিসত্যিই এলো তাকে তুমি অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। সাবাস্! এ না হ'লে আর ব্যবসাদার?"

মনমেজাজের সুখ না থাকায় ইলিযা পলের কথার জবাব দেয় না, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে সে ফুঁসছে। পলের ছাতা-পড়া বুরুশের মতো হলদে রঙের দাড়ি-গোঁফগুলোর দিকে তাকিয়ে ইলিয়া মনে মনে হাসে।

পল্ যতোই তিরস্কার করুক না কেন সে-তিরস্কারে ইলিয়া বিচলিত হয় না। বন্ধুর ব্যঙ্গভরা ছটফটে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে :

"ছোকরা আমাকে শাসাচ্ছে! বুঝতে পারছি মেয়েটা ওর কাছে নালিশ জানিয়েছে। কিন্তু আমি কি তাকে খুব বেশি অপমান ক'রেছিলাম? ইচ্ছে ক'রলে তো আরও বেশি ক'রতে পারতাম।"

এদিকে পল্ সমানে ব'লতে থাকে :

"তুমি জানো না গাভ্রিকের দিদি কতো বুদ্ধিমতী। সে সব বোঝে, তোমার আমার মতো মুখ্যু তো নয়! আর তাকে কি না তুমি—উঃ! ওরা সবাই মানুষ ভালো, যেমন চালাকচতুর তেমনি সরল, তাছাড়া আইনকানুন ওদের নখদর্পণে। দেখছো কি অমন ক'রে? যা ব'লছি তা সত্যি! সোফিয়া নিকলায়েফ্‌নাকে হাতে রাখলে পারতে। কিন্তু তা না ক'রে তুমি—"

ইলিয়া ধীরে ধীরে বলে : "থামো পাশ্‌কা! উপদেশ দিও না। মনে রেখো আমি আমার খুশিমতো চলি!"

"আর, এই খুশিমতো চলার মানে হ'লো লোকজনকে অপমান করা, কি বলো?"

"অতোশত বুঝি না। আমার যা ইচ্ছা হয় আমি তা-ই করি। তোমরা সবাই মিলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছো। এতো কষ্ট ক'রে আমাকে উপদেশ দেবার কোনো দরকার ছিলো না, পাশ্‌কা!"

তারপর কাউণ্টারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বলে :

"আর কিছু ব'লবে? বলবার মুরোদ আছে?"

দৃঢ় স্বরে পল্ জবাব দেয় : "গাভ্রিকের দিদির আছে। ওদের তুমি হার মানাতে পারবে না।"

"বেশ, তাহ'লে ওদের কাছেই যাও।"

পলের কথাগুলো ইলিয়ার ভালো লাগে না। ক্লান্তিতে তার পা দুখানা যেন অবশ হ'য়ে আসে। এখন একটু একা থাকতে চায় সে।

পল্ শাসায় : "হ্যাঁ, তাই যাবো। যাবো শুধু এইজন্যেই যে ওদের কাছে গেলে আশার কথা শুনতে পাই, বুঝতে পারি জীবনে আনন্দ আছে, আদর্শ

আছে। এর আগে এতো আনন্দ আর কখনো পাই নি, এর আগে আমাকে কেউ সম্মানও করে নি।"

ক্ষীণস্বরে ইলিয়া বলে : "গলাবাজি ক'রো না!"

সংগে সংগে পল্ চীৎকার ক'রে ওঠে : "তুমি একটি গাড়োল!"

ঠিক এই সময় একটি মেয়ে ডজন খানেক শার্টের-বোতাম কিনতে আসে। বোতামগুলো নিয়ে মেয়েটি ইলিয়ার হাতে একটি সিকি দিতেই ইলিয়া সিকিটাকে দু-একবার আঙুলে ব'গড়ে ফিরিয়ে দেয় মেয়েটিকে। বলে :

"ভাঙানি নেই। দামটা পরে কোনো সময় দিয়ে যেও।"

বাক্সে ভাঙানি ছিলো, কিন্তু তার চাবিটা ছিলো ভিতরের ঘরে। সেখান থেকে চাবি এনে বাক্সো খুলতে আর ইচ্ছা করে না ইলিয়ার।

মেয়েটি চ'লে যেতে নতুন করে বাকবিতণ্ডা শুরু না ক'রে, ইলিয়া যদি কিছু বলে এই আশায়, পল্ হাঁটুর ওপর টুপিটা চেপে ধ'রে খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ইলিয়া কিন্তু একটি কথাও বলে না, মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে শিস্ দিতে শুরু করে। রাস্তা থেকে ভেসে আসে গাড়ির চাকার শব্দ। লোকজন চ'লেছে যে যার কাজে। এক রাশি ধূলো ঢোকে ঘরের মধ্যে।

বোবার মতো আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পল্ নিজেই কথাবার্তা শুরু করবার চেষ্টা করে : "তারপর?"

একটু ভেবে ইলিয়া জবাব দেয় : "কিছুই না।"

"কিছুই না?"

"না। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

অতএব একটি কথাও না ব'লে মাথায় টুপিটা দিয়ে পল্ বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। সেইদিকে চেয়ে ইলিয়া দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবে : "তবে কি আমার শরীরটা সত্যিই ভালো নেই?"

খয়েরী রঙের একটা প্রকাণ্ড কুকুর দরজায় একবার উঁকি মেরে লেজ নেড়ে চ'লে যায়। একটা বুড়ি ভিখিরি এসে ইনিয়েবিনিয়ে ভিক্ষা চায় :

"রাজা বাবা, কিছু ভিক্ষে দাও এই বুড়িকে।"

ঈষৎ মাথা নেড়ে ইলিয়া জানিয়ে দেয় যে ভিক্ষা হবে না।

রাস্তায় হট্টগোল বেড়েই চ'লেছে। হুড়োহুড়ির বিরাম নেই। কেবল ঘস্‌ঘস্ আর ঘটর্‌ঘটর্ শব্দ। এক এক সময় মনে হয় পৃথিবী জুড়ে যেন একটা বিরাট চুল্লী জ্ব'লছে। কাজ আর কাজ। লোহালক্কড়ের ঝন্‌ঝন্ শব্দে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে ঘরদোর। কাছাকাছি কোথাও কে যেন ছুরিতে শাণ দিচ্ছে। ইলিয়ার মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে ওঠে।

একজন ফেরিওয়ালা সুর ক'রে হেঁকে যায়:

"আঙুর চাই আঙুর......"

একটির পর একটি মুহূর্ত আসে আর যায়। কতো সম্ভাবনা, কতো অপ্রত্যাশিত আনন্দই না লুকিয়ে থাকে তার মধ্যে। নতুন কিছু না কিছু ঘ'টছেই, এমনই অনন্ত ও অক্লান্ত এই সৃষ্টির লীলা। কিন্তু ইলিয়ার মধ্যে যেন মরে গেছে সবকিছু। বন্ধ্যা মাঠের মতো খাঁ খাঁ ক'রছে তার মন। আশা নেই, কামনা নেই, কেবল একটা বিরাট ক্লান্তি যেন চেপে ব'সেছে তার বুকের ওপর। দিবারাত্র কেবল দুঃস্বপ্নই দেখছে সে। এইভাবে তার জীবন কাটতে থাকে। লোকজন আসে, যার যা কেনবার কিনে নিয়ে যায়, আর তাদের দিকে চেয়ে ইলিয়া বিষণ্ণ মনে ভাবে:

"আমাকে যেমন ওদের দরকার নেই, তেমনি ওদেরকেও আমার দরকার নেই। আপতত একটু খাপছাড়া লাগছে, তবে এটাও স'য়ে যাবে ধীরে ধীরে। আমি একা থাকবো—আমি একা থাকবো!"

গাভ্রিকের বদলে বাড়িওয়ালার রাঁধুনী ইলিয়াকে চা তৈরি ক'রে দিয়ে যায়, খাবারদাবারও দিয়ে যায় সে-ই। স্ত্রীলোকটি রোগা, মুখখানা তার লাল, মুখে সর্বদাই একটা বিরক্তির ভাব, তার ওপর চোখদুটি যেমন নিষ্প্রভ তেমনি অভিব্যক্তিহীন। মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে ইলিয়া প্রায় ক্ষেপে যায়।

"কি আশ্চর্য, জীবনে কি কোনোদিন কোনো ভালো জিনিষ দেখবো না?"

তারপর হতাশ হ'য়ে ইলিয়া বিষণ্ণভাবে মনে মনে বলে:

"আমার জীবনের না আছে ছিরি না আছে ছাঁদ!"

নানান চিন্তায় ইলিয়া ডুবে থাকে। চিন্তাগুলো তাকে কষ্ট দেয় সত্যি, কিন্তু তা যদি আবার না থাকে তাহ'লে সে আরও কষ্ট পায়। এতোদিন ধ'রে লোকজন—বিশেষ ক'রে তার বন্ধুরা—এই চিন্তার খোরাক জুগিয়ে এসেছে,

কিন্তু আজ তারাও যে যার স'রে প'ড়লো। এখন বাকি রইলো শুধু খদ্দের। দেখতে দেখতে ইলিয়া নিজের নিঃসঙ্গতার কথা ভুলে যায়, এমন কি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখাও ছেড়ে দেয়। একটা সর্বগ্রাসী ঔদাসীন্য তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে ফেলে।

আর এইভাবে ঢিমে তালে ক্লান্তি ও যাতনার মধ্যে দিয়ে তার দিন কাটতে থাকে।

৩০

এক সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ ক'রে ইলিয়া সবে উঠানে একটা এল্‌ম্ গাছের তলায় শুয়েছে এমন সময় শুনতে পেলো দেয়ালের ওধারে কিসের যেন শব্দ হ'চ্ছে। একটু পরে মনে হ'লো কে যেন আদুরে গলায় ব'লছে :

"সোনা আমার, যাদু আমার, কে তোমায় ব'কেছে মানিক ?"

দেয়ালের ফুটো দিয়ে ইলিয়া দেখলো ঢ্যাঙামতো মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোক একটা প্রকাণ্ড হলদে রঙের কুকুরকে আদর ক'রছে।

ইলিয়া ভাবলো : "যারা আদর করার মতো আর কাউকে খুঁজে না পায় তারাই কুকুরকে আদর করে।"

এই সময় গাভ্রিক্, গাভ্রিকের দিদি, পাশ্‌কা এবং মাশার কথা মনে পড়তেই ইলিয়ার বুকের মধ্যেটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

"যেদিন দরকার ছিলো সেদিন ওরা আসতো আমার কাছে। আজ দরকারও ফুরিয়েছে, ওরা আসাও ছেড়ে দিয়েছে। মরুক্ গে যাক্! আমি কাল জাকবের সংগে একবার দেখা ক'রে আসবো।"

দেয়ালের ওধারে স্ত্রীলোকটি তখনো তার কুকুরকে আদর ক'রতে থাকে :

"সোনা আমার, যাদু আমার······"

ইলিয়া বিষণ্নমনে ভাবলো : "তাতিয়ানা যদি একবারটি আসতো !"

কিন্তু তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্‌না তখন শহর থেকে অনেক দূরে—এক গ্রামাঞ্চলে। জাকবের সংগেও ইলিয়া দেখা ক'রতে যেতে পারলো না, কারণ পরের দিন সকালে হঠাৎ তেরেন্সকাকা এসে হাজির হ'লো।

ইলিয়া তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে, বিছানা থেকে নামে নি পর্যন্ত, ব'সে ব'সে ভাবছে : "জীবন কাটানো তো নয় যেন ঠাণ্ডা কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া। সহজে ক্লান্তিও আসে, আবার পথও ফুরোয় না"—এমন সময় ও হঠাৎ শুনতে পেলো দরজায় কে যেন বারেবার টোকা মারছে। রাঁধুনীটা হয়তো চায়ের কেৎলি নিতে এসেছে এই ভেবে ইলিয়া দরজা খুলতেই দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে ওর কাকা !

মাথা নেড়ে, একটু রসিকতার হাসি হেসে ব'ললো তেরেন্স :

"কী কাণ্ড, ন'টা বাজতে যায়, এখনো পর্যন্ত দোকান খুলিস্ নি? আচ্ছা ব্যবসাদার তো তুই?"

জবাবে ইলিয়াও একটু মুচকি হাসলো—কিন্তু দরজাটা আগলে। তেরেন্সের মুখখানা রোদে পুড়ে তামাটে মেরে গেছে, বয়সও যেন ক'মে গেছে আকস্মিকভাবে, তাছাড়া তার চোখদুটোও চকচক ক'রছে খুশিতে। তেরেন্সের পায়ের কাছে প'ড়ে র'য়েছে এক গাদা থলে আর পুঁটুলি এবং সেগুলোর মধ্যে তাকেও দেখাচ্ছে একটা জীবন্ত পুঁটুলির মতো।

"কেমন আছিস্? কৈ, পথ ছাড়্, তোর আস্তানায় একবার ঢুকতে দে।"

দরজা ছেড়ে ইলিয়া একে একে পুঁটুলিগুলো ঘরের মধ্যে আনতে লাগলো, আর কুলুঙ্গীর বিগ্রহটার সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে ব'লতে লাগলো তেরেন্স :

"আহা, করুণাময়ের কী দয়া! ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলাম।—হ্যাঁরে, ভালো আছিস্ তো?"

কাকাকে আলিঙ্গন করবার সময় ইলিয়া অনুভব করলো কুঁজোর দেহ তখনো বেশ মজবুত। ঘরের চারিদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে জোর গলায় ব'ললো তেরেন্স :

"দাঁড়া, আগে হাত-মুখ ধুয়ে নি, শরীরটা বড়ো ম্যাজ-ম্যাজ ক'রছে।"

দেখে মনে হ'লো তেরেন্সের চেহারায় একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। আগে আগে সে না ঝুঁকে দাঁড়াতেই পারতো না, কিন্তু এখন যেন প্রায় সোজা হ'য়েই দাঁড়াতে পারছে। হয়তো বোঁচকা পিঠে নিয়ে ঘোরবার সময় তার কুঁজটা বেশ খানিক নিচের দিকে নেমে গেছে!

মুখে খাব্‌লা খাব্‌লা জল ছিটোতে ছিটোতে তেরেন্স জিজ্ঞাসা ক'রলো ভাইপোকে :

"কাজকম্মো চ'লছে কেমন?"

কাকা যে অনেকখানি ব'দলে গেছে এতে খুশি হ'লো ইলিয়া। চা তৈরী ক'রতে ক'রতে সে তেরেন্সের নানান প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো—তবে কিছু সাবধানে, একটু চেপেচুপে।

"তুমি কেমন আছো?"

চোখ বুঁজে মাথা নেড়ে, এক ফালি তৃপ্তির হাসি হেসে জবাব দিলো তেরেন্স :

"দিব্যি ভালো আছি। খুব ঘটা ক'রে তীর্থ সেবে এলাম, এতোখানি আনন্দ পাবো ভাবিও নি। মোদ্দা কথা জীবনের সত্যটাকে যাচাই ক'রে এলাম।"

তারপর টেবিলের ধারে ব'সে আঙুলে দাড়ি পাকাতে পাকাতে মাথাটা কাত ক'রে ব'লতে লাগলো তেরেন্স :

"কোনো তীর্থস্থান আর বাকি রাখি নি। যতোটা পেরেছি জপতপও ক'রেছি। কতো কি দেখলাম, কতো কি শুনলাম। চোখ কান জুড়িয়ে গেছে। সাধুসঙ্গও ক'রেছি অনেক।"

তীর্থের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রতে ক'রতে তেরেন্স আত্মহারা হ'য়ে যায়। তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে তৃপ্তির হাসি, চোখের পাতাদুটি গর্বে আত্মপ্রসাদে ঈষৎ ভিজে যায়।

এমন সময় বৃষ্টি এলো। প্রথমে ঝিরঝির ক'রে, তারপর মুষলধারে। জানলার শার্শিগুলো কাঁপতে লাগলো।

"একবার একটা বিরাট মঠে গিয়েছিলাম। তার ভিতরটা যেমন নিস্তব্ধ তেমনি অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে ভয় লাগে। চারিদিকে জ্ব'লছিলো ছোট ছোট প্রদীপ—শিশুর চোখের মতো। কী অনন্ত শান্তি সেখানে। আজও যেন দেখতে পাচ্ছি সেই প্রদীপগুলোকে।"

একঘেয়ে গলায় তেরেন্স সেই মঠের সৌন্দর্য বর্ণনা ক'রতে লাগলো। এদিকে বৃষ্টির দাপট আরও বেড়েছে। ঘরের ছাদটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে বাতাস। ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে প'ড়ছে হু হু ক'রে।

"কি ব'লবো ইলুশা, ইচ্ছে করে আবার সেখানে ফিরে যাই।"

ধীরে ধীরে ইলিয়া ব'ললো : "যাই হোক্, তোমার বুকের বোঝাটা শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আসতে পেরেছো তো?"

চেয়ারে সোজা হ'য়ে ব'সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো তেরেন্স, তারপর ইলিয়ার দিকে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ব'ললো :

"সোজাসুজি এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। পাপ ক'রেছিলাম সত্যি, কিন্তু তা স্বেচ্ছায় করি নি। পায়ের তুলনায় জুতো যদি খুব বেশি ছোট হয় তাহ'লে তা যেমন কামড়ায়, তেমনি এই পাপের বোঝাও আমাকে অহরহ কষ্ট দিতো। আমি যদি সেদিন পেক্রুহার কথা না শুনতাম তাহ'লে ও আমাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দিতো। ঠিক কি না?"

"খুব ঠিক।"

"তাহ'লেই বুঝে দেখ। কিন্তু যেই তীর্থ ক'রতে বেরুলাম অমনি মনটা হাল্‌কা হ'য়ে গেলো। হাঁটতে হাঁটতে শুধু এই কথাই মনে মনে ব'লেছি: 'হে ঈশ্বর, তুমিই আমার বিচার ক'রো। পাপ যে ক'রেছি তা আমি জানি, কিন্তু তুমি না রাখলে আমাকে কে রাখবে বলো'?"

একটু মুচকি হেসে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো: "তার মানে ঈশ্বরের সংগে তোমার বোঝাপড়া শেষ ক'রেই এসেছো, তাই না?"

ওপর দিকে চোখ তুলে জবাব দিলো কুঁজো তেরেন্স: "তা বলা মুশ্‌কিল। ক্ষমা করা না করা তাঁরই হাতে। আমার প্রার্থনাকে তিনি কিভাবে নিয়েছেন তা তো আমি জানি না।"

"কিন্তু তোমার বিবেকের অবস্থা এখন কেমন?"

"তার মানে?"

"মানে—বিবেক এখন শান্ত তো?"

কান পেতে কি যেন শুনছে এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তেরেন্স জবাব দিলো: "নীরব, একেবারে নীরব।"

ইলিয়া একটু ঠাট্টার হাসি হাসলো।

ফিসফিস ক'রে ব'ললো তেরেন্স: "অন্তর দিয়ে যদি প্রার্থনা করা যায় তাহ'লে বুকের বোঝা হাল্‌কা হয় বৈ কি।"

চেয়ার থেকে উঠে ইলিয়া জানলার ধারে চ'লে গেলো। ফুটপাথের ধার দিয়ে ঘোলাটে জলের স্রোত বইছে। রাস্তার হেথা-হোথা জল জ'মে গিয়ে ছোট ছোট ডোবার সৃষ্টি হ'য়েছে। বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়তেই সেগুলো চমকে উঠছে। ইলিয়ার দোকানের সামনের বাড়িখানা ভিজছে তো ভিজছেই। শার্শিগুলো ঝাপ্‌সে যাওয়ায় ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে। রাস্তা

নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। শব্দের মধ্যে কেবল বৃষ্টির ঝরঝরানি আর বাতাসের আর্তনাদ। ওপাশের একখানা বাড়ির কার্নিশের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে আছে একটি নিঃসঙ্গ পায়রা। ভিজে বাতাসে থই থই ক'রছে কেমন একটা গুরুভার ক্লান্তি। ইলিয়া ভাবলো: "বর্ষা শুরু হ'লো।"

একটা থলের মুখ খুলতে খুলতে ব'ললো তেরেন্স: "প্রার্থনা করা ছাড়া পরিত্রাণের আর কীই বা উপায় আছে বল্?"

কাকার দিকে না চেয়ে বিষণ্ণভাবে ইলিয়া ব'ললো:

"তা তো বটেই! ব্যাপারটা জলের মতো সোজা, অর্থাৎ প্রথমে পাপ ক'রবে, তারপর প্রার্থনা ক'রে পবিত্র হবে, আর তারপর নতুন ক'রে পাপ শুরু ক'রবে। এই তো?"

"তা কেন? সৎভাবেও তো জীবন যাপন করা যায়।"

"ক'রে লাভ কি?"

"লাভ কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাভ কি?"

"বিবেকের কি কোনো দাম নেই?"

"কি দাম আছে শুনি?"

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে তেরেন্স ব'ললো: "আছে বৈ কি। কী যে বলিস্ তুই?"

কাকার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ইলিয়া দৃঢ়স্বরে ব'ললো:

"যা বলি ভেবেচিন্তেই বলি।"

"কিন্তু এ-ধরণের কথাবার্তা বলা যে পাপ।"

"পাপ হয় হবে।"

"এর জন্যে তোকে শাস্তি পেতে হবে।"

"মোটেই না।"

জানলার সামনে থেকে স'রে এসে ইলিয়া কাকার মুখের দিকে তাকালো।

এদিকে কুঁজো তেরেন্স তার ভাইপোর মজবুত দেহটার দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে ভাবতে থাকে কি ক'রে ইলিয়ার ভুল ধারণাটা ভেঙে দেওয়া যায়। খানিক পরে মনের মতো জবাব খুঁজে পেয়ে তেরেন্স ব'ললো:

"মোটেই না কি রকম? শাস্তি তোকে পেতেই হবে! আমার কথাই ধর্ম্। পাপ ক'রেছিলাম ব'লে আমাকে শাস্তিও পেতে হ'য়েছে।"

রুক্ষ গলায় ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"শাস্তি আবার পেলে কবে?"

"পাই নি? জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছে, পাছে পাপ বেরিয়ে পড়ে। এই দুশ্চিন্তা, এই উৎকণ্ঠা কি শাস্তি নয়?"

একটু হেসে উদ্ধতভাবে ব'ললো ইলিয়া: "পাপ তো আমিও ক'রেছি, কিন্তু সেজন্যে আমি এতোটুকুও ভীত নই।"

কঠোর স্বরে ব'ললো তেরেন্স: "বাজে বকিস্ নি!"

"সত্যি ব'লছি, আমি এতোটুকুও ভীত নই। তবে জীবন বড়ো নিষ্ঠুর।"

সংগে সংগে মেঝের ওপর থেকে উঠে বিজয়ীর মতো ব'ললো তেরেন্স: "তাহ'লেই বুঝে দেখ্, নিজের মুখেই ব'ললি জীবন নিষ্ঠুর, তাই না?"

"হ্যাঁ। সবাই আমাকে ত্যাগ ক'রেছে—যেমন ক'রে খোসপাঁচড়ার রোগীকে মানুষ ত্যাগ করে ঠিক তেমনি ক'রে।"

"আর ঐটাই হ'লো তোর শাস্তি। হায় রে!"

প্রায় পাগলের মতো চীৎকার ক'রে ব'ললো ইলিয়া: "কিন্তু কেন?" এই ব'লে সে রাগে দুঃখে দেয়াল আঁচড়াতে লাগলো। ভয় পেয়ে গিয়ে একটা দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চাপা গলায় ব'ললো তেরেন্স:

"চুপ কর্, চেঁচাস্ নি!"

কিন্তু কে কার কথা শোনে, ইলিয়া সমানে চেঁচাতে লাগলো। এতো দিন ধ'রে তার বুকের মধ্যে যতো কথা জমা হ'য়ে ছিলো সেগুলো সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তেরেন্সের মুখের ওপর:

"তীর্থ ক'রতে যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না তোমার। না গেলে কি হ'তো? কিছুই হ'তো না। চুরিই করো আর খুনই করো, যতোক্ষণ ধরা না প'ড়ছো তোমাকে শাস্তি দেবারও কেউ নেই। শাস্তি তারাই পায় যারা ধরা প'ড়ে যায়। নইলে কিসের ভয়?"

সাবধানে ভাইপোর দিকে এগোতে এগোতে তেরেন্স ব'ললো: "চুপ কর্

ইলিয়া, চুপ কর্। এতো মেজাজ গরম করিস্ নি। স্থির হ'য়ে ব'স্। এসব কথা আলোচনা ক'রতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়।"

এই সময় হঠাৎ ধপাস ক'রে একটা শব্দ হ'লো। মনে হ'লো কি যেন একটা প'ড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে দরজার কাছে এসে থেমে গেলো। কাকা ভাইপো দু'জনেই চ'মকে উঠে নীরব হ'য়ে গেলো। আবার সব নিস্তব্ধ।—শব্দের মধ্যে কেবল বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি।

ভয়ে ভয়ে ফিসফিস ক'রে তেরেন্স জিজ্ঞাসা ক'রলো: "ব্যাপার কি?"

চুপি চুপি দরজা খুলে ইলিয়া উঠানের দিকে মুখ বাড়ালো। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে জানলার ধারে গিয়ে ব'ললো:

"বাক্সোগুলো প'ড়ে গেছে।"

আবার মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে থলেগুলো খুলতে খুলতে খানিক পরে ব'ললো তেরেন্স:

"না, না, একবার ভেবে দেখ্ ইলিয়া, এ ধরণের কথাবার্তা বলা কি ভালো? এ যে অধর্ম। এতে ঈশ্বরের কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু তোর সর্বনাশ হবে। একবার এক সাধু আমাকে ব'লেছিলেন—"

এই ব'লে ইলিয়ার দিকে আড়চোখে চেয়ে তেরেন্স আবার তীর্থের কথা শুরু ক'রলো। ইলিয়া আর ক'রবে কি, ব'সে ব'সে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দিয়ে তার কথা শুনতে লাগলো, আর সেই সংগে ভাবতে লাগলো কাকা আর সে একসংগে থাকবে কি ক'রে।

যাই হোক, তেরেন্সের সংগে ইলিয়ার দিনগুলো নেহাত মন্দ কাটে না। পুরোণো বাক্সোগুলো জুড়েতাড়ে তেরেন্স একখানা খাট বানিয়ে নিলো এবং খাটখানাকে ফেললো ঘরের এক কোণে। গাভ্রিক্ না থাকায় তার কাজগুলো সেই ক'রতে লাগলো—যেমন চা তৈরি করা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, হোটেল থেকে খাবার আনা ইত্যাদি। এদিকে মুখে তার ঈশ্বরের নাম লেগেই আছে। সন্ধ্যা হ'লে তেরেন্স ভাইপোকে শোনায় টুকটাক্ ধর্মের কাহিনী, আর নিজের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে ইলিয়াও শোনে কাকার কথা, আর ভাবে: "এইবার সন্ধ্যার দিকে একটু বেড়াতে যেতে পারবো।" আসলে তার মন চায় শহর

ছেড়ে মাঠে চ'লে যেতে যেখানে আছে শান্তি, নির্জনতা আর অন্ধকার। তার মনের অবস্থাও ঠিক এই মাঠেরই মতো!

বাড়ি ফেরার এক সপ্তাহ পবে তেবেন্স পেত্রুহা ফিলিমনফের সংগে দেখা ক'রতে গেলো, কিন্তু ফিরে এলো মুখ ভার ক'রে। ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো: "ব্যাপার কি?"

তেবেন্স আমতা আমতা ক'রে ব'ললো: "কিছুই না—মানে—না, তেমন কিছু না। সবায়েব সংগেই দেখা হ'লো, অনেক কথাবার্তা হ'লো, এই আব কি।"

ইলিযা জিজ্ঞাসা ক'রলো: "জাকব কেমন আছে?"

"জাকব? জাকব ম'রতে ব'সেছে। তোব কথা জিজ্ঞেশ ক'বলো। হলদে হ'য়ে গেছে তাব মুখ, কেবলই কাশে আজকাল।"

এই ব'লে ঘবেব এক কোণে তেরেন্স বিষণ্ণভাবে ব'সে প'ড়লো।

একঘেয়ে দিনগুলো আসে আর যায। বাগে আক্রোশে ইলিয়া ভিতবে ভিতরে সাপেব মতো ফুঁসতে থাকে। বন্ধুবান্ধবেব কেউই তাব সংগে দেখা ক'বতে আসে না। "মাশা, পল্—এবা হয়তো জীবনে কোনো নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে, তাই ভুলে গেছে আমাকে", মনে মনে বলে ইলিয়া। ঘোডাব লাথি খেয়ে মাতিৎসা মারা গেছে হাসপাতালে। পের্ফিশ্কার তো পাত্তাই নেই। ইলিয়া ভাবে মুমূর্ষু জাকবকে একবার দেখে আসবে, কিন্তু যাই যাই ক'রেও যাওযা হয় না। মনে মনে বলে: "গিয়ে আর লাভ কি? ওকে তো আর আমার কিছু বলবাব নেই!" সকালের দিকে ইলিয়া খবরের কাগজ পড়ে, আর দুপুরে দোকানে ব'সে বিবর্ণ ঝরাপাতাগুলোর দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। মাঝে মাঝে দু-একটা পাতা উড়ে আসে দোকানের মধ্যে।

আব এদিকে কাজ ক'রতে ক'রতে তেবেন্স বিড়বিড় করে: "হে ভগবান, আমাদের দিকে একটু মুখ তুলে চেও..."

সেদিন রবিবার। খবরের কাগজ খুলেই ইলিয়া প্রথম পাতায় দেখলো 'আগে আর পরে' নামে একটি কবিতা ছাপা হ'য়েছে। কবির নাম—পি, গ্রাৎচফ্।

পল্ লিখেছে :

"এতোদিন ধ'রে বুনেছি কেবল
দুঃখের কালো জাল ;
বেদনা অশ্রু হাহাকারে শুধু
কেটে গেলো এতো কাল !"

প'ড়তে প'ড়তে ইলিয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পলের মুখখানা—সেই উজ্জ্বল উদ্ধত দুটি চোখ—চঞ্চল আর বিষণ্ণ যাদের চাহনি। কবিতাটিতে পল্ ব'লেছে : এক অজানা শহরের মধ্যে সে কেবলই ঘুরে বেড়িয়েছে নিঃসঙ্গ-ভাবে, শতচ্ছিন্ন পোষাক প'রে। কেউ তাকে করুণা করে নি, কেউ তাকে সম্মানও করে নি। এইভাবে সে যখন ক্ষুধায় ক্লান্তিতে মরমর, তখন তার সংগে দেখা হ'য়ে গেলো কতকগুলি মহৎ লোকের, যারা তাকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিলো, যারা তাকে ভালোবেসে আশার বাণী শোনালো। তাই

"আজিকে আমার অন্তর জুড়ে
বিহঙ্গ ডেকে যায়,
ভোরের আলোকে নবীন পুলকে
আশার গীতিকা গায় !"

কবিতাটা শেষপর্যন্ত প'ড়ে ইলিয়া ক্রুদ্ধভাবে খবরের কাগজখানাকে দূরে ঠেলে দিলো, তারপর মনে মনে ব'ললো :

"যতোই বানিয়ে বানিয়ে লেখো না কেন তাতে কারোরই কিছু যায় আসে না। সবুর করো, মহৎ লোকের লাথি তো খাও নি, যখন খাবে তখন তোমার টনক্ ন'ড়বে। মহৎ লোক—আহা মহৎ লোকই বটে !"

এই সময় তার মাথায় হঠাৎ আর একটি চিন্তার উদয় হ'লো :

"আচ্ছা, এখন যদি ওদের কাছে গিয়ে বলি : 'আমি এসেছি, আমায় ক্ষমা করুন, তাহ'লে কেমন হয় ?"

কিন্তু সংগে সংগেই সে নিজের প্রশ্নের জবাব দিলো : "কেন যাবো ?"

আর তারপরই বিষণ্ণভাবে প্রশ্নটার নিষ্পত্তি ক'রে দিলো এইভাবে :

"গেলেই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে।"

কবিতাটা আর একবার প'ড়তেই ইলিয়া রাগে হিংসায় জ্ব'লে উঠলো, তারপর ভাবতে শুরু ক'রলো গাভ্রিকের দিদির কথা :

"ওর বড়ো দেমাক। লোকজনের দিকে এমনভাবে তাকায় যে পিছন ফেরা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকে না।"

ঐ কাগজেরই আইন-আদালতের স্তম্ভে ইলিয়া প'ড়লো ২৯শে সেপ্টেম্বর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ভেরা কাপিতানভার বিচার হবে—চুরির অপরাধে। রেগে টং হ'য়ে ইলিয়া পলের উদ্দেশে মনে মনে ব'ললো :

"মেয়েটা রইলো জেলে, আর তুমি ব'সে ব'সে কাব্যি ক'রছো।"

"ভগবান, আমার মতো পাপীতাপীর দিকে একটু মুখ তুলে চেও, এই ব'লে ভাইপোর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে তেরেন্স ডাকলো :

"ইলিয়া।"

"কি ?"

"পেত্রুহার কথা ভাবছি।'

করুণভাবে একটু হেসে কুঁজো তেরেন্স খানিক নীরব হ'য়ে রইলো।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা করে : "তার সম্বন্ধে আবার কি ভাবছো ?"

"ও আমাকে ঠকিয়েছে।"

কাকার দিকে চেয়ে মুখে কিছু না ব'ললেও মনে মনে ব'ললো ইলিয়া :

"বেশ ক'রেছে।"

"হায়, হায়, পেত্রুহা আমাকে ঠকিয়েছে।"

ইলিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো : "মোটমাট কতো চুরি ক'রেছিলে ?"

কাকাকে নীরব দেখে ইলিয়া আবার জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"হাজার দশেক ?"

মাথাটা কাত ক'রে অবাক গলায় ব'ললো তেরেন্স :

"দ-অ-শ ?"

তারপর ইলিয়ার দিকে হাত নেড়ে আবার ব'ললো :

"ব'লছিস্ কি তুই ? হায় ভগবান, হায় ভগবান। সব মিলিয়ে হাজার তিনেকের কিছু বেশি ছিলো, আর তুই ব'ল্‌ছিস্ কি না দশ ? কি যে বলিস্, ইলিয়া।"

ব্যংগের হাসি হেসে ইলিয়া ব'ললো :

"দশ হাজারেরও বেশি ছিলো ঠাকুর্দার।"

"তুই মিছে কথা ব'লছিস্।"

"মিছে কথা ব'লবো কেন? সে নিজেই আমাকে ব'লেছিলো।"

"কিন্তু ও কি গুনতে জানতো?"

"তোমার চেয়ে কিংবা পেক্রহাব চেয়ে কিছু খারাপ গুনতো না নিশ্চয়ই।"

তেরেন্সকে চিন্তিতভাবে মাথা নোয়াতে দেখে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো : "কতো ঠকিয়েছে পেক্রহা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ললো তেরেন্স : "প্রায় সাতশো। হ্যাঁরে, তাহ'লে তোর ধারণা ঠাকুর্দার দশ হাজারেবও বেশি ছিলো?"

ইলিয়া মুখ বুঁজে থাকে। কাকার হতাশা দেখে তার বিরক্তি আসে।

ভাবতে ভাবতে বিস্মিতভাবে তেরেন্স জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কিন্তু এতো টাকা কোথায় লুকোনো ছিলো? আমরা তো খুঁজতে কিছু বাকি রাখি নি। ভেবেছিলাম সব কিছুই আমরা নিয়েছি। তাহ'লে পেক্রহা হয়তো আমায় তখনই ঠকিয়েছিলো, কি বলিস্?"

ইলিয়া কঠোর স্বরে ব'ললো : "চুপ করো। এখনো টাকার কথা ভাবছো?"

গভীরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তেরেন্স ব'ললো : "তা বটে, এখন আর সে-কথা ভেবে লাভ কি!"

মানুষের লোভের যে অন্ত নেই এবং টাকার জন্যে মানুষ যে সবকিছুই ক'রতে পারে এই ভেবে ইলিয়া মনে মনে ব'ললো তার যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতো তাহ'লে সে ঘোড়াব বদলে মানুষকে দিয়েই গাড়ি টানাতো। রাগে প্রতিহিংসায় ইলিয়া টেবিলের ওপর দুম্ ক'রে একটা ঘুসি মারতেই তেরেন্স ভাইপোর মুখের দিকে চেয়ে চ'মকে উঠলো।

টেবিলের ধার থেকে উঠে রুক্ষ গলায় ইলিয়া ব'ললো কাকাকে :

"কিছু না, এমনি একটু ভাবছিলাম।"

সন্দেহের স্বরে তেরেন্স সায় দিয়ে ব'ললো : "হ্যাঁ, ও-রকম হয় মাঝে মাঝে।"

কাকার সংগে মাত্র এই ক'দিন থেকেই ইলিয়া প্রায় হাঁপিয়ে ওঠে।

কুঁজোর রকম-সকম ভালো লাগে না তার। ইলিয়াকে দোকান-ঘরের দিকে যেতে দেখলেই তেরেন্স তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় এবং বিড়বিড় ক'রে কী যে বলে তার মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। কাকার সন্দেহের দৃষ্টিটুকু ইলিয়া সোজাসুজি দেখতে পায় না বটে, তবে বুঝতে পারে ঠিকই। ইলিয়ার হাবভাব, চলা-ফেরা সবকিছুর প্রতিই তেরেন্সের দৃষ্টিটা কিছু বেশি সজাগ। তাই ইলিয়া সর্বদাই তটস্থ হ'যে থাকে পাছে কাকা তাকে কোনো অপ্রিয় প্রশ্ন ক'রে বসে। এই সব কারণে সে কাকার সংগে কথা বলা প্রায় বন্ধই ক'রে দেয় এবং বুঝতে পারে যে তেরেন্সের সংগে তার বনিবনা হওয়া মুশকিল। তাই মনে মনে বলে: "এভাবে আর কতোদিন চ'লবে? আমি যে হাঁপিয়ে উঠলাম!"

ইলিয়া আজকাল একটুতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কিছুই যেন ভালো লাগে না তার। সবচেয়ে মারাত্মক কথা এই যে কোনো কাজেই তার মন লাগে না। এক এক সময় তার মনে হয় সে যেন দিনদিন একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। অত্যাচার অবিচার ছাড়া জীবনে সে যে কিছুই পায় নি এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে যাওয়ায় সে কেবলই নিজের দোষত্রুটি-গুলোকে সমর্থন ক'রতে চেষ্টা করে এবং তার ফলে মানুষের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটা কেবলই বেড়ে যেতে থাকে।

তেরেন্স আসবার কিছুদিন পরেই তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না এসে হাজির হ'লো। এসেই খয়েরী রঙের ফাষ্টিয়ান শার্ট-পরা গেঁয়ো কুঁজো লোকটাকে দেখে নাক সিটকে জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে:

"উনি বুঝি তোমার কাকা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কাছেই থাকবেন না কি?"

"নিশ্চয়ই।"

ইলিয়ার রুক্ষ গলা আর চ্যাটাং চ্যাটাং জবাব শুনে তাতিয়ানার বুঝতে বাকি থাকে না যে কোনো কারণে ইলিয়ার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তাই তেরেন্স সম্বন্ধে সে আর কোনো উচ্চবাচ্যই করে না। এদিকে দরজার ধারে গাভ্রিকের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে দাড়িতে মোচড় দিতে দিতে তেরেন্স ধূসর

রঙের গাউন্‌-পরা তন্বী তাতিয়ানার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কেবল তেরেন্স নয়, ইলিয়ারও নজর তাতিয়ানার দিকে। তাতিয়ানা চড়ুই পাখির মতো ঘরময় ঘুরঘুর ক'রতে থাকে। ইলিয়া ভাবে মেয়েটা হয়তো এখুনি তাকে হাজারগণ্ডা প্রশ্ন ক'রে ব'সবে। কিন্তু মনে মনে বলে :

"দাঁড়াও, একবার বাগে পাই, তারপর তোমার মজা দেখাচ্ছি!"

কাউণ্টারেব পিছনে দাঁড়িয়ে জাবদাখাতার পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে তাতিয়ানা ব'ললো :

"মাঝে মাঝে দু-এক হপ্তা গ্রামের দিকে ঘুরে এলে মনটা বেশ হাল্কা হ'য়ে যায। জিনিষপাতিও সস্তা, লোকজনও ভালো। টেলিগ্রাফ আপিসের একজন কেরাণী কী সুন্দরই যে বেহালা বাজালো কি ব'লবো! যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছোট্টো, শান্ত নদী আছে। ফাঁকতালে নৌকো চালানোটাও শিখে এলাম। কিন্তু চাষীদের আণ্ডাবাচ্চাগুলোকে নিয়েই যতো জ্বালা! মাছিব মতো ভন্‌ভন্‌ করতে থাকে। কেবল দাও আর দাও। ওদের বাপ মা-রাই ওদেব ভিক্ষে ক'বতে শেখায়।—ভারি বিশ্রী!"

রুক্ষ গলায় ইলিয়া বললো : "কেউই ওদের এসব শেখায় না। ওদের বাপ মা-রা উদয়াস্ত খাটে, তাই ছেলেপুলের দিকে নজরই দিতে পারে না। তুমি যা ব'লছো তা সত্য নয়।"

অবাক হ'য়ে তাতিযানা ইলিয়াব মুখের দিকে খানিক তাকালো। তারপর কিছু বলবাব জন্যে সবে ঠোঁটদুখানি ফাঁক ক'রেছে এমন সময় তেরেন্স একটু হেসে সসম্মানে ব'ললো :

"আজকাল গ্রামে ভদ্দরলোক প্রায় দেখাই যায় না। আগে আগে তাঁরা জীবনভোর গ্রামেই থাকতেন, কিন্তু এখন তাঁরা মাঝেসাঝে সেখানে ঢুঁ মেরে আসেন, এই পর্যন্ত।"

প্রথমে তাব দিকে, তারপর ইলিযাব দিকে চেয়ে তাতিয়ানা জাবদাখাতায় আবার মনোনিবেশ ক'রতেই তেরেন্স গেলো ভ'ড়কে! ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে শার্টের প্রান্ত নিয়ে পাকাতে লাগলো। মিনিট খানেক সবাই চুপচাপ। একদিকে তাতিয়ানা উল্টে চ'ললো জাবদাখাতার পাতাগুলো, আর অন্যদিকে তেরেন্স তার কুঁজটা ঘ'ষতে লাগলো দরজার ফ্রেমে।

এমন সময় শোনা গেলো ইলিয়ার ধমক :

"কথা হ'চ্ছে ওঁতে আমাতে, তার মধ্যে তুমি মাথা গলাতে আসো কি ব'লে শুনি? তাছাড়া মাস্থিতে যাঁরা তোমার চেয়ে বড়ো তাঁদের সংগে কথা ব'লতে হ'লে আগে তোমার বলা উচিত: 'আমার একটা কথা আছে, যদি অভয় দেন তো বলি' কিংবা এই ধরণেরই একটা কিছু। তা না ক'রে সরাসরি ফোড়ন কাটা!—অসহ্য!"

জাবদাখাতাখানা আর একটু হ'লে তাতিয়ানার হাত পিছলে প'ড়েই গিয়েছিলো আর কি! কোনোরকমে সামলে নিয়ে তাতিয়ানা হেসে উঠলো। এদিকে মাথাটি হেঁট ক'রে তেরেন্স রাস্তায় চ'লে গেলো। তখন ইলিয়ার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি হেসে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো তাতিয়ানা :

"আমার ওপর রাগ ক'রেছো বুঝি? কিন্তু কেন?"

তাতিয়ানার চোখদুটো চকচক ক'রতে থাকে—ছলনায়।

ইলিয়া তাতিয়ানার কাঁধদুখানা চেপে ধ'রলো। মেয়েটাকে সে ঘৃণা করে সত্যি, কিন্তু নিষ্ঠুর কামনায় সে যেন পাগল হ'য়ে উঠলো। তার ইচ্ছা হ'লো তাতিয়ানাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আপেলের মতো পিষে দেয়! দাঁতে দাঁত চেপে ইলিয়া তাতিয়ানাকে নিজের বুকের কাছে জোর ক'রে টেনে নিতেই তাতিয়ানা ইলিয়ার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ফিশফিশ ক'রে ব'ললো :

"ছাড়ো ছাড়ো, লাগছে! পাগল হ'লে নাকি? এখানে কি মানুষ চুমু খায়? ছি ছি, দোকানে দাঁড়িয়ে কি না—! আর, শোনো, তোমার কাকাকে এখানে রাখা চ'লবে না। ঐ কুঁজ দেখলে খদ্দের ভয়ে পালিয়ে যাবে। ওকে বরং অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও। এবার ছাড়ো আমাকে! উঃ, লাগছে!"

কিন্তু ইলিয়া তাকে বেশ ক'রে জাপ্‌টে ধ'রে চুমু খাওয়ার জন্যে তার মুখের ওপর নিজের মুখখানা ক্রমেই নামিয়ে আনতে লাগলো।

"ছাড়ো ব'লছি, তবু ছাড়বে না! কি ভেবেছো তুমি? লজ্জাশরম নেই তোমার? ছেড়ে দাও আমাকে—"

তাতিয়ানা হঠাৎ পাঁকাল মাছের মতো পিছলে মেঝের ওপর প'ড়ে গেলো, আর একটু পরেই ইলিয়া দেখলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জামায় বোতাম দিতে দিতে তাতিয়ানার হাত দুখানা কাঁপছে।

"বড়ো লাগিয়ে দাও তুমি! একটু সবুর ক'রতে পারো না?"

তাতিযানার কথা শুনে ইলিয়ার রগদুটো দপদপ ক'রে উঠলো, ঝিমঝিম ক'রতে লাগলো মাথাটা, এক রাশি গরম কুযাশায় চোখদুটো যেন ঝাপ্‌সে গেলো। কাউণ্টারের পিছনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাতিয়ানার দিকে চেযে ইলিয়া ভাবলো পৃথিবীতে যতো নোংরামি আছে তার প্রতীক হ'লো ঐ মেযেটা; শুধু তাই নয়, ওর সমস্ত দুঃখের জন্যেও দায়ী সে!

তাতিয়ানা ব'ললো: "পৌরুষ থাকা ভালো, কিন্তু মানিক, সেই সংগে একটু সংযমও থাকা ভালো।"

জবাবে ইলিয়া ব'ললো: "বেরিযে যাও এখান থেকে!"

সোনার ব্রুচের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে ইলিয়ার দিকে না চেয়ে ব'ললো তাতিয়ানা:

"যাচ্ছি। কিন্তু শোনো, আজ না—পরশু ২৩শে আমার জন্মদিন, সেইদিন এসো।—আসবে তো?"

ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো মেয়েটাকে জাপটে ধ'রে যন্ত্রণা দেয়। কাঁপতে কাঁপতে আবার ব'ললো:

"বেরিয়ে যাও!"

তাতিয়ানা চ'লে যেতেই তেবেন্স দোকানে ঢুকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"উনিই বুঝি তোর পার্ট্‌নার্?"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে ইলিয়া ব'ললো: "হ্যাঁ।"

"খাসা স্ত্রীলোক! তবে হাবভাব যেন কেমন-কেমন! দেখতে একফোঁটা, কিন্তু—"

কর্কশস্বরে ইলিয়া ব'ললো: "কিন্তু—হারামজাদী!"

জবাবে আমতা-আমতা ক'রে তেরেন্স কি যে ব'ললো কে জানে, তবে তার সন্দেহের দৃষ্টিটুকু ইলিয়ার চোখে ধরা প'ড়লো ঠিকই। ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"অমন ক'রে কি দেখছো আমার দিকে ?"

"আমি ? জয় বাবা বিশ্বনাথ ! কৈ, কিছু না তো !"

"যা ব'ললাম ভেবেচিন্তেই ব'লেছি। কেবল হারামজাদীই নয়, ও একটা—। থাক্ সে-কথা।"

সহানুভূতির স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ললো তেরেন্স :

"ও ! তাই বুঝি, তাই বুঝি ?"

কঠোর স্বরে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"তার মানে ?"

"মানে—"

"কি ব'লতে চাও তুমি ?"

ইলিয়ার অগ্নিমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ক্ষুন্ন হ'য়ে তেরেন্স খানিকক্ষণ নির্বাক হ'য়ে রইলো, তারপর চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে ব'ললো বিষণ্ণবদনে :

"তার মানে—এসব তুইই ভালো বুঝিস্।"

চীৎকার ক'রে ইলিয়া ব'ললো : "এই, আর কিছু না ? হ্যাঁ, ওদের আমি খুব ভালো ক'রেই চিনি। বাইরেই ওদের যতো চাকচিক্য !"

তখন আরাম ক'রে চেয়ারে ব'সে মোলায়েম গলায় প্রায় আপনমনেই ব'লতে লাগলো তেরেন্স :

"সেদিন দারোয়ানটার সংগে কথা হ'চ্ছিলো তার ভায়ের সম্বন্ধে। ছেলেটার এক হপ্তার জেল হ'য়ে গেছে। দারোয়ান ব'ললো এমনিতে তার ভাই বেশ শান্তশিষ্টই ছিলো, কিন্তু একদিন কি যে হ'লো, মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে পাগলের মতো দোকানের কর্মচারী থেকে শুরু ক'রে মনিব পর্যন্ত সবাইকে মেরেধ'রে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড ক'রে ব'সলো। মারের চোটে মনিবের মুখখানা তো চেনাই যায় না—এমন ব্যাপার ! কিন্তু শুনলাম আগে আগে সে মুখ বুঁজে মনিবের মারই খেতো—টুঁ শব্দটি ক'রতো না—তাই ঘটেও নি কিছু।"

কাকার কাহিনী শুনতে শুনতে ইলিয়া ভাবতে লাগলো :

"নাঃ, এসব ছেড়েছুড়ে আমাকে চ'লে যেতে হবে দেখছি। চুলোয় যাক

পরিষ্কার জীবন! কোনো জীবনই আমার জন্যে নয়। কিন্তু এখানে থাকলে আমি মারা যাবো। উঃ, দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে!"

তেরেন্স ব'লে চ'ললো: "কিন্তু তারপর আর সইতে না পেরে একদিন সে ফেটে প'ড়লো।"

"কে?"

"ঐ যে গো দারোয়ানের ভাইটা। তার কথাই তো ব'লছি। শেষটায় মারামারি করার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তার এক হপ্তার জেল হ'য়ে গেলো।"

"ও!"

"সাত সাতটা দিন!·· তাই ব'লছিলাম ছেলেটার বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে বিক্ষোভ জ'মছিলো—যেমন ক'রে চিম্‌নিতে ভূষি জমে ঠিক তেমনি ক'রে—তারপর একদিন সমস্ত বিক্ষোভ জ্ব'লে উঠলো আগুনের মতো—আর সেই আগুনে······"

ইলিয়া লুনেফ্ ব'লে উঠলো:

"কাকা, তুমি একটু কাউন্টারে দাঁড়াও! আমি বাইরে যাচ্ছি।"

তেরেন্সের ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর একঘেয়ে ধর্মের কচকচি শুনতে ভালো লাগে না ইলিয়ার। মনে হয় গির্জায় যেন বিষাদের ঘণ্টা বাজছে। এদিকে দোকানঘরখানাও হ'য়েছে তেমনি। মালপত্রে ঠাসা যেন একটা স্যাঁতসেঁতে গুদামঘর! কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েও কি স্বস্তি আছে? আকাশের মুখ তোলো-হাঁড়ি। দিনকতক একনাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ রাস্তাঘাট একেবারে কাদায় কাদা। ফলে হ'য়েছে এই যেখানে যেটুকু পরিষ্কার জায়গা আছে তা যেন কালো মুখে সাদা দাঁতের মতো উৎকটভাবে চকচক ক'রছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়িগুলোর রঙই গেছে পাল্‌টে। বাতাসেও কেমন একটা বিশ্রী ভাপ্‌সা গন্ধ! গাছের হলদে পাতাগুলো মৃত্যুযন্ত্রণায় কাঁপছে। খানিক দূর থেকে কার্পেট ঝাড়ার শব্দ ভেসে এলো।

আরও খানিকটা এগিয়ে ইলিয়া দেখলো রাস্তাটা যেখানে শেষ হ'য়েছে সেখান থেকে দৈত্যের মতো বড়ো বড়ো সাদা-কালো-লাল্‌চে মেঘ পাক খেতে খেতে আকাশের দিকে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে মেঘগুলোকে দেখাতে লাগলো

ধোঁয়ার পাহাড়ের মতো। দেখতে দেখতে আকাশ ছেয়ে গেলো একখানা কালো পাথরে। মনে হ'লো ঐ পাথর বুঝি এখুনি পৃথিবীর বুকের ওপর ভেঙে প'ড়বে। মেঘাচ্ছন্ন বিষন্ন আকাশখানাকে অসহ্য লাগলো ইলিয়ার। ঠাণ্ডায় ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে সে আবার দোকানে ফিরে এলো।

"নাঃ, দোকানপাট ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমাকে চ'লে যেতেই হবে এখান থেকে। তান্‌কা আর কাকা মিলে এ-দোকান চালাক্, আমি যাই।"

এই সময় ইলিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একখানি বৃষ্টিভেজা মাঠের ছবি। সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে চওড়া একটি রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে বার্চ্‌গাছের সারি। আকাশ থমথম ক'রছে কালো মেঘে। আর সেই পথ দিয়ে সে যেন চ'লেছে পিঠে একটা বোঁচকা নিয়ে, কাদায় ডুবে যাচ্ছে তার পা, মুখে লাগছে বৃষ্টির ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টা। তার ওপর নির্জন সেই মাঠ, রাস্তাটাও জনমানবশূন্য, এমন কি একটি কাকও ব'সে নেই কোনো গাছে।

ইলিয়া মনে মনে ব'ললো ঃ

"কোথায় যাবো? যাবার জায়গাও নেই, আর যাবার মতো সাহসও নেই আমার! উঃ—না—আমি গলায় দড়ি দেবো!"

একুশ গেলো, বাইশ গেলো। আজ তেইশে সেপ্টেম্বর : ভেরার বিচারের দিন। সকালে ঘুম ভাঙতেই ইলিয়ার মনে প'ড়লো সে-কথা।

"মেয়েটার বরাতে কি আছে কে জানে!"

চায়ের পেয়ালায় তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে দিতে ইলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সেই সংগে ভাবলো :

"যাক্, আপাতত দোকানের হাত থেকে তো একটু রেহাই পাওয়া যাবে!"

কোনোরকমে চাটুকু শেষ ক'রে গায়ে জামাটা দিয়েই ও ছুটলো কোর্টের দিকে, কিন্তু পৌঁছে দেখলো তখনো পর্যন্ত দরজাই খোলা হয় নি, এক গাদা লোক জড়ামড়ি হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে কোর্টের সামনে। ইলিয়াও দরজার কাছাকাছি একটা জায়গায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

কোর্টের সামনে বড়োসড়ো একটি পার্ক্। তার ঠিক মাঝখানে বিরাট এক গির্জা। কতকগুলো ছায়া কাঁপছে শানবাঁধানো রাস্তাটার ওপর। সূর্য নিস্তেজ—কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ—এক একবার উঁকি মেরেই অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই এক একটা ছায়া পার্কের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এসে রাস্তা পার হ'য়ে গাছের কোমর বরাবর উঠছে, তারপর দেখতে দেখতে ঢেকে ফেলছে গির্জাটির আপাদমস্তক এবং একটু পরেই গুটিগুটি মেরে এগিয়ে আসছে কোর্টের দিকে যেখানে লোকজন ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রত্যেকের মুখেই বিষাদের ছায়া, ক্ষুধার ছাপ। এ ওর দিকে দেখছে ক্লান্ত চোখে, এ ওর সংগে কথা ব'লছে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। পাতলা কাপড়ের গলাবন্ধ কোট এবং তোবড়ানো টুপি-পরা, লম্বা চুলওয়ালা একটি লোক ঠাণ্ডায় কালিয়ে-যাওয়া আঙুলগুলো দিয়ে তার ছুঁচলো লাল্‌চে দাড়িটা পাকাতে পাকাতে ছেঁড়া জুতোশুদ্ধ পা দুখানা অধীরভাবে ঠুকছে মাটির ওপর। তালি-লাগানো পদেফ্‌কা* কোট-পরা আর একটি লোক টুপিতে চোখ দুটি প্রায় ঢেকে একখানা হাত পকেটে এবং অন্যখানা শার্টের মধ্যে গুঁজে মাথা হেঁট ক'রে

*এক ধরণের খাটো কোট যা চাষীরা প'রে থাকে।

দাঁড়িয়ে যেন ঝিমোচ্ছে। পী-জ্যাকেট এবং উঁচু বুট-পরা কালোমতো বেঁটে-সেটে একটি লোককে দেখে মনে হ'লো সে যেন কোনো কারণে বিশেষ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তাকে দেখতে প্রায় গুবরেপোকার মতো। লোকটা তার সরুপানা ছোট্টো বিবর্ণ মুখখানা আকাশের দিকে তুলে মাঝে মাঝে শিস্ দিচ্ছে, আর ভ্রূ কুঁচকে গোঁফজোড়া চাটবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে কথা ব'লছে সকলের চেয়ে বেশি।

একপাশে মাথাটা হেলিয়ে সে ব'ললো : "এরা কি মনে ক'রেছে ? দরজা খুলবে না না-কি ?"

"কে জানে, কিন্তু দেরি হ'চ্ছে ভীষণ ! হ্যাঁ ভায়া, লাইব্রেরিতে গিয়েছিলে না-কি ?"

লম্বা চুলওয়ালা লোকটি নীরস গলায় জবাব দিলো : "না, এতো সকালে গিয়ে কি ক'রবো ?"

"বাপ্‌স্, এদিকে যে শীতে কালিয়ে গেলাম !"

লম্বা চুলওয়ালা লোকটি ঘোঁত ঘোঁত শব্দ ক'রে বোধ হয় একটু সহানুভূতি জানালো, তারপর ব'ললো চিন্তিতভাবে :

"কিন্তু কোর্ট বা লাইব্রেরি না থাকলে ঠাণ্ডার হাত থেকে আমরা বাঁচতাম কি ক'রে ?"

কালোমতো লোকটি কোনো কথা না ব'লে তার কাঁধদুখানা একটু নেড়েচেড়ে নিলো। এই লোকগুলোর দিকে চেয়ে, এদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ইলিয়ার ধারণা হ'লো এরা হয় পকেটমার আর নয়তো এমন সব বদমাশ যারা লোক ঠকিয়ে, বিশেষ ক'রে চাষীদের ঠকিয়ে দিন গুজরান করে, কিংবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি দেখিয়ে সাহায্য ভিক্ষা চায়। আগে এই শ্রেণীর লোকগুলোকে ভয় ক'রতো ইলিয়া, কিন্তু এখন এদের দেখলে তার মনে কেবল কৌতূহলই জাগে। ইলিয়া ভাবলো : "এরা যে কেন বেঁচে আছে বুঝি না।"

এমন সময় কোথা থেকে একজোড়া পায়রা উড়ে এসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো রাস্তার ওপর। ভুঁড়িওলা মোটা পায়রাটাকে তার সঙ্গিনীর চারিধারে হেলেদুলে বক্‌বকম্ ক'রতে দেখে কালোমতো লোকটি শিস্ দিয়ে উঠতেই পদেফ্‌কা কোট-পরা লোকটি চ'মকে উঠে মাথা তুললো। দেখা গেলো তার

মুখখানা ফুলে নীল হ'য়ে গেছে, চোখের তারাদুটোও কেমন যেন নিষ্প্রভ—ঘষা কাচের মতো।

পায়রাদুটো উড়ে যেতেই কালোমতো লোকটি সেইদিকে চেয়ে বললো: "পায়রা দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। পয়সাওলা ব্যবসাদারগুলোর মতোই ব্যাটারা ভুঁড়ি দোলায় আর বক্‌বকম্ করে।—গা জ্ব'লে যায় আমার!"

তারপর সে হঠাৎ ইলিয়াকে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলো:

"তোমার কোনো মকদ্দমা আছে না কি হে?"

"না।"

"আসামী-টাসামী নও তো?"

"না।"

ইলিয়ার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে লোকটি নাকিসুরে ব'ললো:

"ভারি অদ্ভুত তো!"

মুচকি হেসে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"কি অদ্ভুত?"

হেঁড়ে গলায় লোকটি জবাব দিলো: "তোমাকে দেখে কিন্তু আসামী-আসামী লাগছে।"

কথাটা খচ্ ক'রে বিঁধলো ইলিয়ার বুকে, কিন্তু জবাব দেবার কোনো সুযোগই পেলো না সে, কারণ ঠিক সেই সময় কে যেন ব'লে উঠলো:

"খুলছে রে, খুলছে!"

আর সংগে সংগে কালোমতো লোকটি খোলা দরজা দিয়ে তীরবেগে ভিতরে ঢুকে গেলো। ইলিয়াও ঢুকতে গেলো তার পিছনে পিছনে, কিন্তু দরজার মুখে লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে গুঁতো মেরে আগে যাবার চেষ্টা ক'রতেই সে ইলিয়াকে পাল্‌টা গুঁতো মেরে ব'ললো:

"একটু আস্তে দাদা, অতো তাড়া কিসের?"

এই ব'লে সে ইলিয়ার আগে ভিতরে ঢুকে প'ড়লো।

গুঁতো খেয়ে রাগ না ক'রে ইলিয়া অবাক হ'লো কিছুটা। ভাবলো:

"আজব কাণ্ড! রাস্তার যে পকেটমার সেও চায় কিনা লাটসাহেবের মতো আগে আগে যেতে!"

বিচার-ঘরখানি অন্ধকার থমথমে। সবুজ কাপড়ে-ঢাকা লম্বা টেবিল থেকে শুরু ক'রে উঁচু উঁচু হাতলদার চেয়ার, সোনালী ফ্রেমে-বাঁধানো বিরাট বিরাট প্রতিকৃতি, জুরীর সদস্যদের বসবার বড়োবড়ো লাল রঙের চেয়ার, রেলিঙের পিছনে কাঠের প্রকাণ্ড বেঞ্চিটা সবকিছুই এতো ভারি যে দেখলে মনও সম্ভ্রমে ভারি হ'য়ে উঠে। ঘরের দেয়ালগুলোর রং পাঁশুটে, জানলাগুলি খাঁজ কেটে বসানো, তাতে মোটা মোটা ক্যাম্বিশের পর্দা, শার্শিগুলো ঝাপ্‌সা।

একটু পরেই ভিতরের ভারি দরজাগুলো নিঃশব্দে খুলে গেলো এবং কয়েকজন উর্দিপরা লোক তেমনি নিঃশব্দে ব্যস্তবাগীশের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘরময়। বিরাট ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলোতেই ইলিয়ার মনে হ'লো প্রত্যেকটি বস্তু যেন শাসাচ্ছেঃ "খবরদার, টুঁ শব্দটি ক'রো না। ক'রলেই—।" ভয়ে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ইলিয়া অভিভূত না হ'যে পারে না। এমন সময় বিচারকমণ্ডলীর আগমন-সংবাদ ঘোষিত হ'লো। শুনেই চ'মকে উঠলো ইলিয়া এবং এক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ানোই যে রীতি তা তার জানা না থাকলেও সকলের আগে লাফিয়ে উঠলো আসন ছেড়ে। যে চারজন লোক বিচার-ঘরে প্রবেশ ক'রলেন তাঁদের একজন হ'লেন গ্রমফ্, যাঁর বাসা ইলিয়ার দোকানের ঠিক সামনেই। এসেই মাঝখানের হাতলদার চেয়ারটিতে ব'সে তিনি একবার তাঁর চুলে হাত বুলিয়ে নিলেন, তারপর শার্টের স্বর্ণখচিত কলারটা নেড়েচেড়ে একটু ঢিলে ক'রে নিয়ে আরাম ক'রে ব'সলেন চেয়ারে হেলান দিয়ে। গ্রমফের মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া আশ্বস্ত হ'লো কিছুটা, কারণ আগের মতো তাঁর গালদুখানা আজও লাল টকটকে, উপরন্তু মুখের খোসমেজাজী ভাবটুকুও বজায় র'য়েছে পুরোমাত্রায়। কেবল তফাতের মধ্যে এইঃ তাঁর গোঁফের প্রান্তদুটি আজ ছুঁচলো হ'য়ে বেশ খানিকটা উর্ধ্বমুখী হ'য়েছে। গ্রমফের ডানদিকে ব'সেছেন একজন খর্বকায় সুদর্শন বৃদ্ধ, মুখে তাঁর ছোটো পাকা দাড়ি, নাকটি চাপা, চোখে চশমা। আর, বাঁদিকে ব'সেছেন লালচে দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক, মাথায় তাঁর চকচকে টাক, দাড়িটা আবার দ্বিধা বিভক্ত, মুখের রং হ'লদে, ভাবের লেশমাত্রও নেই তাতে। এছাড়া ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে

আছেন আর একজন তরুণ হাকিম। তাঁর মাথাটি গোল, চুলে কদমছাঁট, চোখের তারাদুটি কালো এবং ড্যাবডেবে। কিছুক্ষণ ধ'রে তাঁরা সকলেই মুখ বুঁজে টেবিলের কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন এবং তাঁদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে ইলিয়া ভাবতে লাগলো হয়তো এখুনি তাঁদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে উঠে জোর গলায় কোনো জরুরী ঘোষণা ক'রে ব'সবেন।

কিন্তু হঠাৎ বাঁদিকে ঘাড় ফেরাতেই ইলিয়ার চক্ষুস্থির হ'য়ে গেলো। দেখলো, প্রথম সারির লাল রঙের চেয়ারগুলোর একখানাতে হেলান দিয়ে ব'সে হাঁড়িমুখো পেত্রুহা ফিলিমনফ্ মুরুব্বীর মতো লোকজনের দিকে দেখছে। পেত্রুহার দৃষ্টিও দু-একবার প'ড়লো ইলিয়ার মুখের ওপর এবং ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো পেত্রুহাকে দেখিয়ে সারা কোর্টকে বলে :

"শুনুন, সকলে শুনুন, এ লোকটা চোর, নিজের ছেলেটাকেও ঠেঙিয়ে মেরেছে!"

রাগে ইলিয়ার বুকখানা পুড়ে যেতে থাকে।

গ্রমফ্ ধীরে ধীরে ব'ললেন: "তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে, তুমি—"

ইলিয়া ফিরেও দেখে না কথাগুলো কাকে বলা হ'চ্ছে। ওর দৃষ্টি তখনো পেত্রুহার মুখের ওপর নিবদ্ধ। পেত্রুহা ফিলিমনফের মতো একটা পয়লা নম্বরের শয়তান যে কি ক'রে জুরীর আসনে ব'সতে পারে তা ইলিয়া কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

কপাল চুলকোতে চুলকোতে অলস গলায় চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসামীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন: "জবাব দাও, তুমি কি দোকানদার আনিসিমফ্‌কে ব'লেছিলে: 'সবুর করো, তোমাকেও দেখে নেবো আমি'?"

বাতাসের ধাক্কায় একটা জানলার কব্জা ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে উঠলো।

জুরীর সদস্যদের মধ্যে ইলিয়া আরও দুজনকে চিনতে পারে। একজন সিলাচেফ্, অপরজন দোদনফ্। সিলাচেফ্ কন্‌ট্র্যাক্‌টারি করে, এক নম্বরের চোয়াড় সে, চাষাড়ে চোয়াড়, দৈত্যের মতো চেহারা তার, ইয়া লম্বা লম্বা হাত, দেহের তুলনায় মুখখানা নেহাতই ক্ষুদ্র, পেত্রুহার বন্ধু সে, দাবাখেলার ইয়ার।

লোকে বলে সিলাচেফ্ একদিন একটা মজুরের সংগে বচসা ক'রে তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো নীচে এবং মজুরটা মারাও গিয়েছিলো সেই কারণে। দোদনফ্ কারবার করে লেস্-ফিতের, প্রকাণ্ড একখানা দোকানও আছে তার। ইলিয়া তার কাছ থেকে মালপত্র কেনে এবং হাড়ে হাড়ে জানে কতো বড়ো নিষ্ঠুর আর কৃপণ ঐ লোকটা। বার দুই দেউলিয়াও হ'য়েছিলো সে এবং তখন টাকা প্রতি দু আনা হিসেবে পাওনাদারদের দেনা মিটিয়েছিলো, এমন ধড়িবাজ!

"সাক্ষী! তুমি কখন আনিসিমফের বাড়ি পুড়তে দেখেছিলে?"

জানলার কব্জাটা আবার ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে উঠলো।

এমন সময় ইলিয়া শুনতে পেলো ওর পাশের লোকটি চাপা গলায় ফিশফিশ ক'রে ব'লছে: "গা—ডোল!"

বক্তা আর কেউ নয়, সেই কালোমতো লোকটি। ঘাড় ফেরাতেই ইলিয়া চিনতে পারলো তাকে। লোকটা ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে, ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকিয়ে আবার ব'ললো: "গাডোল!"

"কে, কে গাডোল?" ফিশফিশিয়ে জিজ্ঞাসা করে ইলিয়া।

"কে আবাব, ঐ আসামীটা! সাক্ষীকে কুপোকাত করবাব এমন একটা সুযোগ পেয়েও হারালো। আরে ছোঃ! আমি হ'লে—ইস্!"

ইলিয়া এইবার তাকালো আসামীর দিকে। লোকটা ঢ্যাঙা, মোটামোটা হাড়গুলো যেন তার চামড়া ফুঁড়ে বেরুচ্ছে, মাথাটা লম্বাটে, দেখলেই বোঝা যায় চাষী। ভয়ার্ত, বেত্রাহত কুকুরের মতো দেখাচ্ছে তাকে। আত্মরক্ষায় অপারগ হ'যে শত্রুবেষ্টিত অসহায় কুকুবের মতোই লোকটা দাঁত দেখাচ্ছে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, আর তার মুখের দিকে চেয়ে রগড় দেখছে পেত্রুহা, সিলাচেফ্, দোদনফ্ এবং অন্য সকলে। ইলিয়ার মনে হ'লো ওরা সবাই যেন মনে মনে ব'লছে:

"ধরা যখন প'ড়েছে, তখন ব্যাটা দোষী না হ'য়ে যাবে কোথায়!"

কালোমতো লোকটি চাপা গলায় ব'ললো: "দূর্, ভালো লাগছে না। এও কি একটা মামলা! একেবারে নিরেস! আসামীটা যেমন বুদ্ধু, মোক্তারটাও তেমনি হাঁদা, আর সাক্ষীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম,

ওগুলো তো চিরকেলে গাধা। আমি হ'লে অমন সাক্ষীকে কবে পকেটে পুরে ফেলতাম।"

ফিশফিশ ক'রে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়া :

"লোকটা কি দোষী ?"

"হয়তো না। তবে দোষী সাব্যস্ত হবে ঠিকই। আত্মরক্ষাটুকু পর্যন্ত ক'রতে জানে না এমন আহাম্মক। চাষাদের দস্তুরই এই। একেবারে অপদার্থ! দেহে রক্ত-মাংস আছে বটে, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি ব'লে কোনো বস্তু নেই।"

"তা ঠিক।"

তারপর লোকটি হঠাৎ ব'লে ব'সলো : "তোমার কাছে আনা চারেক পয়সা হবে ?"

"তা হবে।"

"দাও তো।"

দেওয়া উচিত কি না ভেবে ঠিক করবার আগেই ইলিয়া ব্যাগ থেকে একটা সিকি বার ক'রে লোকটার হাতে দিলো এবং দেবার পর তার দিকে আড়চোখে চেয়ে মনে মনে ব'ললো :

"সাবাস্, এই তো চাই! বাঁচতে হ'লে এই ভাবেই বাঁচা উচিত—স্রেফ অপরের ঘাড় ভেঙে!"

সে যেন নিজের অজান্তেই লোকটাকে মনে মনে একটু শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেললো।

চোখের ইশারায় আসামীকে দেখিয়ে কালোমতো লোকটি আবার চাপা গলায় ব'ললো : "লোকটা গবেট, সত্যি গবেট!"

এমন সময় নাজিরের কণ্ঠ শোনা গেলো : "আপনারা চুপ করুন।"

এইবার উঠে দাঁড়ালেন পাব্লিক্ প্রসিকিউটর্। জুরীর সদস্যদের সম্বোধন ক'রে বেশ মোলায়েম গলায় টিপে টিপে ব'ললেন তিনি : "আপনারা আসামীর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। ও যে অপরাধী তা ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ব'লতে কি, সাক্ষী-সাবুদের চেয়েও ওর অপরাধের বড়ো প্রমাণ হ'লো ওর ঐ মুখ। যাই হোক্, একে একে সমস্ত সাক্ষীরই এজাহার শুনলেন আপনারা, এখন বলুন আসামী অপরাধী কি না। অবশ্য এ বিষয়ে আর কোনো

সন্দেহই থাকতে পারে না—মানে, থাকা উচিতও নয়—এবং সেইজন্য আমরা নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি, কাঠগড়ার ঐ দণ্ডায়মান আসামীটি সমাজের শত্রু, শৃংখলার শত্রু এবং আইনের শত্রু।”

সমাজ, শৃংখলা ও আইনের শত্রুটি কোন্ ফাঁকে ব'সে প'ড়েছিলো। এখন পাব্লিক্ প্রসিকিউটরের মুখে 'দণ্ডায়মান' শব্দটি শুনে মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তার হাত দুখানা ঝুলে প'ড়লো দু পাশে, দীর্ঘ দেহটা ঝুঁকে প'ড়লো সামনে। দেখে মনে হ'লো, ন্যায়ধর্মের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দেবার জন্যে সে যেন প্রস্তুত!

ইলিয়া লুনেফ্‌ও মাথা নীচু ক'রলো। কতকগুলো বিশ্রী অস্বস্তিকর চিন্তা ভিড় ক'রে এলো ওর মাথায়। ও কেবলই পেত্রুহার থলথলে লাল মুখখানার দিকে তাকাতে লাগলো, তারপর গ্রমফ্ "অধিবেশনের সাময়িক বিরাম" ঘোষণা ক'রতেই কালোমতো লোকটির সংগে বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। কোটের পকেট থেকে একটা তোবড়ানো সিগারেট বার ক'রে সেটাকে সোজা ক'রতে ক'রতে ইলিয়ার সঙ্গী ব'ললো:

"আজব লোক বটে! শপথ ক'রে ব'ললো কি না: 'আমি বাড়িতে আগুন লাগাইনি'। কিন্তু এখানে শপথ-টপথের কোনো দাম নেই, এখানে শুধু চাবুকের জন্যে পিঠটা পেতে দিতে হবে, বাস্—হা হা! এ কি কম গুরুতর মামলা! একটা ব্যবসাদারের গায়ে আঁচড় লেগেছে, সুতরাং তুমি দোষী কি আমি দোষী সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হ'লো, এর জন্যে কাউকে না কাউকে শাস্তি দিতেই হবে—আর, যে ধরা প'ড়বে, শাস্তি পেতে হবে তাকেই!"

চিন্তিতভাবে ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো: "তোমার কি মনে হয় লোকটা দোষী?"

সিগারেটটা ধরিয়ে তাতে দু একটা হেঁচকা টান মেরে ব'ললো লোকটি:

"আমার ধারণা ও দোষী। তার কারণ ও বোকা। চালাক লোকেরা কখনো দোষী হ'তে পারে না।"

এতোক্ষণ পরে ইলিয়া লোকটাকে ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পেলো। ইঁদুরের চোখের মতো তার চোখ, ইঁদুরের দাঁতের মতো তার দাঁত।

কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে, শেষটায় চাপা গলায় ইলিয়া ব'ললো :

"জুরীর সদস্যদের মধ্যে অনেকেই—"

"ব্যবসাদার। হ্যাঁ, বেশির ভাগই ব্যবসাদাব।" ইলিয়াকে কথাটা শেষ ক'রতে না দিয়েই লোকটি ব'লে উঠলো।

তার দিকে আড়চোখে চেয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"ব্যবসাদাবই বটে! ওদেব কয়েকজনকে আমি চিনি।"

"তাই না কি?"

"খাসা ভদ্দবলোক সব! বুঝতেই পাবছো কি ব'লছি!"

"তা আব বুঝবো না? খাসা ব'লে খাসা, এক একটা আবার ঝানু চোরও।"

এই ব'লে সিগাবেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে, কাঁধ দুখানা নেড়েচেড়ে, বেপরোয়া ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো লোকটি :

"তবে অবাক হবাব কিছু নেই, এ-বকম ব্যাপাব ঘটে মাঝে মাঝে। বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই বিচাব একটা প্রহসন মাত্র। গরীব বড়োলোক এই নিয়েই তো দুনিয়া। যে বড়োলোক সে গবীবেব কোনো অপবাধই বরদাস্ত করে না, বাগে পেলেই তাব টুঁটি টিপে ধরে, এইটাই হ'লো বেওয়াজ। খিদের চোটে মানুষ অনেক কিছুই ক'বে থাকে, কিন্তু বড়োলোক তা সইবে কেন? আমি প্রায়ই নানান মামলায় এজাহাব দিয়ে থাকি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো গরীবকে বড়োলোকের বিচার ক'রতে দেখলাম না। আর, বড়োলোক যদি বড়োলোকের বিচার কবে তাহ'লে জানবে যে সে লোভেব বশবর্তী হ'য়েই ক'রছে। ভাবখানা এই : 'তুই সব নিবি কেন? আমাকেও কিছু দে'।"

ইলিয়া ব'ললো : "লোকে বলে বড়োলোক গরীবকে বোঝে না।"

সংগে সংগে জবাব দিলো ইলিযার সঙ্গীটি :

"বাজে কথা! বোঝে ঠিকই, তাই সে অতো কঠোর।"

ইলিয়া আস্তে আস্তে ব'ললো : "অবশ্য কেউ যদি বড়োলোক হ'য়েও সৎ হয় তাহ'লে নেহাত মন্দ হয় না। কিন্তু যে-বড়োলোক শয়তান সে কি ক'রে অন্যের বিচার ক'রবে?"

কালোমতো লোকটি শান্ত স্বরে ব'ললো :

"যে যতো বড়ো শয়তান সে ততো কঠোর বিচারক। সে-কথা যাক্, চলো চুরির মামলাটা শুনে আসি। এ-মামলার আসামী তো একটা মেয়ে, তাই না ?"

চাপা গলায় ইলিয়া ব'ললো : "মেয়েটি আমার চেনা।"

"তাই না কি ? চলো, তাহ'লে তোমার চেনা মেয়েটিকেই একবার দেখে আসা যাক্।" এই ব'লে ইলিয়ার মুখখানা একবার চট্ ক'রে দেখে নিয়েই লোকটি বিচার-ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

তাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিলো ইলিয়ার, কিন্তু হঠাৎ সব কেমন যেন গুলিয়ে গেলো। বিশেষ ক'রে লোকটার চেহারা এবং কথা-বার্তা এমন বেখাপ্পা যে তাকে প্রশ্ন ক'রতেই ভয় লাগে। ইলিয়া ভাবলো : "থাক্, ওকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই।" তবে পেত্রুহার মুখখানা মনে প'ড়তেই ও তার উদ্দেশে মনে মনে ব'ললো : "ওর মতো একটা ডাকসাইটে হারামজাদা কি না মানুষের বিচার ক'রতে ব'সেছে !" ইলিয়া এখনো পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রহসনটাকে কিছুতেই হজম ক'রতে পারছে না। ক্ষোভে যন্ত্রণায় জ্ব'লে যাচ্ছে ওর অন্তর।

দরজার দিকে এগোতেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ পল্‌কে দেখে ইলিয়া খুশি হ'লো। পলের কোটের আস্তিনে একটু টান দিতেই পল্ ঘুরে দাঁড়ালো এবং ইলিয়াকে মুচকি হাসতে দেখে সেও অতি কষ্টে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রলো।

"গুড্ মর্ণিং !"

"গুড্ মর্ণিং !"

তারপর দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দুজনার মুখের দিকে চেয়ে।

তিক্ত হাসি হেসে পল্ জিজ্ঞাসা ক'রলো : "তারপর, কি মনে ক'রে ? দেখতে এসেছো বুঝি ?"

ইলিয়া ভাবলো বলে : "দেখতে এসেছি মানে ? কি আবার দেখতে এসেছি ?"

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা ক'রলো—খানিকটা বিব্রতভাবেই :

"সে এসেছে না কি ?"

"কে ?"

"কেন, তোমার সোফিয়া নিকলা—"

ইলিয়ার কথায় বাধা দিয়ে পল্ নীরস গলায় জবাব দিলো :

"সোফিয়া আমার নয়।"

দুই বন্ধু চুপচাপ বিচার-ঘরে প্রবেশ করে।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"এক সংগেই ব'সবো তো আমরা ?"

ইতস্তত ক'রে পল্ ব'ললো :

"না, মানে, বন্ধুবান্ধবের সংগে এসেছি কি না, তাই—"

"ও ! আচ্ছা।"

কিন্তু একটু এগিয়েই পল্ আবার উত্তেজিতভাবে ব'ললো : "ইলিয়া, প্রতিবাদী-পক্ষের কৌঁস্থলীর সওয়াল-জবাবগুলো একটু মন দিয়ে শুনো।"

ইলিয়া আস্তে আস্তে ব'ললো : "শুনবো।"

তারপর আরও আস্তে ব'ললো : "আচ্ছা ভাই, চলি।"

"এসো। আবার দেখা হবে।"

এই ব'লে পল্ গ্রাৎচফ্ হনহন ক'রে নিজের জায়গার দিকে চ'লে যেতেই ইলিয়ার মনে হ'লো সে যেন ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে গেলো। পলের ওপর ওর হিংসা হ'লো প্রচণ্ড। গায়ে তার নতুন ভালো কোট উঠেছে, তাছাড়া এই ক'মাসে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হ'য়েছে যথেষ্ট। ইলিয়া দেখলো পল্ গাভ্রিকের দিদির ঠিক পাশটিতেই ব'সে আছে। সোফিয়াকে সে কি যেন ব'লতেই সোফিয়া তৎক্ষণাৎ ইলিয়ার দিকে ঘাড় ফেরালো, আর সংগে সংগে ইলিয়াও নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে নিলো অন্য দিকে। হঠাৎ যতো রাজ্যের অশান্তি ভিড় ক'রে এলো ওর মনে। রাগে দুঃখে বিহ্বলতায় ওর বুকখানা ক্ষুব্ধ সাগরের মতো তোলপাড় ক'রে উঠলো। সেইসংগে শুরু হ'লো চিন্তার ঝড়। চোখের সামনে কি ঘটছে না ঘটছে তা বোঝবার ক্ষমতাটুকুও যেন লোপ পেতে ব'সলো ওর।

ইতোমধ্যে ভেরাকে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো আসামীর কাঠগড়ায়। ভেরার ধূসর বর্ণের গাউনটা এসে প'ড়েছে গোড়ালি পর্যন্ত, মাথায় জড়ানো র'য়েছে একখানি সাদা রুমাল, এক গুচ্ছ সোনালী চুলে ঢেকে গেছে ওর

কপালের খানিকটা, গাল দুখানা বিবর্ণ, ঠোঁট দুখানি আঁটসাট বন্ধ, কেবল বিস্ফারিত চক্ষুদুটির গম্ভীর দৃষ্টি গ্রমফের মুখের উপর নিবদ্ধ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, হ্যাঁ"—ভেরার এই সংক্ষিপ্ত জবাবগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে এলো ইলিয়ার কাণে।

ভেরার দিকে মোলায়েম দৃষ্টিতে চেয়ে গদগদ-কণ্ঠে ব'ললেন গ্রমফ্: "কাপিতানভা! তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তুমি সেই রাত্রে চুরি ক'রেছিলে।"

তারপর খোসমেজাজী বেবালের মতো ঘডঘডে গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন: "তোমার দোস কি তুমি স্বীকার ক'রছো?"

পলের দিকে তাকিয়ে ইলিয়া দেখলো পল্ মাথা নুইয়ে ব'সে টুপিটা কেবলই মুখের ওপর টানবার চেষ্টা ক'রছে। গাভ্রিকের দিদি কিন্তু ব'সে আছে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে। তার সেই উন্নাসিক উদ্ধত ভাবটুকু এখানেও বজায় র'য়েছে পুরোমাত্রায়। দেখে মনে হ'চ্ছে, আসলে সে-ই যেন সকলের বিচার ক'রতে ব'সেছে—ভেরার, দর্শকদের, এমন কি হাকিমদেরও।

পাতলা ফাটা পেয়ালায় টোকা মারলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি গলায় ভেরা ব'ললো:

"আমি আমার দোষ স্বীকার ক'রছি।"

সংগে সংগে কতকগুলো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে প'ড়লো ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। জুরীর সদস্যরা এমনভাবে মুখ ফেরালো যেন হাসি গোপন করবার চেষ্টা ক'রছে। একটু পরেই ইলিয়া দেখলো পেত্রুহা, দোদনফ্ এবং জুরীর আরও অনেকে ভেরার দেহটাকে দুচোখে গিলছে। বিশেষ ক'রে পেত্রুহার মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের লাল হ'য়ে উঠেছে। ইলিয়ার ইচ্ছা হ'লো উঠে গিয়ে পেত্রুহার থলথলে গালে একটা চড় মেরে বলে:

"হারামজাদা! দেখছিস কি অমন ক'রে? এখানে বিচার ক'রতে এসেছিস, না নষ্টামি ক'রতে এসেছিস্? তোর মরণও হয় না!"

রাগে ইলিয়ার রগদুটো দপ দপ ক'রে ওঠে।

গরমের চোটে ভেড়ার চোখগুলো যেমন ঠেলে বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি

ক'রে চোখদুটো ঠেলে বার ক'রে ঠোঁট চাটতে চাটতে, অলস গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন গ্রমফ্ :

"আচ্ছা কাপিতানভা, কতো দিন ধ'রে তুমি এই—মানে—এই বেশ্যাবৃত্তি ক'রছো ?"

ডানহাতখানা মুখের উপর বুলিয়ে ভেরা দৃঢস্বরে জবাব দিলো :

"অনেক দিন ধ'রে।"

সংগে সংগে ঘরময় একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেলো, আর পল্ মাথাটা আরও নুইয়ে টুপিটা এমনভাবে টেনে নামাতে লাগলো মুখের ওপর, যেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে লুকোতে চাচ্ছে।

"কতো দিন ?"

ভেরা নিরুত্তর। কিন্তু ওর গম্ভীর দৃষ্টি তখনো গ্রমফের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

"এক বছর ? দু বছর ? পাঁচ বছর ? জবাব দাও, ঠিক কতো দিন ?"

ভেরা তবুও নিরুত্তর। ঠিক যেন ধূসর বর্ণের কোনো পাষাণ-প্রতিমা। কেবল মাঝে মাঝে রুমালের প্রান্তটুকু কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর বুকের ওপর।

শেষটায় জুলফি চুলকোতে চুলকোতে গ্রমফ্ ব'ললেন :

"অবশ্য জবাব দেওয়া না দেওয়া তোমার মর্জি।"

গ্রমফের কথা শেষ হবার সংগে সংগে লাফিয়ে উঠলেন রোগামতো একটি ব্যারিষ্টার। মুখে তাঁর ছুঁচলো দাড়ি, চোখদুটি ডিম্বাকার, নাকটি সরু ও লম্বা এবং মাথার পিছনদিকটা চওড়া।

স্পষ্ট খনখনে গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন তিনি :

"আচ্ছা কাপিতানভা, বলো তো কিজন্যে তুমি এই বৃত্তি গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছো ?"

হাকিমদের দিকে চেয়ে ভেরা জবাব দিলো :

"বাধ্য হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

"না, না—তা ঠিক নয়। শোনো—আমি জানি—তুমি আমাকে ব'লেছিলে।"

ভেরা ব'ললো : "আপনি কিছুই জানেন না।"

এই ব'লে ব্যারিষ্টারটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিরক্ত গলায় আবার ব'ললো :

"আমি আপনাকে কিছুই বলিনি। সে-সব আপনারই মনগড়া কথা।"

চট্ ক'রে দর্শকদের দিকে একবার দেখে নিয়ে, প্রতিবাদী-পক্ষের কৌঁসুলীকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে ভেরা জিজ্ঞাসা ক'রলো হাকিমদের :

"ওঁর সংগে আমি কথা ব'লতে চাই না, আপনারা কি তার অনুমতি দেবেন ?"

আবার একটা চাপা গুঞ্জন শোনা গেলো,—তবে এবার আরও জোরে এবং আরও স্পষ্টভাবে।

ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হ'য়ে ইলিয়া তাকালো পলের দিকে। ভেবেছিলো এর পর পলের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা যাবেই। কিন্তু দেখা গেলো পল্ নীরব নিশ্চল হ'য়ে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। আর, ওদিকে গ্রমফ্ মুচকি হাসতে হাসতে রসাল গলায় কি যেন সব ব'লছেন ভেরাকে।

একটু পরে ভেরার দৃঢ়স্বর শোনা গেলো :

"সোজা কথা এই—আমি বড়োলোক হ'তে চেয়েছিলাম, তাই টাকাটা নিয়েছিলাম, বাস্, এর বেশি কিছু নয়। আর, আমার ধরণটাই এই।"

জুরীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ক'রতে শুরু ক'রে দিলো। বেশ বোঝা গেলো তারা যেন কোনো কারণে বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়েছে। হাকিমদের মুখেও একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো।

বিচার-ঘরখানা নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়। রাস্তা দিয়ে তখন সৈনিকরা মার্চ্ ক'রে চ'লেছে। পাথরের ওপর ভারি বুটের শব্দ হ'তে থাকে। সে-শব্দ বিচার-ঘরের মধ্যেও ভেসে আসে।

পাব্লিক্ প্রসিকিউটর্ ব'ললেন :

"আসামী যখন নিজেই নিজের দোষ স্বীকার ক'রেছে তখন—"

শেষটুকু আর শুনতে চায় না ইলিয়া। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার দিকে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

এমন সময় বেশ জোর গলায় নাজির ব'লে উঠলো : "চুপ করুন আপনারা !"

পিছিয়ে এসে পলের মতো মাথা নীচু ক'রে ইলিয়া আবার ব'সে প'ড়লো

নিজের আসনে। পেত্রুহার লাল মুখখানার দিকে ও কিছুতেই চাইতে পারলো না। বারেবার মনে মনে ব'ললো: "ওটা শয়তান, শয়তানের ধাড়ি!" গ্রমফের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলো, তাঁর হাসিখুশির অন্তরালে একটি নিষ্ঠুর প্রাণ লুকিয়ে আছে এবং ছুতোর যেমন র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ চাঁচতে অভ্যস্ত, তেমনি তিনিও মানুষের বিচার ক'রতে অভ্যস্ত। হঠাৎ এক উদ্ভট চিন্তা এসে হাজির হ'লো ইলিয়ার মাথায়:

"আমি যদি আমার দোষ স্বীকার ক'রতাম, তাহ'লে আমারও বিচার হ'তো এইভাবে। পেত্রুহা বিচার ক'রতো, আর আমাকে পাঠাতো সাইবেরিয়ায়। সে নিজে অবশ্য থাকতো এইখানেই। বেটা শয়তান!"

এই চিন্তাটা তাকে এমনভাবে পেয়ে ব'সলো যে অন্য কোনো চিন্তার অবকাশই রইলো না তার।

শোনা গেলো ভেরা কাঁদতে কাঁদতে ব'লছে:

"না, না, এর পর আর কিছু ব'লবেন না, আর আমি শুনতে পারবো না— না, না, এ আমি চাই না, এ আমি চাই না—"

গলাটা চেপে ধ'রে রুমালখানা মাথা থেকে খুলতে খুলতে ভেরা সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। মনে হ'লো কেউ যেন ওকে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রছে।

"দোহাই ভগবানের, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন—"

লাফিয়ে উঠে ইলিয়া সামনের দিকে এগোতে গেলো, কিন্তু নিজের অজান্তেই ভিড়ের ধাক্কায় এসে প'ড়লো একেবারে বাইরের বারান্দায়। শুনতে পেলো কালোমতো লোকটি ব'লছে:

"গোপন ব'লতে আর কিছুই রইলো না মেয়েটার।"

পল্ গ্রাৎচফ্ দাঁড়িয়ে ছিলো দেয়ালের ধারে। মুখখানা তার পাণ্ডুর, চুল উসকোখুসকো, চোয়াল দুটো কাঁপছে। ইলিয়া এগিয়ে গেলো তার দিকে। চারিধারে লোক গিজগিজ ক'রছে, ব'কছেও অনর্গল, তামাকের গন্ধে সেখানকার বাতাসটাও যেন বেশ-একটু ভারি-ভারি।

"এর মানে—জেল! কান্নাকাটি ক'রলে আর হবে কি?"

"আচ্ছা বোকা, নিজের থেকেই কি না দোষ স্বীকার ক'রলো!"

"ব'ললেই তো পারতো টাকা ক'টা ঐ ব্যবসাদারটাই ওকে দিয়েছিলো!"

"আসলে ব্যাপারখানা কি বলুন তো?"

এই ধরণের নানান মন্তব্য মাছির মতো ভনভন ক'রতে লাগলো ইলিয়ার চার পাশে।

পলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে ইলিযা জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"তারপর?"

ইলিয়ার দিকে চেয়ে পল্ ঠোঁট দুখানা ফাঁক ক'রলো বটে, কিন্তু কোনো কথাই ব'ললো না।

ইলিয়া ব'ললো: "শেষপর্যন্ত একজন বন্ধুর সর্বনাশ ক'রে ছাড়লে, কি বলো?"

পল্ এমনভাবে চ'মকে উঠলো যেন কেউ ওর পিঠে এক ঘা চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। তারপর ডানহাতখানা ইলিয়ার কাঁধে রেখে করুণ স্বরে ব'ললো:

"আমি?"

কাঁধের ওপর থেকে পলের হাতখানা ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ইলিয়া ভাবলো বলে:

"হ্যাঁ তুমি! তোমার জন্যেই ও যে চুরি ক'রেছিলো এটা লুকোবার জন্যে তুমি কী না ক'রেছো!"

কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রেখে তার বদলে শুধু ব'ললো:

"পেত্রুহা ফিলিমনফ্ ওর বিচার ক'রলো। এটা কি ঠিক?"

এই ব'লে ইলিয়া একটু মুচকি হাসলো এবং সেই হাসিটুকুই ঠোঁটে নিয়ে রাস্তায় পা দিলো। কিন্তু পা যেন আর চলে না। যতো রাজ্যের ক্লান্তি জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর যেন চেপে ব'সেছে।

ক্লান্ত ক্ষুধার্ত রাস্তার-কুকুরের মতো ইলিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো সন্ধ্যা পর্যন্ত। মনটা খাঁ খাঁ ক'রতে লাগলো শূন্য প্রান্তরের মতো। তারপর এক সময় ওর মনে হ'লো ক্ষুধায় পেট যেন জ্ব'লে যাচ্ছে।

তারপর—

অন্ধকার। পর পর কয়েকটা বাড়ির জানলা দিয়ে হলদে আলো এসে প'ড়েছে রাস্তার ওপর। দু একটা জানলার ঝনকাঠে ফুলের টব থাকায় ছোটো ছোটো নক্‌শা-কাটা ছায়াও প'ড়েছে পথের এখানে-ওখানে। হাঁটতে হাঁটতে থেমে ছায়ার নক্‌শাগুলোর দিকে চেয়ে ইলিয়া গ্রমফের বাড়ির জানলার ফুলগুলোর কথা ভাবে: ভাবে গ্রমফের স্ত্রীর কথা যাকে দেখতে ঠিক রূপকথার রাণীর মতো, আর ঐসংগে ওর মনে প'ড়ে যায় সেই দুঃখের গানগুলো যা শুনলে মানুষ না হেসেই পারে না।

একটা বেরাল গুটিগুটি মেরে রাস্তা পার হ'য়ে যায়।

ইলিয়া আবার হাঁটতে থাকে, তারপর রাস্তার মোড়ে এসে আবার থামে। কোণের দিকের একটা ঝলমলে বাড়ি থেকে গান-বাজনার শব্দ ভেসে আসে। হয়তো সেটা হোটেল।

"নাঃ, এবার একটা হোটেলে না ঢুকলেই নয়," এই ভেবে ইলিয়া রাস্তার ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে।

একটু পরে কে যেন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো: "খবরদার!"

আর সংগে সংগে খানিকটা গরম হাওয়া ওর গালে লাগতেই ইলিয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো কালোমতো একটা ঘোড়ার নাক প্রায় ওর মুখের ওপর এসে প'ড়েছে। ইলিয়া লাফ দিয়ে এক পাশে স'রে যেতেই কোচোয়ানটা তাকে গোটাকতক বাছা বাছা মধুর বাক্য শুনিয়ে "হুই হাঃ, হুই হাঃ" ক'রতে ক'রতে গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লে গেলো।

হোটেলের দিকে না গিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়া ভাবলো: "ঘোড়ার গাড়ি চাপা প'ড়ে কেউ মরে না।"

তারপর একটু এগিয়ে মনে মনে ব'ললো:

"এবার পেটে তো কিছু না দিলেই নয় দেখছি। কিন্তু ভেরাটা এইবার নির্ঘাৎ মারা প'ড়বে।"

ভেরাকে মনে প'ড়তেই ইলিয়া ভাবলো, ভেরার কথা না ভেবে ওর নিজের কথাই ভাবা উচিত এখন। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও ইলিয়া চিন্তার মোড় ফেরাতে পারলো না।

"দেমাকী বটে মেয়েটা! পাশ্কার কথা উচ্চবাচ্যও ক'রলো না একবার! এই মেয়েটাই দেখছি সবচেয়ে ভালো। ওলিমপিয়াদা হ'লে ভেরার মতো কি চুপ ক'রে থাকতে পারতো? তা পারতো, হ্যাঁ, তা পারতো। ওলিম-পিয়াদাও ভালো। কিন্তু যদি তান্কা হ'তো, তাহ'লে?"

এই সময় ওর হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো সেদিন তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্নার জন্মদিন এবং সে ওকে নেমন্তন্নও ক'রেছে। তাতিয়ানার কাছে যাওয়ার কথাটা ভাবতেই প্রথমটায় ওর কেমন ঘেন্না-ঘেন্না ক'রতে লাগলো, কিন্তু একটু পরেই ও ভেবে ঠিক ক'রলো:

"না, যেতেই হবে ওখানে।"

সংগে সংগে আর একটা দুশ্চিন্তা উঁকি মারলো ওর মনের দরজায়!

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইলিয়া এসে হাজির হ'লো আভ্তনমফ্দের বাড়ি এবং একটু পরে খাওয়ার ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই আলোতে ওর চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেলো। দেখলো, টেবিলের চারিধারে কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে আছে। তাদের দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই ও বিষণ্ণভাবে একটু মুচকি হাসলো।

ইলিয়াকে দেখে কিরিক্ চেঁচিয়ে উঠলো: "আরে, এই যে, তুমি!"

তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না ব'ললো: "মুখখানা বেজায় শুকিয়ে গেছে দেখছি!"

"সংগে কিছু মিষ্টি এনেছো তো? জন্মদিনের কোনো উপহার? হায় হায়! আচ্ছা ভুলো-মানুষ তো তুমি!"

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা ক'রলো: "কোথায় ছিলেন বলুন তো?"

তাতিয়ানার মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনে ইলিয়া প্রথমটায় একটু অবাক হ'লো, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলো এর তাৎপর্য। প্রকাশ্যে অর্থাৎ স্বামী কিংবা বাইরের লোকের সামনে 'আপনি' এবং নিভৃতে 'তুমি'। সেই ভালো। "আমিও সাবধান হবো", মনে মনে ব'ললো ইলিয়া।

এদিকে কিরিকের আর তর সইলো না। ইলিয়াকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটি অতিথির সংগে সে তার পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর শুরু হ'লো করমর্দনের পালা। ইলিয়ার মনে হ'লো অতিথিদের সব ক'টা মুখ

একাকার হ'য়ে গিয়ে যেন একটা বিরাট দেঁতো হাসিতে পরিণত হ'য়েছে। এদিকে কাবাবের গন্ধে ইলিয়ার নাকে সুড়সুড়ি লাগে। চেয়ারে ব'সতেই ও বুঝতে পারলো ক্লান্তিতে ওর পা দুখানা যেমন টনটন ক'রছে তেমনি খিদেতেও পেট জ্ব'লছে দাউ দাউ ক'রে! চুপচাপ এক টুকরো রুটি তুলে নিয়ে ইলিয়া খেতে শুরু ক'রে দিলো। তাই দেখে অতিথিদের একজন হো হো ক'রে হেসে উঠতেই তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না ব'ললো ইলিয়াকে:

"একটা অভিনন্দনও জানালেন না আমাকে? এসেই অমনি খেতে ব'সে গেলেন?"

তারপর মাথা নীচু ক'রে চা ছাঁকতে ছাঁকতে টেবিলের তলা দিয়ে ইলিয়ার পায়ে সজোরে একটা ঠেলা মেরে ফিশফিশ ক'রে ব'ললো তাতিয়ানা:

"তুমি যেন কী! এখানে একটু সভ্যভব্য হ'য়ে থাকো বাপু!"

টেবিলের ওপর রুটির টুকরোটা রেখে, হাত দুখানা ঘ'ষে, বেশ চেঁচিয়ে ইলিয়া ব'ললো:

"আজ সারাটা দিন কোর্টে কাটিয়ে এলাম।"

কথাটা শুনেই তাতিয়ানার অতিথিরা বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো ইলিয়ার দিকে। তাদের চাহনির ধরণ দেখে মনে হ'লো তারা যেন তার মুখ থেকে কোনো চমকপ্রদ কাহিনী শোনবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। ইলিয়া বিব্রত হ'যে প'ড়লো। ঘরখানা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ হ'য়ে যেতেই ইলিয়ার মাথায় আবার শুরু হ'লো চিন্তার ঝড়। কিন্তু দেখতে দেখতে চিন্তাগুলো মিলিয়ে গেলো একে একে।

মিষ্টির বাক্সোটা তুলে নিয়ে চিমটে দিয়ে একটা সন্দেশ পাকড়াও করবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ক্যাঁটকেটে গলায় ব'ললো ফেলিৎসাতা এগরফ্না:

"মাঝে মাঝে মামলা-মকদ্দমা বেশ ভালো লাগে।"

তাতিয়ানার গাল দুখানা লাল হ'য়ে উঠতেই কিরিক্ সশব্দে নাক ঝেড়ে ব'ললো ইলিয়াকে:

"কি যেন ব'লছিলে হে একটু আগে, সেটা না হয় শেষ ক'রেই ফেলো না? ও, তাহ'লে কোর্টে বিচার দেখতে গিয়েছিলে আজ?"

ইলিয়া ভাবলো, সে হয়তো তাতিয়ানার অতিথিদের অস্বস্তির কারণ হ'য়ে উঠছে। অবশ্য, সেজন্য এতোটুকুও বিব্রত হ'লো না সে। বরং তার ঠোঁটে একফালি মুচকি হাসিই খেলে গেলো। এদিকে অতিথিরা আবার কথাবার্তা শুরু ক'রলো।

টেলিগ্রাফ আপিসের একটি তরুণ কেরাণী ব'ললো: "আমি একবার একটা খুনের মামলা দেখতে গিয়েছিলাম।"

সংগে সংগে চেঁচিয়ে উঠলো মিসেস ত্রাভ্‌কিন্: "খুনের গল্প প'ড়তে বা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।"

এদিক-উদিক চেয়ে তার স্বামী ব'ললো:

"প্রকাশ্য বিচার অবশ্য খুবই কল্যাণকর।"

"সেই মামলার আসামী ছিলো আমার এক বন্ধু—এউগেনিয়েফ্। একদিন সে সিন্দুক পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় একটা ছোকরার সংগে ঠাট্টা-তামাসা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ তাকে গুলি ক'রে দিলো।"

তাতিয়ানা ভ্লাসিএফ্না গালে আঙুল দিয়ে ব'লে উঠলো:

"ওমা, কি ভয়ানক!"

টেলিগ্রাফ আপিসের কেরাণীটি কিন্তু মোটামুটি খোসমেজাজেই ব'ললো:

"সংগে সংগে ছোকরাটা মারা গেলো।"

খশখশে গলায় ত্রাভ্‌কিন্ ব'ললো:

"আমি একবার এক মামলায় এজাহারও দিয়েছিলাম। তাছাড়া আর একটা এমন মামলা দেখেছিলাম যার আসামী তেইশটা ডাকাতি ক'রেছিলো। নেহাত মন্দ নয়, কি বলেন?"

কিরিক হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

এরপর অতিথিরা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে গেলো। একদল ঘিরে ধ'রলো টেলিগ্রাফ আপিসের তরুণ কেরাণীটিকে, অপর দল ঘিরে ধ'রলো ত্রাভ্‌কিনকে। তারপর শুরু হ'লো খুন-ডাকাতির গল্প শোনা। এদিকে ইলিয়া চেয়ে রইলো তাতিয়ানার দিকে। দেখলো, লাল সিল্কের আঁটসাঁট বডিস প'রে তাতিয়ানা প্রজাপতিটির মতো ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। সে যে বেশ সুখেই আছে এটা বোঝা গেলো তার চকচকে মুখখানি দেখে। চোখের মিহি ইশারায়

তাতিয়ানা ওকে বার দুই ডাকলো, কিন্তু ও গেলো না তার কাছে। বেশ বুঝতে পারলো তাতিয়ানা সেজন্য ক্ষুণ্ণই হ'য়েছে। কিন্তু এতে খুশিই হ'লো সে।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কিরিক্ জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে :

"তুমি অমন প্যাঁচার মতো চুপটি ক'রে ব'সে আছো কেন হে? কিছু বলো। এখানে আর কুটুম্বিতে ক'রো না। এঁরা সকলেই ভালো ঘরের সন্তান, সুতরাং ভয় নেই, কথায় কথায় কেউ তোমার খুঁত ধ'রবে না।"

সংগে সংগে ইলিয়া বেশ চেঁচিয়েই আরম্ভ ক'রলো :

"আজ একটা মেয়ের বিচার দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়েটি আমার চেনা। বেশ্যা বটে, তবে মানুষ ভালো।"

সংগে সংগে অতিথিরা আবার ইলিয়ার দিকে ঝুঁকে প'ড়লো। একটা চাপা হাসির শব্দও শোনা গেলো আশেপাশে। ঝন্‌ঝন্ ক'রে তাতিয়ানার হাত থেকে কাঁটাচামচগুলো প'ড়ে যেতেই ইলিয়া বুঝতে পারলো এটা যুদ্ধের সংকেত। চোখদুটো বড়ো বড়ো ক'রে সকলের মুখের দিকে চেয়ে ইলিয়া ব'ললো :

"আপনারা হাসছেন কেন? সত্যি ব'লছি, ওদের মধ্যেও খুব ভালো মেয়ে আছে।"

বাধা দিয়ে কিরিক্ ব'ললো : "তা হ'তে পারে, তবে এ নিয়ে বেশি বকবক ক'রো না।"

ইলিয়া ব'ললো : "আপনারা তো সকলেই ভালো ঘরের সন্তান, সুতরাং বেফাঁস যদি কিছু বলেও ফেলি, আশা করি কেউ কিছু মনে ক'রবেন না।"

এই ব'লে সে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসলো।

"মেয়েটা এক ব্যবসাদারের টাকা চুরি ক'রেছিলো।"

হতাশ হ'য়ে কিরিক্ চেঁচিয়ে ব'ললো :

"এই দেখো, কোথাকার জল কোথায় নামছে!"

"বুঝতেই পারছেন কখন এবং কিভাবে সে ঐ টাকা চুরি ক'রেছিলো, তবে এমনও হ'তে পারে টাকাটা হয়তো সে চুরিই করে নি, বরং উপহার হিসেবে পেয়েছিলো ঐ ব্যবসাদারটার কাছ থেকে।"

কিরিক্ তাতিয়ানাকে ডেকে ব'ললো :

"তানিচ্‌কা, এখানে এসো। ইলিয়া আমাদের মজার মজার গল্প শোনাচ্ছে।"

কিন্তু তাতিয়ানা তার আগেই ইলিয়ার পাশটিতে এসে হাজির হ'য়েছে। সাবধানে একটু হেসে, কাঁধদুখানা নেড়েচেড়ে ব'ললো সে :

"এতে অবাক হবার কি আছে শুনি? এমন ব্যাপার তো হরদমই ঘ'টছে। এ-ধরণের গল্প কি তুমিও জানো না? অনেক জানো। ভাগ্যিস্ এখানে কোনো অবিবাহিতা তরুণী নেই! কিন্তু—থাক্, এসব কথা পরে হবে। এখন আপনারা চলুন, দয়া ক'রে কিছু মুখে দিন।"

কিরিক্ চেঁচিয়ে ব'ললো : "যান, আপনারা দয়া ক'রে পাশের ঘরে যান।" তারপর একটু রসিকতা করবার জন্যে হেসে আবার ব'ললো : "আমিও যাচ্ছি, আমারও তো খিদে পেয়েছে—হি হি হি!"

ইলিয়া বেশ বুঝতে পারলো আভ্‌তনমফ্‌দের ইচ্ছা নয় ব'লে অতিথিরাও ওর কথায় কান দিতে নারাজ। এতে সে আরও চ'টে গেলো এবং দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে সম্বোধন ক'রে ব'ললো :

"আর তারপর, যারা এই মেয়েটির বিচার ক'রলো তারা খুবসম্ভব নিজেরাই ওকে বহুবার ভোগ ক'রেছে। তাদের কয়েকজনকে আমি চিনি। শয়তান ব'ললেও তাদের খুব কম বলা হয়।"

আঙুল উঁচিয়ে কঠোরস্বরে ত্রাভ্‌কিন্ ব'ললো :

"এভাবে আপনার কথা বলা উচিত নয়। ওঁরা হ'লেন জুরীর সদস্য এবং আমি নিজেও—"

ইলিয়া চেঁচিয়ে ব'ললো : "ঠিক ব'লেছেন—জুরী—হ্যাঁ, জুরীই বটে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কি সুবিচার আশা করা যায়, যারা—"

"এখানেও আমার একটি কথা বলবার আছে। সকলের ভালোর জন্যেই সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জুরী-প্রথার প্রবর্তন ক'রেছিলেন। এ একটা মহৎ কীর্তি। কোন্ সাহসে সরকার-বাহাদুরের একটি প্রতিষ্ঠানকে আপনি এইভাবে গালমন্দ করেন?"

রাগের চোটে ত্রাভ্‌কিনের ফুলো ফুলো গাল দুখানা কাঁপতে লাগলো।

ফেলিৎসাতা এগরফ্‌না তাতিয়ানার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাতেই তাতিয়ানার মুখখানা এক নিমেষে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। মিনতির স্বরে সে ব'ললো অতিথিদের :

"আপনাদের হাতে ধ'রে ব'লছি আপনারা এসব তর্ক ছেড়ে দিন। সত্যি এসব ভালো লাগে না। কিরিক্, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো ওঁদের।"

বিব্রতভাবে চোখ পিটপিট ক'রতে ক'রতে কিরিক্ ব'ললো :

"দয়া ক'রে একটু চুপ করুন। চুলোয় যাক ওসব কীর্তি আর দর্শনের কচকচি।"

হাঁপাতে হাঁপাতে ত্রাভ্‌কিন্ জবাব দিলো :

"দর্শনেব কথা নয়, এটা হ'লো রাজনীতির কথা। আর, যারা ঐভাবে কথাবার্তা বলে তাদের বলা হয় মূর্খ!"

ব্যাপারটা মন্দ লাগছে না ইলিয়ার। ত্রাভ্‌কিনের অগ্নিমূর্তি দেখে ও মনে মনে হাসে। বিশেষ ক'রে অতিথিদের সামনে আভ্‌তনমফ্‌দের মাথা হেঁট হ'য়ে যাওয়ায় ও খুবই খুশি হয়। মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখবার লোভটা যেন পেয়ে বসে ওকে। মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে ইলিয়া ব'ললো :

"আপনি শিক্ষিত মানুষ, আমাকে যা খুশি ব'লতে পারেন, কিন্তু আমি আমার কথা ফিরিয়ে নেবো না। আগে যা ব'লেছি এখনো তাই ব'লবো। যার পেট ভর্তি সে কি ক্ষুধার্তকে বোঝে? ক্ষুধার্ত লোক চোর হ'তে পারে, কিন্তু যার পেট ভর্তি সেও চোর!"

রাগে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ত্রাভ্‌কিন্ ব'ললো :

"কিরিক্ নিকদিমিচ্! আমি—মানে—এসব কি? এ যে—"

ঠিক সেই মুহূর্তে তাতিয়ানা তার একখানি কোমল বাহু ত্রাভ্‌কিনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। ত্রাভ্‌কিন্ তা গ্রহণ ক'রতেই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাতিয়ানা ব'লতে লাগলো :

"যে স্যাণ্ডুইচ খেতে আপনি ভালোবাসেন সেই স্যাণ্ডুইচই বানিয়েছি—মাছের সংগে সেদ্ধ ডিমের ফালি মিশিয়ে, তার সংগে টাটকা মাখনে-ডোবানো কচি পেঁয়াজকুচি দিয়ে—"

"ন্-হ্যাঁ! আমি জানি!"

ক্রুদ্ধ ত্রাভ্‌কিন বার কয়েক জিভে টাক্‌না দিলো সশব্দে।

ইলিয়ার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে স্বামীর আর একখানা হাত নিজের বাহুলগ্ন ক'রে মিসেস্‌ ত্রাভ্‌কিন্‌ ব'ললো :

"সামান্য ব্যাপারে উত্তেজিত হ'য়ো না, আস্তন্‌।"

এদিকে ত্রাভ্‌কিন্‌কে শান্ত করার জন্যে তাতিয়ানা তখনো ব'লছে : "ভাজা মাছের সংগে টোমাটো দিয়ে—"

যেতে যেতে হঠাৎ থেমে, ইলিয়ার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অনুকম্পা-মিশ্রিত তিরস্কারের সুরে ব'ললো ত্রাভ্‌কিন্‌ :

"এসব ভালো নয়, ইয়ংম্যান! বুঝেসুঝে কথা ব'লবে। আগে বুঝবে তারপর অন্য কথা।—হ্যাঁ!"

ইলিয়া ব'ললো : "বুঝি না ব'লেই তো আমি মনের কথা খুলে বলি। কোন্‌ অধিকারে পেত্রুহা ফিলিমনফ্‌ মানুষের বিচাব ক'রতে বসে?"

ইলিয়ার দিকে ফিরেও না চেয়ে, অতি সাবধানে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে অতিথিরা পাস কাটিয়ে চ'লে যেতেই কিরিক্‌ তার সামনে এগিয়ে গিয়ে রুক্ষ গলায় ব'ললো :

"কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার, তুমি একটি গাড়োল, নিরেট গাড়োল!"

ইলিয়া চ'মকে উঠলো। চোখের সামনে এমনভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো যেন হঠাৎ ওর মাথায় কেউ এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে কিরিকের দিকে এক পা এগিয়ে যেতেই কিরিক্‌ তার দিকে না চেয়ে টেবিলের যেখানে খাবারের ডিশগুলো সাজানো ছিলো সেইদিকে চ'লে গেলো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইলিয়া দেখতে লাগলো অতিথিদের দাঁতের কসরত। মনে মনে ব'ললো : "খাচ্ছে না তো, যেন ঘাস চিবোচ্ছে!" সংগে সংগে ওর দৃষ্টি প'ড়লো তাতিয়ানার ওপর এবং তৎক্ষণাৎ ওর রগদুটো ফুলে উঠলো। শুনতে পেলো খেতে খেতে ত্রাভ্‌কিন্‌ ব'লছে : "বাঃ, বাঃ, চপটা বেশ হ'য়েছে, স্যাণ্ডুইচও হ'য়েছে খাসা।"

তাতিয়ানা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলো : "একটু গোলমরিচ দেবো?"

"দাঁড়াও, দেওয়াচ্ছি তোমায় গোলমরিচ" এই ব'লে সোজা টেবিলের

সামনে গিয়ে লাল রঙের মদ-ভর্তি একটা গেলাস তুলে নিয়ে ইলিয়া তাতিয়ানাকে ডেকে ব'ললো :

"এসো তানুকা, ঠোঁট দুখানা একটু ভিজিয়ে নিই !"

এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। চমকে উঠে খাওয়া বন্ধ ক'রে অতিথিরা ভয়ে বিস্ময়ে তাকালো ইলিয়ার দিকে।

"তাতে কি হ'য়েছে, এসো একটু মদ খাওয়া যাক্ ! কিরিক্ নিকদিমিচ্, আমার মিস্ট্রেস্‌কে একটু বলুন না আমার সংগে মদ খেতে ! সত্যিই তো, চক্ষুলজ্জা কেন ? এতে কিই বা যায় আসে ? নোংরামিগুলোই বা লুকিয়ে রেখে লাভ কি ? সবাই দেখুক, সবাই শুনুক ! আমার তো তাই ইচ্ছে।"

"শয়তান !" এই ব'লে তাতিয়ানা একখানা ডিশ্ ছুঁড়ে মারলো ইলিয়ার মুখ তাক্ ক'রে। ডিশখানা দেয়ালে লেগে গুঁড়ো হ'য়ে যেতেই অতিথিরা আরও ভড়কে গেলো এবং কিরিক্ ও ইলিয়াকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক পাশে স'রে দাঁড়ালো। কিরিকের অবস্থা তখন দেখবার মতো !

একটা ছোট্টো ভাজা মাছের ল্যাজ ধ'রে ইলিয়ার দিকে চেয়ে নেহাতই অসহায়ের মতো সে চোখ পিটপিট ক'রতে লাগলো।

এদিকে তাতিয়ানা তখন কাঁপছে ঠকঠক ক'রে, মুখখানা তার লাল হ'য়ে গেছে একেবারে। ইলিয়ার দিকে গলাটা বাড়িয়ে চিলের মতো চীৎকার ক'রে ব'ললো তাতিয়ানা :

"আপনি মিছে কথা ব'লছেন ··মি-মিছে কথা ব'লছেন আপনি !"

শান্ত নির্বিকার গলায় ব'ললো ইলিয়া :

"তুমি কি চাও ন্যাংটো হ'লে তোমাকে কেমন দেখায় তাও আমি বলি এঁদের সকলকে ? তুমি নিজেই তোমার দেহের প্রত্যেকটি তিল আমাকে দেখিয়েছিলে। ব'ললে আর কেউ না বুঝুক তোমার স্বামী নিশ্চয় বুঝবেন আমি ঠিক ঠিক ব'লছি কি না।"

কে যেন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হেসে উঠলো। সেই সংগে দু একটা বিস্ময়সূচক শব্দও শোনা গেলো ঘরের কোণ থেকে। গলাটা চেপে ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে তাতিয়ানা ঝুপ ক'রে ব'সে প'ড়লো একখানা চেয়ারে।

টেলিগ্রাফ আপিসের কেরাণীটি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো :

"পুলিশে খবর দিন!"

সংগে সংগে ষাঁড়ের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে কিরিক ইলিয়ার দিকে এগিয়ে গেলো। কিরিকের মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ইলিয়া কঠোর স্বরে ব'ললো:

"ক'রছেন কি? মোটা মানুষ আপনি, একটা ঘুষি খেলেই চোখে অন্ধকার দেখবেন। যান, সরে যান। কিন্তু আপনারা সকলে শুনুন, যদি সত্য কথা শুনতে চান তো আমার কাছ থেকে শুনুন। আমি......"

কিরিক আবার তেড়ে গেলো ইলিয়ার দিকে। অতিথিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেলেংকারিটা দেখতে লাগলো। ত্রাভ্‌কিন্‌ পা টিপে টিপে ঘরের এক কোণে গিয়ে একখানা টুলের ওপর জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সলো।

কিরিকের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে ইলিয়া রুক্ষ গলায় ব'ললো:

"সাবধান, এগোবেন না, নইলে মুখ ফাটিয়ে দেবো। আপনার সংগে আমার কোনো ঝগড়া নেই, তাই কোনো ক্ষতিও ক'রতে চাই না আপনার। গোবেচারা বোকাসোকা মানুষ আপনি, কোনোদিন কোনো ক্ষতিও করেন নি আমার, তাই ব'লছি আর এক পাও সামনে এগোবেন না—সাবধান!"

তারপর কিরিক্‌কে আবার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দেয়ালে মাথা রেখে ব'লতে লাগলো ইলিয়া:

"আপনাব স্ত্রীই তো প্রথমে আমার পেছনে লাগলো। সেয়ানা বটে! ওর চেয়ে খারাপ মেয়েমানুষ পৃথিবীতে নেই! কিন্তু আপনারা সকলেই এক গোয়ালের গরু। আজ কোর্টে গিয়ে শিখে এসেছি কেমন ক'রে বিচার ক'রতে হয়। যাই হোক্‌, তান্‌কাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, যা-কিছু ঘ'টেছে আকস্মিকভাবেই ঘ'টেছে, কারোর কোনো হাত ছিলো না, আমার জীবনের সব ঘটনাই এমনি আকস্মিক। এমন কি, ঠিক এইরকম আকস্মিকভাবেই আমি একটা লোককে গলা টিপে মেরেছিলাম। ইচ্ছে ছিলো না, তবুও। তান্‌কা! আমরা যে ব্যবসা ফেঁদেছিলাম তা কার টাকায় জানো? সেই লোকটার, যাকে আমি খুন ক'রেছিলাম।"

হঠাৎ উল্লসিত হ'য়ে ঘরময় নেচে বেড়াতে বেড়াতে একবার এর কাছে একবার ওর কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো কিরিক্‌: "পাগল, ও পাগল! দেখছেন না ওর চেহারাটা? শুনছেন না ওর কথাবার্ত্তাগুলো?

ও পাগল হ'য়ে গেছে। ইলিয়া, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হ'চ্ছে দোস্ত, সত্যি দুঃখ হ'চ্ছে!"

সংগে সংগে ইলিয়া হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

উঠে, ট'লতে ট'লতে ফেলিৎসাতা এগরফ্‌নার কাছে গিয়ে তাতিয়ানা কাঁপা গলায় ব'ললো ঃ

"কিছুদিন ধ'রেই আমি ওঁর এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রছিলাম—চোখে কেমন একটা বুনো দৃষ্টি, কথাবার্তাগুলো কেমন যেন উন্মাদের মতো—"

ইলিয়ার মুখের দিকে চেয়ে ফেলিৎসাতা বিজ্ঞের মতো ব'ললো ঃ

"তাই যদি হয়, তাহ'লে এখুনি পুলিশ ডাকা উচিত।"

কিরিক্‌ চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "পাগল হ'য়ে গেছে, ও পাগল হ'য়ে গেছে!"

ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চেয়ে গ্রিস্‌লফ্‌ ব'ললো ঃ "এইবার ও হয়তো আমাদের ধ'রে ঠেঙাবে!"

তারা কেউই দরজার দিকে এগোতে সাহস ক'রলো না, কারণ ইলিয়া দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার ভয়ে যে সবাই ভীত এতে খুবই খুশি হ'লো সে। তাছাড়া, প্রত্যেকটি অতিথির মুখ দেখে ওর ধারণা হ'লো, আভ্‌তনমফ্‌দের জন্যে তারা কেউ দুঃখিত তো নয়ই, বরং ভয় যদি না পেতো তাহ'লে হয়তো তারা সারা রাতই এই ঘরে ব'সে সানন্দে ওর মুখে তাতিয়ানার কেচ্ছা শুনতো। এতে ইলিয়া আরও খুশি হ'লো। তারপর ভ্রূজোড়া কুঁচকে কঠোর স্বরে ব'ললো ঃ

"পাগল আমি হইনি, কিন্তু সাবধান, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। যেতে আমি দেবো না আপনাদের এবং আপনারা যদি আমাকে আক্রমণ করেন, তাহ'লে ঠেঙিয়ে আপনাদের মেরে ফেলবো।"

এই ব'লে সে বাঘের থাবার মতো হাতের মুঠোটা একবার সামনে তুলেই নামিয়ে নিলো।

"আপনারা সব কেমনধারা মানুষ বলুন তো? বেঁচেই বা আছেন কিসের জন্যে? খালি খাওয়া আর খাওয়া—ছোটোলোক কোথাকার!"

কিরিক্‌ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো ঃ "এই, মুখ সামলে কথা বলো!"

তারপর একটু পরেই আবার ব'ললো ঃ "চোপরাও!"

"চুপ ক'রতে হয় আপনি করুন। আমি চুপ ক'রবো না। বেড়ে আছেন আপনারা—মদ-মুর্গি ওড়াচ্ছেন, পরস্পর পরস্পরকে ঠকাচ্ছেন—কিন্তু ভালোবাসার নামটি নেই—বাঃ, বেশ! আর এছাড়া আপনারা ক'রবেনই বা কি? এর বেশি কীই বা চাই আপনাদের! আমি কি চেয়েছিলাম জানেন? একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন। কিন্তু সেরকম জীবন কোথাও নেই! মাঝখান থেকে আমিই শুধু নোংরা হ'য়ে গেছি, খারাপ হ'য়ে গেছি। কোনো ভালো লোকই আপনাদের কাছে তিষ্ঠতে পারবে না, তুদিনেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। ভালো মানুষকে আপনারা তিলে তিলে দ'গ্ধে মারেন। আমি না হয় খারাপ লোক, কিন্তু আপনারা কী শুনি? এক একটা ধেড়ে ইঁদুর! আমার অবস্থা হ'য়েছে এঁদোঘর-ভর্তি ধেড়ে ইঁদুরের মধ্যে অসহায় বেরালের মতো। আপনারা সর্বত্র আছেন, ঝালে আছেন, ঝোলে আছেন, ভাবেন যে সবকিছুরই বিচার ক'রতে পারেন আপনারা, আইনও করেন ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু আসলে আপনারা পোকামাকড ছাড়া আর কিছুই নন। আপনারাই আমাকে নষ্ট ক'রেছেন।"

এই পর্যন্ত ব'লে হঠাৎ বিষণ্ণভাবে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন ক'রলো ইলিয়া:

"কিন্তু এখন কি ক'রবো?"

ইলিয়াকে আনমনে চিন্তা ক'রতে দেখে টেলিগ্রাফ আপিসের কেরাণীটি তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মুখ তুলে ইলিয়া ব'ললো: "ঐ যাঃ, একটাকে যেতে দিলাম!"

কেরাণীটা চীৎকার ক'রে ব'ললো: "আমি চ'ললাম পুলিশ ডাকতে!"

ইলিয়া ব'ললো: "যান, তাই ডেকে আনুন। এখন সবই সমান।"

তারপর তাতিয়ানাকে তার পাশ দিয়ে ট'লতে ট'লতে বেরিয়ে যেতে দেখে তাতিয়ানার দিকে চেয়ে একফালি গর্বের হাসি হেসে আবার বললো:

"আঘাত দিয়েছি তোমায়, অবশ্য দেওয়াই উচিত ছিলো। ইতর কোথাকার!"

ঘরের এক কোণে হাঁটু গেড়ে ব'সে একটা বাক্সের মধ্যে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে কিরিক্ চেঁচিয়ে ব'ললো:

"চুপ—চোপরাও!"

চেয়ারে ব'সে বুকের ওপর হাতদুখানা ভাঁজ ক'রে ইলিয়া জবাব দিলো :

"চেঁচাচ্ছেন কেন গাড়োলের মতো? চুপ করুন। স্ত্রীর জন্যে দরদ হ'চ্ছে, না? কিন্তু আমি ওকে ভালো ক'রেই চিনি, কারণ ওর সংগে আমিও শুয়েছি। সে-কথা যাক্। পলুএক্‌তফের কথা মনে আছে আপনার? সেই পোদ্দার পলুএক্‌তফ্—যার কথা আমি আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস ক'রতাম? সেই পলুএক্‌তফ্‌কেই আমি খুন ক'রেছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, তার টাকাতেই আমাদের দোকান খোলা হ'য়েছিলো।"

তারপর ইলিয়া ভাবলো : "কিন্তু এইবার?"

সংগে সংগে হঠাৎ আবার ব'লে উঠলো :

"আপনি কি ভাবছেন আপনার কাছে আমি দোষ স্বীকার ক'রছি? প্রমাণ করুন তো দেখি একবার। আপনার সংগে একটু রগড় ক'রছিলাম, এই যা।"

এমন সময় কিরিক্ লাফিয়ে উঠলো, মুখখানা তার লাল, চুল উস্‌কোখুস্‌কো, হাতে একটা পিস্তল। চোখের তারাদুটো উন্মাদের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে কিরিক্ ব'ললো :

"এইবার পালাও তো দেখি! আহা-হা, তাহ'লে পলুএক্‌তফ্‌কে তুমিই খুন ক'রেছিলে, কেমন?"

ভয়ে স্ত্রীলোকগুলো কেঁপে উঠলো! ত্রাভ্‌কিন্ ব'ললো :

"শুনুন, আমি এখানে আর থাকতে পারছি না, আমাকে যেতে দিন, এ হ'লো আপনাদের প্রাইভেট ব্যাপার, আপনারা নিজেদের মধ্যেই বুঝুন।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে, কিরিক্ তখন নিজের আনন্দেই বিভোর। ইলিয়ার সামনে পিস্তলটা ধ'রে নাচতে নাচতে সে ব'ললো :

"সবুর করো, তোমাকে সাইবেরিয়ায় পাঠাচ্ছি।"

ক্লান্ত চোখে কিরিকের দিকে চেয়ে নির্বিকারভাবে ব'ললো ইলিয়া :

"আশা করি আপনার পিস্তলে গুলিও ভরা নেই? কিন্তু এতো লাফালাফি ক'রছেন কেন? আমি কোথাও যাবো না, ভয় নেই। যাবার কোনো জায়গাও নেই আমার। আপনি আমাকে সাইবেরিয়ার ভয় দেখাচ্ছেন? বেশ, না হয় সাইবেরিয়াতেই পাঠাবেন।"

শোনা গেলো চাপা গলায় ত্রাভ্‌কিনের স্ত্রী ব'লছে :

"আসুন, চ'লে এসো, আসুন।"

"ভয় ক'রছে, গিন্নী।"

ত্রাভ্‌কিনের স্ত্রী স্বামীর হাত ধ'রতেই স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ইলিয়ার পাশ দিয়ে মাথা নীচু ক'রে চ'লে গেলো। পাশের ঘরে তখন ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে তাতিয়ানা, মাঝে মাঝে তার গোঙানিও শোনা যাচ্ছে এ ঘরে। এদিকে ইলিয়ার বুকের মধ্যে একখানা শূন্য প্রান্তর যেন হাহাকার ক'রে ওঠে।

চিন্তিতভাবে চাপা গলায় ইলিয়া ব'ললো :

"এইবার আমার জীবন খতম হ'লো। অবশ্য, এর জন্যে আমার কোনো দুঃখও নেই। কিন্তু কে আমার জীবনটাকে ভেঙেচুরে দিলো?"

তার সামনে দাড়িয়ে বিজয়ীর মতো ব'ললো কিরিক আভ্‌তনমফ্‌ :

"তোমার কাহুনিতে কিন্তু ভুলছি না আমরা।"

"কে ভোলাতে চাচ্ছে আপনাদের? জাহান্নমে যান আপনারা। আপনাদের দুঃখ তো কেবল পকেট থেকে একটা দোআনি প'ড়ে গেলে। আমারও তাই। একটা কুত্তার জন্যে আমার দুঃখ হবে, তবু আপনাদের জন্যে হবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় কুত্তাদের সংগে না থেকে আমাকে মানুষের সংগেই থাকতে হ'য়েছে। কিন্তু পুলিশ আসছে না কেন? আমার আর ভালো লাগছে না। কিরিক নিকদিমিচ্‌, আপনি বরং চ'লে যান এখান থেকে, আপনাকে দেখলেই আমার গা বমি বমি করে।"

সত্যিই তাই। কিরিকের সামনে ব'সে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে না তার।

ইলিয়ার দিকে দেখতে দেখতে অতিথিরা একে একে ঘরের বাইরে চ'লে গেলো।—বলা ভালো, প্রায় বুকে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। তাদের যেতে দেখে ইলিয়ার মনে হ'লো কেবল কতকগুলো কালো কালো ধ্যাবড়া যেন ওর সামনে দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্ছে। হঠাৎ মুচকি হেসে ও ব'ললো :

"আসুন কিরিক্‌ নিকদিমিচ্‌, একা একা ল'ড়ে যাই।"

কিরিক্‌ গর্জন ক'রে উঠলো : "বুলেটে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।"

তাচ্ছিল্যের স্বরে ইলিয়া জবাব দিলো :

"কিন্তু বুলেট কি আছে আপনার? সে-কথা যাক। একা একা যদি লড়তেন তাহ'লে বেশ খানিকটা হাতের সুখ ক'রে নিতাম।"

এরপর ইলিয়া আর কোনো কথা না ব'লে চুপচাপ ব'সে রইলো।

অবশেষে দুজন পুলিশকে নিয়ে একজন পুলিশ-অফিসার এসে হাজির হ'লো। তাদের দেখেই চমকে উঠে ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

পুলিশ অফিসারের কানের পাশ দিয়ে ডান হাতখানা ছুঁড়ে ইলিয়াকে দেখিয়ে তাতিয়ানা গলা-গলায় ব'ললো :

"ও আমাদের কাছে স্বীকার ক'রেছে যে, ও-ই পলুএর তক্ পোদ্দারকে খুন ক'রেছিলো।"

সংগে সংগে পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"কিন্তু প্রমাণ করতে পারেন?"

ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে ইলিয়াই জবাব দিলো :

"না পারার কারণ কি আছে? আমিই তো প্রমাণ ক'রতে পারি। বিদায় তান্‌কা, মন খারাপ ক'রো না, ভয়ও পেও না—কিন্তু কি যেন ভাবছিলাম —ও হ্যাঁ—তোমরা সকলে মিলে জাহান্নমে যাও।"

পুলিশ-অফিসারটি চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর একখানা কাগজ রেখে কি যেন লিখতে শুরু ক'রে দিলো, আর সেই সময় দুজন পুলিশ ইলিয়ার দুপাশে দাঁড়িয়ে তাকে পাহারা দিতে লাগলো। তাদের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ইলিয়া মাথাটা নীচু ক'রলো। ঘরখানা হঠাৎ যেন নিস্তব্ধ হ'য়ে যায়,—শব্দের মধ্যে কেবল কাগজের ওপর কলমের ঘসঘসানি। বাইরে শুধু অন্ধকার—কালো প্রাচীরের মতো। কিরিক দাঁড়িয়ে ছিলো জানলার সামনে অন্ধকারের দিকে চেয়ে। হঠাৎ পিস্তলটা ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে পুলিশ-অফিসারটিকে ব'ললো :

"সাভেলিয়েফ্। ওকে বরং দু ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও—ও পাগল।"

কিরিকের দিকে চেয়ে মিনিটখানেক ভেবে পুলিশ-অফিসারটি ব'ললো :

"না, সে অসম্ভব—বিশেষ ক'রে ওর এই উক্তির পর। তাছাড়া অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্‌রাও জেনে ফেলেছে।"

"কি কাণ্ড, কি কাণ্ড" ব'লে কিরিক্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

মাথা নাড়তে নাড়তে ইলিয়া ব'ললো: "কি দয়া আপনার কিরিক নিকদিমিচ্। কতকগুলো কুত্তা আছে যারা মার খেয়েও মনিবের পা চাটে। কিন্তু—হয়তো দয়াপরবশ হ'য়ে আপনি ও-কথা বলেন নি। পাছে বিচারের সময় সকলের সামনে আপনার স্ত্রীর মুখোস খুলে দিই সেই ভয়েই হয়তো ব'লেছেন, তাই না? কিন্তু কোনো ভয় নেই, তেমন কিছু ঘটবে না। ওর কথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়, নাম মুখে আনা তো দূরের কথা।"

কিরিক্ তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চ'লে গিয়ে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়লো।

পুলিশ-অফিসারটি জিজ্ঞাসা ক'রলো ইলিয়াকে:

"ওহে, নাম সই ক'রতে পারো?"

"পারি।"

কলমটা নিয়ে কাগজখানা না প'ড়েই ইলিয়া বড়ো বড়ো হরফে লিখে দিলো: **ইলিয়া লুনেফ**। তারপর মুখ তুলতেই দেখলো পুলিশ-অফিসারটি ওর মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো অফিসার:

"তোমার বিবেক কি তোমায় ও-কাজ ক'রতে ব'লেছিলো?"

ইলিয়া দৃঢ়স্বরে জবাব দিলো:

"আমার বিবেক নেই।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। পাশের ঘরে কিরিক্ ব'লে উঠলো:

"ও একটা পাগল!"

কাঁধ দুখানা নেড়েচেড়ে পুলিশ-অফিসারটি ব'ললো:

"চলো। আমি তোমার হাত বাঁধবো না, কিন্তু তুমিও পালাবার চেষ্টা করবে না। এখান থেকে হাজত খুব বেশী দূরে নয়, পাহাড়টার ঠিক নীচেই।"

ইলিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো:

"পালিয়ে, যাবো কোথায়?"

"তা আমি জানি না। ভগবানের দিব্যি ক'রে বলো যে পালাবে না!"

পুলিশ-অফিসারের বলিরেখাময় মুখখানার দিকে চেয়ে রুক্ষ গলায় ইলিয়া ব'ললো :

"আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।"

পুলিশ-অফিসার হুকুম দিলো :

"মার্চ্!"

রাস্তায় নেমে রহস্যময় রাত্রির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যে একটু দাঁড়িয়ে, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিয়া আকাশের দিকে তাকালো। আকাশ প্রায় কালো এবং মনে হ'লো পৃথিবীর যেন খুবই কাছে—অনেকটা কোনো খুপরির ঝুল-ধরা কড়িকাঠের মতো।

বাঁ পাশের পুলিশটা ব'ললো : "পা চালাও!"

ইলিয়া পা বাড়ালো। রাস্তার দু-ধারে বাড়িগুলোকে দেখাচ্ছে বিরাট বিরাট পাথরের মতো, পায়ের চাপে কাদায় শব্দ হচ্ছে যোঁপানির মতো, আর রাস্তাটা যেখানে গিয়ে মিশেছে সেখানটা যেন আরও অন্ধকার।

যেতে যেতে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে ইলিয়া কোনোরকমে টাল সামলে নিলো। তারপর আবার সেই চিন্তা :

"কিন্তু এর পর?"

আর সংগে সংগে ভেরার বিচারের দৃশ্যটা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। যেন শুনতে পেলো গ্রমফের শান্ত কণ্ঠস্বর, যেন দেখতে পেলো পেত্রুহার লাল মুখখানা।

পাথরে হোঁচট খেয়ে ইলিয়ার পায়ের আঙুলগুলো টনটন ক'রতে লাগলো।

আরও ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে পড়লো বড়লোকদের সম্বন্ধে সেই কালোমতো লোকটির নির্ভীক কথাগুলো :

"ওরা বোঝে ঠিকই, তাই ওরা এতো কঠোর!"

তারপর ও শুনতে পেলো গ্রমফের সেই খোসমেজাজী প্রশ্ন :

"তুমি কি তোমার দোষ স্বীকার ক'রছো?"

মনে হ'লো পাব্লিক প্রসিকিউটর্ যেন ব'লছে :

"আসামীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—"

তারপর পেত্রুহার সেই নোংরা বাঁকা হাসি!

এইবার খোঁড়াতে শুরু ক'রলো ইলিয়া এবং হাঁটতে লাগলো আরও ধীরে ধীরে।

ডান পাশের পুলিশটা ধ'মকে উঠলো :

"এই, জোরে জোরে পা চালাও !"

একটা মর্মান্তিক দুঃখ যেন ছুরির মতো বিঁধলো ইলিয়ার বুকে। সংগে সংগে হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু ক'রে দিলো সে। পুলিশদুটো তাজ্জব ব'নে গেলো। ইলিয়া ছুটে চ'ললো—যতো জোরে পারে—পাহাড়ের ঢালু বুকের ওপর দিযে—পাথরে হোঁচট খেতে খেতে—হাহাকারী বাতাসের বুক চিরে—অন্ধকারে হাঁপাতে হাঁপাতে। তার পিছনে পিছনে ভারি পা ফেলে ছুটতে লাগলো পুলিশ, বাতাস দীর্ণ হ'লো পুলিশের বাঁশির শব্দে, আর সংগে সংগে একটি কর্কশ কণ্ঠ গর্জন ক'রে উঠলো :

"ধরো, ধরো ওকে !"

ইলিয়া তখনো ছুটছে—প্রাণপণ ছুটছে। যন্ত্রণা নেই, ক্লান্তি নেই, কে যেন দুখানা পাখা লাগিয়ে দিয়েছে ওর দুপায়ে। না, পেত্রুহাকে ও আর দেখতে চায় না, কিছুতেই না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা হতাশার সাপ যেন হঠাৎ ফণা তুলে ধরলো ওর সামনে। ওর মনে প'ড়ে গেলো রাস্তাটা ঘুরে গেছে 'হাই স্ট্রীটে', আর সেখানে গিয়ে প'ড়লেই লোকজন ওকে ধ'রে ফেলবে।

ইলিয়া চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো : "ওরে মন, উড়ে চল্ !" তারপর মাথা নীচু ক'রে আরও জোরে ছুটে চ'ললো সামনের দিকে। হঠাৎ কালো রঙের একটা পাথুরে দেয়াল ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। তারপর শুধু একটি শব্দ। ঠিক যেন নদীর বুকে ঢেউয়ের আছাড় খাওয়ার মতো। দেখতে দেখতে শব্দটা মিলিয়ে গেলো রাত্রির অন্ধকারে সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি তুলে।

তারপর দুটি মনুষ্যমূর্তি সেই পাথুরে দেয়ালটাকে লক্ষ্য ক'রে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এলো পাহাড়ের গড়ানে বুক দিয়ে। আর-একটু এগিয়ে ঠিক দেয়ালের গোড়ায় তারা দেখতে পেলো একটি মূর্তিকে। সংগে সংগে তারা ঝাঁপিয়ে প'ড়লো তার ওপর, কিন্তু উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাড়ি। ইতোমধ্যে আরও কতকগুলো লোক নেমে এলো পাহাড় থেকে। তাদের পায়ের শব্দে, হাঁকডাকে আর পুলিশের বাঁশির আর্তনাদে বাতাস যেন কেঁপে উঠলো।

পুলিশদুটোর একজন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা ক'রলো :

"গতরটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, না? যা ছোটান ছুটছিলো!"

দ্বিতীয় পুলিশটি দেশলাই জেলে মাটিতে উবু হয়ে ব'সতেই দেখতে পেলো তার পায়ের কাছে প'ড়ে র'য়েছে একখানা মুঠো-করা হাত এবং মুঠোটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

"মাথাটা যেন একেবারে ফানুসের মতো ফেটে গেছে!"

"ঐ যে দেখো, ঘিলু দেখা যাচ্ছে।"

অন্ধকারের মধ্যে থেকে আরও কতকগুলো কালো কালো মনুষ্যমূর্তি লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

যে পুলিশটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলো সে আস্তে আস্তে ব'ললো :

"ছিছিছি, একি ক'রলি হতভাগা!"

তার সঙ্গীটি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর হাতদুখানা ক্রুশের আকারে রেখে ক্লান্ত, ধরা-গলায় ব'ললো :

"সে যাই হোক্, হে ভগবান, তুমি ওর আত্মার শান্তিবিধান ক'রো!"